সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ

সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ

সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ

চতুর্থ খণ্ড

প্রাইমা পাবলিকেশন্স
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭

মুদ্রাকর
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৯০এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

দাম : পঁচিশ টাকা

আমার লেখা গল্পের এই সংগ্রহ তাঁদেরই কাছে আমার কৃতজ্ঞতার উৎসর্গ হয়ে রইল, যাঁদের শুভেচ্ছা আমার লেখকতার জীবনে সবচেয়ে বড় সহায় ও সম্বল হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ

সূচীপত্র—

অদ্ভুত সমন্বয়। যেমন উপাধ্যায়, তেমনি তাঁর জমিদারী আর খামার, বিষ্ণু-মন্দিরটাও তেমনি। সবই জরাজীর্ণ।

ষাটের ওপর বয়স হয়েছে উপাধ্যায়ের। গায়ের শিরাগুলি যজ্ঞসূত্রের জালের মতো কাঁধ বুক পিঠ ও পেটের ওপর ছড়িয়ে থাকে। এককালের সুগৌর লম্বা শরীর এখন বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে। একটা চোখে ছানি। গলার চামড়াগুলি গল-কম্বলের মতো ঝোলে। গরদের ধুতি শক্ত গেরো দিয়ে কোমরে বাঁধা, উঠতে-বসতে ভাল থাকে না, কাছা কোঁচা খুলে যায়। লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; দেখে মনে হয়, একটা নেড়া শ্বেতচন্দনের গাছ কাৎ হয়ে রয়েছে। একটু নড়ে উঠলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ ছড়ায়।

জমিদারী তথৈবচ। ছাব্বিশটা গ্রাম নিয়ে এত বড় কল্যাণঘাট মৌজা। এক-একদিন সূর্য ডোবে আর মুহুরী কালাচাঁদ খবর নিয়ে আসে, অমুক নম্বরের লাট নিলামে বিকিয়ে গেল বকেয়া খাজনার জন্য। তারপর আর একদিন আর এক নম্বরের।

খামারও তাই। মরাইয়ে এক কণা দানা নেই। গোলাঘরের মটকীগুলো চামচিকে আর ইঁদুরের বিষ্ঠায় ভরা। বাঁশের বিরাট বিরাট চাঙ্গারিগুলোতে মরা আরশুলা।

খেতের দশা আর বলা যায় না। এঁটেল মাটি বছরে সাত মাস জল খায় না। লাঙলের ভোর ফেরে না, মই দিলে ঢেলা ভাঙে না। পিলপেটা বাউরী চাষী, হাই তুললে প্রাণবায়ু কাঁপে। জিরজিরে হাতে লাঙলের মুঠি ধরে, মুখ থুবড়ে পড়ে। নিড়েনে বসলে কোমর টাটায়।

বাথানে গোবর নেই। গরুগুলোর হাড় মোটা, পাছা সরু, সোজা শিং, পালান ছোট। খোল খড় জাউ পায় না। খিদের পেটে গুলের মুথী চিবোয়, শুয়ে শুয়ে ধোঁকে আর জাবর কাটে। বাছুরের গা চাটে না, গুঁতিয়ে সরিয়ে দেয়। বাঁটে দুধ নেই, জোরে টানলে শিরা ফাটে, রক্ত ফোটে!

জরাজীর্ণ শ্রীহীন কল্যাণঘাট মৌজা। মাঝে মাঝে নর তালগাছের বন, ফল হয় না, জটা ধরে। চাষীরা মাঠান ফসলের বীজ ছড়ায়, অধেক বীজ কলায় না। শিরকাঠি ভেঙে পড়ে। মাটিতে জো নেই, ভাদুই ফলে তো রবি ফলে না, আউশ হলে আমন নয়। ফলের গাছে গাছে ছাতা ধরে, গাছের পুষ্টি শোষে

ছাগলনাদির দল।

জলাগুলিতে জল নেই, খোঁড়া মোষেরা কাদা মাখে। বিলভরা শুধু কচ্ছপ, শোল, থুকচেলী রাজকাঁকড়া, ল্যাঠা আর চাপাবেলে। মাছগুলির মাথা বড়, ধড় ছোট, বেঁড়ে বামন চেহারা।

লঙ্কা ক্ষেতে মড়ক লাগে। লাল স্বর্ণমণিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরে পড়ে মরা ফড়িংয়ের মতো। শ্রাবণের জলে গাছ দাঁড়িয়ে যায়, জ্যৈষ্ঠের খরানিতে নেতিয়ে পড়ে—অঙ্কুর চোখ কল পোয়া রোগ, সবই পুড়তে থাকে। কল্যাণঘাটের মাটিতেও ঘুণ ধরে গেছে।

সপ্তাবরণ বিষ্ণুমন্দিরের বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ। প্রাচীরগুলো ভেঙে চুরে গড়িয়ে গেছে প্রান্তরের ঢালু ধরে নদীর খাত পর্যন্ত। ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বেনমতীর জলে রোদ আর কুয়াশার খেলা। সব ভেঙেছে, আছে শুধু বিমান গৃহটি। তবে নামমাত্র থাকা, ফাটল ধরেছে অনেকদিন।

বিমান ঘর ছেড়ে এগিয়ে গেলেই মনে হবে যেন শ্মশানে নামা হ'ল। ভগ্ন বিগলিত ও বিলুণ্ঠিত সব পাথরের মূর্তি। কেউ প্রোথিত পীঠচ্যুত, কেউ ধুলোয় ঢাকা। মাঝে মাঝে সেঁয়াকুল আর কামরাঙার বন। এক বিরাট দেব-ভূমির যত বিমানপাল, হবিরক্ষক আর কিন্নরমিথুনের জীর্ণ অস্থিমালা, পঞ্জর আর করোটি পিণ্ডীকৃত হয়ে রয়েছে। সে নিত্যাগ্নিকুণ্ডে এখন খুঁজলে এক টুকরো অঙ্গারও আর পাওয়া যায় না। হেমাস্থানে হবিচিহ্ন নেই—আছে বিছুটির ঝাড়। কত শত বৎসর ধরে কল্যাণঘাটের এই শ্মশানপ্রান্তরে পরিবার দেবতারা ঘুমোচ্ছে। এক অমোঘ পরিণামের ঝঞ্ঝাবাত দেবসংসারকে ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। ক্ষয়ে গেছে ক্ষয়ে যাচ্ছে! রাত্রিতে শুধু বিমানঘরে একটি বাতি জ্বলে। প্রথম যাজকের বংশধর বুড়ো উপাধ্যায় জেগে আছেন বিনিদ্র শ্মশানপালের মতো।

কোন্ অভিশাপের রোষে জতুগৃহের মতো ছাই হয়ে গেল এই শিলাময় শিল্প-বিভূতি? প্রদক্ষিণ-পথের ওপর শুধু ঠেসে জমে আছে কাদার পিণ্ড। দেবতাদের মাথার নাগছত্র আর দেবীদের প্রভামণ্ডল যুগ যুগ ধরে ভিজে শুকিয়ে ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাকা, অনুমতি, জয়া, অম্বা, ক্ষমা, জয়ন্তী আত্মগোপন করেছে বুনো ফুলের ঝোঁপঝাঁপের আড়ালে—অভিমানিনীর মতো মুখ লুকিয়ে আর এ অবহেলা সইতে পারে না। খণ্ড, কবন্ধ ও ছিন্নবাহু আয়ুধপুরুষেরা প্রান্তরের কাঁটাবন আর কাঁকরের শয্যায় লুটিয়ে রয়েছে। কামিনী আর ব্যজনীদের সে অভঙ্গ ঠাম এখনও নষ্ট হয়নি, কিন্তু হাতের চামড় ছিঁড়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। প্রধান দ্বারী প্রচণ্ডের মূর্তিটা অনেককাল হলো গড়িয়ে উধাও

হয়ে গেছে বেনমতীর স্রোতে। সঙ্গীহারা চণ্ড শুধু একা পড়ে আছে কাৎ হয়ে, ফাটল ধরে চৌচির হয়ে গেছে তার সমস্ত শরীর।

কোথায় সেই সুউচ্চ শুকনাসা শিখর আর বলম্বিত আমলক! শুধু ভগ্নস্তূপ, উচ্ছন্ন এক দেবতার উপনিবেশ। বিচূর্ণিত স্তম্ভ, কলস, হর্মিকা, শৃঙ্গ। ভগ্ন ও স্খলিত শঙ্খ, চক্র, গদা খড়্গ, পরশু, অঙ্কুশ, বজ্র! এক ঋদ্ধ নাগর দেবায়তনের চূর্ণাস্থি, শুধু মাঠ জুড়ে নুড়ির সমারোহ।

বিমানঘরে বাতি জ্বলে। কৃষ্ণশিলায় গড়া উত্তমদশতাল ধ্রুববেরর মূর্তি। বিক্রমখচিত আয়তস্র বেদীর ওপর ভোগশয়ান চতুর্ভুজ বিষ্ণু। ডানহাতে পদ্ম, বামহাতে কটকমুদ্রা। নীলোৎপল হাতে ভূমিদেবী বসে আছেন বাঁ পায়ের কাছে। একটু দূরে আদিশেষ নাগের বিষাক্ত নিশ্বাসে জর্জর মধু ও কৈটভ, হিংস্র ভ্রূকুটিকুটিল চোখের দৃষ্টি। দক্ষিণশীর্ষ জয়দ বিষ্ণু—গলায় বিলম্বিত বৈজয়ন্তী শোভা, বুকে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ। ব্যালোল কেয়ূরে মকরকুণ্ডলে ও করণ্ডমুকুটে শোভিত সৃষ্টিধর। এক বিরাট পাষাণের মহাকাব্য! মন্দিরগাত্রের চিত্রার্ধগুলি এখনও অক্ষত এক একটি ছন্দোবদ্ধ মহিম্ন স্তব যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিছুক্ষণের জন্য।

আরও মানুষ আছে কল্যাণঘাটে। তারা কে যে কোন্ যুগের লোক বলা দুরূহ। তবু তারা বেঁচে আছে, আর বাঁচতেও চায়।

তারক মিশ্র কন্যাদায়ে পড়েছে। মিশ্রের বউ পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কাছে দুঃখ করে, নিজেদের মন্দভাগ্যের কথা রটিয়ে বেড়ায়।—গরীবের ঘরে এমন অতি-বাড়ন্ত মেয়ে। দেখতে দেখতে ফেঁপে ফুলে একটা মাগী হয়ে পড়লো। কোন সম্বন্ধই ঘেঁসছে না, কি যে উপায় করি!

বনেদী দু'তিনটি মাত্র পাত্র ছিল। মিশ্র ঘটক লাগিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, কিন্তু ফল হয়নি কিছু।

আচার্যিদের কালীপদ, কাব্যতীর্থ পেয়েছে, টোল করে। ফর্সা রোগা রক্তশূন্য চেহারা, শূলব্যথায় কাতরায়। মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সে চায় এক, নীবারশূকবৎ তন্বী—নীবার ধান্যের শীষের মতো তন্বী; তার কবিমন আচ্ছন্ন করে আছে এই রকম একটি মূর্তি। এমন মূর্তি সে কখনও চোখে দেখেনি। তবু আশা ধরে আছে, একদিন হয়তো এ-ধ্যান সফল হবে।

ত্রিবেদীদের ছেলে জগদীশ। কালো বেঁটে চেহারা। জ্যোতিষ পড়েছে, ঠিকুজী লেখে। কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছে।

কালীপদর সঙ্গে তর্ক করে জগদীশ তার পছন্দের নমুনা শোনায়। নীলতোয়দ-মধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা—নীলমেঘের মধ্যে বিদ্যুল্লেখার মতো উজ্জ্বল। এই গুণের কোন মেয়ে পেলে সে বিয়ে করতে পারে। কাঞ্চন নাম মুখে আনতেই সে হেসে ফেলে। বিষ্ণুমন্দিরের কালো পাথরের অতিকায় দ্বারপালটার পাশেই ওকে মানাবে ভাল।

চক্রবর্তীদের নরহরি। ব্রাহ্মণ হয়েও কবরেজী করে। তবে সেটা তার বৃত্তি নয়, কারণ চিকিৎসার জন্য সে পয়সা নেয় না। শুধু দান নেয় আতপচাল কি তাম্রখণ্ড রৌপ্যখণ্ড। কাঞ্চনের চেহারাটা মনে পড়তেই মুখ কুঁচকে ওঠে। —ওকি মেয়েমানুষের চেহারা? মেয়েমানুষ হবে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

সময় পেলেই নরহরি বনবাদার ঢুঁড়ে বেড়ায়। মস্তর আউরে খুঁজতে থাকে আসল হস্তিকর্ণপলাশের গাছ, যার দুটি পাতা মধুসহ সেবন করলেই শত বৎসর পরমায়ু, মৃগেন্দ্রবিক্রম আর পদ্মরাগকান্তি। তারপর—অনাহত যৌবন এক লাস্যাধারা প্রমদা মূর্তি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আশ্চর্য, এরাও কল্যাণঘাটেরই মানুষ। এদের অতীত গেছে, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও অলীক। কৃষ্টিভ্রষ্ট দুর্ভাগারা—না ঘাটের না ঘরের। তবু টিঁকে আছে। বিদ্‌ঘুটে বিশ্বাস আর কল্পনাকেলিতে বেশ মনের আরামে মজে আছে সব। জীবন সরে গেছে বহু দূরে, তার জন্যে কোন দুঃখ নেই।

সব আশা ছেড়ে দিয়ে উপাধ্যায়ও যেন কালস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বসেছিলেন। এ ভাঙন আর থামবে না।

চোখে পড়লো, মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন চলেছে কাঁখের ওপর ভরা জলের কলসী জড়িয়ে। জীর্ণ শীর্ণ কল্যাণঘাটের বুকে যৌবনের চলৎ মূর্তি। এই কালো গেঁয়ো মেয়ে, গায়ে জামা নেই, খাটো শাড়িতে শরীর জড়ানো, টান করে খোঁপা বাঁধে। যেন প্রতিমালক্ষণ মিলিয়ে কেটে কুঁদে গড়া হয়েছে এই নিটোল উৎফুল্ল মূর্তি। কৃশমধ্যা সুগ্রীবা বিপুল-শ্রোণী চারুপীনপয়োধরা—হুবহু মিলে যায়। উপাধ্যায় আশ্চর্য হলেন। এই মেয়ের বিয়ের জন্য মিশ্রের এত দুশ্চিন্তা!

সকাল থেকে উপাধ্যায় আজ নিজের মধ্যে অদ্ভুত রকমের এক চঞ্চলতা অনুভব করছেন। উঠে দাঁড়াতে হবে। রক্ষা করতে হবে এই জমিদারী ক্ষেত খামার মন্দির। বসে বসে এ ভাঙন আর দেখলে চলবে না।

হাতের লাঠি ঘরের কোণে রেখে দিলেন উপাধ্যায়। স্নানের পর শুধু চন্দন-চর্চা নয়, মালতী কুঁড়ির একটা মালাও গলায় পড়লেন, গরদের ধুতি আর উড়ুনি একটু গুছিয়ে সাজ করে প'রে নিয়ে, সোজা টান হয়ে দাঁড়ালেন উপাধ্যায়।

মন্দির মণ্ডপের থাম ধরে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় তাঁর দৃষ্টি মেলে দিলেন মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল কল্যাণঘাটের প্রান্তর জনপদ ছাড়িয়ে, বেনমতীর বালুতট পার হয়ে দিগ্বলয় পর্যন্ত। উপাধ্যায়ের উষ্ণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভাবনার প্রবাহ উঠছে আর নামছে। সৃষ্টির পথে যেন মূর্তিরা সব ভীড় করে আছে। সুযৌবনা সুরম্যাঙ্গী পীনোর্বী পীনগণ্ডা। উপাধ্যায়ের আরক্ত কর্ণমূলে বিকেলের রোদ এসে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যা, ছায়া নামলো ধ্বংসস্তূপের ওপর। পাখীর কূজন এল থেমে। আকাশে তারা, বেনমতীর জলরোল, ঝাউবনের উচ্ছ্বাস, অক্লান্ত ঝিল্লীরব—সেই অদ্ভুত শব্দমায়াবৃত জীর্ণ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় শুনলেন সৃষ্টির গুঞ্জরণ। জরা সরে গেছে, তাঁর মূর্তিময় ধ্যানলোকের এক সুললনা নেমে এসেছে মাটিতে—মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন।

সকালবেলা শয্যাশায়ী উপাধ্যায়ের পিঠে ও কোমরে কবরেজী তেল মালিশ করতে করতে চাকর রামু অনুযোগ করে বললো—এ বয়সে অনিয়ম করলে কি আর সহ্য হয় কর্তাঠাকুর? কাল কি লাফালাফিটাই করলেন! শরীরের গাঁটে গাঁটে চোট লেগেছে খুব।

উপাধ্যায় আস্তে আস্তে বললেন,—আমায় একটু তুলে ধরে বসিয়ে দে তো রামু।

উঁচু বালিসে হেলান দিয়ে বসলেন উপাধ্যায়। চোখের কোলে চামড়ার ওপর লালচে ঘায়ের মতো দাগ পড়েছে। সমস্ত রাত না কাঁদলে এরকম কখনও হতে পারে না। কিন্তু সহজে হঠবেন না উপাধ্যায়। তাঁর প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়নি একটুকুও। -রামু, কালাচাঁদ মুহুরীকে এখুনি ডাকঘরে যেতে বল একবার। সোমনাথকে জরুরী তার করে দিক্—বাবা অসুস্থ, কাজ আছে, অবিলম্বে চলে এস।

একমাত্র ছেলে সোমনাথ থাকে কলকাতায়। পড়ে আর চাকরীর চেষ্টা করে। উপাধ্যায় ভূভারতে একটি মাত্র ঘৃণ্য স্থানের পরিচয় জানেন—কলকাতা। কথায় কথায় বলেন—কলকাতা নয়, ওটা কালসূত্র নরক। জীবনে মাত্র একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন। সাতদিনের বেশী টিঁকতে পারেননি। ধূলো গোলমাল ভীড়, গাড়িঘোড়া—কোনটাই তার কারণ নয়। সে অন্য ব্যাপার।

কলকাতায় এসে প্রথম দিনেই উপাধ্যায়ের চোখে পড়লো শাড়ি পরিহিতা এক মেমসাহেব। দৃশ্যটা বিভীষিকার মতো উপাধ্যায়ের মনে ও মস্তিষ্কে চেপে রইলো তিন দিন ধরে। তবুও সহ্য করে ছিলেন, কিন্তু ক'দিন পরেই আবার

দেখলেন গাউন পরা এক বাঙালী মেয়ে। সেদিনই কলকাতা ছেড়ে কল্যাণঘাটে ফিরে চলে গেলেন উপাধ্যায়। আর কখনও এমুখো হননি।

এ হেন কলকাতায় সোমনাথকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাবার সময় বুক কেঁপে উঠেছিল উপাধ্যায়ের। কল্যাণঘন বিষ্ণুর অভয়-মুদ্রার আশ্বাস স্মরণ করে সে দুঃসাহসিক কাজটাও করলেন। এতদিন পরে নিজেই আবার ছেলেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিলেন। সোমনাথ তার পেয়ে চলে এল কল্যাণঘাটে।

—আমার তো হয়ে এল সোমনাথ। এইবার তোকে দাঁড়াতে হবে। এই জমিদারী ক্ষেত খামার মন্দির, এক কথায় তোর ভবিষ্যৎ। আর তো নষ্ট হতে দেওয়া চলে না।

প্রতিবাদ করলো সোমনাথ।—আমার পড়া আর চাকরীর ভরসাটুকু নষ্ট করে, কলকাতা থেকে ডেকে আনিয়ে শেষে এইখানে আমার ভবিষ্যৎ দেখলেন আপনি? ঘটি ডোবে না, এই সব তালপুকুর নিয়ে আমার হবে কি?

—পুরুষের মতো কথা বলতে শেখ। উপাধ্যায়ের মেজাজ গরম হয়ে উঠলো। —কলকাতায় গিয়ে আর কিছু না হোক, মেরুদণ্ডটা হারিয়েছ। ঘটি ডোবে না, ওসব ফাজিল কথা মুখে এনো না কখনো!

প্রথম দিনেই বাপছেলের বার্তালাপে একটা মনোমালিন্যের বীজ বোনা হয়ে গেল। দু'জনের মাঝখানে আরও বড় সংশয়ের কুজ্ঝটিকা দু'জনকে আড়াল করে রাখলো। সোমনাথ একটু সতর্ক হয়ে গেল। সেই আশঙ্কাটাই হয়তো সত্য। উপাধ্যায়ও উৎকণ্ঠ হয়ে রইলেন। কলকাতায় গিয়ে সোমনাথের মতিগতি কিছু গোলমাল হয়ে যায়নি তো!

কিন্তু এরকমভাবে বেশীদিন চলে না। সোমনাথ একদিন দু'কান দিয়েই স্পষ্ট শুনলো। উপাধ্যায় বললেন—এইবার তোকে সংসারী হতে হবে। একবার বলবাহুর মতো তুই এই ভাঙা সংসারে দাঁড়া বাবা সোমনাথ। সবই তো রয়েছে, কিছুই যায়নি। শুধু দুহাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, যেন আর ভেঙে না পড়ে।

গলাটা একবার কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে উপাধ্যায় একটু বিশদ করেই বললেন—তারক মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন। দেবীর মতো সর্বসুলক্ষণা মূর্তি, তোর ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেছি। তারপর সুবিধে মতো একটা দিন স্থির করবো।

সোমনাথ প্রতিবাদ করে না, উত্তর দেয় না। শান্তভাবে সব শুনে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসে। সোমনাথের নির্লিপ্ততা উপাধ্যায়কে আঘাত দেয় সবচেয়ে বেশী। সমস্ত রাগ নিয়ে পড়ে কলকাতার ওপর।—ঐ কলকাতা

তোমাদের মাথা খেয়েছে, জাত খেয়েছে। যেদেশে ফিরিঙ্গীতে সংস্কৃত পড়ায় আর ভটচার্যি শেখায় ইংরেজী, সেদেশে থাকলে মতিগতি উল্টে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু ওসব চলবে না।

সোমনাথ বাপকে শ্রদ্ধা করতে আর পারছে না। উপাধ্যায়ের এই পিতৃত্বের স্পর্ধাটা একটা প্রেতের হুমকির মতো মনে হয়। পাথরের মূর্তিগুলোর মতই নির্বোধ-হৃদয়। ওর স্নেহটাও যেন একটা ব্যাধির আবদার।

রহিল তোমার কোদালী, বনে চলিল বনমালী—সোমনাথের মনে এই রকম একটা বিদ্রোহের ভাব মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে আনে। উপাধ্যায়ের উপদ্রব সহ্য করে যাওয়াটাই শ্রেয়, বুড়ো হাতির নষ্টামি লোক যেমন সহ্য করে। শুধু বাকি কটা দিন কোন মতে পার করিয়ে দেওয়া—মরে গিয়েও কিছু হাড় দাঁত দিয়ে যাবে, যার দাম নেহাৎ নগণ্য নয়। সোমনাথের বাইরের সুবাধ্যতার পেছনে এইরকম কোন মনস্তত্ত্ব হয়তো আছে।

চূড়ান্ত আশঙ্কাটা যতদিন সত্যে পরিণত না হয়, ততদিন চুপ থাকাই ভাল। ভূতের ভয় করছে ক্ষতি নেই, শুধু ঘাড় মটকাবার আগে সরে পড়লেই তো হলো।

উপাধ্যায়ের ঘরের বারান্দায় দু'জন সাহেব আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে উঠলেন। সোমনাথ এগিয়ে এল। উপাধ্যায় ঘরের ভেতর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে উঁকি দিয়ে এক একবার দেখতে লাগলেন।

সোমনাথ এসে জানালো—দু'জন ফরাসী আর একজন বাঙালী অধ্যাপক এসেছেন। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন।

উপাধ্যায় অপ্রসন্নভাবেই বললেন—তা দেখুক, আমার আপত্তি নেই! তবে জুতো খুলে রাখতে বল! আর ফটো তুলতে পারবে না।

সোমনাথ একটু আপত্তি করলো—এই কাঁটা আর কাঁকর ঠেলে ঘুরতে হবে, জুতো থাকলে দোষ কি?

—না, থাকবে না। উপাধ্যায় চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন।

ফরাসী সাহেব দু'জন স্তূপ দেখতে বেরিয়ে গেলেন সোমনাথের সঙ্গে। বাঙালী ভদ্রলোক একা বসে রইলেন। উপাধ্যায় আর একবার সন্দিগ্ধ চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে লাঠির ঠেলা দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। সোমনাথ আর সাহেবরা ফিরে এলে প্রশ্ন করলেন,—ও ভদ্রলোক এখানে ঠায় বসে রইল কেন রে?

—উনি হলেন—! সোমনাথ বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—উনি কি ?

—উনি অপৌত্তলিক।

—তার মানে ?

—উনি মূর্তি-পূজো করেন না, ওসব পছন্দও করেন না।

—হুঁ। উপাধ্যায় হুঙ্কার চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করলেন।

সকালের ট্রেনে এসে বিকেলের ট্রেনে ফিরতে হবে। অতিথিরা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন খুব। সোমনাথ তিনথালা খাবার সাজালো।

উপাধ্যায় একটা থালা লাঠির খোঁচা দিয়ে উল্টো দিলেন। বাকী দুটো থালা সাহেব দু'জনকে পরিবেশন করে নিজে তাদের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সোমনাথ রাগে ও লজ্জায় নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

—সর্বস্ব যে লুটে নিল! সোমনাথ ও সোমনাথ!

উপাধ্যায়ের বুকফাটা চিৎকারে সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। কালাচাঁদ মুহুরী খবর এনেছে, পশ্চিমের মাঠে একটা পাটল রঙের স্তম্ভ দু'ভাগ হয়ে পড়েছিল। আজ দেখা গেল, তার একটা খণ্ড গোবর্ধনের খিড়কির পুকুরে, কাঁচা ঘাটে পাতা রয়েছে। বাউরী মেয়েরা তার ওপর বসে বাসন মাজছে।

—ফৌজদারী করতে হবে সোমনাথ। আমার পাথর নিয়ে গেছে, আমি ওর মাথা নেব। উপাধ্যায় পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন।

সোমনাথ মনের বিরক্তি চেপে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।—হুঁঃ, ফৌজদারী করবে গোবর্ধনের সঙ্গে। ঢোঁড়ার তেজ দেখ। গোবর্ধন ইচ্ছে করলে যে তোমার মন্দিরের বিগ্রহটা কিনে নিতে পারে টাকার ওজনে।

উপাধ্যায়ের রাগ পড়লো গিয়ে সোমনাথের ওপর। কিছুক্ষণ কলকাতাকে গালাগালি দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন।

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা চলে। তখন মনে হয় মালিন্য যেন দূর হয় গেছে অনেকখানি। মিলনও অসম্ভব নয়।

উপাধ্যায় বলেন, শুনেছি সরকার থেকে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, এইসব পুরাকীর্তি রক্ষার জন্য। তুই কিছু জানিস নাকি রে সোমনাথ ?

—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।

—তবে একটু চেষ্টা কর না বাবা। ওরা যদি একটু যত্ন নেয়, সাহায্য করে, তবে মন্দিরটা বাঁচে। মূর্তিগুলোর এ অবহেলা বড় বুকে বাজে, আর সহ্য হয় না! বড় অভিশাপ কুড়োচ্ছি সোমনাথ।

উপাধ্যায়ের গলার স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায়। সোমনাথের মনের ভেতর যত উদ্ধত অশ্রদ্ধাপুঞ্জ মুহূর্তের জন্য একটা বেদনার স্পর্শে মমতায় অবনত হয়ে আসে।

গভীর বিশ্বাসে ভারি হয়ে আসে বুড়ো উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর।—দেবভূমি কখনো নিশ্চিহ্ন হতে পারে না সোমনাথ। ইতিহাস তার সাক্ষী। তাকৃলা মাকানের বালুর ঝড় স্তূপ বিহার চৈত্যগৃহকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। শোনগঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়ে নিতে পারেনি বুদ্ধগয়ার মন্দির। যে অক্ষয় শিলাশিল্পে দেবতা আশ্রয় নিয়েছেন, তার বিনাশ নেই।

নিরুত্তর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে উপাধ্যায় আবার মেজাজ হারাতে থাকেন। সোমনাথ যদি দু'চার কথায় আপত্তি প্রতিবাদও জানায়, তবে বুড়ো মনে মনে তবু খুশী হন; হাত দিয়ে যেন একটা অবলম্বন, ভবিষ্যতের একটা স্পর্শ অনুভব করেন। নইলে সবই শূন্য, অসহনীয় হয়ে ওঠে। আর, সেই আশঙ্কাটাই সত্য বলে মনে হয়।

উপাধ্যায় বুঝিয়ে বলেন,—কলকাতাকে এতটুকুও বিশ্বাস করিস্ না সোমনাথ! ওখানে সব ফাঁকি। কী দুর্ভাগ্য মানুষগুলোর। কলের জল খায়।

সবচেয়ে অপরাধ—কলকাতায় নাকি ভারতীয় শিল্পের চর্চা হয়। স্কুল ক'রে ছেলেদের ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়া শেখানো হয়।—আমি সে সব ছবি দেখেছি। মেমের কপালে টিপ এঁকে, কেয়ূর আর কুণ্ডল পরিয়ে দিয়ে যত খৃষ্টান পাদরীদের ঘুষখোর চর শিল্পাচার্য সেজেছে। কী ভয়ানক ব্যাভিচার।

সোমনাথ মৃদু প্রতিবাদ জানায়।—আপনি যতটা সন্দেহ করছেন ততটা নয়। ভারতের শিল্পকে তাঁরাও বোঝেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁরাই বরং এতদিন পরে আমাদের লুপ্ত শিল্পকলাকে উদ্ধারের কাজে লেগেছেন।

উপাধ্যায় উত্তেজিত হয়ে ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ফেলে দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর গিয়ে নিয়ে আসেন একটা পত্রিকা।—এই দেখ, কলকাতার ভাস্কর গড়েছেন এই রুদ্রমূর্তি। কি বস্তু এটা?

—কেন রুদ্রই তো। খারাপ কি হয়েছে!

—রুদ্র? একবার চোখ মেলে তাকিয়ে বল। একটা বেহেড মাতাল সাহেব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চুল উসকো-খুসকো করে দাঁড়িয়ে আছে। এই হলো রুদ্র? তোমার কলকেতে ভাস্করের হাত দুটো কেটে ফেলতাম কাছে পেলে।

অবসন্ন হয়ে উপাধ্যায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসেন। শুধু চিক-চিক করে চোখ দু'টো, অসহ অন্তর্দাহের দু'টো শিখা। আর একটু শান্ত হয়ে বলেন—মিছেই

রাগ করি না সোমনাথ। সেদিন কাগজে পড়লাম, আধুনিক এক বর্মী ভাস্কর ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গড়েছে। মূর্তির হাতে হাতঘড়ি আর চোখে চশমা পরিয়ে দিয়েছে। বলতো, কী সব অনাচার চলেছে?

সোমনাথ—না, এসব সত্যিই অন্যায়।

—এসব পাপ, এর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আরও শুনলাম, কথাটা সত্য কিনা জানি না। কলকাতায় নাকি এক বিলেতফেরত ভদ্রলোক দেবতার মুখোস পরে অশ্লীল লম্ফ-ঝম্প করে আর ভারতীয় নৃত্য নাম দিয়ে টাকা কামায়?

সোমনাথ যেন উপাধ্যায়ের মনের গহনে ক্ষতটাকে দেখতে পায়। তাই অভিমতগুলি বড় রূঢ় হলেও সোজা অস্বীকার করার মতো যুক্তি হাতড়ে পায় না। তবু একটা প্রতিবাদ দাঁড় করায়।—শুধু প্রাচীন ভারত নিয়েই তো চলে না। আধুনিক ভারতের, আধুনিক যুগের রীতি মানিয়ে চলতে হবে তো।

আধুনিক! কথাটা শুনেই উপাধ্যায় আবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। বিকৃত স্বরে বলেন—তোমার কলকেতে-শিল্পীরা ভারতীয়ও নয়, আধুনিকও নয়। ভারতীয় হবার মতো নিষ্ঠা নেই, আধুনিক হবার মতো প্রতিভা নেই। ওরা কিছুই নয়। যেন সাহেবরা বুঝতে পারে, এই ওদের লক্ষ্য। ছবি মূর্তি নাচ গান—সব। ভারতীয় হলে সাহেবরা বুঝতে পারবে না, এই ওদের ভয়।

নিশির ডাকে নয়, ঘুম এল না তাই। সোমনাথ ঘরের কপাট খুলে বেরিয়ে গেল। রাত্রির শেষ যাম, চাঁদ ডুবছে বেনমতীর ওপর। জল আর বালিয়াড়ির গায়ে লেগেছে তামাটে জ্যোৎস্নার আভা। কোন উদ্দেশ্য নেই, সোমনাথ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের চারদিকে।

একটা ঢিবি থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়লো, কেউ যেন কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখের ধাঁধা মাত্র। বৃষ্টির কাদা-জল লেগে ঢাকা পড়েছে শায়িত মূর্তিটা। হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে দিতেই হেসে উঠলো একটি মুখ। ললিতাসনা এক সৌম্য দক্ষিণামূর্তি—বরদা মুদ্রা। কী স্পষ্ট হাসি, আয়ত চোখে কী গাঢ় উজ্জ্বল দৃষ্টি। সোমনাথের সমস্ত শরীর একবার শিউরে উঠলো। ভয় ভয় করছে। তার সমস্ত ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞাকে যদি মূর্তিটা প্রশ্ন করে বসে। সোমনাথ অন্য পথে সরে পড়লো।

ক্লান্ত হয়ে সোমনাথ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো একটা অবলুণ্ঠিত ভাঙা তোরণের গায়ে। অদ্ভুত এক অনুভবের মোহ তার বিচারবুদ্ধিকে ঘিরে ধরেছে যেন। সময়ের ব্যবধান ভেঙে যাচ্ছে—এক সমুন্নত বিগত যুগের কোলে এসে পৌঁছে

গেছে সোমনাথ। ঢিপ ঢিপ করছে পাথরের মূর্তির বুকগুলি। তারা বেঁচে আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে কে? এক স্মেরমুখী নগ্না মূর্তি। সোমনাথ আচমকা দু'পা পিছিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। এ কে?

রভসে আকুল এক দিব্যাঙ্গনা অতিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে। গুরুনিতম্বে রত্নসূত্র, কঠিন কুচকলিকা আবেগে কোমল হয়ে রয়েছে। সুপুষ্ট বর্তুল দু'টি হাতে তুলে ধরে আছে পদ্মবীজের মালা, যেন গায়ে ছুঁড়ে মারবে। তার বুকের উত্তাপ লাগছে সোমনাথের গায়ে। চোখে মুখে উষ্ণ নিশ্বাসের ভাপ। অজস্র স্বেদবিন্দু কপালে চক চক করে ফুটে উঠলো। সরে গিয়ে তোরণের অপরদিকে হিমে ভেজা একটা কুশের ঝাড়ের ওপর বসে পড়লো সোমনাথ।

এই মূর্তিলোকের রূপ ও হৃদয় সে আজ যেন বুকের কাছে অনুভব করছে। এই বিরাট সুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এক উদ্দাম জয়জয়ন্তী রাগ। মূর্চ্ছাহত হয়ে রয়েছে এক প্রাচীন বৈভব। এই ন্যগ্রোধ আর নাগরঙ্গবনে উৎসবের প্রদীপ যদি আর একবার ঝলসে ওঠে, দেখা দেবে শত শত জীবন্ত নরনারীর রূপ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন, কপালে কাশ্মীরপত্রের লিখা—সুন্দর। ওর কুন্তলস্খলিত একটি ফুল কুড়িয়ে নিতে মন আকুল হয়ে ছুটবে।

কিন্তু এ নিশির ডাকের ঘোর আর কতক্ষণ? চাঁদ ডুবে গেল। দিনের আলোতে মাটি হয়ে দেখা দেবে এই রূপময় অতীত। কাঞ্চন বাতিল হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

উপাধ্যায় উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রতিদিনের কাজের একটা ছক বেঁধে নিয়েছেন। সকালে উঠেই কালাচাঁদ মুহুরীকে একবার ক'রে তাড়া দেন। প্রজাবাড়ি পাঠিয়ে দেন খাজনা উসুলের জন্য। দুপুরে বসে সোমনাথকে দিয়ে দরখাস্ত লেখান গভর্নমেণ্টের দরবারে। বার শত বছরের পুরাতন কল্যাণঘাটের এই বিষ্ণুমন্দির। হিন্দু সংস্কৃতির এই কীর্তিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন। এই অনাদৃত দেবভূমিকে আবার ঘসেমেজে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

তারপর বিকেলের দিকে আসেন তারক মিশ্র। কাঞ্চন আর সোমনাথের ঠিকুজি সুমুখে মেলে নিয়ে বসেন। বিয়ের কথা, দিনক্ষণের বিচার চলে। সোমনাথ বাইরে বেড়াতে চলে যায়।

মিশ্র চলে যায়। উপাধ্যায় আবার হাঁপিয়ে পড়েন। একটা শূন্যতা যেন

তাঁকে গিলে খাবার জন্য আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন—সোমনাথ, সোমনাথ!

সোমনাথ নেই। উপাধ্যায় আস্তে আস্তে ওঠেন। যে আশঙ্কা তাঁর মনে অনেকদিন থেকেই পুষ্ট হচ্ছিল, সেটা সত্য হয়েছে। উপাধ্যায় ক'দিন আগে এ সত্য আবিষ্কার করেছেন।

উপাধ্যায় সোমনাথের ঘরে এসে ঢুকলেন। সেই বাক্সের ডালাটা খুলে একটা মোটা ইংরেজী বইয়ের ভেতর থেকে বার করলেন ফটোটা। এক অনাম্নী তরুণীর ছবি।

উপাধ্যায় বিভোর হয়ে দেখেন, মুগ্ধ হন, শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ঘর ভাঙানিয়া এ মূর্তির চোখে অদ্ভুত হাসি। সপ্তাবরণ এই দেবায়তনের কোন দেবিকার চোখে এমন হাসি নেই। চোখে হাসি, মহাকালের এও এক নতুন সৃষ্টি। কি নিষ্ঠুরভাবে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী! হাসিও ঠোঁট থেকে সরে যায়, চোখে আশ্রয় নেয়। উপাধ্যায় নিষ্পলক চোখে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। কর্পূর প্রদীপের আলো নাচতে থাকে বিগ্রহের সম্মুখে। বাইরের মণ্ডপে স্তম্ভে চত্বরে আলোছায়ার চামর দুলতে থাকে। সে আলোড়নে জেগে ওঠে সারি সারি স্থানক আসীন ও শয়ান দেবতার দল। উপাধ্যায় যেন নষ্ট সম্বিৎ ফিরে পান। দ্রুত ফিরে এসে বিমান ঘরের একটা স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্চনা শেষে পুরোহিত চলে যান। গন্ধ ধূমে আচ্ছন্ন বাতাস নিশ্বাসে গিয়ে আবেশ সৃষ্টি করে, সমস্ত চিন্তাজাল এলোমেলো হয়ে যায়। উপাধ্যায় ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ক্ষুদ্রাঙ্ক নাটকের মতো এক একটা দিন উপাধ্যায় এইভাবে পার করে দিচ্ছেন।

এমনিভাবে একদিন তীব্র এক অনুশোচনায় উপাধ্যায় অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন নিজেরই দুর্বলতার জন্য। সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি আর কানে পৌঁছয়নি সেদিন। উপাধ্যায় দু'চোখের পিপাসা ঢেলে দেখছিলেন ফটো। এ কেমন মেয়ে—বেণী নেই, ফাঁপানো চুলের ভার কোমর পর্যন্ত নেমেছে। এই লোল রুক্ষ অলক ডাকিনীদের মাথাতেই শোভা পায়। কিন্তু তবু কি সুন্দর! গায়ে জামা, একটা শাড়ি লতার মতো রোগা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরেছে। হাতে দু'গাছি সরু চুড়ি, কানে হালকা ধরনের মাকড়ির মতো অলঙ্কার। পায়ে মঞ্জীর নেই, চামড়ার জুতো। কচি কচি মুখ, অনেকটা গৌরী কুমারিকারূপা। কিংবা তারচেয়েও ঢলঢল। চোখে সেই হাসি।

আরতির শেষে শঙ্খের ফুৎকার উপাধ্যায়ের কানে এসে আচমকা বাজলো।

কোন মতে বিগ্রহের সম্মুখে একটা প্রণাম সেরে উপাধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত রাত ছটফট করলেন একটা অশুচি জ্বালায়।

উপাধ্যায় ঘরের বারান্দায় মসৃণ মেজের ওপর একটা থামে ঠেস দিয়ে বসলেন। সামনে একটা পঞ্জিকা।

—সোমনাথ!

—সোমনাথ এসে সামনে দাঁড়ালো। উপাধ্যায়ের গলার স্বর দৃপ্ত আদেশের মতো।—দিন স্থির করে ফেলেছি, আসছে মঙ্গলবার। শুভ কাজে আর বেশী দেরী করা উচিত নয়। মিশ্রকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি।

সোমনাথ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সামনে বুড়ো উপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে। দু'চোখের দৃষ্টিতে হিংস্র স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়তে লাগলো।

—ওকি সোমনাথ। অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে তোর? উপাধ্যায়ের গলার স্বর সন্ত্রাসে থরথর করে উঠলো। সংহার জ্বালায় আকুল ত্রিপুরান্তক শিবমূর্তির চোখে এই দৃষ্টি উপাধ্যায় দেখেছেন!

– এই সংসারকে দাঁড় করাতে হবে। লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাঙতে দিলে চলবে না। এই পবিত্র কর্তব্যের দায় তুই ছাড়া আর নেবার কে আছে?

লাঠিতে ভর দিয়ে উপাধ্যায় উঠলেন। বোধহয় সোমনাথের হাত দুটো সাগ্রহে ধরতে যাচ্ছিলেন। একটা গরুরগাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে এসে থামলো সামনের পথে। ফাইল বগলে এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল।

আরও অনেক জিনিস নামলো। দশ বস্তা সিমেন্ট, আলকাতরা পাঁচ টিন, লোহার ছড় দু'বোঝা, দু'বস্তা জমাট পিচের টুকরো। খুরপি হাতে এক ছোকরা ওস্তাগরও নেমে এল।

সোমনাথ নিজের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। হতভম্ব উপাধ্যায় আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন—একি ব্যাপার?

কালাচাঁদ মুহুরী বুঝিয়ে দিল।—সরকারের লোক, ভাঙা মন্দির মূর্তি সব মেরামত করে দিতে এসেছেন। আপনি যে দরখাস্ত করেছিলেন, তা গ্রাহ্য হয়েছে।

সোমনাথ! সোমনাথ! ছোট ছেলের মতো ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলেন উপাধ্যায়। ছানি-পড়া চোখ ফেটে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়লো।

—সোমনাথ কি সব এসেছে দেখ। কি চায় এরা?

একটা পচা পাঁক আর পুরীষের গাদা যেন সামনে রাখা হয়েছে, দেবতাদের গায়ে ছুঁড়ে মারবার জন্য। সপ্তাবরণ দেবনিকেতনের সংস্কার করবে এরা? এই

সব মালমশলা? স্থবির উপাধ্যায়ের কাতর চিৎকার আবার বেজে উঠলো—সোমনাথ, শীগ্‌গির আয়!

সোমনাথ এল কিন্তু সামনে এসে আর থামলো না। হাতে একটা স্যুটকেশ। বারান্দা থেকে নেমে পড়লো পথে। তারপর আর দেখা গেল না।

আগন্তুক ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই চুপচাপ। কল্যাণঘাটের এক বিকলাঙ্গ বিগ্রহের মতো থামের গায়ে কাৎ হয়ে বসে রইলেন উপাধ্যায়। নির্বোধের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন স্টেশনের পথের দিকে।

মুহুরী কালাচাঁদ ধিক্কার দিয়ে উঠলো।—ছি ছি, যাবার সময় বাপকে একটা প্রণাম করে গেল না।

উপাধ্যায় আর গলা খুলে বলতে পারলেন না।—না, ও প্রণাম করতে পারে না।

কল্যাণঘাট যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। শ্বেত কৃষ্ণ ধূম্র পাটল বহ্নিবর্ণসন্নিভ কঠিন প্রস্তরের শত শত মূর্তি কীর্তি ও বিগ্রহ গলে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ধ্যানের স্রোতে। মজ্জমান উপাধ্যায় যেন শেষ দৃষ্টি মেলে দেখছেন—তীর সরে গেছে বহুদূরে। শুধু দিক্‌প্রান্তে জেগে রয়েছে অনাম্নী সুতনুকা এক মূর্তির ছলনা। চোখে অদ্ভুত হাসি।

ম নো বা সি তা

হারিয়ে গিয়েছে প্রতিভা সেনের সেই ছোট্ট হাতব্যাগ, রোজই অফিসে যাবার সময় আর অফিস থেকে ফেরবার সময় যে হাতব্যাগ প্রতিভা সেনের হাতে ঝুলতো, কিংবা কোলের উপর পড়ে থাকতো। রঙীন চামড়ার ছোট্ট হাল্কা হাতব্যাগ, তার উপর এমবস করা ছোট্ট একটি সাদা তাজমহল। এই তো মাত্র তিন মাস আগে লখনউ-এ বেড়াতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ কুটিরশিল্প প্রদর্শনীর একটা স্টল থেকে ব্যাগটাকে কিনেছিল প্রতিভা।

ছুটির পর অফিস থেকে বের হয়ে ডালহাউসি-বালিগঞ্জ ট্রামে ভিড় ঠেলে ওঠবার পরেও ব্যাগটা হাতেই ছিল। মনে পড়ে প্রতিভার, ট্রামটা মোড় ফিরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ভিতর দিয়ে যখন চলতে শুরু করলো, তখনও এই

ব্যাগটা প্রতিভার কোলের উপর ছিল।

নতুন আংটিটা আঙুলে বড় বেশি ঢিলে হয়েছে; তাই আঙুল থেকে প্রায় পড়-পড়ও হয়েছিল একবার। আংটিটাকে আঙুল থেকে খুলে নিয়ে ব্যাগের ভিতর কখন ভরেছিল প্রতিভা, তাও স্পষ্ট করে মনে পড়ে। ট্রামটা তখন ত্রিকোণ পার্ক পার হয়ে ছুটে চলেছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই। গড়িয়াহাটার মোড়ে নামবার সময় ব্যাগটা হাতে ছিল বলে মনে পড়ছে না। মনে হয়, ভুল করে ট্রামের সীটের উপরেই ব্যাগটাকে রেখে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে প্রতিভা।

উদ্বিগ্ন হয়ে ট্রাম ডিপোতে একবার ফোনও করেছিল প্রতিভা। কিন্তু জানা গেল, কোন হারানো লেডিজ-ব্যাগ ডিপোতে জমা হয়নি।

তবে তো কোন সন্দেহই নেই যে, কেউ একজন ব্যাগটাকে পেয়েছে আর নিয়ে চলে গিয়েছে। ব্যাগের ভিতরে নতুন আংটিটা আছে। সৎ মানুষের হাতে পড়লে আংটিসুদ্ধ ব্যাগটাকে পাওয়া যাবে। আর, কোন অসতের হাতে পড়লে সবই যাবে। আংটিটা ফেরত আসবে না, ব্যাগটাও না।

আংটিটা ছাড়া ঐ ব্যাগের মধ্যে আর যে-সব বস্তু আছে, এই পৃথিবীর দু'টি মানুষ ছাড়া আর কারও কাছে সে-সব বস্তুর কোন দাম নেই। দুটো চিঠি, আর একটা ফটো। প্রতিভার নামে অফিসের ঠিকানায় জয়ন্ত রায়ের যে চিঠিটা কাল এসেছে, সেই চিঠি। জয়ন্তর কাছে প্রতিভার লেখা যে চিঠিটা আজই পোস্ট করবে বলে ভেবে রেখেছিল প্রতিভা, সেই চিঠি। আর, প্রতিভা সেনের নিজের একটি হাফ পোস্ট-কার্ড সাইজের ফটো।

কিন্তু সত্যিই ব্যাগটা কোন সৎ লোকের হাতে পড়েছে, এমন সৌভাগ্যও যে আশা করতে পারা যাচ্ছে না। যদি তাই হতো, তবে কি এই তিন দিনের মধ্যেও কোন ভদ্রলোক এসে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে যেতেন না? অন্তত চিঠি দিয়ে তো জানাতেন যে, অমুক ঠিকানায় লোক পাঠিয়ে আপনার ব্যাগ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন! যার ব্যাগ, এবং যে অফিসে সে কাজ করে, তার পরিচয় তো ব্যাগের ভিতরের একটি চিঠির ঠিকানা দেখলেই বুঝে ফেলা যায়।

যারই হাতে পড়ুক ব্যাগটা, সে কিন্তু প্রতিভা সেনের জীবনের সবচেয়ে বেশি মায়াময় ও গোপন-করা একটা ঘটনার পরিচয় জেনে ফেলেছে। আশ্চর্য নয়, প্রতিভা সেনেরই পরিচিত কোন মানুষ, কিংবা কোন আত্মীয় মানুষের হাতে ব্যাগটা পড়েছে। কি বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল! হাওড়ার শিবপুরে থাকে, এবং অনেক টাকা হাতে নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে নেমেছে যে জয়ন্ত

রায়, তার সঙ্গে ডালহাউসি স্কোয়ারের মুর এণ্ড মরিসনের হেড অফিসের প্রতিভা সেনের অল্পদিনের চেনাশোনা ও মেলা-মেশার ইতিহাস ভালবাসার আবেগে মধুর হয়ে উঠেছে, এই ঘটনা যদি কোন পরিচিত বা আত্মীয় মানুষ জানতে পারেন, তবে? বিয়েটা হয়ে যাবার পর জেনে ফেললে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিয়ের আগে জেনে ফেললে যে লজ্জারই ব্যাপার হয়ে যায়। যদি বিয়ে শেষ পর্যন্ত না হয়, তবে তো ঘটনাটা প্রতিভার জীবনের একটা বিদ্রুপের, একটা গ্লানির গল্প হয়ে আত্মীয়দের আর পরিচিতদের মুখে মুখে ঘুরবে। শুধু লজ্জা নয়, ভয়ও পায় প্রতিভা।

এই ভোভার লেনে কাকার যে বাড়িতে থাকে প্রতিভা, সে বাড়িতে মুখচোরা মেয়ে বলে প্রতিভার যে একটু দুর্নামগোছের সুনামও আছে। কাকিমা বিয়ের কথা বললেই প্রতিভা শুধু একটা লাজুক হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্যি বিয়ে করতে চায় কি না-চায় মেয়েটা, কাকিমা স্পষ্ট করে কিছু বুঝতেও পারেন না। কাউকে বিয়ে করবে বলে মনে মনে কোন অনুরাগের কাণ্ড করে বসে আছে কিনা, তাও বোঝা যায় না। সেই মেয়ে যদি হঠাৎ এভাবে ধরা পড়ে যায়, যদি কোন লোক বাড়িতে এসে কাকিমার হাতেই হারানো ব্যাগটাকে দিয়ে যায়, তবে বাড়ির লোকের বিস্ময় দেখে প্রতিভাকে বিব্রত হতে হবে বৈকি। কেউ কেউ হয়তো বিরক্ত হয়ে একটা মন্তব্য করে বসবেন, ভাল করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ কোথাকার কার সঙ্গে এসব কাণ্ড করে বসলো প্রতিভা?

অফিস কামাই করে তিনদিন ধরে এক অদ্ভুত প্রতীক্ষার আকুলতা নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে প্রতিভা সেন, যদি কেউ ব্যাগটা ফেরত দিতে আসে! কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। কেউ আসে না। আর বুঝতে কিছু বাকিও থাকে না। কোন চেনা মানুষের হাতে নয়, কোন অপরিচিত সৎ মানুষেরও হাতে নয়, নিতান্ত এক অসৎ লোভী মানুষের হাতে পড়েছে ব্যাগটা; এবং সেই অসৎ লোকটা এতক্ষণে প্রতিভা সেনের জীবনের প্রথম অনুরাগের অদৃষ্টলিপি, সেই দুই চিঠিকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আবর্জনার মতো পথের ধূলোর উপর ফেলে দিয়েছে। আর, আংটিটাকে বাজারে বেচে দিয়ে টাকা গুনছে আর হাসছে।

ব্যাগ ফেরত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হয়। ধরা পড়ে যাবার যে ভয় করেছিল প্রতিভা, সে ভয় যখন আর নেই, তখন আর ক্ষতিই বা কিসের? আংটিটা গেল; একশো দশ টাকার ক্ষতি মাত্র। কিন্তু জয়ন্ত রায় আর প্রতিভা সেনের জীবন যে ভালবাসার বন্ধন চিরকালের মতো স্বীকার করে নেবার জন্য তৈরী হয়েছে, সে ভালবাসা তো ঐ দুটি চিঠি মাত্র নয়। সে ভালবাসা যে

প্রতিভা সেনের ভাবনায় নীরব কলরবের মতো বাজছে। সে ভালবাসা যে জয়ন্ত রায়ের জাগা চোখেও স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত রায়কে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

সেই কথাই তো ঐ চিঠিতে লিখেছিল জয়ন্ত রায়। আর দেরি করতে চায় না জয়ন্ত। জয়ন্তর ইচ্ছা, এই মাসেই যে-কোন একটি দিনে বিয়ে হয়ে যাক। এই ইচ্ছার কথাটুকু লিখতে গিয়ে জয়ন্তর কলম যেন একটা অভিমানের বিদ্রোহ ঢেলে দিয়েছে।—এখনও যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে প্রতিভা, আমাকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হতে পারবে না, তবে স্পষ্ট করে সে-কথা জানিয়ে দিও।

কি অদ্ভুত সন্দেহ! উল্টো সন্দেহ। এতদিন যে প্রতিভা সেনের মনেই এই সন্দেহ ছিল ; পৃথিবীতে এত সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে থাকতে জয়ন্ত রায়ের মতো মানুষ কেন প্রতিভা সেনের মতো মেয়েকে ভালবেসে ফেলে ?

এই মুর এণ্ড মরিসনের অফিসেই ম্যানেজারের কেবিনে জয়ন্ত রায়ের সংগে একদিন প্রতিভা সেনের দেখা। একটা ফাইল নিয়ে ম্যানেজারের কেবিনে প্রতিভাকে সেদিন উপস্থিত হতে হয়েছিল। সেই যে দেখা, সেই দেখার বিস্ময় আর অনুভব আর ক'দিনের আলাপ ও পরিচয়ের পর যেদিন আরও নিবিড় হয়ে প্রতিভা সেনের আর জয়ন্ত রায়ের মুখ রঙীন করে দিল, সেদিনের পর আর কেউ কোনদিন কারও কাছে মনের ইচ্ছা গোপন রাখতে পারেনি।

মুখোমুখি দেখা কমই হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় ? বরং মুখে যে-কথা বলতে গেলে নিঃশ্বাসটা লজ্জা পেয়ে বিচলিত হয়, সে-কথা চিঠির পাতায় অনায়াসে লিখে দিয়ে জয়ন্তর ভালবাসার মন সুরভিত করে দিয়েছে প্রতিভা। জয়ন্তের চিঠির কথাগুলিও যেন ভালবাসার আবেদনময় ঝংকার।

একবছরও হয়নি, কিন্তু আর কি-ই বা জানবার আছে ? নিজের মনের অনুভবের সত্য তো আর অস্বীকার করতে পারা যায় না। তাই জয়ন্তর শেষ চিঠির উত্তরে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে প্রতিভা।—বেশ তো, এই মাসের যেদিনে তোমার ইচ্ছে, সেদিনেই বিয়ে হয়ে যাক্ ; আমার একটুও আপত্তি নেই।

কিন্তু, কি বিশ্রী ব্যাপার! এই চিঠিটাই হারানো ব্যাগের সঙ্গে হারিয়ে গেল ? চিঠির উত্তর যেতে দেরি দেখে জয়ন্ত বোধহয় ভাবছে, প্রতিভা সেন নিশ্চয় জয়ন্তর ভালবাসার দাবি প্রত্যাখ্যান করতে চায়।

আজই অফিসের টিফিনের ছুটির সময় জয়ন্তর চিঠির উত্তর আবার নতুন করে লিখতে হবে। আর একটি দিনও দেরি করা উচিত নয়।

২

টিফিনের সময় হবার আগেই, অফিস ঘরে নিজের টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে যখন মস্ত বড় বড় যোগ-বিয়োগ করছে প্রতিভা সেন, তখন ডাকপিয়ন এসে অতি ক্ষুদ্র একটি রেজিস্টার্ড পার্শেল প্রতিভা সেনের টেবিলের উপর রাখে। প্রতিভারই নামে এই পার্শেল এসেছে।

চলে যায় ডাকপিয়ন। এবং পার্শেলটা খুলতেই প্রতিভা সেনের নিবিড়-কালো চোখ দুটো যেন একটা ভয়াতুর বিস্ময়ের ছোঁয়ায় চমকে কেঁপে ওঠে। সেই আংটিটা এসেছে। শুধু আংটিটা; সেই সঙ্গে ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা কয়েকটা কথা।—পার্শেলের উপর প্রেরকের নাম-ধাম সবই ভুয়ো জানবেন! আপনার আংটিটা ফেরত দেওয়া উচিত বলেই ফেরত দিলাম।

এই ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা চিঠিতে লেখকের কোন ভুয়ো নামও নেই, শুধু একটা শূন্যতা।

কিছু বুঝতে পারে না প্রতিভা। একটা বিশ্রী রহস্য বলে মনে হয় বলেই ভয় পায়। এ কেমন অদ্ভুত ধরনের সৎ লোক? অগোচর রাজ্যের এই হিতাকাঙ্ক্ষী? আংটিটা, যেটার দাম আছে, সেটাই ফেরত দিল, আর যেগুলির কোন দামই নেই, সেই চিঠি দুটো আর ফটোটা, সেগুলি ফেরত দিল না?

একটা নতুন উদ্বেগ; নতুন অস্বস্তি! মনে হয়, ভয়ানক ধরনের কোন অসতের হাতে পড়েছে ব্যাগটা। প্রতিভা সেনের জীবনের ভালবাসার এই ঘটনাকে নিয়ে একটা জঘন্য কৌতুকের খেলা খেলতে চায়; নইলে দুটি মানুষের ভালবাসার দুটি চিঠিকে, আর এক নারীর ফটোকে আটক করে হাতের কাছে কেন ধরে রাখলো লোকটা?

বিশ্রী একটা হিংস্রক ছায়া চোখের উপর যেন কামড় দেবার জন্য বার বার কাছে ছুটে আসছে। মুখ কালো করে বুকের ভিতরে আর্ত নিঃশ্বাসের দুরু-দুরু শিহরটা চাপতে চেষ্টা করে প্রতিভা। এবং, এই আতঙ্কের মধ্যেই আবার হঠাৎ শান্ত হয়ে গম্ভীর মুখে ভাবে, অন্তত এইটুকু বোঝা গেল, একশো দশ টাকা দামের একটা আংটির সোনার জন্য লোকটার মনে কোন লোভ নেই। অসৎ লোক না হতেও পারে।

ভাবতে গিয়ে বোধহয় প্রতিভা সেনের মনের যুক্তি-বুদ্ধির ছন্দও এলোমেলো হয়ে যায়। চুপ করে বসে এই রহস্যের বুকটাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করে প্রতিভা। সত্যিই কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নয় তো?

টিফিনের সময় পার হয়ে যায় ; জয়ন্তর চিঠির উত্তরে নতুন করে চিঠি লেখা আর হয় না। কি আশ্চর্য, এই রহস্যটা এসে প্রতিভা সেনের ভালবাসার জীবনের চরম ইচ্ছার ঘোষণাকে যেন বোবা করে রেখে দিল। কালও প্রতিভার চিঠি না পেয়ে জয়ন্ত রায় একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে সন্দেহ করবে, প্রতিভা সেনের ভালবাসার মুখরতা হঠাৎ মুখ বন্ধ করলো কেন ?

যাক্ গিয়ে, দু-চারটে দিন দেরি করে চিঠি দিলেও চলবে। শেষ পর্যন্ত সবই জানবে আর বুঝবে জয়ন্ত, কেন শেষ চিঠির উত্তর পেতে একটু দেরি হয়ে গেল।

৩

তিনটে দিন পার হয়ে গিয়েছে ; এবং মনেও আছে প্রতিভার, জয়ন্ত রায়ের চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অফিসের ঠিকানায় আবার একটা চিঠি এসে পৌঁছলো ; সেই অগোচর রাজ্যের এক অদ্ভুত হিতাকাঙ্ক্ষীর বেনামী চিঠি। বেশ বড় করে লেখা লেপাফাবন্ধ একটি চিঠি।

চিঠি পড়ে প্রতিভা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা সেনের নিবিড় কালো চোখের তারা থেকে যেন একটা দুঃসহ জ্বালার সাদা ছাই উড়তে থাকে। এই জ্বালা নিজের মনের উপর একটা তপ্ত ধিক্কারের জ্বালা। আর এই ধিক্কার যেন নিজেরই মনের একটা অন্ধতার উপর ধিক্কার। একি ভয়ানক বিদ্রূপের গান গাইছে হিতাকাঙ্ক্ষীর চিঠিটা।

…জয়ন্ত রায়ের কাছে লেখা আপনার চিঠিটা আমি নিজেই ডাকে দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত দিইনি। কেমন যেন মনে হলো ! সন্দেহ হলো, আপনি ভুল করছেন না তো ? তাই খোঁজ নিলাম, জয়ন্ত রায় কে, এবং কেমন মানুষ ?

…খোঁজ নিয়েই বড় ভয় পেয়েছি। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি। জয়ন্ত রায়কে বিয়ে করা আপনার উচিত নয়। জয়ন্ত রায় মোটেই সচ্ছল অবস্থার মানুষ নয়। অনেক টাকা নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে নেমেছে জয়ন্ত রায়, একথা নিছক মিথ্যা কথা। জয়ন্ত রায় রেস খেলা ছাড়া আর কোন কাজই করে না।

…জয়ন্ত রায় এর আগে তিন বার বিয়ে করেছে এবং পত্নীত্যাগ করেছে। জয়ন্ত রায়ের নামে অনেক পাওনাদারের মামলা চলছে। শিবপুরে যে বাড়িতে থাকে জয়ন্ত, সে বাড়ি জয়ন্তর বাড়ি নয়। এবং ভদ্রলোকের থাকবার বাড়িও নয়। ওটা জুয়ার আড্ডা।

…আমার কথা যদি অবিশ্বাস করেন, তবে অন্তত একবার হাওড়া পুলিশের কাছে খোঁজ নেবেন। তখন বুঝতে পারবেন যে, আমি একটি কথাও মিথ্যা বলিনি, এবং বাড়িয়েও বলিনি।

বাড়ি ফিরে গিয়ে এই চিঠি হাতে নিয়ে কাকিমার কাছে কেঁদে পড়ে প্রতিভা। এবং পরদিনই হাওড়া পুলিশের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এসে কাকা বললেন—খুব বেঁচে গিয়েছে প্রতিভা। জয়ন্ত রায় একটা অমানুষ।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে কাকাও একটা বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন।—তবু ভাবতে ভাল লাগছে জয়া, এরকম সৎ নিঃস্বার্থ ও হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষও আছে।

কাকিমা—কার কথা বলছো ?

কাকা—এই যে, চিঠি লিখেছেন অথচ নাম দেননি যে ভদ্রলোক !

কাকিমা—আংটিটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাকা—আশ্চর্য মানুষ। দেখতে ইচ্ছে করে।

দুদিন পরে একলা ঘরে বসে নিজেরই মনের ভাবনার মধ্যে এই সত্য অনুভব করে আর ছটফট করে প্রতিভা। প্রতিভা সেনেরও যে দেখতে ইচ্ছে করে ! এমন করে আড়ালে থেকে অকারণে প্রতিভা সেনের জীবনের এত বড় উপকার করে দিল যে, সে মানুষকে চোখে দেখবার জন্য মনটা মাঝে মাঝে বড় বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আরও আশ্চর্য, এই ব্যাকুলতার জন্য কোন লজ্জা পায় না প্রতিভা।

জয়ন্ত রায় একবার টেলিফোনে কথা বলেছিল। প্রতিভা সেন শুধু একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করে দিয়েছে।—কোন কথা বলতে চাই না।

অফিসে বসে কাজ করতে করতেই আনমনা হয়ে যায় প্রতিভা। টেলিফোনে কি সেই মানুষটির গলার স্বর কোন দিন শুনতে পাওয়া যাবে না ? কাছে এসে দেখা দিতে যদি বাধা থাকে, থাকুক। না আসুক। কিন্তু টেলিফোনে কথা বলতে কি বাধা থাকতে পারে ? একবার শুধু বললেই তো হয়, আমি আপনার উপকার করেছি। সেই মুহূর্তে প্রতিভাও তার মনের সব ব্যাকুলতা গলার স্বরে ঢেলে দিয়ে বলে দিতে পারবে, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ ! কিন্তু কে জানে, প্রতিভা সেনের কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ নেবারও লোভ আছে কিনা ভদ্রলোকের মনে ?

কিংবা, হয়তো প্রতিভা সেনের মতো মেয়েকে ঘৃণাই করেন ভদ্রলোক ? ভালবাসতে গিয়ে সত্য মিথ্যার বোধ হারিয়ে ফেলে, ভাল-মন্দ ঠাহর করতে

পারে না যে মেয়ে, তাকে ঘৃণা করে আর ভয় না করে পারবেনই বা কেন ?

কিন্তু ভদ্রলোকেরও কি আর একটা সত্য জানতে ইচ্ছে করে না ? জানতে পারলে যে নিজেই সুখী হবেন, তাঁরই চিঠির পুণ্যে প্রতিভা সেনের জীবন একটা মরণ থেকে বেঁচে গিয়েছে। জয়ন্ত রায়কে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভদ্রলোকের চিঠির অনুরোধ জয়ী হয়েছে। প্রতিভা সেনের অন্ধতা ঘুচে গিয়েছে।

জানতে পেরেছেন নিশ্চয়। যিনি এত খোঁজ নিতে জানেন, তিনি কি আর এটুকু খোঁজ না করে আছেন ? কিন্তু কই ? এই সামান্য কথাটাও তো লিখলেন না যে, দেখে সুখী হলাম, জয়ন্ত রায় নামে দুর্ভাগ্যটা আপনার জীবনের ক্ষতি করতে পারলো না।

জানতে কি ইচ্ছে হয় না ভদ্রলোকের, প্রতিভা সেন আবার কোন ভুল করলো কিনা ? সে মানুষের মনে এমন ইচ্ছে দেখা দেবে না, হতেই পারে না। মনে হয়, আড়াল থেকে খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু খোঁজ নিতে হলে যে প্রতিভা সেনকে দেখবারও দরকার হয়ে পড়ে ; সত্যিই কি, এই অদ্ভুত ভদ্রলোক আড়াল থেকে প্রতিভাকে দেখছেন ?

প্রতিভার মনের একটা সন্দেহ, কিন্তু সন্দেহটা যেন প্রতিভার মুখের উপর আলো ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে। না, সন্দেহ কেন হবে ? বিশ্বাস করতেই যে ইচ্ছে করে, প্রতিভার আসা-যাওয়ার উপর, প্রতিভার মুখের সব ভাবনাময় শিহরগুলির উপর নিয়ত চোখ রেখে আনাগোনা করেন ভদ্রলোক। প্রতিভার জীবনকে ভুলের ভয় থেকে আগলে রাখবার জন্য একটা মায়াময় শাসন, একটা সতর্ক উপকার প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ একটু দূরে দূরে থাকে বোধহয়। হয়তো মাঝে মাঝে খুব কাছাকাছি এসে প্রতিভার চোখের উপর দিয়েই চলে যায়। তার ছায়া এসে প্রতিভার গায়ের উপর পড়ে, তার নিঃশ্বাসের বাতাস প্রতিভার গায়ে লাগে ; কিন্তু তাকে চিনতে পারে না প্রতিভা। চেনবার উপায় নেই। কিন্তু কোনদিন কি চিনে ফেলতে পারা যাবে না ?

যেমন আফিসের শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে, তেমনি বাড়িতে, ঘরের নিভৃতে চুপ করে বসে থাকা অলস অব্যস্ততার মধ্যে, ভাবনাগুলি যেন প্রতিভা সেনের মনের ভিতরে ছটফট করতেই থাকে। দূর ছাই ! নিজেরই উপর রাগ করে প্রতিভা। এটাও যে একটা নতুন আপদ হয়ে উঠলো। ভাবতে ভাবতে শেষে হিস্টিরিয়ায় না ধরে বসে !

আবোল-তাবোল চিন্তার গ্রাস থেকে রেহাই পেতে চায় প্রতিভা। কিন্তু বুঝতেই পারে না, কি চেষ্টা আর কেমন চেষ্টা করলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। নিজের উপর আরও রাগ হয়, যখন বুঝতে পারে যে মনটাই ভাবনা-গুলিকে ছাড়তে চায় না। হিষ্টিরিয়ায় আর বাকি কি?

৪

সেদিন কাকিমাও হঠাৎ প্রতিভার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি-যেন ভাবনা করলেন বলে মনে হলো। কাকিমার চোখের রকম দেখে সন্দেহ করে অন্য ঘরে যাবার জন্য প্রতিভা এগিয়ে যেতেই কাকিমা গম্ভীর হয়ে বলেন—মিছিমিছি তোমার এত ভাবনা করা ভাল দেখায় না প্রতিভা। আবার কি যে ভাবছো, কে জানে?

না, ঠিক ভাবনা নয়। গুমরে রয়েছে প্রতিভা সেনের মন। হিতাকাঙ্ক্ষীর তুচ্ছতা যেন প্রতিভার সুন্দর মুখটাকে অপমান করেছে। প্রতিভার সুন্দর মুখেরও যে যথেষ্ট অহংকার আছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আর মিছিমিছি একটা বই হাতের কাছে টেনে নিয়ে, অলস ও উদাস হয়ে বসে থাকে প্রতিভা। সত্যিই তো, একেবারে মিছিমিছি! কাকিমার অভিযোগ একটুও মিথ্যে নয়। সেই হিতাকাঙ্ক্ষীর বোধহয় শুধু আত্মাটাই আছে, অবয়ব নেই। তাকে দেখতে পাওয়া যাবে, তাকে চিনে ফেলবে আর ধরে ফেলবে প্রতিভা, এই আশা নিতান্ত অবাস্তব আশা।

রাগ হয় সেই ভদ্রলোকেরই উপর; ভদ্রমহোদয় তাঁর উদারতার গর্বে নিজেকে একেবারে অদৃশ্য করে রেখেছেন বলেই না প্রতিভা সেনের ভাবনাকে বৃথা ভাবনা বলে মনে করেন কাকিমা; আর প্রতিভার আশা প্রতিভার নিজেরই কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়।

অফিসে যাবার সময় হতে এখনো অনেক বাকি আছে; তবু মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে তোয়ালে হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় মিররের কাছে একবার দাঁড়ায় প্রতিভা।

চমকে ওঠে, তারপর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে প্রতিভা! ভিতরের ঘরে কাকার সঙ্গে কথা বলছেন কাকিমা—প্রতিভা যার কথা ভেবে উতলা হচ্ছে, সে দেখা দিতে আসবে বলে মনে হয় না।

কাকা—অ্যাঁ? কার কথা ভাবছে প্রতিভা?

কাকিমা—ঐ সেই তার কথা, যাকে চেনে না প্রতিভা, হারানো আংটিটা

পাঠিয়েছে যে।

কাকা—কিন্তু তারও তো একবার এসে দেখা দেওয়া উচিত ছিল। এরকম একটা রহস্য হয়ে থাকবার দরকার ছিল না।

কাকিমা—বোধহয় প্রতিভাকে পছন্দই করে না।

কাকা—কি অদ্ভুত কথা বলছো? যাকে কোনদিন চোখে দেখলোই না, তাকে পছন্দ বা অপছন্দ করবে কেমন করে?

কাকিমা—আমার মনে হয়, প্রতিভাকে একবার না একবার দেখেছে।

কাকা—প্রতিভাকে দেখলে পছন্দ করবে না, এটাও যে বিশ্বাস হয় না। দেখে থাকলে পছন্দ হয়েছে। এবং পছন্দ হয়েও যে আসতে পারছে না, সেটা হলো লজ্জা, নয় তো ভয়।

আবার চমকে ওঠে প্রতিভা। ভয়ের চমক নয়, একটা উল্লাসময় আশার চমক। মিররের দিকে তাকিয়েও আশ্চর্য হয় প্রতিভা। মুখের চেহারা যে সব লজ্জার মাথা খেয়ে এক মুহূর্তেই বদলে গিয়ে হাসছে। যেন প্রতিভার হৃৎপিণ্ডটাই হাসছে। আর মনটাও একটা উতলা খুশির নিঃশ্বাসের সঙ্গে লুটোপুটি করছে। কোন সন্দেহ নেই, হিতাকাঙ্ক্ষী মশাই প্রতিভা সেনের মুখটাকে আড়াল থেকে দেখে মুগ্ধ হন, এবং সরে যান।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও প্রতিভা সেনের এই নতুন কল্পনার ছবিটা মনের ভিতর হেসে হেসে মাতামাতি করতে থাকে। অদৃশ্য হিতাকাঙ্ক্ষীরও মনের একটা গোপন কীর্তিকে যেন এতদিনে ধরে ফেলতে পেরেছে প্রতিভা। আর চিনতে বাকি কি? একশো দশ টাকা দামের আংটিটা ফেরত দিতে পারে, কিন্তু ফটোটা ফেরত দিতে পারে না। ইস্, কী নির্লোভ মন!

কিন্তু, সে কি এই লজ্জা আর ভয়ের জন্য চিরকাল নিজেকে প্রতিভার কাছে অচেনা আর অধরা করে রাখবে? প্রতিভা সেনের জীবনটাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে চিরটা কাল শাস্তি দেবে? এই মানুষটার মনেও কি হিস্টিরিয়া আছে? প্রতিভার ফটোটা চিরকাল বুকের কাছে লুকিয়ে রাখবে আর চোখের কাছে তুলে নিয়ে দেখবে অথচ প্রতিভার জীবন্ত চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলবে না? অদ্ভুত লজ্জা আর অদ্ভুত ভয়।

টেবিলের উপর হাত পেতে, আর সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে ও চোখ বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর যখন ঘড়ির দিকে তাকায় প্রতিভা, তখন বুঝতে পারে প্রতিভা, ঘড়িটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কারণ

চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে। শাস্তির পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোকের বোকা ভয় আর বোকা লজ্জার জন্যই এই শাস্তি।

কিন্তু...তাকে কি কোনদিন চিনে ফেলতে পারবে না প্রতিভা? কেন পারবে না? আবার মাথা ঝুঁকিয়ে, হাতের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে যেন একটা প্রতিজ্ঞার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে প্রতিভা। তাকে চিনতে হবেই। না চেনা দিয়ে যাবে কোথায়? প্রতিভা সেনের চোখও চারদিকের সব ছায়া, সব মুখ, সব দৃষ্টি আর সব নিঃশ্বাসের শব্দের উপর পাহারা রাখবে। দেখা যাক্, তাকে চিনতে পারা যায় কিনা?

অফিসে যাবার আগে আজ যেমন সাজে নিজেকে সাজায় প্রতিভা, মনে পড়ে না, তেমন সাজে সুষমার বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার দিনেও নিজেকে সাজিয়েছিল কিনা। মিররের দিকে তাকিয়েও মনে মনে স্বীকার করে প্রতিভা, প্রতিভার এই মুখের ছবিটা এর চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে কোনদিন ফুটে ওঠেনি। ভাগ্যের লীলাকলার রকম দেখেও মনে মনে একটা দুঃখের হাসিও হেসে ফেলে প্রতিভা। ভাগ্যটা যেন প্রতিভাকে ঘাড়ে ধরে এক অদ্ভুত হয়রানির অভিসারে পৃথিবীর পথের উপর ছেড়ে দিচ্ছে।

ছোট্ট সাদা তাজমহল আঁকা সেই রঙীন চামড়ার ব্যাগ, যে ব্যাগটা প্রতিভা সেনের জীবনে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছে, সেই ব্যাগটি তো আর নেই। প্ল্যাসটিকের নতুন একটি লেডিজ-ব্যাগ কিনেছে প্রতিভা। সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে অফিস যাবার সময় রোজই যেমন, আজও তেমনই বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারটার উপর কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রতিভা।

হঠাৎ শিউরে ওঠে প্রতিভা সেনের মুখ আর নিবিড়কালো চোখ। একটি মোটর গাড়ি মন্থর চালে চলতে চলতে রাস্তার ওপাশের গাছটার কাছে, এবাড়ির গেটের ঠিক ওদিকে এসেই থেমে যায়। গাড়ি ড্রাইভ করছেন যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোক গাড়ির ভিতরেই চুপ করে বসে তাঁর চশমাপরা দুই চোখ একেবারে অপলক করে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

চোখের সামনে মিরর নেই, তাই বুঝতে পারে না প্রতিভা, কি নিবিড় কৌতূহলের ভারে অলস হয়ে টলমল করছে প্রতিভার চোখ! মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারে না, প্রতিভা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকে। অচেনা কোন ভদ্রলোকের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকলে চোখ দুটো যে বেহায়া হয়ে যায়, এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও এই মুহূর্তে প্রতিভা সেনের চেতনা থেকেই যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে।

মোটর গাড়িটা আবার মন্থর চালে চলতে চলতে তারপর যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে উধাও হয়ে যায়।

ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম স্পঞ্জ করে প্রতিভা। ধূর্ত হাসির শিহর চাপতে গিয়ে বার বার ছটফট করে ওঠে। পাউডারের পাফ চটপট দু'বার ঘাড়ে আর গলায় বুলিয়ে নিয়েই বের হয়ে যায়।

৫

সেদিনের পর মাত্র আর দুটি দিন পার হয়েছে, ট্রামের ভিড়ের মধ্যেই দেখতে পায় প্রতিভা, দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক ; আর, দু'চোখ অপলক করে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যদিও ভদ্রলোকের সাজটা সেদিনের সাজের মতো নয় ; সেদিন ভদ্রলোকের গলায় একটা নীল রং-এর টাই ঝুলছিল। আজ আদ্দির পাঞ্জাবি, গলাটা খোলা। কিন্তু মুখটা যাবে কোথায় ? সেই সুশ্রী ঝকঝকে মুখ, আর সেই দু'চোখ অপলক করে তাকাবার অভ্যাস ?

গড়িয়াহাটার মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় যখন সেই ঝকঝকে মুখটিকে দেখবার জন্য খোঁজ করে প্রতিভা সেনের চোখের প্রখর চাহনি, তখন প্রতিভার চোখ দুটোই হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে যায়। কে জানে কখন আর কোথায় নেমে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রতিভা সেনের চোখের এই বিষণ্নতাই আবার, মাত্র দুটি দিন পার হয়ে যেতেই প্রসন্নতা হয়ে যায়। ফুটপাথ ধরে হেঁটে অফিসের প্রবেশ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পায় প্রতিভা, ফুটপাথের গা ঘেঁষে রাস্তার উপর একটা অচলন্ত গাড়ির ভিতরে নীল রং-এর টাই ফুরফুর করে উড়ছে। সেই অপলক দৃষ্টি। প্রতিভা সেনের সারা মুখ জুড়ে প্রসন্নতার হাসি মিষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সে হাসি মুখ ঘুরিয়ে লুকিয়ে ফেলে অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়ে প্রতিভা।

আরও কতবার ট্রামে দেখা হলো। সিনেমা হাউসের গেটের কাছেও দেখা হলো। লেক রোডে সুষমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল প্রতিভা। কি আশ্চর্য, সেখানেও ; সুষমাদের বাড়ি থেকে বের হতেই দেখতে পায় প্রতিভা, বেশ একটু দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুচকুচে কালো গাড়িটা, তার ভিতরে সেই ঝকঝকে মুখ। দূর থেকেই প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক ; যেন মুগ্ধ হয়ে দূর স্বপ্নলোকের একটা চাঁদের দিকে তাকিয়ে

আছে।

প্রতিভার চোখে একটা মৃদু ভ্রূকুটি যেন দুঃসহ অভিমানের শিহরের মতো কাঁপতে থাকে। প্রতিভা সেনের ফটো লুকিয়ে রাখতে ভয় নেই, লজ্জা নেই, যত ভয় কাছে এসে একটা কথা বলতে? ভদ্রলোকের ইচ্ছা, প্রতিভা আগে কথা বলুক। প্রতিভা আর কত বেহায়া হবে বলে আশা করছে এই অদ্ভুত হিতাকাঙ্ক্ষী? ছিঃ!

কিন্তু এরকম একটা অকারণ লুকোচুরির খেলাও যে অসহ হয়ে উঠছে।

তবু এই অসহ অবস্থাকেই অসহায়ের মতো আরও অনেকবার সহ্য করে প্রতিভা। সহ্য করতে বাধ্য হয়। ট্রামেতে আরও কতবার কাছাকাছি দেখা হয়েছে। সেই গাড়ি আরও কতবার ডোভার লেনের এই বাড়ির ছায়া পার হতে গিয়েই মন্থর হয়েছে, থেমেছে, আর চলে গিয়েছে। কথা বলবে বলে প্রতিভা নিজেই চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারেনি।

ঘরের নিভৃতে বসে চুপ করে ভাবতে গিয়ে প্রতিভার চোখের পাতা ভিজে যায়; কাকিমাও দেখে ফেলেন এবং দুঃখিত স্বরে ধমক দেন—তোমার হলো কি প্রতিভা? মিছিমিছি, ছিঃ।

মুখে বলতে পারা যায় না; কিন্তু লিখবেই বা কি করে? এই ঝকঝকে মুখের নাম-ধামের কোন পরিচয়ই যে জানে না প্রতিভা!

হেস্তনেস্ত করবার একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছটফট করতে করতে একটা অদ্ভুত চেষ্টার চেহারা প্রতিভার কল্পনায় ফুটে ওঠে। এই নতুন ব্যাগটাকেও একবার ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেললে কেমন হয়? ব্যাগ আটক করে রাখবার লোভ আর অভ্যাস আছে যার, সে কি আবার এই হারিয়ে ফেলা ব্যাগটাও আটক করবে না? আর, লোভীর মতো ব্যস্ত হয়ে সেই ব্যাগ খুলে ভালবাসার চিঠি পড়ে ফেলবে না?

কাণ্ডটা হিস্টিরিয়ারই মতো একটা কাণ্ড। কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন সে কাণ্ড করেই ফেললো প্রতিভা।

ট্রামেতে প্রতিভার সীটের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ভয় আর লজ্জার সেই মানুষ; সেই ঝকঝকে মুখ, সেই গলাখোলা আদ্দির পাঞ্জাবি!

ব্যাগটাকে সীটের উপরে ফেলে রেখে দিয়ে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে যায় প্রতিভা সেন।

—আপনার ব্যাগ ফেলে যাচ্ছেন। ঝকঝকে মুখের এতদিনের বোবাপনা হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুনতেই পায় না প্রতিভা। চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে ব্যাগটাকে বাইরে তুলে ধরে ডাকতে থাকেন হিতাকাঙ্ক্ষী—আপনার ব্যাগ!

কিন্তু দেখতেই পায় না প্রতিভা।

অনেকক্ষণ পরে, এবং অনেকখানি পথ পায়ে হেঁটে পার হয়ে শ্রান্তভাবে পথের এক পাশে থমকে দাঁড়ায় প্রতিভা। একি কাণ্ড হয়ে গেল! প্রতিভার অভিমানের চিঠি এই হারিয়ে ফেলা ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয় পড়ে ফেলেছেন হিতাকাঙ্ক্ষী।—আপনাকে চিনতে পেরেছি। বুঝতেও পেরেছি সব। কিন্তু বুঝতে পারি না, এত ভয়ই বা কেন আপনার আর এত লজ্জাই বা কেন? যদি আমাকে চিরকাল দেখবার ইচ্ছে থাকে, তবে অনায়াসে কাকার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতে পারেন। তাতেও যদি লজ্জা লাগে, তবে আপনার বাড়ির মানুষকে বলুন। আমাকে আর শাস্তি দেবেন না, এই অনুরোধ।

এই চিঠি পাওয়ার পরেও যদি ঐ ঝকঝকে মুখ ঠাট্টা করে হেসে ওঠে? কিম্বা প্রতিভা সেনের এই বেহায়া দুঃসাহসের কায়দা দেখে আরও ভয় পায় এবং অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে? প্রতিভা সেনের জীবন যে ব্যর্থ ভালবাসার একটা পঙ্কিল কবর হয়ে পৃথিবীতে পড়ে থাকবে।

বাড়ি ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে একা ঘরের ভিতরে বসে আর চোখ মুছে মুছে যেন বুকের ভিতরের একটা ভয় মুছে ফেলতে চেষ্টা করে প্রতিভা।

৬

ডোভার লেনের বাড়িতে ছোটখাট একটা ব্যস্ততার উৎসব। কাকা ব্যস্ত, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে চেয়ারের উপরে চুপ করে বসে থাকে যে প্রতিভা সেন, তারও বুকের সব নিঃশ্বাস ব্যস্ত।

এরই মধ্যে কাকিমা একবার এসে প্রতিভাকে ধমকে দিয়ে হেসে গিয়েছেন—সৌমেন তোমাকে বিয়ে করতে চায় আর তুমিও চাও, এই সোজা কথাটা আমাকে বলতে তোমার কি বাধা ছিল প্রতিভা? এ তো একটা সুখবর, এর চেয়ে ভাল সুখবর হয় না।

ভবানীপুরের নরেশ এটর্নির ছেলে ডাক্তার সৌম্যেন, যে সৌম্যেন ভিয়েনা থেকে ফিরে এসে এখন নিজেই একটা ক্লিনিক করেছে এবং এরই মধ্যে বেশ ভাল পশারও করেছে, সেই সৌম্যেন এখন ডোভার লেনের এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে বসে কাকা আর কাকিমার সঙ্গে গল্প করছে। সৌম্যেনের মা-ও

এসেছেন। কবে বিয়ে হবে, সেই দিনও স্থির করা হয়ে গিয়েছে।

ভয় ছিল প্রতিভার, একবার ঐ ভীতু আর লাজুক হিতাকাঙ্ক্ষী নিশ্চয় প্রতিভার সঙ্গে একটা না একটা কথা বলতে আসবেই। হয়তো এই ঘরের ভিতরেই এসে দাঁড়াবে। কাকিমাকে যে-রকম খুশি দেখা গেল, তাতে সন্দেহ করতে হয়, কাকিমা নিজেই সৌম্যেনকে এই ঘরের দিকে নিয়ে এসে আর ফেলে রেখে চলে যাবে।

ভয় হয় প্রতিভার, ভীতু লোকের একবার ভয় ভাঙলে বড় বেশি দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। যাকগে, হোক না একটু দুঃসাহসী। তাতেই বা ভয় কিসের?

প্রতিভাকে ডাকতে এলেন কাকিমা।—সৌম্যেন ডাকছে।

—কোথায়?

—বাইরের বারান্দায়। তুমিই সৌম্যেনের চা নিয়ে যাও প্রতিভা।

চা নিয়ে যায় প্রতিভা। আর, প্রতিভার এত দিনের অভিমানও যেন সৌম্যেনের একটি আহ্বানে মুছে যায়। সৌম্যেনই আগে কথা বলে—এস।

সৌম্যেনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেরই মুখের হাসির লজ্জায় আর নিবিড়-কালো চোখের ভীরু মুগ্ধতায় বিব্রত হয় প্রতিভা। আস্তে আস্তে বলে—আজ আর বেশিক্ষণ বসতে বলো না, বড় অস্বস্তি হচ্ছে।

সৌম্যেন হাসে—তা'হলে এস, হ্যাঁ, একটি কথা অন্তত শুনে যাও।

প্রতিভা - বল।

সৌম্যেন—আমি সত্যিই যেন এতদিন পাগল হয়ে গিয়ে মনে মনে তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারিনি যে তুমিও…।

প্রতিভা—আমি তো তোমারও আগে, তোমাকে দেখবারও আগে…। আচ্ছা, এবার যাই।

ডোভার লেনের বাড়ির এই ব্যস্ততার উৎসব শেষ হয়ে যেতে আর বেশি দেরি হয়নি।

যাবার আগে সৌম্যেনের মা প্রতিভার হাত ধরে বলে গেলেন—এবার চাকরি ছাড়তে হবে প্রতিভা।

দুপুর হয়, বই পড়তে বসে প্রতিভা সেনের চোখ ঠিক যখন একটা ঘুম-ঘুম আবেশে মজে আসতে থাকে তখন কাকিমা নিজেই এসে একটা চিঠি প্রতিভার হাতের কাছে রেখে দিয়ে চলে যান। একটা খামের চিঠি। ডাকে এসেছে চিঠিটা।

কার চিঠি? প্রতিভার চোখের ঘুম-ঘুম আবেশ যেন একটা কাঁটার খোঁচা

খেয়ে ছিঁড়ে যায়। হাতের লেখাটা যে চেনা মনে হয়।

হিতাকাঙ্ক্ষীর চিঠি।—দেখে খুশি হলাম। নিশ্চিন্ত হয়েছি। এবার আপনি ভুল করেননি। আমি এবারও খোঁজ নিয়েছি। ডাক্তার সৌম্যেন মিত্র অতি সজ্জন, অতি চমৎকার চরিত্রের মানুষ। সৌম্যেন ডাক্তারের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে খুবই ভাল হয়। সৌম্যেন ডাক্তার যদি রাজি থাকেন, তবে আপনিও রাজি হবেন, এই অনুরোধ করি।

চিঠিটাকে আঁকড়ে ধরে, একটা ভয়ানক আর্তনাদ বুকের ভিতরেই চেপে রেখে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে প্রতিভা। কি ভয়ানক এই রক্তমাংসহীন অদৃশ্য অশরীরী হিতাকাঙ্ক্ষী! আড়াল থেকে প্রতিভা সেনের অভিসারের পথ-বিপথের উপর চোখ রাখছে, প্রতিভা সেনের নির্ভুল ভালবাসার উপর মঙ্গলবারি বর্ষণ করছে।

প্রতিভা সেন যে মনে মনে এই হিতাকাঙ্ক্ষীরই বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী যেন প্রতিভাকে আদর করে তুলে নিয়ে সৌম্যেনের বুকের উপর রেখে দিল।

কিন্তু না। আবার পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হিতাকাঙ্ক্ষীরই অনুরোধ মাথা পেতে বরণ করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সৌম্যেনও তো মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। আড়াল থেকে দেখে সুখী হোক হিতাকাঙ্ক্ষী।

৭

মাত্র পাঁচটি দিনের অদেখার পালা শেষ হয়ে যাবার পর সৌম্যেনের সঙ্গে প্রতিভার আবার যেদিন দেখা হয়, সেই দিনটি হলো বিয়ের দিন। সময়টা সন্ধ্যা। আবার এই বাড়িতে একটা ব্যস্ততার উৎসব জেগে ওঠে।

হাতে হাত রাখা শুভ পরিণয়ের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রার চলে যান। তারপরেও ঘরের ভিতরে সৌম্যেনের সঙ্গে নানা আত্মীয়জনের আলাপের কলরব বাড়তে থাকে। আর, প্রতিভা বোধহয় এই সন্ধ্যার নতুন মনটাকে নিয়ে একটু একলা হবার জন্য বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

বারান্দার উপর সেই বেতের চেয়ারে বসে রাস্তার ওপাশের গাছের ছায়াটার দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে যায় প্রতিভার, ঐ তো, ঐ সেই গাছের ছায়া, যার দিকে তাকাতে গিয়ে সৌম্যেনের ঝকঝকে মুখ প্রথম চোখে পড়েছিল।

একটি লোক গেটের দিক থেকে এগিয়ে এসে বারান্দার উপরে ওঠে। রোগা-রোগা চেহারা, অথচ বেশ সুশ্রী এক ভদ্রলোক। বয়সও বেশি হবে না;

সৌম্যেনের চেয়ে কিছু কমই হবে বলে মনে হয়। ভদ্রলোকের সাজটা বেশ পরিচ্ছন্ন। কাকারই কাছে কোন মামলার কাজে এসেছেন বোধহয়।

চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভিতরে চলে যাবার জন্য প্রতিভা এগিয়ে যেতেই যুবক ভদ্রলোক বলে—আমি আপনারই কাছে এসেছি।

চমকে ওঠে প্রতিভা।—আমার কাছে?

খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো একটা বস্তু প্রতিভার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে হাসে—এই নিন, আপনার ব্যাগ।

প্রতিভার চোখ থরথর করে কেঁপে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিভা—আপনি?

—হ্যাঁ। এইবার ব্যাগটা ফেরত দেওয়া উচিত বলে মনে হলো, তাই দিয়ে গেলাম।

প্রতিভার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়—এতদিনের মধ্যে কেন ফিরিয়ে দিয়ে যাননি? কি অসুবিধা ছিল? এলেন না কেন? আসলেই তো পারতেন।

—আসা উচিত হতো না।

—কেন?

—আমি সামান্য মুহুরির চাকরি করি।

মাথা হেঁট করে প্রতিভা। প্রতিভার মুখের উপর যেন একটা বোবা কান্নার নির্মম জ্বালা লালচে হয়ে ফুটে উঠেছে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে প্রতিভা—আসেননি, ভালই করেছেন।

ব্যাগটা খোলে প্রতিভা। হ্যাঁ, আছে, সেই ভয়ানক ভুলের চিঠি দুটো আছে। ফরফর ক'রে চিঠি দুটো ছিঁড়ে দিয়ে ব্যাগের ভিতরে আবার কি-যেন খোঁজে প্রতিভা।—ফটোটা কই?

মুহুরি মানুষের চোখ দুটো হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে ওঠে।—ও হ্যাঁ, ভুল হয়েছে, মাপ করবেন। ফটোটা কালই ফেরত পাবেন। ডাকে পাঠিয়ে দেব।

প্রতিভা—ফেরত দিতে চান আপনি?

—না।

ভেজা চোখ মুছতে মুছতে ছটফট ক'রে বলে ওঠে প্রতিভা—তাহলে ফটোটা আপনারই কাছে থাক্।

তিনি নামেই প্রসাদবাবু; কিন্তু সাজে-পোষাকে একেবারে সাহেব। গায়ের রংটাও সাহেব-সাহেব, অর্থাৎ বেশ একটু লালচে ফরসা।

অনেক সখের মতো শিকারও কোন কোন মানুষের একটা সখ। কিন্তু শিকার হলো প্রসাদবাবুর জীবন।

শিকারের সুবিধার জন্যে জঙ্গলের কাছাকাছি একটা পাথুরে মাঠের এক কোণে প্রায়-একটা স্থায়ী ডেরা করে ফেলেছেন প্রসাদবাবু। এই জঙ্গলটার নাম দামুয়া-ভালুয়া, তাই প্রসাদবাবুর ডেরার নাম দামুয়া-ভালুয়া ক্যাম্প। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যেখানে গয়া জেলার সীমানার বড় বড় তাল গাছগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে আর একটি বেশ সুন্দর ম্যাকাডাম সড়ক দামুয়া-ভালুয়ার শাল খেজুর আর নিমের ঠাসা ভিড়ের বুক চিরে আরও ঘন ছায়াময় এক রহস্যের দিকে চলে গিয়েছে। এই সড়কের পাশে এক পাথুরে মাঠের উপর প্রসাদবাবুর দামুয়া-ভালুয়া ক্যাম্প।

অর্থাৎ তিনটি তাঁবু। একটি বড়, অন্য দুটি ছোট ছোট। ছোট দুটির একটিতে রান্নার কাজ হয়, আর একটিতে চাকরেরা ঘুমোয়। বড় তাঁবুতে থাকেন স্বয়ং প্রসাদবাবু। কখনো নেয়ারের খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘি-এ ভাজা হাঁসের ঠ্যাং দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান, আবার কখনো বা বনাতের আরাম চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে এক পাঁইট হুইস্কি আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ ক'রে দেন। তার পরেই হাতের কাছে একটা রাইফেল টেনে নিয়ে রাইফেলটার পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করেন।

কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো সন্ধ্যায়, এমন কি মাঝ রাতে এবং শেষ রাতেও জঙ্গলের বুক তল্লাস করতে বের হয়ে যান প্রসাদবাবু। চারজন চাকর মস্তবড় এক একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে, আর টর্চ টাঙ্গি বল্লম ও বন্দুক হাতে নিয়ে প্রসাদবাবুর দু'পাশে আর পিছনে থেকে জঙ্গলের ভিতরের যত সরু সরু ও আঁকা-বাঁকা রেখাপথ ধরে কাঁটাঝোপের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে থাকে। মাথার উপরে ফুরুৎ করে ভীরু পাখী উড়ে পালিয়ে যায়; বাঁ দিকে সুড়ুৎ করে একটা খরগোস দৌড়ে যায়, আর ডানদিকে একটা বুড়ো খেজুর গাছের গলা থেকে হিস্ ক'রে একটা রাগী গোখরো নীচের মাটির উপরে হঠাৎ ঝরে পড়ে। এগিয়ে যেতে থাকেন প্রসাদবাবু।

অনেকগুলি উইটিপির ভিড় পার হবার পর যে জায়গায় আসা যায়, সেখানেও একটা ডেরা দেখা যায়। জঙ্গলটা এখানে একটু ফাঁকা, ছোট-ছোট দু'তিনটে ভুট্টার ক্ষেত। দুটো জলকুণ্ডও আছে। একটি ঘরও আছে এখানে। অর্থাৎ মাত্র এক ঘর খোঁজি এখানে থাকে।

কাঁকর আর মাটি মিশিয়ে তৈরী দেয়াল। চালা বলতে ঐ হলো চালা। কতগুলি কাঁচা কচি শালগাছের শরীর আড়াআড়ি শুইয়ে রাখা হয়েছে। তারই উপর দুটো জীর্ণ ধনুকের দেহ পড়ে রয়েছে।

জানোয়ারের ঠিকানা জানে যে, এবং ঘুমন্ত অথবা জাগন্ত জানোয়ারের ডেরার একেবারে কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পথটি খুঁজে দিতে পারে যে, এই ঘর হলো সেই দক্ষ খোঁজি ভিখনের ঘর। কিন্তু ভিখন আজ আর নেই। আছে শুধু ভিখনের বউ মিঠি। মিঠিই আজকাল খোঁজির কাজ করে।

ঐ ছোট ছোট দুটি ভুট্টার ক্ষেত, আর এই খোলা জায়গাটুকু প্রসাদবাবুর দয়াতেই পেয়ে গিয়ে ভিখন খোঁজি এখানে ঘর বেঁধেছিল। চারটি বছর ধরে জঙ্গলের এই নিভৃতে বিচিত্র ও বিপুল এক শ্বাপদ-সংসারের প্রায় মাঝখানে খোঁজি ভিখনের সংসারও যেন এক নতুন শ্বাপদের নীড়ের মতো গড়ে উঠেছে। ভিখন ছিল এক পাকা শিয়ালগীর। শিয়ালের ডাক ডেকে সন্ধ্যার জঙ্গলের কত শিয়ালের মন ভুলিয়ে দিয়েছে ভিখন। জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে মাঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে শিয়ালের দল। ভিখনের পোষা দুটো শিক্ষিত কুকুর সেই মুহূর্তে তাড়া করে বনের শিয়ালকে ঘিরে ধরে খোলা মাঠের ঘাসের উপর চিৎ করে ফেলে গলা ছিঁড়ে দিয়েছে। তারপর সেই রক্তমাখা নিষ্প্রাণ শিয়ালের চামড়া ছাড়িয়ে, ঝরনার জলে ধুয়ে নিয়ে ঘরে চলে গিয়েছে ভিখন। প্রতি রবিবারে চৌপারন বাজারে গিয়ে মুচিদের কাছে চামড়া বেচে চাল আর নুন নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

মানুষটা ছিল সরকারী আইন অনুযায়ী ক্রিমিনাল ট্রাইবের মানুষ, যারা নাকি জন্ম থেকেই অপরাধ করবার স্বভাব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। পুলিশ ওকে এই জঙ্গলের কাছে এক মাসের জন্য থাকবার অনুমতি দিয়েছিল। একদিন কোথা থেকে ঐ মিঠি নামে কোন্ এক ঐ-রকমই ক্রিমিনাল ট্রাইবের মেয়েকে যোগাড় করে নিয়ে এল ভিখন। এবং একদিন প্রসাদবাবুর ক্যাম্পের কাছে দু'জনে এসে আবেদন জানালো—আপনার জমিদারীর ভিতর ঐ জঙ্গলটার এক কোণে থাকবার একটা হুকুমনামা দিন হুজুর; নইলে পুলিশ আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

একবার ভিখনের দিকে, তারপর অনেক বার মিঠির দিকে তাকালেন প্রসাদবাবু। তারপর লাল চোখের নেশার রং একেবারে তরল ক'রে দিয়ে বলেন—একটা ভালুকের সঙ্গে একটা হরিণী?

সত্যিই, ভিখনের চেহারাটা ভালুক-ভালুক আর মিঠির চেহারাটা হরিণী-হরিণী। ভিখনের মাথার বড় বড় রুক্ষ চুলের ঝাঁকড়াতে জটা ধরেনি, ফুলে ফেঁপে রয়েছে চুলগুলি। ভালুকের গর্দানের রোঁয়া ঠিক এই রকমই ফেঁপে থাকে।

আর মিঠি সত্যিই হরিণী-হরিণী। কাপড়ের একটা টুকরো, যার বহর দেড় হাতের বেশি হবে না, লম্বায়ও পাঁচ হাতের বেশি নয়, শুধু কোমরে এক-পাক আর বুকে আধ-পাক জড়ানো। একটা বুনো লতাকে কোমরবন্ধের মতো শক্ত করে বেঁধে রেখেছে মিঠি। যৌবনের উচ্ছলতা আর কোমল ছাঁদ বুনো লতার আর টুকরো কাপড়ের বাঁধনে যেন রাগ ক'রে আরও দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রসাদবাবুও মনে করেন, ঐ চেহারাতে জঙ্গলের যত কর্কশ স্নেহ দিয়ে পুষে রাখাই তো উচিত। নইলে বন্দী হয়ে পৃথিবীর কোন্ এক চিড়িয়াখানার গরাদের আড়ালে চলে যাবে।

ভিখন আর মিঠি প্রসাদবাবুরই প্রজা হয়ে গেল; প্রসাদবাবুর হুকুমনামার গুণে ওরা চাষী হয়ে গেল। কাজেই পুলিশও আইন অনুযায়ী ওদের আর তাড়িয়ে না দিয়ে দানুয়া-ভালুয়ার এই হিংস্র নিভৃতে ভুট্টা ফলিয়ে বেঁচে থাকবার অনুমতি দিল। সত্যিকারের চাষীদের একটা গাঁ কাছেই আছে, সামান্য একটু দূরে।

সেই ভিখন আজ আর নেই। কিন্তু সেজন্য প্রসাদবাবুর মনে কোন উদ্বেগ নেই। মিঠিও ঠিক ভিখনের মতো পাকা খোঁজির কাজ করতে পারে—জানোয়ারের খোঁজ পাওয়া যাক্ আর না যাক্, ক্যাম্পে ফিরে যাবার আগে প্রসাদবাবু মিঠিকে ভাল বকসিস দিয়ে যান। কোনদিন চার আনা, কোনদিন ছয় আনা।

এক একদিন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন প্রসাদবাবু। খোঁজে যেতে আপত্তি করে মিঠি। তার কারণ হলো, মিঠির ছেলেটা। ভিখন মারা যাবার এক বছর আগে এই ছেলেটা জন্মেছে, এখন বয়স প্রায় তিন বছর। ছেলেটাকে একলা ঘরে রেখে কাজে বের হতে ভয় পায় মিঠি। ঐ সত্যিকারের চাষীদের গাঁয়ে যে আখের ক্ষেত মিঠির ঘরের একেবারে কাছাকাছি এসে শেষ হয়েছে, সেই আখের ক্ষেতে দিনের বেলাতে হিংস্র হুঁড়ার ঘুরে বেড়ায়। টাঙ্গি হাতে না নিয়ে ঐ জলকুণ্ডের কাছেও যাওয়া নিরাপদ নয়।

মিঠির আপত্তি গ্রাহ্য করেন না প্রসাদবাবু। এখুনি বের হতে হবে মিঠিকে, জঙ্গলের ভিতরে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে হবে। আর, একেবারে মরির কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে যেতেই হবে। মিঠির হাতে একটা সিকি তুলে দেন প্রসাদবাবু। ছেলেটাকে কোন চাষীর বাড়ির খড়ের মাচানে বসিয়ে রেখে ফিরে আসে মিঠি। চকচকে টাঙ্গিটা হাতে তুলে নেয়। তার পরেই হেসে ফেলে সেই বুনো হরিণী—চলুন।

জঙ্গলের কোথায় সল্ট লিক আছে? জানতে চান প্রসাদবাবু।

মিঠি হাত তুলে দেখিয়ে দেয়—এই স্রোতের ওদিকে ঘাসের বনের কাছে আজকাল নোনা মাটি চাটতে আসে জানোয়ার।

ঠিক খোঁজ দিয়েছে মিঠি। একটুও মিথ্যে নয়। ঘাসের বনের কাছে এসে শত শত থাবার ছাপ দেখতে পান প্রসাদবাবু। টাটকা একটা ছাপ দেখে মনে হয়, মাত্র এক মিনিট আগে একটা বাঘ মাটি চেটে চলে গিয়েছে।

আজ কি কোথাও মরির খোঁজ পাওয়া যাবে? মিঠিকে প্রশ্ন করতেই হাতের চকচকে টাঙ্গির মতই একটি চকচকে হাসি চমকে ওঠে, এক টুকরো কাপড় পরা সেই বুনো হরিণীর গভীর কালো দুটি চোখে। মিঠি বলে—পাওয়া যাবে হুজুর।

খেজুরের ঘন ভিড় পাশে রেখে কাঁটাশিরীষের আর সোঁদালের জঙ্গল পার হয়ে প্রসাদবাবুর দল চলতে থাকে। আগে আগে পথ দেখায় মিঠি। সেঁয়াকুলের লতানো কাঁটা বড় বড় বহেড়া আর হরতকীর শরীর জড়িয়ে ধরেছে। গাছের পাতায় জলের ফোঁটা। ওগুলি কিন্তু শিশির নয়। গাছের ঘাম। মাছির দল গাছের সেই ঘাম শুঁকে শুঁকে গুনগুন করে।

হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে থমকে দাঁড়ায় মিঠি। বোধহয় পথ ভুল হয়েছে। প্রসাদবাবুর চাকরের দল ভয় পেয়ে আর রাগ করে মিঠিকে ধমক দেয়। তবু মিঠি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আসশেওড়ার একটা গাছ। সাদা সাদা ফুল মাটির ঘাসের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। একটা সুগন্ধও থেকে থেকে হাওয়াতে ভেসে আসছে। দেখতে পান প্রসাদবাবু, মিঠির কোমর ছুঁয়ে দুলছে কতগুলি বনযোয়ানের মঞ্জরী।

চাকরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন প্রসাদবাবু। সেই মুহূর্তে অভিজ্ঞ চাকরও ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ব্যাগ থেকে একটা গেলাস বের করে আর হুইস্কি ঢেলে প্রসাদবাবুর হাতে ধরিয়ে দেয়। প্রসাদবাবুর চোখেও রঙীন নেশা ধরে।

—কি দেখছো মিঠি? দেরি কিসের?—হাঁক দেন প্রসাদবাবু।

মিঠি বলে—গাঁজার গাছ।

হ্যাঁ, এই ভয়ানক নিভৃতেও বাজারের কোন্ বে-আইনি লোভের চক্রান্ত কখন্ এসে গাঁজার চাষ ক'রে চলে গিয়েছে। বেশ লাভ হয় গাঁজার এই বে-আইনি চাষে। প্রসাদবাবুর চাকররা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে গাঁজার পাতা ছিঁড়ে ব্যাগ ভর্তি করে। মিঠিকে আশ্বাস দেয়—আবার যখন দেখা হবে, তখন তোকেও কিছু পয়সা দিয়ে যাব। অন্তত আনা তিন-চার তো নিশ্চয়ই দেব।

এক গাল হেসে আবার উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যায় মিঠি। মিঠির পথ-চলার তালের সঙ্গে যেন শব্দ মিলিয়ে আশে পাশের ঝোপে পটপটে ফল ফট্‌ফট্ ক'রে ফাটতে থাকে।

চিল উড়ছে উপরে। পথের পাশের লতাগুলি নেতিয়ে রয়েছে। মাটির উপর ঘাসগুলি যেন আঁচড়ানো। শুকনো পাতা এপাশে ওপাশে যেন ঝেঁটিয়ে সরানো। মিঠি হাত তুলে দেখায়—ঐ যে।

হ্যাঁ, ঠিকই খোঁজ দিয়েছে মিঠি। একটা বাছুরের লাস পড়ে রয়েছে। লাসের শুধু অর্ধেকটা খেয়ে চ'লে গিয়েছে জানোয়ার। মরির কাছে এগিয়ে এসে প্রসাদবাবু বলেন—লেপার্ডের কীর্তি। আজ তাহলে এখানেই মাচান বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হয়।

এই ভাবেই, ভিখন মরে যাবার পরেও প্রসাদবাবুর শিকারের প্রয়োজনে খোঁজির কাজ করে আসছে মিঠি। প্রসাদবাবুও খুশি হয়ে মিঠিকে বকশিস দেন। এবং হেসে হেসে বলেন, ভিখন ছিল একটা ভালুক, ভিখনের বউ হল একটা হরিণী, আর ভিখনের এই ছেলেটা একটা খরগোস।

হ্যাঁ, প্রসাদবাবুর ঐ চেহারা আর ঐ বন্দুক দেখলেই তিন বছর বয়সের ছেলেটা যেন সুড়ুৎ করে এক দৌড়ে আড়ালে সরে গিয়ে আমলকির পাতার ঝোপে মুখ গুঁজে দিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

দাহুয়া-ভালুয়ার এই শ্বাপদময় সংসার থেকে কত সংহারের আনন্দে মত্ত হয়ে ফিরে গিয়েছেন প্রসাদবাবু। ক্যাম্পে বসে হেসে হেসে তাকিয়ে দেখেছেন, ঐ যে এখনো সামনে ঘাসের উপর পড়ে আছে তাঁরই ভোরের শিকারের মরা শরীরটা। একটা ভালুকী। মনে হয় যেন মুখ থুবড়ে আর মাটি কামড়ে নীরবে কাঁদছে ভালুকীটা। ভালুকীর পিঠের রোঁয়ার ভিতরে লুকিয়ে এখনো নড়ে-চড়ে উঁকি দিচ্ছে জ্যান্ত বাচ্চাটা। চাকরকে ডাক দিয়ে হাত এগিয়ে দেন প্রসাদবাবু। হাতে হুইস্কির গেলাস চলে আসে।

শালের আড়ালে লুকিয়ে থাকে লাজুক চৌ-শিঙ্গা। ঘাসের জঙ্গলকে

সিরসিরিয়ে আর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটে ছোট্ট ছোট পারা হরিণ, শুয়োরের মতো মাটি শোঁকা অভ্যাস। প্রসাদবাবুর রাইফেলের কাছে সবারই সমান আদর। শুধু বুলেট বাছতে যা দেরি! পর মুহূর্তে জঙ্গলের বুকে একটা আর্তশব্দ ঠিকরে ওঠে, জানোয়ারের ফুটো বুকের ভিতর থেকে তপ্ত রক্তের ঝলক উথলে উঠে জঙ্গলের মাটি রঙীন করে দেয়। চৌ-শিঙ্গা ও পারার লাস টেনে নিয়ে আসে চাকরের দল।

নির্ভীক প্রসাদবাবু। প্রসাদবাবু জঙ্গলে ঢুকলে সারা জঙ্গলটাই যেন একটা ভয়ের শিহর চুপ করে সহ্য করতে থাকে। তক্ষক কাশে—খক্ খক্ খক্। হায়না হাসে—খাঃ, খাঃ, খাঃ। প্রসাদবাবুও মনে মনে হেসে কেশে অন্য পথে চলে যান। হায়না মেরে চারশো পঞ্চাশ ডবল ব্যারেলের অপমান করবার দরকার নেই। হায়নাগুলি হলো জঙ্গলের ছুঁচো। দাঁতলা শুয়োর, ডোরাকাটা বড় মামা, আর নীলগাই-এর সন্ধান পেতে চান প্রসাদবাবু।

যে ক'দিন শিকারে আসেন না প্রসাদবাবু সেই ক'দিন মিঠি নিজেই শিকার করে। মিঠির হাতে বার বোরের প্যারাডক্স নেই। বড় জোর একটা টাঙ্গি। কিন্তু এই টাঙ্গিও শিকারের জন্য নয়। নিজের প্রাণটাই বাঘ আর ভালুকের শিকার হয়ে যেতে পারে, যে কোন মুহূর্তে। তাই হাতের কাছে এই টাঙ্গিটা রাখে মিঠি।

জাল পাতে আর ফাঁদ পাতে মিঠি। সন্ধ্যা হলে এক একদিন চাষীদের গাঁয়ের বুড়ো বটের মাথার সঙ্গে জাল ঝুলিয়ে দিয়ে রাত জাগে। বাদুড়ের ঝাঁক এক একদিন ধরাও পড়ে। বাজারের কবরেজের লোক এসে বাদুড় কিনে নিয়ে যায়! এক একটা বাদুড় দু' পয়সা। বাজারের পাখিওয়ালাও মাঝে মাঝে এসে দাদন দিয়ে যায়, আট আনা কিংবা দশ আনা। ফাঁদ পেতে পাখি ধরে মিঠি। টিয়া আর লটকন তোতা, কখনো বা একটা শিকরে বাজ, কখনো পাঁচ সাতটা ঠুক ঠুকিয়া, কোন কোন দিন একটা দুটো পিউ কাঁহা। বটের আর তিতির কড়া ক'রে ভেজে মদের সঙ্গে খেতে ভালবাসেন প্রসাদবাবু। অনেক বটেরও ধরে রাখে মিঠি। প্রসাদবাবুর চাকরেরা এসে নিয়ে যায়।

এক একদিন কোন কাজই করে না মিঠি। সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা সত্যিই একেবারে বুনো হরিণীর মতো শরীরটাকে যেন ঘাসের উপর এলিয়ে দিয়ে কখনো পড়ে থাকে, কখনো গড়ায়। মাঝে মাঝে তিন বছর বয়সের ছেলেটাকে বুকের উপর চড়িয়ে জড়াজড়ি করে। সন্ধ্যার আবছায়া যদি থাকে, তবে দেখলে মনে হবে, সত্যিই একটা হরিণী একটা খরগোসকে বুকে নিয়ে খেলছে।

এই সময় জঙ্গলের গাছের আড়ালে কোন শব্দ হলেই ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মিঠি। বাঘের আর ভালুকের ভয়ে নয়। মানুষের ভয়ে। মনে হয়, সাহেব আসছেন বন্দুক হাতে নিয়ে এবং এখনই বুকের উপর খরগোস নিয়ে এই খেলার আনন্দ ছেড়ে দিয়ে খোঁজের কাজে বের হতে হবে। আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে আসেন প্রসাদবাবু। কারণ, ঐ আখের ক্ষেতের কাছেই মাচান বাঁধা হয়েছে। কারণ. ভয়ানক এক বাঘিনীর উপদ্রব শুরু হয়েছে।

বাঘটাকে দশ দিন আগে প্রসাদবাবুই গুলী করে মেরেছেন। এই মাচানের উপর বসে একটি গভীর রাতের মুহূর্তে প্রসাদবাবুর আনন্দ বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছিল। এক গুলিতে বাঘটাকে মেরে ফেলতে পেরেছিলেন। ধন্য হয়েছে তাঁর ৩৮৫ ম্যাগনাম রাইফেল আর ১৮০ গ্রেন সিলভারটিপ ডিলেড অ্যাকশন বুলেট। চৌপারন থানার আঙ্গিনাতে সেই বিরাট ডোরাকাটা রয়্যালের চেহারা দেখবার জন্য হাজার মানুষের ভিড় ভেঙ্গে পড়েছিল।

কিন্তু বাঘিনীটা কই? বাঘিনীর খোঁজ পাওয়া যায় না। অথচ প্রতি দিন ও রাত বাঘিনী যেন চারদিকের দশটা গাঁয়ের প্রাণের উপর প্রতিশোধ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ডাকের রানার সেই বুড়ো মানুষটাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক মাইল দূরে এক পাহাড়ের কাছে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে বাঘিনী। পুলিশ শুধু রানারের নীল জামাটার একটা টুকরো আর চিবনো হাড়গুলিকে তুলে নিয়ে এসেছে।

মহিষ আর গরুর সংখ্যা হবে মোট উনিশ, সবই বাঘিনীর পেটে গিয়েছে। গাঁয়ের চাষী দিন দুপুরেই ধান কাটার সময় বাঘিনীর থাবায় আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। এই হিংস্র বাঘিনীকে মারবার জন্য প্রসাদবাবুও হিংস্র হয়ে উঠেছেন। রাতের পর রাত জাগেন। মাচানের উপর বসে থাকেন। মাচানের নীচে একটা রোগা ছাগল গাছের সঙ্গে সারারাত বাঁধা থাকে। ছাগলটা সারারাত চেঁচিয়ে ডাকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! বাঘিনীর লোভের জন্য এমন সুন্দর একটা টোপ ফেলা হয়েছে। টোপটা কি সুন্দর কাতরস্বরে ব্যা ব্যা ক'রে সারারাত ধরে ডাকে। তবু সেই ধূর্তা বাঘিনী মাচানের কাছে আসে না।

ভোর হতেই মাচান থেকে নেমে রাত জাগা চোখ দুটোকে আরও মাতাল করে চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রসাদবাবু—মিঠি!

মিঠি এসে বলে—হুজুর।

—বাঘিনী আসে না কেন?

—বাঘিনী এদিকে আসবে না হুজুর।

রাগ করেন প্রসাদবাবু।—রোজ এই এক কথা। আসবে না, আসবে না। তারপরেই বিড় বিড় করেন প্রসাদবাবু—তোর ছেলেটা যদি সত্যিই খরগোস হতো তবে ওটাকেই আমি মাচানের নীচে বাঁধতুম।

একদিন, দুদিন, তিনদিন। তার পরেই এক সকালে মাচান থেকে নামতেই খোঁজ দিল মিঠি, বাঘিনী কাছেই আছে হুজুর।

প্রসাদবাবুও মিঠির সঙ্গে এগিয়ে যেয়ে স্বচক্ষে দেখলেন, জলকুণ্ডের কাছেই কাদার উপর বাঘিনীর পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে। কাল রাতেই তাহলে বাঘিনী এত কাছে চলে এসেছিল?

মিঠি জানে, শুকনো পাতার উপর বাঘের পায়ের শব্দ কেমন করে চোরের মতো ফিসফাস শব্দ করে। মিঠির চোখের মতো ওর কান দুটোও যে বুনো উল্লাসের সব রহস্য এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারে। প্রসাদবাবু কল্পনা করেন, মিঠিও যদি মাচানে থাকে, আর মিঠির হাতে টর্চ থাকে, তবে বাঘিনীর পায়ের শব্দ মাচানের কাছাকাছি আসতেই বাঘিনীর উপর টর্চের আলো সেই মুহূর্তে ফোকাস করতে পারবে না কেন মিঠি?

সন্ধ্যা হবার আগেই ক্যাম্প থেকে মত্ত হয়ে একাই ছুটে আসেন প্রসাদবাবু। মিঠির হাতে একটা টাকা বকসিস ফেলে দেন। মিঠিকে টর্চ ফোকাস করবার কায়দা শিখিয়ে দেন প্রসাদবাবু। মিঠি খুশি হয় আর হেসে হেসে আকুল হয়।

সন্ধ্যা হতেই প্রসাদবাবু ও মিঠি মাচানে ওঠে। তিন বছর বয়সের ছেলে-টাকেও সঙ্গে নেয় মিঠি। এবং সন্ধ্যা গভীর হবার আগেই ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সন্ধ্যা গভীর হতে প্রসাদবাবুও তাঁর চোখে সংহারের নেশা আর একটু মত্ত ক'রে নেন। ফ্লাস্ক হতে চুমুক দিয়ে হুইস্কি খান এবং রুমাল দিয়ে মুখ মুছেই মিঠির দিকে তাকিয়ে হাঁক দেন—মুখ হাঁ কর মিঠি।

মুখ হাঁ করে মিঠি। প্রসাদবাবুর ফ্লাস্ক থেকে হুইস্কির ছোট একটি ঝরনা গ্রীষ্মের বুনো হরিণীর মতো পিপাসী মিঠির হাঁ-করা মুখের ভিতর ঝরে পড়ে।—খেতে বড় ভাল হুজুর। মুখ মুছে আস্তে আস্তে বলে মিঠি।

জঙ্গলের বুক নিঝুম। আকাশের তারাগুলি শুধু ঝিকমিক করে। মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি কীট, শত শত শ্বাপদ আর লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদের প্রাণ যেন সমাহিত হয়ে গিয়েছে। একটা তক্ষকের কাশিও শব্দ ক'রে ওঠে না।

তিন শো পঁচাত্তর ম্যাগনাম হাতে নিয়ে বাঘিনীর প্রাণকে কাছে পাওয়ার জন্য যেন তপস্যা করছে দুরন্ত সংহারনিপুণ প্রসাদবাবুর শিকারী জীবনের সবচেয়ে বড় আশা। এই বাঘিনীকে খুন করতে পারলে শিকারী প্রসাদবাবুর খ্যাতি শত শিকারীর মুখে মুখে একটি বিস্ময়ের গল্প হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

শেষ রাত। মিঠির মুখের দিকে তাকান প্রসাদবাবু। শুকনো পাতার উপরে চোরা পায়ের ফিসফাস কোন শব্দ কি শুনতে পায়নি মিঠি?

মিঠি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানায়—না।

বাঘিনী আসেনি, আসবেও না বোধহয়। ভোর হতে আর কতক্ষণ? শিকারী প্রসাদবাবু যেন তাঁর দুই চোখে অদ্ভুত এক কৌতূহলের নেশা বিভোর করে দিয়ে বুনো হ'রণীর মতো একটা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখ ফেরান না প্রসাদবাবু। জঙ্গলের রাতজাগা জীবনে কোন সংহারের মুহূর্তে প্রসাদবাবুর চোখে এমন নিবিড় নেশা মত্ত হয়ে ওঠেনি। ভাজা হাঁসের মাংস খেতে কত ভাল লাগে, সেই স্বাদের মতো একটা স্বাদের জন্য শিকারী প্রসাদবাবুর বুকের নিঃশ্বাসের মধ্যে দুঃসহ একটা লোভের ঝড় তপ্ত হয়ে উঠেছে।

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করেন প্রসাদবাবু। মিঠির হাতে গুঁজে দেন নোট। মিঠি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুনো হরিণীর চোখও এই বিপুল উপহারের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে যেন আরও ঢলঢল হয়ে ওঠে।

পরমুহূর্তে বুনো হরিণীর সেই ঢলঢল চোখ রুষ্টা বাঘিনীর চোখের মতো ধক্ ক'রে জ্বলে ওঠে।—কি হুজুর?

মিঠিকে দুহাতে কাছে টানেন প্রসাদবাবু। মিঠি বলে—এ কি হুজুর?

প্রসাদবাবু মিঠির পাঁচ হাত কাপড়ের দিকে আর লতা দিয়ে বাঁধা কোমরটার দিকে তাকান। তার পরেই···।

তারপরেই একটা চাপা আর্তনাদ। একটা যন্ত্রণাক্ত কাতরানির শব্দ। রাইফেলটাও হাতে তুলে নিতে পারলেন না প্রসাদবাবু। প্রসাদবাবুর গলাটাকে যেন এক ক্রুদ্ধা বাঘিনীর দাঁতের কামড় হিংস্র হয়ে চেপে ধরেছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে প্রসাদবাবুর। গলা থেকে রক্তের ঝরনা ঝরে পড়ছে। ছটফট করছেন, গোঁ গোঁ করছেন প্রসাদবাবু। তবু বাঘিনী তার কামড় শিথিল করে দেয় না। প্রসাদবাবু অসাহায়ভাবে মাচানের তক্তা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেন।

মাচানের উপর থেকে আস্তে আস্তে ভোরের প্রথম আলোর আভাস দিতেই নেমে আসে মিঠি। গাছের গায়ে মুখ ঘষে মুখের রক্ত মুছে ফেলে। তারপর

সেই ভুট্টায় ক্ষেত মাড়িয়ে, নিমের আর খেজুরের ভিড় পার হয়ে, কে জানে এই অরণ্যের ভিতরে কোন শ্বাপদের গুহার ভিতরে নিরাপদে লুকিয়ে থাকবার জন্য চলে যায়। বুনো হরিণীর মতো এক নারী, তার কোলে খরগোসের মতো একটা ছেলে।

হাসপাতালের একটি ঘরে প্রসাদবাবুর অজ্ঞান ও রক্তাক্ত দেহ। হাসপাতালের ফটকের সম্মুখে, বাজারের দোকানে দোকানে চাষীদের গাঁয়ে গাঁয়ে আর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সব ডাকবাংলোতে লোকের মুখে ঐ একই কথা—সাবাস প্রসাদবাবু। সেই হিংস্র বাঘিনীর সঙ্গে হাতে হাতে লড়াই করতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছেন প্রসাদবাবু।

জ্ঞান হয়েছে প্রসাদবাবুর। প্রসাদবাবুর গলার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করবার সময় ডাক্তারের চোখে একটা প্রশ্ন শুধু একবার চমকে ওঠে—এ কেমন ক্ষত? কামড়ের রকমটা যে মানুষের দাঁতের কামড়ের মতো!

কিন্তু হাসপাতালের ফটকের জনতা বলাবলি করে—প্রসাদবাবু মাচা থেকে রাইফেল হাতে নিয়ে বাঘিনীর পিছনে ছুটেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই তাঁর রাইফেলটা হাত থেকে পড়ে গেল। এবং, সেই মুহূর্তে ধূর্তা বাঘিনীটা প্রসাদবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পুলিশ অফিসার হেসে হেসে আর একটা আশার কথা বলতে থাকেন।—আসছে বড়দিনে ভাইসরয়ের শিকার পার্টিতে প্রসাদবাবু নিমন্ত্রণ পাবেন, নিশ্চয়।

হি সা ব মি লা তে

চন্দ্র-সূর্য কেন আলো দেয়? এরকম কঠোর একটা দার্শনিক প্রশ্নের সব উত্তাপ একদিন একটি কথায় একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছিল দিবাকর। কথায় কথায় বন্ধুদের মধ্যে ঘোর তর্কের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। পুরো তিন ঘণ্টার মুখরতার পর সেই তর্ক শান্ত হয়েছিল।

সেদিন বি-এ পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। দিবাকরের সেই পাঁচ বন্ধুও পাস করেছে। পাসের আনন্দ উদ্‌যাপন করবার একটা পরিকল্পনা আগেই তৈরী ক'রে রাখা হয়েছিল। প্রবল রকমের কোন হুল্লোড়, ফুর্তি, পিকনিক অথবা ছুটোছুটির পরিকল্পনা নয়। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু বেলুড়ের গঙ্গার ঘাটে

বসে থাকা, আর শুধু গল্প করা।

ছয় বন্ধুর মধ্যে দিবাকর ছাড়া আর সবাই, অর্থাৎ সেই পাঁচ বন্ধুই ছিল দার্শনিক; সবাই ফিলজফিতে অনার্স'ও পেয়েছে, একমাত্র অদার্শনিক দিবাকর। তিনবার ম্যাট্রিকে ফেল ক'রে, চার বারের বার পাস ক'রে কলেজে ঢুকেছিল দিবাকর। ইকনমিকস-এর একটা বইও কিনেছিল, কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল দিবাকর। কারণ, বই পড়ে ইকনমিকস্ শেখবার দরকার হয় না। দিবাকর বলেছিল, জগৎটাই ইকনমিকস্।

কিন্তু কি আশ্চর্য, অদার্শনিক দিবাকরই সেদিন সেই কঠোর দার্শনিক তর্কের মুখরতা ক্ষান্ত করে দিয়েছিল। দিবাকর বলেছিল, চন্দ্র-সূর্য আলো দিতে বাধ্য হয় বলেই আলো দেয়। এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।

সত্যিই, পাঁচ দার্শনিক বন্ধু হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল। প্র্যাকটিক্যাল দিবাকর, ইকনমিকসের ভক্ত দিবাকর সামান্য কয়েকটা কথায় যা বলে দিল, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। আলো না দিয়ে থাকতে পারে না চন্দ্র-সূর্য, আলো দিতে বাধ্য, তাই আলো দেয়।

বেলুড়ের গঙ্গার ঘাটে বসে সেই তর্কের জীবন অনেকদিন হলো অতীত হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বন্ধুর জীবন এখন কে জানে কোন নতুন প্রশ্নের প্রেরণায় বা তাড়নায় কোথায় চলে গিয়ে কি করছে, সে খবর জানে না দিবাকর। কিন্তু আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই পাঁচ বন্ধুর কথা। বেচারা ত্রিদিব, সঞ্জয়, হৃদয়, বনমালী আর রঞ্জন! যেখানেই থাকুক আর যা-ই করুক না কেন, আজ নিশ্চয় ওরা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছে যে, চন্দ্র-সূর্য যে আলো দিতে বাধ্য হয়, সেই তত্ত্বটা ফিলজফি নয়, একেবারে বিশুদ্ধ ইকনমিকস্! চন্দ্র-সূর্যের চরিত্রের রহস্য নিয়ে গবেষণা করবার সেই অদ্ভুত অকেজো শখ আজ ওদের আর নেই বোধহয়। নিজের নিজের ভাগ্যের রহস্য নিয়ে ভাবছে আর হয়রাণ হচ্ছে। হয়তো কারবারে ভাল প্রফিট করছে, কিংবা ভাল পোস্টের চাকরি নিয়ে ভাল মাইনে পাচ্ছে। আর তা যদি না হয়ে থাকে, তবে তো ছেঁড়া ছাতা হাতে নিয়ে দু'বেলা দৌড়ে দৌড়ে তিন-চারটে ছেলে-পড়াবার গো-খাটুনি খেটে-খেটে আরও ভাল করে বুঝতে পারছে যে, মানুষের জীবন হলো ইকনমিকস্, মোটেই ফিলজফি নয়।

সেই পাঁচ বন্ধুর জীবনের পরিণাম কল্পনা ক'রে নিজের নির্ভুল জীবনের গৌরব স্বীকার করে দিবাকর। নিজের জীবনের এই উন্নতিই দিবাকরকে বার-বার স্মরণ করিয়ে দেয়, এই উন্নতি হতোই, হতে বাধ্য, তাই হয়েছে। কর

কোম্পানির এত বড় অফিসে চল্লিশ টাকা মাইনের ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক হয়ে ঢুকে এই চার বছরের মধ্যেই পাঁচ'শো দশ টাকা মাইনেতে অ্যাসিটেন্ট ম্যানেজারের পোস্টে নিজেকে ঠেলে ওঠাতে বাধ্য হয়েছে দিবাকর। ম্যানেজার রাখালবাবু এইবার রিটায়ার করতে কিংবা অতিষ্ঠ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন এবং শেষ পর্যন্ত দিবাকর ম্যানেজার হতে বাধ্য হবে।

জগৎটাই ইকনমিকস্। বুঝতে একটুও দেরি করেনি দিবাকর। নিজের উন্নতির জন্য যে-কোন কাজ করতে বাধ্য হওয়াই উন্নতির অর্থনীতি।

কর কোম্পানির বর্তমান মালিক, অর্থাৎ শ্রীসুপ্রকাশ দত্ত বয়সের দিক দিয়ে দিবাকরের চেয়েও বছর আট-দশ ছোটই হবে! দিবাকর যে বছর ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক হয়ে এই অফিসের একটা টেবিলের কাছে একটা টুলের উপর বসেছিল, সেই বছরেই বুড়ো দত্তবাবু মারা গেলেন আর নতুন মালিক হয়ে দেখা দিল বুড়ো দত্তবাবুর ছেলে এই সুপ্রকাশ।

ম্যানেজার থেকে শুরু করে দপ্তরী পর্যন্ত সকলেই নতুন মালিক সুপ্রকাশ দত্তের অফিস-ঘরে ঢুকে নমস্কার আদাব ও সেলাম জানিয়ে এসেছিল। কিন্তু দিবাকর? শুধু দিবাকর সুপ্রকাশ দত্তকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বাধ্য হয়েছিল। সুপ্রকাশ দত্তও একটু আশ্চর্য হয়ে দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দিবাকরও দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নতুন মালিক খুশি হতে বাধ্য হয়েছে।

সেই থেকে দিবাকরের জীবনের ইকনমিকস্ একের পর এক জয়ী হয়ে এগিয়ে গিয়েছে, আর উঠেছে। কোন বাধাই বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। এমন কি ঐ ম্যানেজার রাখালবাবুও দিবাকরের চেষ্টার সম্মুখে ছায়ার মতো অশরীরী হয়ে শেষ পর্যন্ত মিথ্যে হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

দিনে অন্তত একটিবার সুপ্রকাশ দত্তের অফিস-ঘরে ঢুকে বেশ একটু বিচলিত ও উত্তেজিতভাবে একটি বক্তব্য বলে যায় দিবাকর।—আমার অপরাধ মার্জনা করবেন স্যার।

সুপ্রকাশ দত্ত হাসে—অপরাধ?

দিবাকর—হ্যাঁ! ম্যানেজার রাখালবাবুর ভুল ধরিয়ে দিলে যদি অপরাধ হয়, তবে আমি অপরাধ করেছি।

সুপ্রকাশ দত্ত—তাই নাকি? কি ভুল করেছেন রাখালবাবু?

দিবাকর—কোম্পানির বেশ ক্ষতি হবে, এই রকম একটি কাণ্ড করে বসে আছেন।

সুপ্রকাশ দত্ত—অ্যাঁ! সে কি?

দিবাকর—হ্যাঁ স্যার। একটা ডীলার, যে বেটা আমাদের একটাও মেশিন আজ পর্যন্ত স্পর্শ করলো না, সেই বেটাকেই খাতির করে চা খাওয়াচ্ছেন আর মোটা ডিসকাউন্টের লোভ দেখিয়ে সাধছেন। নিজেকে এত ছোট করে ফেলবার কি কোন দরকার আছে স্যার?

সুপ্রকাশ দত্তের ভুরু কুঁচকে ওঠে।—না, কোন দরকার নেই!

দিবাকর—এই হলো আমার অপরাধ, আমি আপত্তি করেছি। রাখালবাবু আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

সুপ্রকাশ দত্ত চেঁচিয়ে ওঠে—এজন্য আপনার ওপর বিরক্ত হবার কি অধিকার আছে রাখালবাবুর?

দিবাকর—তা জানি না, তিনি হয়তো মনে করেন যে তাঁর অধিকার আছে। ...কিন্তু আপনি যা-ই মনে করুন স্যার, কোম্পানির স্বার্থের কোন ক্ষতি দেখলে আমি আপত্তি না করে থাকতে পারবো না।

সুপ্রকাশ দত্ত—এক'শো বার আপত্তি করবেন। আমি তো এটাই চাই। এবার থেকে ডীলারদের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন। এসব ব্যাপারে রাখাল-বাবুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

এইভাবে, চার বছরের মধ্যেই দিবাকরের ভাগ্যটাও সেই টেবিলের পাশের ছোট টুলের উপর থেকে সরে গিয়ে একের পর এক অনেক চেয়ার পার হয়ে একেবারে মালিক সুপ্রকাশ দত্তের অফিস ঘরের পাশে একটি নতুন কেবিনে এসে মস্ত বড় টেবিলের কাছে একটি মস্ত বড় চেয়ারে আসীন হতে বাধ্য হয়েছে। কোম্পানির উন্নতির জন্য যা করা দরকার, তাই করতে বাধ্য দিবাকর। যার নুন খায়, তার গুণ গাইতে বাধ্য দিবাকর। যে মালিক চার বছরের মধ্যে দিবাকরের মাইনে পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে পাঁচ'শো দশ টাকা ক'রে দিয়েছে, তার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে বাধ্য দিবাকর।

কে না দিবাকরকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো? স্টোরবাবু ভয় পেয়ে চুপ করে গেলেন। অ্যাকাউন্টসের নিমাইবাবু আশ্চর্য হয়ে চুপ ক'রে গেলেন। নতুন মালিক সুপ্রকাশ দত্তের হৃৎপিণ্ডটাকেই জয় করে ফেলেছে যে দিবাকর, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতাই বা আছে কার? সুপ্রকাশ দত্ত বিশ্বাস করে, দিবাকরবাবু ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে মালিকের প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বলতে আর একজনও নেই। আর সবাই শুধু চাকরি করে মাইনে পাওয়ার জন্য। একমাত্র দিবাকরবাবু প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করেন।

ইউরোপ থেকে নানারকম মেশিন আমদানি করা আর সেই সব মেশিন

ভারতের নানা জায়গায় ডীলারদের মারফৎ বিক্রি করা—ত্রিশ বছর বয়সের কর-কোম্পানির এই কারবারের সুনাম এখনও একটুও কমে যায়নি। বুড়ো দত্তবাবু বলতেন, এই কোম্পানির এক'শো তের জন কর্মচারীর উৎসাহ হলো আমার কোম্পানির প্রাণ। কিন্তু সুপ্রকাশ দত্ত একদিন অফিসের প্রত্যেক ঘরে ঢুকে বেশ উত্তেজিতভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে গেল, আপনারা এই কোম্পানির উন্নতিকে পিষে মারছেন। ত্রিশ বছর ধরে কোম্পানির অনেক ক্ষতি করেছেন, কিন্তু আর নয়, এবার আমিও দেখবো। কোম্পানির উন্নতি না হলে এক পয়সা কারও মাইনে বাড়বে না।

হ্যাঁ, তার কয়েক দিন পরেই মাইনে বাড়াতে হলো কিন্তু শুধু একজনের। দিবাকরের মাইনে হলো ছ'শো দশ টাকা। অ্যাকাউন্টসের নিমাইবাবুকে মুখের উপর শুনিয়ে দিল সুপ্রকাশ দত্ত, দিবাকরবাবু ছাড়া আর কার মাইনে বাড়তে পারে, আপনিই বলুন? কোম্পানির জন্য ভাবছেন আর খাটছেন, দিবাকরবাবু ছাড়া এমন আর একজনও কি আছে?

কাজে ইস্তফা দিলেন ম্যানেজার রাখালবাবু।

সুপ্রকাশ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা স্বীকার করে নিয়ে বললো—খুব ভাল কথা। কোম্পানিরও নিউ ব্লাড দরকার।

সেদিন ম্যানেজারের চেয়ারে বসবার আগে দিবাকরও একবার বিচলিত হয়ে উঠলো। সুপ্রকাশ দত্তের ঘরে ঢুকে আর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে প্রতিজ্ঞা করলো নতুন ম্যানেজার দিবাকর—আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিলেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি আমাকে মরে যেতেও হয়····· অর্থাৎ আমি যে কোন স্যাকরিফাইসের জন্য প্রস্তুত আছি স্যার।

করুণা হাসে—এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করলে আমি কিছু বলতে পারবো না।

দিবাকরের স্ত্রী করুণাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। চার বছর আগের জীবনে, আর আজকের জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে একটি মাত্র সত্যকেই মনে-প্রাণে আরও নিবিড় বিশ্বাসে অভিষিক্ত করে নিয়ে বুঝতে পারে করুণা, চার বছর আগের সেই দীনতা আর রিক্ততা মরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

মনে পড়লে আজও লজ্জা পায় করুণা, দিবাকরের মতো মানুষের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে চার বছর আগে মনে মনে কত রাগই না সহ্য করতে হয়েছিল। বাবার উপর, কাকার উপর, বড়বউদির উপর রাগ হয়েছিল। কোথাকার এক কোম্পানির অফিসে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, এদিকে বিদ্যাবুদ্ধির

রকমও তথৈবচ, এমন মানুষের সঙ্গে বি-এ পড়া মেয়ের, এবং দেখতে বেশ সুন্দর এমন মেয়ের বিয়ে হবে, এই পরিণাম ভাবতেই যে গা সিরসির করে উঠেছিল। কিন্তু কে জানে কেন, সকলে মিলে যেন একটা গোঁ ধরে এই বিয়ের জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাবার টাকা নেই, কাকার সাহায্যে বিয়ে হবে, বোধহয় এই একটি কারণ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না, যার জন্য করুণার মতো মেয়ের সঙ্গে দিবাকরের মতো ছেলের বিয়ের কথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়েও গেল। স্বীকার করে করুণা, শেষ পর্যন্ত লজ্জা পেতে বাধ্য হয়েছে করুণা, দিবাকরের মতো স্বামী পেয়ে জীবনটা গর্বেও ভরে উঠেছে। নিজেকে ক্ষমা করতেও পেরেছে করুণা। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের কেরানিকে বিয়ে করতে মনটা যে বিমর্ষ হয়েছিল, সেটা কোন অপরাধ নয়। বিমর্ষ হতে বাধ্য। এবং আজ সন্ধ্যায় যখন অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে দিবাকর, আর সেই গাড়িতে চড়ে সারা সন্ধ্যাটা বকুলবাগানের মাসিমার বাড়ি থেকে শুরু করে হিতেনদার মেয়ে সুলেখার শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত একবার বেড়িয়ে আসবে করুণা তখন মনে মনে স্বীকার করবে করুণা, আজ সুখী হতে বাধ্য হয়েছে করুণার জীবন। তাই হাসে করুণা এবং দিবাকর আবার জিজ্ঞাসা করে—বলতে পার, কেন তোমাকে আমি এত ভালোবাসি? করুণা হাসে—জানি না।

দিবাকর হাসে—ভালোবাসতে বাধ্য, তাই।

দিবাকরের এই বিশ্বাসের উল্লাস মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েও যেন নিঃশ্বাসের ভিতরে একটা বেদনার ভার অনুভব করে করুণা। দিবাকরের কথার মধ্যে একটুও ভুল নেই। সেই চার বছর আগে, বিশ টাকা ভাড়ার একটা বিশ্রী ঘরের নিভৃতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের একটা দীনতার সংসারে ঢুকে প্রথম যেদিন মুখভার করেছিল করুণা, সেদিনটার কথাই মনে পড়ে। সেদিন করুণার ঐ মুখভার দেখেও অসন্তুষ্ট হয়নি দিবাকর। সেদিন যে-ভাবে হেসেছিল দিবাকর, আজও সেইভাবে হাসে। আমি তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য, এই কথাটা সেদিনের সেই রিক্ত ঘরটারই কথা। আজ সে-কথা মনে পড়তে, নিজের উপর ঘৃণা হয় আর স্বামী দিবাকরের উপর শ্রদ্ধার আবেশে বিহ্বল হয়ে যায় করুণার মন।

কৃতী স্বামীকে শ্রদ্ধা না করে পারবে কেন করুণা? করুণার সুখের আকাঙ্ক্ষার কোন দাবিই যে অপূর্ণ থাকছে না হিতেনদার বউ এসে করুণাকে হেসে হেসে আর আশ্চর্য হয়ে একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন—কার ভাগ্যের জোরে এমনটা হলো করুণা?

—কি হলো ?

—চার বছরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে একেবারে ছ'শো দশ ?

করুণা হাসে—ওর ভাগ্যের জোর।

দিবাকর বলে—না বউদি, করুণার ভাগ্যের জোর।

শুনতে ভাল লাগে করুণার। করুণার ভাগ্যের জোর। করুণার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

—কিন্তু কেমন করে হলো ?

ছিতেনদার স্ত্রীর মুখের এই প্রশ্নটাও একটা বিস্ময় হয়ে উঠেছে এবং কোন উত্তর খুঁজে পায়নি করুণা। দুর্ভাগ্যটা সৌভাগ্য হয়ে যেতে বাধ্য হয়, এ ছাড়া আর কোন্ কারণ থকেতে পারে ? চেষ্টা করেও এমন উন্নতি আর এত সুখের উপহার চার বছরের মধ্যে কে-ই বা লাভ করতে পেরেছে ? মণিমালার স্বামী আজ চার বছর ধরে কত খেটে পড়ছে আর একটা পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু পাশ করতে পারছে না। এত চেষ্টা করেও আজ চার বছরের মধ্যে ইনস্পেক্টর হতে পারলো না মণিমালার স্বামী। কত দুঃখ করছিল মণিমালা।

দিবাকরই উত্তর দেয়।—আপনার প্রশ্নের উত্তর হয় না বউদি।

বউদি—কেন ?

দিবাকর বলে—সূর্য-চন্দ্র কেন আলো দেয় বলতে পারেন ?

বউদি—না।

দিবাকর হাসে—আলো দিতে বাধ্য, তাই আলো দেয়। আর কোন কারণ নেই।

বউদি হাসেন—হবে।

কিন্তু বিশ্বাস করে করুণা, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। দিবাকরের মতো কৃতী স্বামী জীবনে পাওয়ার ছিল, পেতে বাধ্য হয়েছে করুণা।

আজকালও যেদিন পটলডাঙার বাপের বাড়িতে যায় করুণা, সেদিন মা সেই চার বছর আগের উপদেশ আবার নতুন ক'রে শুনিয়ে দিতে ভুলে যান না। শুধু মা কেন, কাকিমাও বলেন। বকুলবাগানের মাসিমাও বলেন।—কখ্খনো দিবাকরের অবাধ্য হবে না। যা বলবে, তাই শুনবে। ইচ্ছে না করলেও দিবাকরের সব ইচ্ছা মেনে নেবে।

বুঝতে পারে করুণা, এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পায়; আজও মা কাকিমা ও মাসিমার মনে সেই পুরণো ভয়ের রেশটুকু যেন লেগে আছে। বিয়েতে করুণার আপত্তির ভাব দেখে, বিয়ের পরেও কিছুদিন করুণার গম্ভীর মুখ দেখে উদ্বিগ্ন

হয়েছিলেন সবাই। করুণাকে উপদেশ দিয়ে দিয়ে সবাই যেন সেই ভয় ভাঙবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। করুণা যেন দিবাকরের অবাধ্য না হয়।

সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মনের মধ্যে বিদ্রোহ রেখেও শুধু জোর করে হেসে হেসে যে উপদেশ মেনে নিয়েছিল করুণা, আজ সে উপদেশ স্মরণ করবারও প্রয়োজন হয় না। আজ করুণার জীবনটাই যেন শ্রদ্ধার আবেশে পরিপূর্ণ হয়ে দিবাকরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার• কাছে বাধ্য হয়ে গিয়েছে। যেন অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে করুণা। ইচ্ছা না থাকলেও দিবাকরের কোন ইচ্ছাকে অসুখী করে রাখতে পারে না। দিনে অন্তত দশ কাপ চা খেত যে করুণা সে করুণা দিবাকরের শুধু মুখের একটা কথার সামান্য অনুরোধেই সাবধান হয়ে গিয়ে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। দিবাকর চা খাওয়া পছন্দ করে না।

দিবাকর যদি বলে যে, আজ আর বকুলবাগানের মাসিমার বাড়ি যাবার দরকার নেই, সেই মুহূর্তে স্বীকার করে নেয় করুণা, না দরকার নেই। দিবাকর বলে, আজ শুধু ময়দানের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরে এসে গাড়িটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও। করুণা বলে, হ্যাঁ তাই ভাল, আজ আর খুব বেশি বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

পূজোর সময় পুরী গেলে কেমন হয়? করুণার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেছিল দিবাকর। দিবাকর বলে—পুরীর সমুদ্র দেখতে সত্যিই কি তোমার মন ছটফট করছে? আমার তো ভাবতেই খারাপ লাগে।

করুণা বলে—আমারও। এমন কি আর অদ্ভুত জিনিস সমুদ্র, যে দেখতেই হবে।

পুরী যাওয়া হয় না। এবং যেতে না পেরে একটুও দুঃখিত হয় না করুণা। বরং ভেবে খুশি হয় যে, পুরী যাবার শখ ছেড়ে দিয়ে দিবাকরকে একটু সুখী করতে পেরেছে করুণা।

বাইরের ঘরে সকালবেলা যখন একা একা বসে অফিসের ফাইলগুলো দেখে দিবাকর, তখন ভিতরের ঘরে বসে নিজের হাতে বুরুশ তুলে নিয়ে দিবাকরের জুতো পালিশ করে করুণা। বাড়িতে চাকর আছে, তবু এই কাজটা নিজের হাতেই করতে ভাল লাগে করুণার। চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না করুণা, কেন এবং কিসের জন্য এ হেন কাজকেও এত ভাল লেগে গেল? ভাল লাগিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে করুণা।

শুনতে পায় করুণা, বাইরের ঘরে মানুষের নানারকম আবেদনের স্বর কাঁপছে বাজছে আর ছটফট করছে। অফিসের লোকেরা আসছে। কারও দাবি পাঁচ

টাকা মাইনে বৃদ্ধি। কারও দাবি একমাস ছুটি। কেউ চায় একশো টাকা ধার। দিবাকরের জীবন আজ এতগুলি মানুষের ভাগ্যের ভালমন্দের প্রভু হয়ে উঠেছে। এই মানুষকে চার বছর আগে কি ভেবেছিল করুণা? করুণার হাত দুটো যেন সেই ভুল ভাবনার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ক্ষমা চাইবার আবেগে আরও উৎসাহের সঙ্গে দিবাকরের জুতোর উপর বুরুশ চালাতে থাকে।

সেদিনও ঠিক সকাল দশটায় অফিসের গাড়ি যখন এল, এবং মিররের সামনে দাঁড়িয়ে দিবাকরের গলায় যখন নিজের হাতে টাই বেঁধে দিল করুণা, তখন হঠাৎ একটু নতুন রকমের বিস্ময় নিয়ে দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে করুণা। দিবাকর যেন একটু নতুন রকমের হাসি হাসছে।

করুণা বলে—কি হলো?

দিবাকর—ম্যানেজার রাখালবাবু কাল চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

করুণা—তারপর?

দিবাকর—তারপর আমিই ম্যানেজার হলাম। আমি ছাড়া সুপ্রকাশ দত্ত আর কাউকে মানুষ বলেই ভাবে না।

করুণা—কেন?

কথাটা যেন নিতান্ত একটা আনমনা চিন্তার ভুলে করুণার মুখ থেকে বের হয়ে গিয়েছে। কেন? এই কথাটাকেই জীবন থেকে বাতিল করে দিয়েছে করুণা। কেন বলে কোন প্রশ্ন নেই, সংসারের সব কিছু বাধ্য হয় বলেই হয় - এই সত্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেও উলটো কথা জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে করুণা। ম্যানেজার রাখালবাবুকেও চেনে করুণা। করুণার টাইফয়েডের সময় রাখালবাবু রোজ দু'বেলা এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছেন। সেই রাখালবাবু। তাঁর মতো এরকম একজন ভাল মানুষ চলে যেতে বাধ্য হলেন কেন? করুণার মনটা কি এই কথা ভেবে আশ্চর্য হয়েছে?

গাড়িতে উঠবার আগে দিবাকর বলে—চলে যেতে বাধ্য হলেন।

যেমন রোজ সন্ধ্যায়, তেমনই আজও সন্ধ্যার আশা করে বসে থাকে করুণা, অফিস থেকে গাড়ি আসবে, এবং সেই গাড়িতে আজ বকুলবাগানের মাসিমার বাড়ি একবার যেতে হবে।

বাইরের ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজানো। গত বছর এই ঘরের সব ফার্ণিচার কোম্পানির অফিস থেকেই এসেছে। তিন হাজার টাকারও বেশি খরচ পড়েছে; সব খরচ দিয়েছে কোম্পানি। দিবাকরের কাছেই শুনেছে করুণা, সে বছর

কর্মচারীদের বোনাস দেবার ঝঞ্ঝাট থেকে কোম্পানিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল দিবাকর, তাই মালিক সুপ্রকাশ দত্ত খুশি হয়ে দিবাকরকে এই উপহার দিয়েছেন।

দিবাকরের ফিরতে বেশির ভাগ দিনই রাত হয়ে যায়। কারণ, অফিস ছুটি হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ মালিকের কাছে থাকতে হয়। অনেক পরামর্শ দিতে হয়। দিবাকর কাছে না থাকলে বেচারা সুপ্রকাশ দত্ত নিজেকে বড় অসহায় বোধ করেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই কোম্পানির কোন না কোন নতুন উন্নতির একটা উপায় আবিষ্কার করে, এবং সেই উপায় অনুসারে একটা ব্যবস্থা না করে ঘরে ফেরে না দিবাকর।

মাঝে মাঝে এমন কথাও দিবাকরের মুখে শুনতে পায় করুণা, মালিক আমার মুঠোর মধ্যে। হেসে হেসে যেন জীবনের এক প্রচণ্ড সাফল্যের গৌরব ঘোষণা করে দিবাকর। অবিশ্বাস করে না করুণা।

গাড়ি আসতে দেরী হচ্ছে। অনেকক্ষণ হলো কাজ সেরে বসে আছে করুণা। অফিস যাবার আগে যে রঙ-এর শাড়ি পরতে বলে গিয়েছিল দিবাকর, সেই রঙ-এর শাড়ি পরেছে করুণা। ফিনফিনে কালো রঙ-এর ভয়েল। করুণার ফরসা চেহারার সঙ্গে কালো রঙ-এর শাড়ি মানায় ভাল, তবু কালো রঙ পছন্দ করে না করুণা। তা ছাড়া ফিনফিনে শাড়ি পরতেও বেশ অস্বস্তি হয়। কিন্তু নিজের রুচির এই সব আপত্তিকে মনের মধ্যে কোন প্রশ্রয়ই দেয় না করুণা। দিবাকর পছন্দ করে, এইটুকুই যথেষ্ট। দিবাকরের ইচ্ছা আর পছন্দের কাছে মাথা নীচু করতে ভালই লাগে করুণার। ফিনফিনে কালো ভয়েলে সাজানো করুণাকে দেখতে পেয়ে দিবাকরের চোখ দুটো খুশি-খুশি হয়ে হেসে উঠবে, ভাবতে ভাল লাগে করুণার।

না, আজ গাড়ি আসতে অনেক দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে। হয়তো আসবেই না। বাইরের ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে করুণা। আজ আর বাইরে বেড়াতে যাওয়া বোধহয় হবে না। নাই বা হলো। কিন্তু এখনই সাজ বদল করবার দরকার কি? যার ইচ্ছের সম্মান রাখবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিনফিনে কালো ভয়েল পরেছে করুণা, সেই মানুষের চোখের সামনে এই সাজে একটা ঘণ্টা বসে থাকতেই তো হবে, থাকা উচিত। তাছাড়া বকুলবাগানের মাসিমার কাছে এমন কোন কাজের কথা বলবার নেই যে সেখানে আজ যেতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে, কোনদিনই কোন কাজের কথা বলবার জন্য বকুলবাগানে

বা পটলডাঙ্গায় কিংবা টালিগঞ্জে যায় না করুণা। একটি মাত্র লোভের আকর্ষণে যেতে হয়। বকুলবাগানের মাসিমা কিংবা হিতেনদার স্ত্রী, অথবা আর কেউ, করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে দিবাকরের প্রশংসা করে যে-সব কথা বলে, শুনতে শুনতে করুণার বুকের ভিতরটাই যেন মিষ্টি হয়ে যায়। সত্যিই, দিবাকর যেন জাদুকরের মতো একটা কাণ্ড করে সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। এত অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতি করতে পেরেছে, অদৃষ্টকে একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে, এমন গুণ আর এমন প্রতিভা ক'জনের দেখা যায়? লাখে না মিলয়ে এক।

করুণার হাতের সোনার চুড়ি শব্দ করে বাজে, তার চেয়েও বেশি মিষ্টি শব্দের ঝংকার তুলে একটা গর্বের চঞ্চলতাও যেন করুণার মনের ভিতরে বাজতে থাকে।

হঠাৎ বাইরের রাস্তার উপর গাড়ির শব্দ শুনে যেন চমকে ওঠে করুণা। তাই তো, কত দেরী করে গাড়িটা এল আজ। কিন্তু এত দেরি করে এখন আর যে কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু অনুমান করতে পারে না করুণা, দিবাকরের ইচ্ছে আছে, করুণা যেন বেড়াতে যায়। নইলে এত দেরি করেও গাড়ি পাঠাবে কেন? তা ছাড়া, দিবাকরের ইচ্ছার আর একটা কারণও বুঝতে পারে করুণা। আজ যে বকুল-বাগানের মাসিমার কাছে একটা নতুন গর্বের কথা বলবার আছে। কর কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছে দিবাকর, এই নতুন সৌভাগ্যের কথাটা না বলে থাকতে পারবে কেন করুণা? এবং মাসিমার চোখের বিস্ময় আর মুখের প্রশংসা কত মুখর হয়ে ওঠে, তাই দেখে নতুন করে মুগ্ধ হতে ইচ্ছেও করে।

আর একটা কথা। দিবাকর যে আজ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে, আমার ম্যানেজার হবার খবর শুনে কি বললেন মাসিমা? দিবাকরের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, দিবাকরের সৌভাগ্যের ইতিহাস শুনে কে কত আশ্চর্য হয়েছে, তার সব বিবরণ শোনাতে হবে। তবে খুশি হবে দিবাকর। ঘাড়ে আর গলায় পাউডার ছড়িয়ে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয় করুণা।

কিন্তু এ কি? ঘরের দরজার কাছে একজনের পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে করুণা।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকে করুণার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দিবাকর। এবং ব্যস্তভাবে ফিসফিস করে—সুপ্রকাশ দত্ত এসেছে।

করুণাও আশ্চর্য হয়—কোম্পানির মালিক সুপ্রকাশ দত্ত?

দিবাকর—হ্যাঁ, নইলে এত ব্যস্ত হবার কোন দরকার হতো না।

করুণা—কেন? এত ব্যস্ত হবার…।

দিবাকর—আঃ, বুঝছো না, সুপ্রকাশ দত্ত নিজে ইচ্ছে করে আমার এখানে এসেছে। আমি বলিনি, তবু এসেছে। এটা একটা অদ্ভুত সৌভাগ্যের ব্যাপার নয় কি?

করুণা হাসে—চা তৈরী করি।

দিবাকর—চা তো আছেই। তা ছাড়া……।

করুণা—কি?

দিবাকর—তুমি নিজে একবার… ·।

করুণা—সেটুকু ভদ্রতা করবো বৈকি। আমি নিজেই চা নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা ততক্ষণ একটু গল্প কর।

দিবাকর—তা তো করবেই……তা ছাড়া।

করুণা—কি?

দিবাকর—প্রণাম করতে ভুলে যেও না যেন।

করুণা হাসে—প্রণাম?

দিবাকর—হ্যাঁ, আমি যদি ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি তবে তুমিও বা কেন……।

করুণা হাসে—বেশ তো। এর জন্য তোমার এত ব্যস্ত হবার কি আছে? তুমি যাকে শ্রদ্ধা কর, আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।

ব্যস্তভাবে চলে যায় দিবাকর। বাইরের ঘরে গিয়ে সুপ্রকাশ দত্তের কাছে দাঁড়ায়।

একটা সোফার উপর বসে হেসে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত।—পাখাটা খুলে দিন দিবাকরবাবু!

—হাঁ স্যার! বলতে বলতে ব্যস্তভাবে এগিয়ে যেয়ে সুইচ টিপে পাখা খুলে দেয় দিবাকর।

গায়ের কোট খুলে নিয়ে দিবাকরের দিকে এগিয়ে দিয়ে সুপ্রকাশ দত্ত বলে—এটাকে কোথাও ঝুলিয়ে দিন তো।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে সুপ্রকাশ দত্তের গায়ের কোট হাতে তুলে নিয়ে দিবাকর দেয়ালের একটা হুকের সঙ্গে আটক করে ঝুলিয়ে দেয়।

—এইবার এক কাপ চা! সুপ্রকাশ দত্ত হাঁপ ছেড়ে হেসে উঠতেই দিবাকর হাসে—আসছে স্যার, একটুও দেরি হবে না।

না, দেরি হয়নি। চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে করুণা।

—ধন্যবাদ। হঠাৎ এসে আপনাকে কষ্ট দিলাম। করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত। এবং হেসে হেসে বেশ কিছুক্ষণ, যেন একটা বিস্ময়ের আবেশে, করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুপ্রকাশ দত্তের হাতের কাছে চা-এর কাপ এগিয়ে দিয়ে সত্যিই অপ্রস্তুতের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন ছটফট করতে থাকে করুণা। করুণার কল্পনাই যেন হঠাৎ বিব্রত হয়েছে। কর-কোম্পানির মালিক সুপ্রকাশ দত্ত বলতে এরকম একজন অল্পবয়সের মানুষ মনে হয়নি করুণার। বয়সে দিবাকরের চেয়ে অনেক ছোট না হলেও বেশ ছোট। এমন মানুষকে পা ছুঁয়ে প্রণাম না করলে অভদ্রতা হবে কেন? পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার দরকারই বা কি?

সুপ্রকাশ দত্তের প্রথম হর্ষের উত্তর দেবার ভদ্রতা ভুলে গিয়ে আনমনার মতো কি যেন ভাবতে থাকে করুণা। সত্যিই যে বিশ্বাস হয় না, দিবাকরকে অবিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে। এই একজন ছোকরা বয়সের মানুষকে দিবাকর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে, কী অদ্ভুত কথা! দিবাকরের মনের ভিতরে একটা সামান্য অহংকারও কি নেই? এত সহজে নীচু হয়ে যায় কেন?

সুপ্রকাশ দত্তকে প্রণাম করতে সত্যিই ভুলে যায় করুণা। ইচ্ছে করেই ভুলে যায় কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখতে পায়, দিবাকরের চোখ দুটো ক্ষুব্ধ হয়ে কটমট করে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। করুণার অবাধ্যতার রকম দেখে যেন ভ্রূকুটি করছে দিবাকর।

করুণার নিঃশ্বাসের বাতাসও টলমল করে ওঠে। নিজেরই উপর রাগ হয়। বোধহয় আবার ভুল করে ফেলছে করুণার মন, সেই পাঁচ বছর আগের মতো ভুল। দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়ে ওঠে না করুণার চোখ। কোথা থেকে একটা কঠোর অবাধ্যতার আবেগ এসে করুণার চিন্তা এলোমেলো করে দিয়েছে।

কিন্তু দিবাকরের চোখের সেই কঠোর শাসনের চাহনি শান্ত না হয়ে বরং আরও প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে। করুণাও কি হঠাৎ একটা ফিলজফির বাতিকে পড়ে মূর্খ হয়ে গিয়েছে? করুণা বোধহয় জানে না, বোঝে না, হিসেব করে চিন্তাও করতে পারে না যে, স্বার্থের জন্য মানুষ যা করতে বাধ্য, সেটা করে ফেলাই উচিত। জানে না করুণা, সুপ্রকাশ দত্তের কাছে আজই যে নতুন একটা অ্যালাওয়েন্স চেয়েছে দিবাকর। বাড়িভাড়া বাবদ মাসিক দু'শো টাকা। করুণা যদি বুঝতে পারতো যে, সুপ্রকাশ দত্তকে প্রণাম করা সত্যিই প্রণাম করা

নয়, ওটা মানুষের উন্নতির একটা ইকনমিকস্‌, একটা হিসাব, তা হলে এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে উসখুস করতো না করুণা।

দিবাকরের চোখের ইঙ্গিত এবার আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। করুণার অবাধ্যতা দেখে রুষ্ট হয়ে দিবাকরের চোখ দুটো কাঁপছে। করুণার শরীরটাও যেন একটা অস্বস্তির জ্বালায় ছটফট করে কেঁপে ওঠে। তারপরেই এগিয়ে এসে সুপ্রকাশ দত্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে করুণা।

হাঁপ ছাড়ে, হেসে ওঠে দিবাকরের মুখ।

সুপ্রকাশ দত্তও খুশি হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—আপনি ঠিকই বলেছিলেন দিবাকরবাবু। কর-কোম্পানির ম্যানেজারের পক্ষে এরকম একটা সাধারণ বাড়িতে থাকা কোম্পানিরই প্রেস্টিজের দিক দিয়ে·· ···।

দিবাকর—আপনি বুঝে দেখুন স্যার। আমি কখনো আমার সুবিধা বা স্বার্থের জন্য কিছু দাবি করি না। কোম্পানিরই প্রেস্টিজের জন্য বাড়িভাড়া বাবদ সামান্য অ্যালাওয়েন্স চেয়েছি, যাতে একটা ভাল বাড়িতে উঠে যেতে পারি।

সুপ্রকাশ দত্ত হেসে ওঠেন—গ্র্যান্টেড!

করুণার মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে যেন কৃতার্থতায় উল্লাস চেপে আস্তে আস্তে বলে দিবাকর—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন করুণা?

সুপ্রকাশ দত্তও ব্যস্ত হয়ে ওঠে—তাইতো! আপনি বসুন করুণা দেবী।

চেয়ারের উপর বসে ফিনফিনে কালো ভয়েলের আঁচলটাকে যেন দু'হাতে খিমচে ধরে করুণা।

সুপ্রকাশ দত্ত বলে—এতদিনে যখন নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ পেয়েছি দিবাকর-বাবু, তখন অন্তত একটা মাসের জন্য বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে চাই!

দিবাকর—সিমলা আপনার মন্দ লাগবে না স্যার।

সুপ্রকাশ দত্ত—না, পাহাড়-টাহাড় আমার ভাল লাগবে না। সমুদ্রের কথা ভাবছি।

দিবাকর—তা হ'লে পুরী?

সুপ্রকাশ দত্ত—না, গোপালপুর-অন-সী। চমৎকার জায়গা। সেই ছেলে-বেলায় একবার গিয়েছিলাম, আজও সমুদ্রের ধারে বেড়াবার আনন্দ মনে আছে।

দিবাকর—বেশ তো। গোপালপুরে গিয়ে একটা মাস থেকে আসুন।

সুপ্রকাশ দত্ত—হ্যাঁ, একটা মাস কিন্তু আপনাকে কোম্পানির সব ঝঞ্ঝাট সইতে হবে।

দিবাকর—নিশ্চয়। নইলে আমি আছি কিসের জন্য?

পকেট থেকে সিগারেট বের করে সুপ্রকাশ দত্ত। দিবাকর নিজের পকেট হাতড়ে ব্যস্তভাবে দেশলাই খোঁজে।

সিগারেট ধরিয়ে হেসে হেসে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত।—আপনি কি সমুদ্র দেখেছেন ?

মাথা নাড়ে করুণা—না।

সুপ্রকাশ দত্ত—তাহলে চলুন না গোপালপুর ?

সুপ্রকাশ দত্তের অনুরোধের ভাষা যেন ঘরের আলো বাতাসকে হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ময়ে চমকে দিয়েছে। ঘরটাই যেন হঠাৎ মূর্চ্ছার আবেশে স্তব্ধ হয়ে যায়।

পা দুলিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আবার এই অনুরোধের উল্লাসে ঘরের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে সুপ্রকাশ দত্ত বলতে থাকে—একটা মাস দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে করুণা দেবী।

কালো ভয়েলের আঁচলটাকে আরও জোরে খিমচে ধরে করুণা, তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে দিবাকরের মুখের দিকে তাকায়।

এইবার দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত—আপনার নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই দিবাকরবাবু ?

সুপ্রকাশ দত্তের প্রশ্নটা যেন দিবাকরের ঘাড়ের উপর এসে আছড়ে পড়েছে। ঘাড় সোজা করতে, মুখ তুলে তাকাতে একটু দেরি করে ফেলে দিবাকর।

—কি বলেন দিবাকরবাবু ? আবার প্রশ্ন করে সুপ্রকাশ দত্ত এবং আরও জোরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে করুণার মুখের দিকে তাকায় দিবাকর। সির সির করে কাঁপতে থাকে দিবাকরের চোখের তারা ! কিন্তু সুপ্রকাশ দত্তের উচ্চকিত হাসির শব্দ শুনে সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে দিবাকর—হ্যাঁ স্যার, কি বললেন স্যার ?

সুপ্রকাশ দত্ত—আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয় ?

দিবাকর বলে—আমার আপত্তি নেই স্যার। কিন্তু......।

সুপ্রকাশ দত্ত—কিন্তু কি ?

উত্তর না দিয়ে করুণার মুখের দিকে তাকায় দিবাকর। দিবাকরের চোখের চাহনি অসহায় হয়ে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন প্রার্থনা করছে। ভয় করছে করুণাকে, জীবনে কোনদিন করুণাকে এমন ভয় করেনি। দিবাকরের ইচ্ছার কাছে এই মুহূর্তে কি ভয়ানক মূর্খের মতো আর নিষ্ঠুরের মতো বাধ্য হয়ে যাবে করুণা। করুণার ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা হাসির জ্বালা শিউরে উঠেছে।

চেঁচিয়ে হেসে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুপ্রকাশ দত্ত।—আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয় ?

হেসে ফেলে করুণা। মাথা হেঁট করে। তারপরেই মাথা নাড়ে।

সুপ্রকাশ দত্ত—কি বললেন ? আপত্তি আছে ?

করুণা—হ্যাঁ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুপ্রকাশ দত্ত।—তাই বলুন। আচ্ছা আমি এখন চলি।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় সুপ্রকাশ দত্ত। ব্যস্তভাবে পিছু পিছু এগিয়ে যায় দিবাকর। সুপ্রকাশ দত্ত হেসে হেসে বলে—আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে দিবাকরবাবু ?

—কিসের সন্দেহ স্যার ?

—আপনি নিতান্ত ভালোমানুষ।

চলে যায় সুপ্রকাশ দত্ত। গাড়ির শব্দটা দূরে সরে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে করুণা—আমারও একটা সন্দেহ হচ্ছে ?

চমকে ওঠে দিবাকর—কি ?

করুণা—তুমি নিতান্তই কর কোম্পানির ম্যানেজার। মানুষ-টানুষ নও !

দিবাকর—তার মানে ?

করুণা—তার মানে তোমার দিকে তাকাতেও আমার ভয় করছে।

দিবাকর—কেন ?

করুণা—ভয় করতে বাধ্য।

জল রাক্ষস

মানুষ নয়, জন্তু নয় ভূতও নয়। তবে কি ? সবাই বলে, ওটা হ'ল মানুষেরই মতো দেখতে এক ধরনের ভুতুড়ে জন্তু। নদীর জলের গভীরে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। ভেসে উঠলেও চেহারার সবটুকু ঠিক দেখা যায় না। শুধু মাথার লম্বা লম্বা চুলের গোছা জলের উপর ভাসতে থাকে। শাঁখ বাজালেই তলিয়ে যায়।

দফাদার বলে—ওকে বলে চুলিয়া, জলের রাক্ষস। অনেকদিন আগে, আমরা তখন নেহাৎই বাচ্চা, এই তল্লাটে খুব জোর চুলিয়ার হামলা হয়েছিল। আমরা গাঁ ছেড়েই চলে গিয়েছিলাম। নদীর এদিকে পাঁচ ক্রোশ আর ওদিকে পাঁচ

ক্রোশ, আষাঢ় থেকে ভাদ্দর পর্যন্ত তিনটে মাস নদীর কোন ঘাটের জলে মানুষ নামত না। ইলিশ ধরতে বাঙাল জেলের দল এসেছিল তারাও পালিয়ে গেল। ব্যাপারীদের নৌকা পর্যন্ত ঘাটে ভিড়তে সাহস পেত না। রায়নগরের বাজার উঠেই গেল। দশ ক্রোশ জুড়ে গঙ্গার দু'দিকের ঘাটগুলি যেন ছাড়া শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করত।

নায়েব মশাই বলেন—আবার এই তল্লাটের সেইরকমই দশা হবে বলে মনে হচ্ছে। হিসেব করে দেখেছি, এই সাত দিনের মধ্যে মোট এগারটা গরু, একটা ঘোড়া, তিনটে বাছুরকে চুলিয়াতে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বলেন—ভগবানগোলার খবর আরও ভয়ানক। শিবমন্দিরের সেবাইতের বউ, দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, কাঁচা বয়সের মানুষটি, শেষরাতে গঙ্গায় নাইতে গিয়েছিল। গায়ে এগার ভরি সোনার গয়না ছিল। গেল, একেবারে তলিয়ে গেল। আজ পর্যন্ত লাশের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দফাদার বলে—গরু-বাছুরের লাশগুলির অবিশ্যি খোঁজ পাওয়া যায়। তলিয়ে যাবার দু'এক দিনের মধ্যেই ভেসে ওঠে। আর দেখা যায়, গরুবাছুরের শুধু চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছে, চোখ খেতে খুব ভালবাসে চুলিয়া।

ভাদ্রের ঢেউ-ছলছল গঙ্গার ধারে কাপ্তেনগঞ্জ নামে যে জায়গার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে গেঁয়ো লোকজনের একটা ভিড় কথা বলছিল, সেখানে আজ আর কোন গঞ্জ নেই। কোন্ কাপ্তেন এখানে গঞ্জের পত্তন করেছিল, তার নামও লোকে জানে না। নায়েব মশাই বলেন, ক্লাইভের আমলের এক ইংরেজ কাপ্তেন নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে রেশমের কুঠি করেছিল। ঐ যে ঘাট থেকে সামান্য একটু দূরে, গাব ডুমুর আর চালতা গাছের জংলা বাগানটার কাছে ভাঙা ভাঙা ইটের স্তূপ পড়ে রয়েছে, ওটাই ছিল সেই রেশম কুঠি।

কাপ্তেনগঞ্জ এখন যে চৌধুরীবাবুর জমিদারি, সে-ও এই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব কাহিনী শুনছে।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে, দিব্যি সুশ্রী চেহারা, কাপ্তেনগঞ্জের বাবু অতীন চৌধুরী যেন সেই ক্লাইভেরই আমলের এক বনেদী গৌরবের শেষ প্রদীপের মতো জ্বলছে। কাপ্তেনগঞ্জের সাবেক কালের সৌখীন জীবনের সুগন্ধ যেন এখনও অতীন চৌধুরীর সাজ-পোষাকে ভুরভুর করে। সিল্কের পাঞ্জাবী ও সিল্কের পায়জামা, পায়ে জরি লাগানো মখমলের চটি। এই পরিপাটি পোষাকদুরস্ত মূর্তি নিয়ে আজ ভোর থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত গাঁয়ের একদল লোকের সঙ্গে গঙ্গার ধারে পাঁচ মাইল হেঁটেছে অতীন চৌধুরী। চুলিয়ার ভয়ে গাঁয়ের যত

ঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে একটা বরযাত্রী দল ঘাটে নৌকা না ভিড়িয়ে সোজা ফিরে চলে গিয়েছে! বিয়েবাড়ির সব আয়োজন আর আনন্দ পণ্ড হয়েছে। জলের রাক্ষস চুলিয়া নাকি ভোরের দিকেই ভেসে ওঠে। তাই গাঁয়ের লোকের অনুরোধে ভোর হতেই আজ বের হয়েছে অতীন চৌধুরী। সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, নায়েবমশাই, দফাদার আর জন দশ-পনের জনচাষী।

চুলিয়া-কাহিনীকে বিশ্বাস করে না অতীন চৌধুরী। শুধু গ্রামের দশজনের অনুরোধের দাবী রক্ষা করা ছাড়া তার মতো মানুষের পক্ষে গঙ্গার ধারে পাঁচ মাইল হেঁটে ক্লান্ত হবার কথা নয়। সব কাহিনী শুনে মনে মনে হাসে অতীন চৌধুরী, কিন্তু মুখে বলে—তাহলে আরও ভাল করে একটা পাহারা রাখবার ব্যবস্থা করা হোক।

দফাদার বলে—আমার সঙ্গে অন্তত জন পাঁচেক বেশ সাহসী মদ্দ থাকলে আমি রোজ শেষরাতে গঙ্গার এই দেড় ক্রোশের উপর নজর রাখতে পারি।

অতীন চৌধুরী বলে—দফাদারের কাজে সাহায্য করবে এই রকম জন পাঁচেক লোকের বন্দোবস্ত করে দিন নায়েবমশাই।

নায়েব মশাই বলেন—কিন্তু সত্যিই যদি দেখা যায় যে চুলিয়া ভেসে উঠেছে, তবে কি হবে?

অতীন চৌধুরী হাসে—শুধু আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দিতে হবে। তারপর আমি আছি আর আমার রাইফেল আছে।

অনেক দূরে, এই গঙ্গারই ধারে এক গাঁয়ে যেন শত শত শাঁখ বাজছে। চমকে ওঠে দফাদার। নায়েব মশাই আতঙ্কিতের মতো চোখ ঘোলা করে দূরের সেই ভয়ার্ত শঙ্খের শব্দ শুনতে থাকেন। প্রেসিডেণ্ট বলেন, বোধহয় উত্তর রঘুনাথপুরের গঙ্গায় চুলিয়া ভেসেছে। ওদিকটা এতদিন নিরাপদ ছিল।

অতীন চৌধুরী আরও জোরে হাসতে থাকে—তুমিও কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে ফেলো না দফাদার। ভাল একটা টর্চ সঙ্গে রাখবে, আর লম্বা লম্বা চুল ভেসে রয়েছে দেখলেই আমাকে খবর দেবে।

চলে গেল অতীন চৌধুরী।

কাপ্তেনগঞ্জের এই ঘাটে দাঁড়িয়ে জমিদারবাড়ির চিলকোঠা দেখতে পাওয়া যায়। কিরকম যেন দেখতে এই প্রকাণ্ড বাড়িটা। বাড়ি থেকে বেশী দূরে মস্ত একটা ফটক, সে ফটকের সব পলেস্তারা ঝরে পড়ে গিয়েছে। ফটকের মাথার ওপর দুটো বড় বড় গম্বুজ। ভাল করে দেখলে এখনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া

যাবে, গম্বুজের গায়ে মীনাকরা রঙীন নক্সার ছিটেফোঁটা লেগে রয়েছে। ফটকের নামটা এখনও মরে যায়নি। লোকে বলে হাতিদরজা।

হ্যাঁ, কাপ্তেনগঞ্জের সেই বিলাস আর বৈভবে ভরা অতীতে এই ফটক দিয়েই রাজা রামগোবিন্দ চৌধুরী হাতির পিঠে ঝকঝকে রূপোর হাওদায় বসে যাওয়া-আসা করতেন। ক্লাইভের হুকুমনামার জোরে গঙ্গার পঁচিশ ক্রোশ জলকর হাসিল করতেন। অতীন চৌধুরী এখন যে ভাঙা দালানটার কাছ দিয়ে যেতে যেতে বিছুটির ঝোপের ছোঁয়া থেকে সিল্কের পায়জামা বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে আর সিগারেট খাচ্ছে, সেখানে এখনও বড় বড় ভারি লোহার জিঞ্জিরের টুকরো মরচে ধরে পড়ে রয়েছে। ঐ জিঞ্জিরে হাতি বাঁধা থাকত। চারদিকের গড় ভরাট হয়ে গিয়েছে, সেই দেউড়ি ধ্বসে পড়ে গিয়েছে, এবং দেউড়ির কাছে শান-বাঁধানো চাতালের উপর সেই তোপও আর নেই, যদিও ফাটলধরা ও কাকভাবিছার আড্ডা এই চাতালের নাম আজও তোপখানা।

জংলা লতাপাতায় একেবারে আগাগোড়া মোড়া যে বারদুয়ারী দালানটার ছাদ এখনও ভেঙে পড়েনি, সেটার নাম বাইমহল। চৌধুরীদের তিন পুরুষ পর্যন্ত এই বারদুয়ারী বাইমহলে আতর গুলাবের ছড়াছড়ির মধ্যে রূপসী বাঈজীর নাচ দেখেছেন আর খুশির রাত জেগেছেন। আজ এই শূন্য দালানের ভিতরে দাঁড়িয়ে টুঁ শব্দ করলে সেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর একটা প্রতিধ্বনি হাঁউমাউ করে বেজে ওঠে।

এই পুরনো ধ্বংসেরই এক পাশে আজ যে তিনতলা বাড়িটার ভিতরে অতীন চৌধুরীর জীবনের দিনরাত পার হয়, সেই বাড়ি তিনপুরুষ আগের ঐশ্বর্যের খোলস মাত্র। সেকেলে সব আসবাব, সব সিন্দুক, সব গালিচা, মূর্তি, বেলোয়ারী ঝাড় ও তৈজস একে-একে বিদায় নিয়েছে। এই বাড়ির একটা ঘর শুধু হাল আমলের মিরর ও আলমারি আর সেকেলে পালঙ্ক দিয়ে সাজানো। আর আছে একটি একেলে মানুষ, অতীনের স্ত্রী মঞ্জুলতা। কলেজের পড়া শেষ না হতেই অতীনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে কলকাতা থেকে সেই যে এই বনেদী গৌরবের খোলসের মধ্যে চলে এল মঞ্জুলতা, তারপর আর বাপের বাড়ি যায়নি। একটানা এই পাঁচ বছর ধরে স্বামীর কাছেই আছে মঞ্জুলতা। যতক্ষণ মাসিক পত্রিকার গল্প পড়ে মঞ্জুলতা শুধু ততক্ষণ যেন কলকাতার জীবনের স্বাদ পায়। আর মনে হয়, জীবনটা যেন একশো বছর ধরে পিছিয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর এক বনেদী কারাগারের মধ্যে হাঁসফাঁস করছে।

স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে এসে কাপ্তেনগঞ্জের বনেদী ধ্বংসের মাঝখানে তিন-

তলা বাড়ির এই কক্ষের ভিতরে প্রথম দিনেই সমস্যাটাকে ঠিক বুঝতে না পেরে চমকে উঠেছিল মঞ্জুলতা। আর দ্বিতীয় দিন ঠিক সন্ধ্যা হতেই সমস্যাটাকে বুঝতে পেরে চমকে উঠেছিল।

সাজ সেরে এই পালঙ্কেরই উপর বসেছিল মঞ্জুলতা, আর অতীনও সাজ সেরে তার সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর আধ শিশি সেন্ট ঢেলে দিয়ে ঘরের বাইরে যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই মঞ্জুলতা বলে—একি ? কাল সন্ধ্যাবেলা'তে এভাবে বেরিয়ে গেলে আর ফিরে এলে সকালবেলা, আজও আবার সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে যাচ্ছ, এর মানে কি ?

অতীন হাসে—এর মানে তোমার না জানলেও চলবে মঞ্জু।

মঞ্জু—বেশ বললে ! স্ত্রী জানতে পারবে না তার স্বামী কোথায় গিয়ে রাত কাটায় ?

অতীন—সেটা জানলেও আমি তোমার স্বামী, না জানলেও আমি তোমার স্বামী।

মঞ্জু বলে—বুঝলাম, কিন্তু বলতে হবে তুমি কোথায় যাচ্ছ।

অতীন—আমার বৈঠকখানায়।

মঞ্জু আশ্চর্য হয়—কোথায় তোমার বৈঠকখানা ?

অতীন—ঐ যে, বারদুয়ারী বাইমহলের পাশে আমড়া বাগানটার মধ্যে একটা নতুন কেবিনঘর দেখছ, সেটাই আমার বৈঠকখানা।

মঞ্জু—মানুষে বৈঠকখানায় বসে বলেই জানি, ঘুমিয়ে রাত কাটায় না।

অতীন—আমিও ঘুমিয়ে রাত কাটাই না। ঘুমোতে হলে তোমার কাছেই এসে ঘুমোব।

পাগলের কথা বলেই সন্দেহ হয়, কিন্তু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে মানুষটা এত ভাল ভাল কথা বলেছে, সে মানুষটা সন্ধ্যে হতেই পাগল হয়ে উঠবে কেন ? মঞ্জু বলে—তুমি আমাকে ঠকাচ্ছো।

অতীন বলে—না। আমি ভগবানকেও ঠকাতে পারি, কিন্তু তোমাকে ঠকাবো না।

মঞ্জু—তবে কেন যাচ্ছ ?

অতীন—না যেয়ে পারি না ! এটা আমার সাতপুরুষের নিয়ম। ঐ নিয়ম আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে। না যেয়ে পারব না মঞ্জু, যেতেই হবে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মঞ্জু—বিয়ের আগেও কি তোমার এই অভ্যাস ছিল ?

অতীন—হ্যাঁ, যখন স্কুলও পার হইনি, সেই ষোল বছর বয়স থেকেই।

আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকে মঞ্জুলতা। এবং আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বের হয়ে যায় অতীন।

এই দৃশ্যটাও অতীনের কাছে এমন কিছু অভিনব নয়। মনে পড়ে বিশ বছর আগের কথা, যখন বাবা আর মা বেঁচে ছিলেন, ঠিক মঞ্জুর মতো এইভাবেই এই পালঙ্কেরই উপর বসে মা চোখে আঁচল চাপা দিতেন, আর বাবা জুঁই-এর মালা হাতে জড়িয়ে, গলায় পাকানো চাদর চড়িয়ে আর আতর মাখানো মোষের শিঙের লাঠি হাতে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বের হয়ে যেতেন। মাঝরাতে গঙ্গায় ঘাটে বজরার মধ্যে যখন খেমটা নাচের ঘুঙুর বাজত তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন মা। এটা কাপ্তেনগঞ্জের সাতপুরুষের নিয়ম।

কিন্তু কলকাতার মেয়ে মঞ্জুলতা ভাবে, কি বীভৎস ও কি ভয়ানক নিয়ম! একেই বোধহয় বলে প্রেত-নিশির ডাক। চক্কোত্তি মশাই যেমন প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক সময়টিতে এসে এ-বাড়ির পুজোর ঘরে আরতি করে চলে যান, এই নিয়মও যেন ঠিক তেমনি এক নিষ্ঠার নিয়ম। সন্ধ্যা হতেই বাড়ির কর্তা তাঁর বৈঠকখানায় চলে যান, কে জানে কোন ভয়ঙ্কর রহস্যের আরতি করতে।

বুঝতে দেরি হয়নি। সকাল হতে অতীন ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই ঘরের বাতাস আতরমাখা পচাটে গন্ধে ভরে যায়। অতীনের চোখ দুটো রাতজাগা ক্লান্তি আর মদের নেশার ঝাঁঝে লাল হয়ে আছে। আস্তে আস্তে টলতে টলতে এসে পালঙ্কের উপর গড়িয়ে পড়ে অতীন, অঘোরে ঘুমোতে থাকে। এবং ঘুমের ফাঁকে ফাঁকেই এক একবার চোখ মেলে তাকিয়ে ডাক দেয়—তুমি একটু কাছে বস মঞ্জু।

দেখতে পায় মঞ্জু, ঘুমের মধ্যেই যেন হাতড়ে হাতড়ে কারও হাত খুঁজছে অতীন।

দুপুর পর্যন্ত ঘুম। তারপরেই উঠে বসে অতীন। স্নান সেরে, খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবিয়ে আর হাতপাখা হাতে নিয়ে যখন চেয়ারের উপর বসে অতীন, তখন যেন একেবারে নতুন মানুষ হয়ে যায়। কত হাসি, কত গল্প, কত ঠাট্টা আর ভাল ভাল কথা। মঞ্জু তখন ভাবে, কি আশ্চর্য, এই মানুষই সন্ধ্যা হতেই আবার পাগল হয়ে যাবে!

বুঝতে কিছু বাকি নেই, সহ্য করা যায় না, উচিতও নয়, তবু সহ্য করে মঞ্জু। যেন কাপ্তেনগঞ্জের এই বনেদী অভিশাপের শেষ দেখবার জন্য একটা আশা নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে মঞ্জুলতা। কে জানে কেমন সেই শেষ!

চা খায় ইন্দুপ্রকাশ, কাছেই চেয়ারে বসে ইন্দুর সঙ্গে গল্প করে মঞ্জুলতা। কাদামাখা মখমলের জুতো পায়ে অতীন সামনে এসে দাঁড়াতেই চেঁচিয়ে ওঠে ইন্দু—কি হে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

অতীন বলে—গাঁয়ের লোকগুলোর মাথা খারাপ হয়েছে। ওদের ধারণা গঙ্গায় নাকি জলরাক্ষস দেখা দিয়েছে ! মানুষ আর গোরু জলে নামলেই তলিয়ে যাচ্ছে। এ গাঁয়ের অনেক গোরু আর ভগবানগোলার এক সুন্দরীকে মেরে ফেলেছে জলরাক্ষস। তাই ভীতু মানুষগুলোকে একটু সাহস দিয়ে এলাম।

অতীনের কলেজ-বন্ধু ইন্দুপ্রকাশ। ভাগ্যচক্রের ফেরে পড়ে ইন্দুও আজ সাত-আট মাস হল এই কাপ্তেনগঞ্জের মাটির টানে অতীনের বড় কাছাকাছি এসে ঠাঁই নিয়েছে। তিনশ বিঘা জমি নিয়ে আখের চাষ করে ইন্দু। কাপ্তেন-গঞ্জের চৌধুরী বাড়ির হাতিদরজা থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে সড়কের ধারে পাতলা দেয়ালের একটি বাংলো তৈরী করে নিয়েছে ইন্দু। এই বাংলোই হল ইন্দুর কৃষি অফিস, থাকবার ঘর, গান গাইবার আসর আর নানা শস্যের বীজ নিয়ে রিসার্চ করার লেবরেটরী। অতীনেরই অনুরোধ, সকাল বেলাটা এখানে এসে ইন্দু যেন রোজই চা খেয়ে যায়। ইন্দুও খুশি মনে সে অনুরোধের সম্মান রক্ষা করেছে। এই সাত-আট মাসের মধ্যে বোধহয় দশ-বার দিন বাদ দিয়েছে, নইলে রোজই এসে চা খেয়ে গিয়েছে ইন্দু।

যতক্ষণ ইন্দু থাকে, মঞ্জুলতার মনটাও যেন ততক্ষণ কাপ্তেনগঞ্জের জীবনের সব ভয়গুলিকে ভুলে যায়। ইন্দুর মুখ থেকেই কলকাতার গল্প শোনে মঞ্জুলতা, মাসিক পত্রিকার গল্প আর না পড়লেও চলে।

ইন্দু বলে—বিয়ের সময় আপনাকে যেন একটু রোগাই দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে এসে তার চেয়েও রোগা হয়ে গেলেন কেন ?

মঞ্জু বলে—আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনার কথা বলুন।

ইন্দু—আমার কথা হল, একদিন রাত্রিবেলা আসতে বলুন, আপনার হাতের রান্না পোলাও-টোলাও খেয়ে যাই। রোজই শুধু চা খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, এ কী রকমের ব্যবহার ?

অতীন বলে—বেশ তো, ইন্দুকে আজ রাতেই খাইয়ে দাও না মঞ্জু।

মঞ্জু বলে—আচ্ছা।

ইন্দু চলে যেতেই মঞ্জু বলে—আমি এবার কলকাতায় চলে যাই।

অতীন হাসে—যেতে পারবে ?

মঞ্জু বলে—কোন্ দুঃখে যেতে পারব না?

অতীন—তুমি আমাকে ভালবাস। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

মঞ্জু—তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি?

অতীন—নিশ্চয়ই। নইলে কবে চলে যেতে।

মঞ্জু—যদি কোনদিন ভালবাসতে না পারি, তবে?

অতীন হো হো করে হাসে—তবুও কলকাতায় চলে যেতে পারবে না মঞ্জু, সে মেয়ে তুমি নও। যদি সত্যিই এমন অঘটন ঘটে, তবে তুমি নিজেকেই ঘেন্না করে মরে যাবে।

কী অদ্ভুত বিশ্বাস! আমড়া বাগানের এক কেবিনঘরে যত পাপিনীর শরীর নিয়ে সারারাত খেলা করে যে নেশাড়ে মানুষটা, সে এই অটল বিশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে আছে, তার স্ত্রী কোনদিন ভালবাসা হারাবে না। চোখ ছলছল করে, মুখ ঘুরিয়ে নেয় মঞ্জু, আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

হঠাৎ আহতা নাগিনীর মতো যেন দুঃসহ আক্রোশে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে মঞ্জু—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

অতীন—কি?

মঞ্জু—এই পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভালবাসতে পেরেছ, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

অতীন হো হো করে হাসে।—এই পাঁচ বছরের প্রতি মুহূর্ত তোমাকেই ভালবেসেছি। তুমি বুঝতে পারনি।

মঞ্জু—তুমি কেমন করে বুঝলে?

অতীন—স্বপ্নে দেখেছি, তুমি মরে গিয়েছ আর আমি কাঁদছি।

চুপ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জু। অতীন বলে—আমি জীবনে কারও জন্য কাঁদিনি, কিন্তু বিশ্বাস কর মঞ্জু, আমি শুধু একজনের জন্যই কাঁদব, সে হ'ল তুমি, যদি তুমি আমার আগে চলে যাও।

ছুটে কাছে এগিয়ে এসে অতীনের হাত ধরে মঞ্জু। ক্লান্ত বিকালের রোদ তখন লাল হয়ে নারকেলের পাতার ঝালরে খেলা করতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই।

আকুল হয়ে মিনতি করে মঞ্জু—তাহলে বল লক্ষীটি, আজ সন্ধ্যায় ঐ কেবিন ঘরে আর যাবে না!

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকায় অতীন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর পায়চারি করে। সন্ধ্যার লাল আলো কালো ছায়ায়

ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়, ছটফট করে অতীন! তাড়াতাড়ি সাজ সারে। সেণ্টের শিশি রুমালের উপর উপুড় করে ঢেলে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। তার পরেই আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জু। পাঁচ বছর তো এইভাবে পার হয়ে গেল। কিন্তু আর কতদিন?

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মঞ্জু, চলে যাচ্ছে অতীন। ক্লাইভের আমলের জলকরের ইজারাদার সেই রাজাবাবু চৌধুরীদের হাতি-ঘোড়া কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু অভিশাপগুলি আছে। বারদুয়ারী বাইমহলে ঘুঙুর বাজে না, বাজাবার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু আমড়াবাগানের এক কেবিনঘরে কাচের গেলাস, দেশী মদের বোতল আর চুড়ির শব্দ প্রতি রাত্রে আত্মহারা হয়ে বাজে। অতীন রায়ের রক্তের ইতিহাস তৃপ্ত হয়।

—এ কি? আপনি বারান্দার কোণে এই একটা বিশ্রী চেয়ারে এভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন?

চমকে ধড়ফড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মঞ্জুলতা। ইন্দু এসেছে। ইন্দু যে আসবে, নিজের হাতে রেঁধে ইন্দুকে খাওয়াতে হবে, সে-কথা ভুলেই গিয়েছে মঞ্জু। সন্ধ্যার পর থেকে এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের মনের জ্বালার সঙ্গে যেন যুদ্ধ করেছে মঞ্জু। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকায় মঞ্জু। কী সর্বনাশ, রাত যে প্রায় দশটা!

ইন্দু বলে—অতীন কোথায়?

মঞ্জু—বাইরে বের হয়েছেন।

ইন্দু—কখন্ ফিরবে?

মঞ্জু—জানি না।

অপ্রস্তুত হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে ইন্দু। মঞ্জু বলে—আপনার ওপর বড় অন্যায় করে ফেলেছি।

ইন্দু আশ্চর্য হয়—অন্যায়?

মঞ্জু—হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছি যে আজ আপনাকে খেতে নেমন্তন্ন করেছি।

হো হো করে হেসে ওঠে ইন্দু—তাই বলুন। কিন্তু সে-জন্য এত দুঃখ করবার কি আছে? আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

মঞ্জু—কিন্তু আমার যে ভাবতে বড় লজ্জা করছে, বড় কষ্ট হচ্ছে ইন্দুবাবু!

ইন্দু—না, না, ওসব কিছু মনে করবেন না। আমাকে একেবারে আপনার জন বলে মনে করবেন। আমি অন্তত আপনার মতো মানুষের কোন দোষই ধরি না।

চলে গেল ইন্দু।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছটফট করে মঞ্জু। কাপ্তেনগঞ্জের এই বাড়ির এই রাতটাকে বড় ঘৃণ্য বলে মনে হচ্ছে। সহ্য করা যায় না। সহ্য করা উচিত নয়। ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে, আমড়াবাগানের অন্ধকারে লুকানো ঐ কেবিনঘরের কপাট ভেঙে ভিতরে ঢুকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে, বনেদী অভিশাপের নেশায় কেমন রঙীন হয়ে রয়েছে জমিদার অতীন চৌধুরী।

ছি-ছি, ওদিকে যেতেও যে ঘেন্না করে। কিন্তু কোনদিকে তো যেতেই হবে। না যেয়ে উপায় নেই! সারা মনটা পাগল হয়ে বলছে, চলে যাও। যাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, তার কাছে যাও।

মনটা পাগল হয়েও সত্যি কথা বলছে। আর এক মুহূর্তও দেরি করে না মঞ্জু। চৌধুরী বাড়ির তিনতলা বিভীষিকার চেহারা পিছনে ফেলে রেখে একটা ছায়াশরীর যেন ছুটে বের হয়ে যায়।

হাতিদরজার গায়ে জোনাকি জ্বলে। তারই কাছে পাতলা দেয়ালের ছোট বাংলো, যেন লতা-পাতা আর ফুলের সাজ পরানো একটি শান্তির নীড়। ইন্দুর ঘরের দরজার কড়ায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জু, থরথর করে কাঁপে সারা শরীর।

এ কি? ইন্দুর কাছে কেন? মঞ্জুর বুকের ভিতরটাই যেন নিজেকে চিনতে পেরে হঠাৎ চমকে ওঠে। মঞ্জুর পায়ের শব্দ আবার ছটফটিয়ে বেজে ওঠে।

ইন্দু ডাকে—কে?

আলো হাতে নিয়ে বাইরে এসেই দেখতে পায় ইন্দু, কেউ নয়, বারান্দার থামের গা-জড়ানো লতাগুলি শুধু দুলছে।

চুলিয়া! চুলিয়া! কাপ্তেনগঞ্জের ঘাটের কাছে জলের উপর চুলিয়া ভেসে বেড়াচ্ছে। শেষ রাতের শেষ তারা নিভে যাবার আগেই সোরগোল আর হাঁকেডাকে সারা গ্রামের ঘুম ভেঙে গেল আর দলে দলে লোকজন ছুটে চলল ঘাটের দিকে।

নায়েব মশাই এসে কেবিনঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিতেই বের হয়ে আসে অতীন চৌধুরী। অতীনের রাইফেলটাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন নায়েব মশাই।

দফাদার বলে—ঘাটের খুব কাছে চুলিয়া ভেসে রয়েছে বাবু।

আর দেরি করে না অতীন। চোখভরা নেশা, আর বুকভরা মদের ঝাঁজ সঙ্গে নিয়েই রাইফেল হাতে ছুটে গিয়ে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঘুম-ভাঙ্গা কাকের ডাক সবেমাত্র শুরু হয়েছে। পূবের আকাশ সবেমাত্র ভোরাল হয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় অতীন চৌধুরী আর গাঁয়ের শত শত মানুষের ভিড়, সত্যিই ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ঢেউ-এর দোলানির সঙ্গে জলরাক্ষসের গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ভাসছে।

পূবের আকাশ যেন ফিক করে হেসে উঠেছে, প্রথম ভোরের আভা ছড়িয়ে পড়েছে জলের উপর। ঠাণ্ডা রাইফেলটাকে হঠাৎ দু'হাতে বুকে আঁকড়ে কেঁপে ওঠে অতীন চৌধুরী। অপলক চোখে দেখতে থাকে অতীন চৌধুরী, জল-রাক্ষসের চুল দেখতে বড় সুন্দর।

শুধু এলোমেলো একরাশ চুল নয়, লাল পাথর বসানো সোনার একটি হেয়ার পিনও ভাসছে। মাঝে মাঝে কপালটাও ভেসে উঠছে, সেই সঙ্গে একজোড়া ঘুমন্ত চোখ। বুটিদার ঢাকাই শাড়ির আঁচলটাও থেকে থেকে ভেসে ওঠে।

নিথর হয়ে বসে থাকে অতীন চৌধুরী। ঘাটের ভিড়ের নিঃশ্বাসগুলি যেন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কোন শব্দ করে না। নায়েব মশাই এরই মধ্যে দুটো লগি আনিয়ে ফেলেছেন। দফাদারও লগিটা হাতে তুলে নিয়েছে।

অতীন চৌধুরীর হাত ধরে নায়েব মশাই ডুকরে ওঠেন—এ কী সর্বনাশ, কে জানে কখন্ এমন কাণ্ড হয়ে গেল বড়বাবু!

তেমনই নীরব আর নিথর হয়ে বসে থাকে অতীন। নায়েব মশাই আবার হাঁউমাউ করে ওঠেন—আমাদের কি করতে বলেন বড়বাবু?

অতীন—আমি কিছুই বলতে পারি না। ইন্দুকে একবার খবর দিন।

চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন নায়েব মশাই।—ইন্দুবাবুকে কেন?

লাল চোখ দুটো ছলছলিয়ে যেন বিকার রোগীর মতো প্রলাপ বকে অতীন—মানুষটা এভাবে শেষ হয়ে গেল, তার জন্য পৃথিবীর অন্তত একজনেরও তো কাঁদা উচিত, কিন্তু আমি যে কাঁদতে পারছি না নায়েব মশাই!

মিস্টার নাগের বাগান পাহারা দেবার জন্ত শুধু একজন দারোয়ান আছে। দিনের বেলায় পাহারা দেবার কোন দরকার হয় না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত স্বয়ং মিস্টার নাগই পাহারা দেন। মাঝে মাঝে অবশ্য বার কয়েক বাড়ির ভিতরে যাবার দরকার হয়, স্নান ও আহারের তাগিদ স্বীকার করতে হয়। সেই কয়েকবার বাগানের উপর চোখ রাখে ড্রাইভার শীতল সিং। দুপুরে এক ঘণ্টার জন্ত আর সন্ধ্যায় একঘণ্টার জন্য। দিনের বাকী সময় বাড়ির বারান্দায় আরাম-চেয়ারে প্রৌঢ় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বাগানের উপর সতর্ক চক্ষুর দৃষ্টি ছড়িয়ে বসে থাকেন মিস্টার নাগ। মাঝে মাঝে অবশ্য হাতের বই-এর উপর চোখ বোলান। কিন্তু সেই দৃষ্টি যেন তাঁর বড়-বড় সতর্ক চক্ষুর ক্ষণিক বিরাম। বই-এর দিকে তাকান বটে, কিন্তু বই পড়তে পারেন বলে মনে হয় না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটার সময় উপস্থিত হয় দলবীর। মিস্টার নাগের বাগানের ফুল আর লতা-পাতা পাহারা দেয়, রাত দশটা থেকে সুরু করে সকাল সাতটা পর্যন্ত।

মিস্টার নাগের বাগান যেন উদ্ভিজ্জ বৈচিত্র্যের একটা সমারোহ। বিচিত্র ফুল, বিচিত্র ফল আর বিচিত্র লতা-পাতা। মিস্টার নাগের বাগানের এমন ফার্ণ কাশ্মীরের শালিমার বাগ ছাড়া আর কোথাও নেই। এই বাগানে এমন ফলের গাছ আছে, যে ফল দেখতে ফুলেরই মতো। এমন ফুল আছে, যেটা সত্যি ফুল নয়, ফল।

আলপাইন ফ্লোরা বড় ভালবাসেন মিস্টার নাগ। উদ্ভিদ-প্রেমিক মিস্টার নাগের বাগানের জুলিপারাস ক্যাসিওপি আর রডোডেনড্রন দেখবার জন্য মাঝে মাঝে বিদেশী টুরিস্টরাও এসে ভীড় করেন।

কলকাতার মাটিতে ভায়োলেট আর ডেজি ভাল ফুটতে পারে না কে বলে? মাঘ মাসের কোন সকাল বেলায় মিস্টার নাগের এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালেই বাগানের ভায়োলেট আর ডেজির শিশিরভেজা শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

হুইটম্যানের কবিতার বই হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে যখন আবৃত্তি করেন মিস্টার নাগ, হোয়েন লাইল্যাক্‌স্‌ লাস্ট ইন দি ডোরইয়ার্ড ব্লুমড, তখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ টান করে সোজা দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বাগানের ফুটন্ত লাইল্যাকের

দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কত টাকা খরচ করেছেন মিস্টার নাগ? অনেকেই জানেন, মিস্টার নাগ তাঁর জজিয়তী জীবনের উপার্জিত সব টাকা এই বাগানের ঐশ্বর্য আর বৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠায় খরচ করে দিয়েছেন। এখনও পেন্সন বলতে যা পান, তার অর্ধেকেরও বেশি এই বাগানের সেবা ও যত্নের কাজে খরচ করে থাকেন। দারা-সুত পরিবার বলতে কেউ নেই মিস্টার নাগের; এই বাগানটাই তাঁর ভালবাসার সংসার।

আফ্রিক্যান টিউলিপ ফুটেছে। ফুলের সেই রক্তিম রূপের স্তবকের দিকে তাকিয়ে মিস্টার নাগের চোখে অদ্ভুত স্নেহাক্ত দৃষ্টি উথলে ওঠে, যেন নবজাতক সন্তানের মুখ দেখছেন মিস্টার নাগ।

বাগানটাকে বড় ভালবাসেন মিস্টার নাগ তাই বড় বেশি উদ্বেগও তাঁকে সহ্য করতে হয়। পাখির উপদ্রব আছে, কাঠবিড়ালীর নষ্টামি আছে, তা ছাড়া চোর মানুষের উঁকি-ঝুঁকিও আছে। কিন্তু দলবীরের মতো কঠোর দারোয়ানও আছে, যে-জন্য শত উদ্বেগের মধ্যেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারেন মিস্টার নাগ।

হাতের কাছে একটা এয়ার গান রাখেন মিস্টার নাগ। দামাস্কা গোলাপের কাছে এসে দুটো দোয়েল লাফালাফি করতেই এয়ারগান তুলে শব্দের ধমক ছাড়েন। উড়ে যায় দোয়েল দুটো। তারপর একটু প্রসন্ন ও প্রশান্ত চোখে হাতের বই-এর উপর চোখ বোলাতে থাকেন।

রাতের পাহারার জন্য মিস্টার নাগের মনে বিশেষ কোন উদ্বেগ নেই। দলবীরের চোখ দুটো যেন শিকারী বেরালের চোখ, রাতের অন্ধকারেও দেখতে পায়। তা ছাড়া দলবীরের হাতে প্রকাণ্ড একটা বিজলী টর্চও থাকে। বাগানের কোথাও খচ মচ করে একটা শব্দ বেজে উঠলেই টর্চের আলো ছুঁড়ে এগিয়ে যায় দলবীর। রাতের পেঁচা ভয় পেয়ে আর চোখ বন্ধ করে গাছের ডালে বসে ছটফট করে। একটা ঢিল মেরে পেঁচাটাকে উড়িয়ে দেয় দলবীর।

প্রত্যেক বছর শীতের কালে মিস্টার নাগের মন একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হিমালয়ের একটা নতুন জাতের অর্কিড কলকাতার মাটিতে শীতের কালেই কেন যেন নেতিয়ে শুকিয়ে মরে যেতে চায়। রহস্যটা ধরতে পারেন না মিস্টার নাগ। তা ছাড়া আরও সমস্যা দেখা দেয়। চেনার গাছের সবুজ পাতা শীতের ছোঁয়া পেলেই লাল আগুনের রং ধরে জ্বল জ্বল করবে, অনেক আশা করেছিলেন মিস্টার নাগ। কিন্তু চেনারের পাতার সবুজ যেন মরা বাঁশ পাতার মতো ফ্যাকাশে হয়ে

যায়। অনেক রকম সারের পাউডার গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়েও কোন সুফল হয় না।

এইবারের শীতে আরও একটা উদ্বেগের ভার সহ্য করছেন মিস্টার নাগ। অনেক চেষ্টা করে এবং অনেক টাকা খরচ করে আরিজোনার ক্যাকটাসের চারা এনে তাঁর বাগানের মাটিতে লাগিয়েছেন। কোথায় আরিজোনার মরুভূমি, আর কোথায় আলিপুর। সুদূর আরিজোনা মরুর দগ্ধ বালুকার বুকে বিচিত্র রহস্যের জাদুতে যে সরস ক্যাকটাস উর্ধ্ববাহু ঋষির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ক্যাকটাসকে আলিপুরের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পুষে রাখতে চান মিস্টার নাগ। প্রথমে দুরাশা বলে মনে হলেও মিষ্টার নাগ এখন মনে করেন, নিতান্ত দুরাশা নয়। এই মাসের শীতটা যদি সহ্য করে পার করে দিতে পারে আরিজোনার এই ক্যাকটাস, তবে ফাঁড়া কেটে যাবে। মিস্টার নাগের দুরাশা সত্য হয়ে উঠবে। বেঁচে যাবে গাছটা। মিষ্টার নাগের বাগান একটা দুর্লভ ঐশ্বর্যের গৌরব লাভ করবে।

পাঁচ গজ রেঙ্গার ফ্ল্যানেল কিনে আনতে হয়েছে। ফ্ল্যানেলের একটা ঘেরাটোপ দিয়ে ক্যাকটাসের শীতশিহরিত শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মরুভূমির জ্বালাময় রোদের আদরে বড় হয়ে ওঠে আর বেঁচে থাকে যে ক্যাকটাস, সে এই মাঘী শীতের একটা রাতের ঠাণ্ডায় আদুড় হয়ে পড়ে থাকলে নির্ঘাৎ মরে যাবে।

সন্ধ্যা হলে নিজেই একবার ক্যাকটাসের কাছে এগিয়ে আসেন মিস্টার নাগ। রাত দশটা হলে আর একবার এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, ফ্ল্যানেলের জ্যাকেটে কোন ফাঁক আছে কিনা। ক্যাকটাসের গায়ে ঠাণ্ডা লাগছে না তো? নিশ্চিন্ত হবার পর চলে যান মিস্টার নাগ। তার পরেই দারোয়ান দলবীরের পাহারা।

রাতের বাগান পাহারা দেয় দলবীর। দলবীরের গায়ে মোটা একটা তুলোর জামা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলে। মাথায় কম্বলের টুপি। হাতে টর্চ আর লাঠি। খাকি জিনের পটি জড়ানো পায়ে বুট জুতো। খট-খট মচ-মচ শব্দ করে পা ঠুকে ঠুকে ঘুরে বেড়ায় দলবীর। মাঝে মাঝে মাটির উপর লাঠি ঠোকে।

চল্লিশ টাকা মাইনে পায় দলবীর। বেহালার এক বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে, যেখানে দিনের বেলার জীবন যাপন করে দলবীর। ঘরের ভাড়া দিতে হয় মাসে আট টাকা। বাড়িতে পাঠাতে হয় পনর টাকা।

দার্জিলিং জেলার এক পাহাড়ী গাঁয়ের মানুষ দলবীর আজ দু'বছর হলো

মিস্টার নাগের এই বাগানের পাহারার কাজ নিয়েছে। বিশ-বাইশ বছরের বেশি বয়স হবে না। বেঁটে খাটো গাঁট্টা-সাট্টা মজবুত চেহারার ছোকরা, এই দলবীরের ছোট ছোট চোখের কুতকুতে হাসি দেখতে যেমন অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত ওর ঐ ছোট চোখের ধকধকে রাগ। রাতের কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি দেখে কুতকুতে হাসি হাসে আর আস্তে আস্তে লাঠি ঠোকে। কিন্তু একটা খেঁকি কুকুরকে বাগানের ভিতরে দেখতে পেলেই দলবীরের ছোট ছোট চোখ হঠাৎ রেগে গিয়ে ধকধক করে। খেঁকি কুকুরটাকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে লাঠি ছোঁড়ে দলবীর। আবার লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাগান পাহারা দিয়ে ঘুরতে থাকে।

এ হেন দলবীরের মনেও একটা উদ্বেগ আছে। দূরে দার্জিলিং-এর এক পাহাড়ী গাঁয়ের ঘরে এখন এই শীতের রাতে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপছে না তো দলবীরের মা বুড়ি? আগুন আছে তো ঘরে? কয়লা কেনবার জন্য, আগুন পোহাবার কাঠ কেনবার জন্য মা বুড়ির নামে গত মাসে পাঁচটা টাকা বেশি পাঠিয়েছে দলবীর। কিন্তু মা-এর চিঠিতে দাবি ছিল, এমাসে যেন দশটা টাকা বেশি পাঠানো হয়। একটা কম্বল দরকার হয়ে পড়েছে মা বুড়ির।

মাত্র পাঁচ টাকা বেশি পেয়ে নিশ্চয় রাগ করেছে মা বুড়ি। কম্বল কিনতে পারেনি নিশ্চয়। কাঠের আগুন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে; তবে কি এখন ঘরের ভিতরে হিমেল রাতের ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আর ঘুমোতে পারছে না মা বুড়ি? ঠিকই তো, একটা কম্বল গায়ে জড়াতে না পারলে ঘুমই বা কি করে হয়? কিন্তু টাকা চাইলেই টাকা আসে না। এটুকু বোঝে না কেন বুড়ি?

রাগ করে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে দলবীর। মাটির উপর জোরে জোরে লাঠি ঠোকে।—হেই, খবরদার! বাগানের পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে একটা গর্জন ছাড়ে দলবীর।

এটাও দলবীরের এই বছরের শীতের রাতের জীবনের একটা নতুন উদ্বেগ। লোকের বাগানে ঢুকে লাউ-কুমড়োর লতা-পাতা পটপট করে ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, না বলেকয়ে লোকের পুকুরে নেমে শাপলা তোলে, আর জলার আশে-পাশে ঘুরঘুর করে কচুর ডাঁটা ভাঙ্গে যে বুড়িটা, সেই বুড়িটা মিস্টার নাগের এই বাগানে উঁকি দিয়েছে।

গর্জন করেই শাক-বুড়ির মুখের উপর টর্চের আলো ছোঁড়ে দলবীর। বুড়িটা টুপ করে মাথা নামিয়ে নেয়, আর পাঁচিলের কাছ থেকে হনহন করে হেঁটে,

প্রায় একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়।

বাগানের ফটকের গেট বন্ধ থাকে। ফটক দিয়ে কোন চোরের পক্ষে ভেতরে ঢোকবার সাধ্যি নেই। শাক-বুড়িটাও ফটকের কাছে এসে উঁকি-ঝুঁকি দেয় না। চার-পাঁচটা থান ইট নিয়ে এসে পাঁচিলের গায়ের সঙ্গে থাক দিয়ে পর-পর উঁচু করে সাজায়। তার পর সেই ইটের ঢিপির উপর উঠে পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, দলবীরের সতর্ক চক্ষুর দৃষ্টি আর কঠোর পাহারার গর্জনের জন্যেই পারে না। রোজই সকালে পাঁচিলের বাইরের গায়ের সঙ্গে লাগানো ইটের ঢিপিটাকে ভেঙ্গে ইটগুলিকে তুলে নিয়ে আসে দলবীর। শাক-বুড়ি বুড়ি হলে হবে কি? ভয়ানক চতুর চোর, আর বেশ মজবুত চোর।

বেশ জেদী চোরও বটে। দলবীরের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেও পরের রাতে আবার ঠিক এসে পাঁচিলের উপর দিয়ে মুখ তুলে বাগানের ভিতরে তাকায়।

রাতের বেলা চুপ করে পালিয়ে যায় বটে শাক-বুড়ি, কিন্তু দিনের বেলা একেবারে মুখর হয়ে প্রতিশোধ তোলে।

দুপুরবেলা, বেহালার বস্তির সেই ঘরের দরজার কাছে বসে যখন বিড়ি টানে দলবীর, ঠিক তখনই শাক-বুড়িটা কোথা থেকে এসে দলবীরের ঘরের দরজার কাছ দিয়েই গালি দিতে দিতে চলে যায়। মুখপোড়া, রেতের ছুঁচো, প্রেতের বেটা প্রেত, রাত জেগে তোর কোন্ বাপের মাথা পাহারা দিস রে হতভাগা!

—তুমকো হাড্ডি তোড় দেগা, চোট্টা বুড্ডি! রাগ করে চেঁচিয়ে আর লাঠি হাতে নিয়ে শাক-বুড়ির দিকে তেড়ে যায় দলবীর। বস্তির লোকেরা হাঁ হাঁ করে ওঠে:—কর কি দলবীর? ও বুড়ির কথায় রাগ করে লাভ নেই। বড় ভয়ানক বুড়ি! ওকে মেরে ফেললেও গালি দিতে ছাড়বে না।

লোকের কথায় আর অনুরোধে রাগ সামলে নেয় দলবীর।

এই চোর শাক-বুড়ির উপদ্রবের জন্য রাতের পাহারার মধ্যে একটা মিনিটও নিশ্চিন্ত হতে পারে না দলবীর। কে জানে কখন কোন্ ফাঁকে পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়বে আর কোন্ ফল, কোন্ ফুল বা লতা উপড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে? হয়তো সাহেবের হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। রাগে দুঃখে পাগল হয়ে যাবেন সাহেব, আর বোধহয় দলবীরকেও ক্ষমা করতে পারবেন না। দলবীরের চাকরি খতম হয়ে যাবে।

মচ মচ খট খট জুতোর শব্দ বাজিয়ে আর লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘুরতে থাকে দলবীর। মাঝে মাঝে পাঁচিলের উপর টর্চের আলো ছুঁড়ে দেখতে থাকে, যদিও

আজ আর টর্চের আলো ছোঁড়বার খুব বেশি দরকার হয় না। ছোট একটা চাঁদ ভাসছে আকাশে, কুয়াশা আর চাঁদের আলো এক সঙ্গে গলে গিয়ে বাগানের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

মনে হচ্ছে, চোর শাক-বুড়িটা আজ আর আসবে না। তবু সাবধান থাকে দলবীর। শাক-বুড়ি বড় চোর। এক মিনিটের জন্য দলবীর আনমনা হয়ে পড়লে, হয়তো সেই সুযোগে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়বে আর লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে শাক-বুড়ি।

ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় দলবীর। আর মাঝে মাঝে মা বুড়ির কথা মনে পড়ে। সত্যিই কি এই শীতে একটা কম্বলের অভাবে ঠক ঠক করে কাঁপছে মা বুড়ি? কারও কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার নিয়ে কম্বলটা কিনে ফেললেই তো হয়! মা বুড়ির এতটুকু বুদ্ধিও নেই, পারে শুধু ছেলের উপর রাগ করতে।

চমকে ওঠে দলবীর। সত্যিই মা বুড়ির কথা ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছিল দলবীর আর সেই সুযোগে চোর শাক-বুড়ি পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়েছে! ঐ তো একটা চতুর ছায়ার মতো বাগানের আরও ভিতরের দিকে এগিয়ে চলেছে বুড়ি।

এতদিনে সুযোগ পেয়েছে দলবীর। চোর শাকবুড়ির গালি-গালাজের সেই ভয়ানক মুখরতার শোধ তুলবে দলবীর। বুড়ির গলা টিপে ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে এসে হাঁক দিয়ে সাহেবকে ডাকতে হবে আর পুলিশ আসবার পর বুড়িকে পুলিশের হাতের কাছে একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিতে হবে।

আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে শিকারী বেড়ালের মতো যেন একটা চতুর ইঁদুরকে ধরবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে দলবীর। ছোট ছোট কুত-কুতে চোখে রাগের জ্বালা ধক-ধক করে।

থমকে দাঁড়ায় দলবীর। চোখ কাঁপে দলবীরের, সেই সঙ্গে বুকটাও কাঁপে। এ কি করছে চোর শাকবুড়ি!

ফুল ছিঁড়লো না, পাতা ছিঁড়লো না, একটা লতা ধরে টান দিল না। কি চমৎকার সীম ধরেছে, সেই সীমের মাচার দিকে একবারও তাকালো না। মিস্টার নাগের স্বপ্নময় স্নেহে ও আদরে লালিত সেই ক্যাকটাসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শাকবুড়ি।

বুড়ির শাড়ির আঁচলটা এই ফিকে চাঁদের আলোতেও বেশ ভাল করে দেখা যায়। বুড়ির গায়ে জড়ানো আঁচলের একটা ছেঁড়া হাঁ করে যেন ঠক ঠক করে

কাঁপছে। রাতের কনকনে শীতে বুড়ির কাঁধটা কুঁকড়ে গিয়েছে।

ক্যাকটাসের গায়ের গরম রেজার ফ্ল্যানেলের ঘেরাটোপের গায়ে হাত দেয় বুড়ি। একটা টান দিতেই খুলে পড়লো পাঁচ গজ ফ্ল্যানেলের টুকরোটা। কোন ব্যস্ততা নেই, আস্তে আস্তে বেশ আয়েস করে সেই ফ্ল্যানেলটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পাচিলের দিকে তাকায় বুড়ি।

গাছের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দলবীর। যেন কোন শব্দ না হয়, বুড়ি যেন একটুও টের না পায়, দলবীর দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভয় করে দলবীরের, দলবীরের ছায়া দেখতে পেলে বুড়ি নিশ্চয় গরম কাপড়ের এতবড় টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাবে। নড়ে না দলবীর। দলবীরের লুকানো ছায়ার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল শাকবুড়ি।

কখন যে পাচিলটা টপকে চলে গিয়েছে শাকবুড়ি, জানে না, লক্ষ্যও করেনি দলবীর। নগ্নদেহ ক্যাকটাসের কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চুপ করে মহা-ভয়ে ভীরু অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একবার চমকে ওঠে দলবীর। বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন মিস্টার নাগ। সাহেবের সেই কঠোর আলোকিত মূর্তির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দলবীর।

এগিয়ে যান মিস্টার নাগ। বাগানের ভিতরে এসে নগ্নদেহ ক্যাকটাসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই দলবীরের সেই হতভম্ব ভীরু চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গর্জ্জন করেন।—তুম চোর হ্যায়।

—নেহি হুজুর। দলবীরের কুতকুতে চোখ ছল ছল করে।

—চুপ! হাম সব দেখা হ্যায়। উপরতলার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখেছি।

নীরব হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে দলবীর।

—ও বুড়ি তুমারা কোন্ হ্যায়? আবার গর্জ্জন করেন মিস্টার নাগ।

—কোন্ বুড়ি হুজুর?

—যে বুড়িকে তুম ফ্ল্যানেল নিয়ে চলে যেতে দিলে।

—ও বুড়ি হামারা কোই নেহি হুজুর।

—ঝুট মত্ বোলো। আমার চোখ পঁচিশ বছরের পাকা জজের চোখ হ্যায়। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

—আপ কেয়া সমঝা হুজুর?

—ও বুড়ি নিশ্চয় তুমারা মা হ্যায়।

—হ্যাঁ হুজুর। চেঁচিয়ে ওঠে দলবীর। ছোট ছোট কুতকুতে চোখে যেন একটা জ্বালা ধক ধক করতে থাকে।

—কিন্তু আজ রাতের শীতে আমার ক্যাকটাস যে মরে যাবে রে চোর।

—নেহি মরেগা হুজুর।

—চুপ। যাও, এখনি দৌড়ে গিয়ে আমার ক্যাকটাসের ফ্লানেল ফিরিয়ে নিয়ে এস।

—নেহি হুজুব।

—কেঁও নেহি? আমার ক্যাকটাসকে তুমি খুন করতে চাও?

—নেহি হুজুর। বলতে বলতে চট করে একটা টান দিয়ে নিজের গায়ের তুলোর জামাটা খুলে ফেলে দলবীর। আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে, আদরে আর যত্নে বিচলিত অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে তুলোর জামা দিয়ে কচি ক্যাকটাসের গা ঢাকা দেয় দলবীর। তারপরই চেঁচিয়ে ওঠে দলবীর।—হাম আউর নোকরি নেহি করেগা, হুজুর।

—কিন্তু তুম তো চোর হ্যায়! তোমার সাজা দরকার। চেঁচিয়ে ওঠেন প্রাক্তন জজ ও বর্তমান উদ্ভিদপ্রেমিক মিস্টার নাগ।

দলবীরও চেঁচিয়ে ওঠে—বহুৎ ঠিক হ্যায়, পুলিশ বোলাইয়ে হুজুর।

ক্ষ ণ কা লী ন

ট্যাক্সি থেকে নেমে, বাড়ির গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পায় তপেশ, লনের উপর সারি সারি চেয়ার আর টেবিল। একটা চা-এর আসর গল্পে আর হাসিতে মুখর হয়ে রয়েছে।

সিল্কের পায়জামা পরে আর তোয়ালের আকারের একটা রুমাল হাতে নিয়ে আসরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁরই দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় তপেশ।—চিনতে পারছেন রজনীদা?

চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা—তপেশ! কি আশ্চর্য, তুমি কবে এলে?

তপেশ—তিন দিন হলো এসেছি।

রজনীদা—কোথায় ছিলে এই তিনদিন?

তপেশ—একটা হোটেলে।

রজনীদা যেন রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন—ছিঃ, আমাকে কি তুমি পর মনে করলে তপেশ, হোটেলে উঠলে? আমার এত বড় বাড়িতে কি জায়গা নেই?

তপেশ হাসে—এখন আপনার এখানেই এসেছি রজনীদা।

রজনীদা—জিনিসপত্র, বিছানা বাক্সটাক্স সঙ্গে আছে কি? না হোটেলেই রেখে এসেছ?

তপেশ—ট্যাক্সিতে আছে, এখনও নামাইনি।

রজনীদা বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এই বয়, সাহেবকা সামান ভিতর লে যাও।·· হ্যাঁ, এস তপেশ, চা খাও।

রজনীদা আবার তেমনই উৎসাহের স্বরে, এবং সেই সঙ্গে একটা গর্বের আবেগও মিশিয়ে দিয়ে চা-এর আসরের যত হাসিখুশি চেহারার আর রঙীন জীবনের মানুষগুলিকে শুনিয়ে তপেশের পরিচয় আবৃত্তি করতে থাকেন।

—এই তপেশ হলো আমার ধীরাজ কাকার একমাত্র ছেলে। ধীরাজকাকা আমার আপন কাকা নন কিন্তু আপন কাকার চেয়েও বেশি আপন জন। বাবার জ্ঞাতি ভাই হলেন ধীরাজকাকা, দুঃখের বিষয় তিনি এখন আর বেঁচে নেই। জীবনের বেশির ভাগ সময় বর্মাতেই ছিলেন। বর্মাতে থাকতে থাকতেই চোখ বুঁজলেন। বিপুল সম্পত্তি করেছিলেন ধীরাজকাকা। রাইস মিল তিনটে, টিম্বার রপ্তানি, আর একটা স্টিমার সার্ভিস। একজন মানুষ একজীবনে এত সম্পত্তি করতে পারে, এটা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

···হ্যাঁ, আমি প্রায় একবছর বর্মাতে ছিলাম। তপেশদের রেঙ্গুনের সেই বাড়ি, বলতে গেলে একটা প্যালেস। এই ব্র্যাবোর্ণ রোডের বাড়িগুলি ধীরাজকাকার সেই মার্বেলের ধীরার তুলনায় কুঁড়েঘর বললেই চলে।

···কি আদরেই না ছিলাম! একটা গাড়ি শুধু আমার ব্যবহারের জন্যেই ছেড়ে দিয়েছিলেন ধীরাজকাকা। এই তপেশ আর আমি সেই গাড়িতে দিন-রাত যথা ইচ্ছা তথা ঘুরে বেড়িয়েছি। কত শিকার, কত পিকনিক। ঠিক সূর্যাস্ত হতে শুরু করেছে, অমনি শাম্পান নিয়ে ইরাবতীর জলে ভেসে পড়েছি, আমি আর তপেশ। তপেশটা তখন স্কুলে পড়ে, আমার চেয়ে কম করেও বার-তের বছর ছোট হবে তপেশ। আমি এখন চল্লিশ, তার মানে তপেশ এখন সাতাশ-আটাশ।

···এক মেম বুড়ি তপেশের গবর্ণেস ছিল। তপেশের মা তো বলতে গেলে তপেশের জন্মের এক বছর যেতে না যেতেই মারা গিয়েছিলেন। ওঃ, আমার

ওপর গবর্ণেস বুড়ির সে কী রাগ! আমার সঙ্গে দিন রাত ঘোরাঘুরি করে তপেশের পড়া নষ্ট হচ্ছে, বুড়ি আমাকে ধমক দিয়ে বার বার কথা শোনাতো!

...কিন্তু সেই বছরেই পরীক্ষায় ফাস্ট হয়েছিল তপেশ। পড়াশোনায় তপেশের ঝোঁক বরাবরই ছিল। ইংলিশে অনার্স নিয়ে এম-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, এ খবর বার্মা ট্রিবিউনে আমি দেখেছি। এই তো পাঁচ বছর আগের কথা।

...তা ছাড়া, কি চমৎকার ছবি আঁকতো সেই ছেলে বয়সেই। আমি বলতাম, তুমি ভবিষ্যতে দ্বিতীয় বতিচেলি হবে তপেশ। সত্যি, সুন্দর একটি ভেনাস এঁকেছিল তপেশ।

—ভেরি ব্লেসেড, অত্যন্ত ফরচুনেট, এবং ট্যালেন্টেড আমার এই তপেশ ভাইটি। ধীরাজকাকার এত বড় সম্পত্তি পেয়েছে যে ছেলে·· ঐ দেখুন···সে ছেলে মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছে।

সত্যি হঠাৎ মাথা হেঁট করে ফেলেছিল তপেশ। এবং চোখ দুটোও যেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

চা-এর আসরের একটি চেয়ার থেকে উঠে এসে এক মহিলা তপেশের কাছে দাঁড়ান।

চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা—ইনি তোমার আশা বউদি, তপেশ।

ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে, আশা বউদির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেলে তপেশ।

আশা বউদি চমকে ওঠেন—একি কাণ্ড! একি কাণ্ড! আমাকে আবার পা ছুঁয়ে প্রণাম কেন?

দেখতে পায় তপেশ, আশা বউদির পিছনে একটি তরুণীও দাঁড়িয়ে আছে। খুবই সুশ্রী, এবং খুবই সুসজ্জিতা এক তরুণী।

আশা বউদি বলেন—আমাদের মন্দাকিনী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

মন্দাকিনী এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে হেসে ওঠে।—রজনীবাবু যে অদ্ভুত স্টোরি বললেন, তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ না করে থাকতে পারলাম না, মাপ করবেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে হাসতে চেষ্টা করে তপেশ।—হ্যাঁ, শুনতে যতটা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে, আসলে কিন্তু···।

চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা—কি? কি বলছে তপেশ? খুব বিনয় করছে বুঝি?

আশা বউদি উত্তর দেন—হ্যাঁ, তপেশ ঠাকুরপো মন্দাকিনীর সঙ্গে এরই মধ্যে ভণ্ডামি সুরু করে দিয়েছেন।

তপেশ বিব্রতভাবে বলে—না না, বিশ্বাস করুন বউদি, আমি সত্যিই ভণ্ডামি করছি না।

মন্দাকিনী—যাক্, আশাদির কথা যেতে দিন। আমি তো সত্যিই আপনাকে কিছু বলিনি। আমি এসেছি বর্মার গল্প শুনতে।

তপেশ—বর্মা খুবই সুন্দর জায়গা।

মন্দাকিনি খিলখিল করে হেসে ওঠে—বাস্, এতেই বর্মার গল্প হয়ে গেল?

তপেশ—আমার কাছে একখানা বই আছে, দি গ্লোরি ছাট ওয়াজ বার্মা। পড়লেই বুঝতে পারবেন।

মন্দাকিনী—বই পড়ে কিচ্ছু বুঝবো না।

তপেশ—কেন? আপনি কি ইংরেজী বই পড়তে···।

হেসে ওঠেন আশা বউদি—মন্দাকিনীকে দেখে কি মনে হয় তপেশ ঠাকুরপো? ইংরেজী জানে না? একটা মুখ্খু হাবা-গবা মেয়ে?

চা-এর আসরের আর-এক চেয়ার থেকে এক প্রৌঢ়া মহিলা এদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে ওঠেন—আমার মন্দাকিনীও ইংলিশে অনার্স।

মন্দাকিনী বলে—ভয় পাবেন না তপেশবাবু, এখনি আপনার কাছে বর্মার গল্প শুনতে চাই না। কিন্তু একদিন শুনতে চাই।

তপেশ—কবে শুনবেন বলুন।

মন্দাকিনী—কাল। আমাদের বাড়িতে, সকালবেলা। চা খেয়ে আসবেন।

তপেশ—বেশ।

চা-এর আসর যখন ভাঙ্গে, মন্দাকিনী যখন আর একবার তপেশের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যায়, তখন তপেশের কাছে আবার এগিয়ে এসে রজনীদা বলেন।—তুমি কলকাতাতে নিশ্চয় কোন কাজে এসেছ, তপেশ?

তপেশ—হ্যাঁ রজনীদা, একটা কাজের জন্যেই এসেছি।

রজনীদা—কতদিন থাকতে হবে মনে করছো?

তপেশ—ঠিক বুঝতে পারছি না।

রজনীদা—বেশ তো। ততদিন তুমি আমার এখানেই থাকবে। খবরদার, হোটেল-ফোটেলের কথা মুখে আনবে না।

অ্যাডভোকেট রজনীদা, ব্র্যাবোর্ণ রোডে তাঁর এই চমৎকার বাড়ির একটি

চমৎকার ঘরের ভিতরে চুপ করে একটা চেয়ারের উপরে বসে থাকে তপেশ, যদিও রাত বারটা পার হয়ে গিয়েছে।

ঘুম আসে না। চোখ দুটোর ক্লান্তি যেন ভয় পেয়ে আর্তনাদ করছে। কি ভয়ানক ভুল ধারণা করেছেন রজনীদা! আজকের এই তপেশের জীবনটা সেই তপেশের জীবনই নয়। রেঙ্গুনের বিখ্যাত মার্চেণ্ট ধীরাজ বোসের সেই বিপুল সম্পত্তির একটা ছিটেফোঁটাও যে আজ আর নেই। যুদ্ধের সময় সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মার্বেলের সেই ধীরা বোমার বিস্ফোরণের উৎসব সহ্য করতে গিয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বিপুল সম্পত্তির বিনাশ নিজের চোখে দেখে নিয়ে হার্ট ফেল করে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন মার্চেণ্ট ধীরাজ বোস। জানেন না, কল্পনাও করতে পারছেন না রজনীদা, রেঙ্গুনের স্কুল মাস্টার তপেশ বোস আজ একটা ভাল চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসেছে। রজনীদা নিশ্চয় এই চাকরি-সন্ধানী চেষ্টায় তপেশকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন, শুধু এই একটি আশা নিয়ে এখানে এসেছে তপেশ।

কিন্তু রজনীদা যে ভুল করে চা-এর আসরের এতগুলি মানুষের কাছে আজকের তপেশের ধূলিময় জীবনটাকে একেবারে একটা রত্নময় জীবন বলে রটনা করে দিলেন। কি ভয়ানক চমকে উঠবেন রজনীদা আর আশা বউদি, এবং বোধহয় এই মন্দাকিনীও, যখন শুনবেন যে তপেশ বোস আজ একটা চাকরিলোভী চেষ্টার মানুষ মাত্র!

লজ্জা পায় তপেশ এবং লজ্জাটা একটা দুঃসহ গ্লানির মতো বোধহয়। রজনীদার ভুল ধারণাকে সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে দিয়ে, চা-এর আসর থেকে উঠে গিয়ে আবার একটা সস্তার হোটেল খোঁজবার জন্য বের হয়ে পড়লেই তো হতো। নিজেরই উপর রাগ হয়। যেন ইচ্ছে করে নিজেকে ভীরু করে রেখেছিল তপেশ। মন্দাকিনী নামে একটা সুন্দর মেয়ের মুখের হাসির অভিনন্দন চোরের মতো লুট করবার লোভে চুপ করে বসে নিজের একটা মিথ্যা গৌরবের রটনাকে মুখর হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছিল।

নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করে তপেশ। যাক্, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন চুপচাপ সরে যেতে হবে। রজনীদা জানবেন, তপেশ বোস আবার তার বর্মার ঐশ্বর্যের কাছে চলে গেল। থেকে যাক এদের মনের ভুল।

কিন্তু চেষ্টা করলেই মনের ভয় ভাঙ্গতে পারা যায় না; মনটাকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেই শান্ত হয় না মন এবং মনের ভিতরে একটা গ্লানি পুষে রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করলেও ঘুম আসতে পারে না।

ভোর হয়ে আসছে, তবুও ঘুম যখন এল না, তখন বরং একটু খুশি হয়ে এবং হাঁপ ছেড়ে প্রস্তুত হয় তপেশ। আর এখানে নয়। রজনীদার গলার স্বর শোনা-মাত্র রজনীদার কাছে গিয়ে ব্যস্তভাবে বলতে হবে, চললাম রজনীদা। মাপ করবেন আশা বউদি, আর এক ঘণ্টাও থাকবার উপায় নেই।

রজনীদা হয়তো আশ্চর্য হয়ে বলবেন—সে কি? এবং আশা বউদি একটু দুঃখিত হয়ে বলবেন—একি কাণ্ড! কিন্তু মনটাকে বেশ একটু শক্ত করে নিয়ে একটা মিথ্যে কথা বলে দিতে পারা যাবে না কি?—উপায় নেই, খুব জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। আজই বাই-এয়ার রেঙ্গুন চলে যেতে হবে।

পার্কের গাছের উপর সকালবেলার রোদ লুটিয়ে পড়েছে দেখা যায়। এবং রজনীদার গলার স্বরও শোনা যায়। লনের উপর ছুটোছুটি করে হাউণ্ডটার সঙ্গে বকাবকি করছেন রজনীদা।

ঘর ছেড়ে ব্যস্তভাবে রজনীদার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তপেশ। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা।—সঞ্জয়বাবুর আরদালি দু'বার এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গিয়েছে।

—সঞ্জয়বাবু কে?

—মন্দাকিনীর বাবা। ঐ যে, গেটের কাছে এক জোড়া ঝাউ দেখছো, ওটাই হলো সঞ্জয়বাবুর বাড়ি। খুব সজ্জন মানুষ।···তা ছাড়া, মন্দাকিনীও। খুব স্টাইল করে, বেশি কথা বলে, কিন্তু তা বলে মনে করো না যে, মেয়েটা একটা হাল্‌কা স্বভাবের মানুষ। ওরে বাবা! আমিই তো জানি! এক ছোকরা উকীল মাসে হাজার টাকাও রোজগার করে না, সেটাও দুঃসাহস করে মন্দাকিনীর গা ঘেঁষতে চেষ্টা করেছিল। মন্দাকিনী ওকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিল।

তপেশ—কিন্তু আরদালি আমার খোঁজ নিতে আসে কেন?

রজনীদা—কি আশ্চর্য, আজ সকালে মন্দাকিনীদের বাড়িতে তোমার যে চা-এর নেমন্তন্ন, সেটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

তপেশ—কিন্তু আপনার কাছে আমার যে একটা জরুরী কথা বলবার ছিল।

রজনীদা—বেশ তো, আগে মন্দাকিনীদের বাড়ির চা-এর নেমন্তন্নটা সেরে এস। তারপর, দুপুরে দু'জনে বসে বসে অনেক জরুরী কথা আলোচনা করা যাবে। আজ আমি আর কোর্টে যাব না।

বর্মার অনেক গল্প শোনে মন্দাকিনী। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তপেশ

মন্দাকিনী।—আমাকে খুব নির্লজ্জ বলে মনে হচ্ছে ?

তপেশ—একটুও না।

মন্দাকিনী—তবে ?

তপেশ—কি বললেন ?

মন্দাকিনী—কিছু বলছি না, চাইছি।

দুচোখ বন্ধ করে তপেশের মুখের কাছে কপালটাকে পেতে দেয় মন্দাকিনী।

—মন্দাকিনী ! আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ায় তপেশ।

আশ্চর্য হয়ে, এবং ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে মন্দাকিনী—কি হলো তপেশবাবু ? আমার বেহায়াপনা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ?

তপেশ—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মন্দাকিনী—কি বুঝতে পারছেন না ?

তপেশ—একদিনের আলাপে, এত তাড়াতাড়ি কেউ কাউকে ভালবেসে ফেলতে পারে ?

মন্দাকিনী—আপনার মতো মানুষকে আমার মতো মেয়ে হলে পারে।

তপেশ—কিন্তু আমি যে কি মানুষ, সেটা যে তুমি এখনও জানতে পারনি।

মন্দাকিনী—তার মানে ?

তপেশ—রজনীদার গল্প শুনে যা মনে করেছ, আমি তা নই।

মন্দাকিনী হাসে—তার মানে, আপনি আরও বড়-মানুষ ?

তপেশ—আমি কিছু না।

মন্দাকিনী—বিনয় করছেন ?

তপেশ—একটুও না। আমি মিথ্যেবাদী নই, অন্তত তোমার কাছে মিথ্যে-বাদী হতে পারবো না।

মন্দাকিনী আবার হাসে—কেন ? আমাকে ভাল লেগেছে বলে ?

তপেশ—হ্যাঁ।

মন্দাকিনী—তবে বলুন, শুনি আপনার সত্যি কথা।

তপেশ—আমি এখন রেঙ্গুনের স্কুলমাস্টার। বাবার বিপুল সম্পত্তির কিছুই আমি পাইনি। সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসেছি। রজনীদা এখনও সেটা কল্পনা করতে পারছেন না।

তপেশের মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনীর সুন্দর চোখের তারা দুটো জ্বলতে থাকে। চোখের দৃষ্টিটাও যেন রুষ্ট আগুনের শিখার মতো তপেশের প্রাণের উপর জ্বালা ছুঁড়ে তপেশকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়। সঞ্জয়বাবুর মেয়ে

হাসে—কি আশ্চর্য, এই সব সাধারণ গল্প আপনার এত ভাল লাগছে ?

মন্দাকিনী—কেন এত ভাল লাগছে, বুঝতে পারছেন না ?

তপেশ—না।

মন্দাকিনী—আপনি বলছেন বলে।

করুণ হয়ে ওঠে তপেশের মুখ। মন্দাকিনী বলে—আপনি যদি অকপট হন, তবে একথা স্বীকার করবেন।

তপেশ—কি বললেন ?

মন্দাকিনী—আমিও জিজ্ঞাসা করছি। আমার কাছে গল্প বলতে কি আপনার একটুও ভাল লাগছে না ?

তপেশ—ভাল লাগছে বৈকি।

মন্দাকিনী—জীবনে আর কোন মেয়ে আপনার কাছে আমার মতো এত আগ্রহ করে গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছে ?

তপেশ—গল্পই কেউ শোনেনি, মুগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা।

মন্দাকিনী—আর কেউ এসে আপনার গল্প শুনুক, এই কি আপনার ইচ্ছা ?

তপেশ—মোটেই না। আপনি অকারণে আমাকে সন্দেহ করছেন।

মন্দাকিনী—আপনি কি মনে করেন, আর কারও কাছে গল্প বলতে আপনার ভাল লাগবে ?

তপেশ—মনে হয় না।

মন্দাকিনী—তবে ?

তপেশ—কি বলছেন ?

মন্দাকিনী—বলছি না কিছু, দেখছি।

তপেশের বুক শিউরে ওঠে।—কি দেখছেন ?

মন্দাকিনী—কি সুন্দর আপনার মুখটা !

তপেশ—আপনি এ কথা বলেন কেন ?

মন্দাকিনী—কেন ?

তপেশ—আপনি কি কিছু কম সুন্দর ?

মন্দাকিনী—সত্যি করে বলুন ?

তপেশ—কি ?

মন্দাকিনী—আমাকে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে আপনার ?

তপেশ—নিশ্চয়।

তপেশের আরও কাছে এগিয়ে এসে তপেশের মুখের দিকে তাকায়

মন্দাকিনীর দুই ঠোঁটের পিপাসার গৌরব একটা কপট গৌরবের ছোঁয়া চাইতে গিয়ে যেন দুঃসহ লজ্জায় শিউরে উঠেছে।

—আমাকে ক্ষমা করবেন? আতঙ্কিতের মতো তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে তপেশ।

মন্দাকিনী—কেন ক্ষমা করবো বলুন?

তপেশ—যে-কথা আপনাকে প্রথমেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, সে কথা পরে বলেছি।

মন্দাকিনী—পরেই বা বললেন কেন?

হঠাৎ মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সঞ্জয়বাবুর মেয়ে মন্দাকিনী। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে তপেশের মুখের দিকে তাকায়।—না বললেই ভাল করতেন।

তপেশ—আচ্ছা, আমি এবার চলি।

মন্দাকিনী—কোথায় যাবেন?

তপেশ—দেখি, কোথায় যাই। তবে রজনীদাকে আর ঠকাবো না।

মন্দাকিনী—তার মানে?

তপেশ—রজনীদার বাড়িতে থাকবো না। আজই, এখনই চলে যাব।

মন্দাকিনী—আর বোধহয় কখনো এদিকে আসবেন না?

তপেশ—না।

মন্দাকিনী—না আসাই ভাল। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন, আর এদিকে আসবেন না?

তপেশ—প্রতিজ্ঞা করছি।

মন্দাকিনী—কিন্তু…।

তপেশ—বলুন।

মন্দাকিনী—আমাকে একটু সম্মান দিয়ে যান।

আবার চোখ বন্ধ করে তপেশের কাছে কপালটাকে পেতে দিয়ে মন্দাকিনী বলে—চিরকালের মতই চলে যাচ্ছেন যখন, তখন আর আপনাকে ভয় কিসের?

ব্র্যাবোর্ণ রোডের উপর দিয়ে একটা শোভাযাত্রার বাজনার শব্দ নাচতে নাচতে চলে যায়। কপাল আর ঠোঁট রুমাল দিয়ে মুছে নিয়েই মন্দাকিনী বলে—আচ্ছা।

ঘর থেকে বের হয়ে পথের শোভাযাত্রার সঙ্গে মিশে যায় তপেশ।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান

স্টেশনটার নাম বললে প্রায় সকলেই বুঝে ফেলতে পারেন, কলকাতা থেকে কতদূরের আর কোন্ জায়গার কথা বলা হচ্ছে।

রায়ের হাট স্টেশন। এই স্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক ফাঁকা পথের দূরত্ব পার হয়ে যেতে পারলে একটা সহরে ভিড়ের কাছে পৌঁছানো যায়। একটা বাজার। সেই বাজারের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, নিকটে নিশ্চয়, খুব বড় না হোক, মাঝারি রকমের একটা সহর আছে এবং সে সহরে সবই আছে। আদালত কাছারি হাসপাতাল সিনেমা হাউস আর কলেজ। বাজারের কাছে এসে দাঁড়ালে আর এদিকে ওদিকে তাকালে রাস্তাগুলির চেহারার সঙ্গে সঙ্গে নামগুলিও চোখে পড়বে। কলেজ রোড, হাসপাতাল রোড ইত্যাদি। এতদূর থেকেও শোনা যায়, সিনেমা হাউসের লাউড স্পীকার গলা ফাটিয়ে বিজ্ঞাপনী গান গাইছে।

যখন কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে থামে, শুধু তখনই স্টেশনটার প্রাণ যেন কলরব করে জেগে ওঠে, নইলে সব সময় শান্ত। সব সময় নীরব। দিন ও রাতের মধ্যে বেশির ভাগ সময় স্টেশনের জীবন যেন আধঘুমের আলস্যে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। প্ল্যাটফর্মের উপর দুটো বড় বড় নাগকেশরের গাছ আছে। সেই গাছের তলায় চীনেবাদামের ফেরিওয়ালাও টান হয়ে শুয়ে থাকে। ধড়ফড় করে জেগে ওঠে তখন, যখন একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আগমনী সঙ্কেতের ঘণ্টা ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

স্টেশনের যে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীর টিকেট চেক করেন চেকার, সেই ফটক পার হলেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি এবং সিঁড়ির শেষ ধাপ পার হলেই বেশ চওড়া একটা কাঁকর ছড়ানো জায়গা, সেখানে একটা দুটো ট্যাক্সি আর গোটা দশেক সাইকেল রিক্সা সব সময়েই উপস্থিত থাকে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে যাত্রীর দল নেমে, কিলবিল করে সরু ফটক পার হয়ে যখন এই খোলা জায়গায় এসে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সোরগোল জাগে সবচেয়ে বেশি। সব ট্যাক্সি আর সব সাইকেল-রিক্সার হর্ণ একসঙ্গে বাজতে থাকে। সেই সঙ্গে হাঁক আর চিৎকারও চলতে থাকে।—এই যে আসুন স্যার—এইয়ো বুড়ো মা—এসগো বাবু। বাজারে যাবেন তিন আনা, টাউন যাবেন চার আনা।

ট্যাক্সি বলে, চলে আসুন, টাউন পর্যন্ত এক টাকা।

সব সাইকেল-রিক্সাই যাত্রী পেয়ে যায়। ট্যাক্সিও বাদ যায় না। কারণ, প্রায় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জার-ট্রেন থেকে এমন দু'চার জন যাত্রী নামেন, যাঁরা ট্যাক্সি চড়তেই ভালবাসেন আর, এক মাইলের জন্য এক টাকা দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

সাইকেল-রিক্সাগুলি দুটি সারিতে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সারিতে ভাগ্যলক্ষ্মী, কত মজা, পক্ষিরাজ, জয় মা কালী আর মন রে আমার। অই সারিতে চল রে চল, সুখশান্তি, উর্বশী, আশীর্বাদ আর প্রাণারাম।

তা ছাড়া, এই সারিতে ভাগ্যলক্ষ্মী আর অই সারিতে আশীর্বাদ সব সময়েই মুখোমুখি, যেন পরস্পরের দিকে একটা আক্রোশের আবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিতাই আশীর্বাদের রামচরণের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বিড়ি টানে। আর, আশীর্বাদের রামচরণ ভাগ্যলক্ষ্মীর নিতাই-এর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে ছোলা চিবোয়। আরও তো আটটা সাইকেল রিক্সা আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এরকম কোন রেষারেষির ভাব নেই। করালী, ভানু, সিদ্দিক, গিরধারী এবং আরও সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়, ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের মধ্যে এরকম টকরা-টকরি কেন? বোঝা যায় না, কেন নিতাই ওরকম কটমট করে রামচরণের দিকে তাকায়। আর, রামচরণই বা কেন ওভাবে ঠোঁট কামড়ে নিতাই-এর দিকে বিশ্রী একজোড়া আক্রোশের চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। এটা একটা রহস্য।

রোজগারের দিক দিয়ে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। একটা সপ্তাহ যদি কারো রোজগারে কিছু কমতি হয়, তবে আর-একটা সপ্তাহে সে কমতি পুষিয়ে যায়। গঙ্গাস্নান করবার জন্য যেদিন যাত্রী নামে বেশী, সেদিন হয়তো নিতাই একটু বেশী রোজগার করে। কিন্তু তারপরেই একটা মেলার দিনে রামচরণের রিক্সাই বার বার ভাড়া নিয়ে ছুটে-ছুটে যায় আর আসে। এবং সব রিক্সা-ওয়ালাই বুঝতে পারে, আজ রামচরণই টেক্কা দিয়েছে, নিতাই-এর চেয়ে অন্তত দেড় টাকা বেশি রোজগার করেছে রামচরণ।

নিতাই আর রামচরণ, দু'জনেরই বেশ হট্টাকট্টা চেহারা। দু'জনের মধ্যে সত্যিই একদিন যদি একটা হাতাহাতি বাধে, তবে কে জিতবে বলা যায় না। নিতাই পরে ছিটের কামিজ আর ধুতি। আর রামচরণ পরে গেঞ্জি ও হাফ-প্যাণ্ট। বয়সের দিক দিয়ে কেউ কারও চেয়ে ছোট-বড় বলে মনে হয় না। কতই বা বয়স? ভানু আর সিদ্দিকের চেয়েও কম। বড়জোর কুড়ি-একুশ হবে নিতাই-এর বয়স, আর রামচরণ বড়জোর সাড়ে-বিশ বা সাড়ে একুশ।

যতক্ষণ স্ট্যাণ্ডের ভিতরে এই দুই রিক্সা দুই ভিন্ন সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ততক্ষণ যেন একটা নীরব উদ্বেগ সহ্য করে দুই রিক্সাই। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিতাই বার বার স্টেশনের ফটকের দিকে তাকায়। আশীর্বাদের রামচরণও তাকায়। কিলবিল করে যাত্রীর দল ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এদিকেই এসে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি সামনে এসেও দাঁড়ায়। কিন্তু না নিতাই, না রামচরণ, দু'জনের কারও চোখের দৃষ্টিতে বা আচরণে ভাড়া নেবার আগ্রহ চঞ্চল হয়ে ওঠে না। ওরা দু'জনেই যেন বিশেষ একজনের শুভাগমনের ছবি দেখবার আশায় চোখ তুলে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আসছে বোধহয়, কাল তো এই দশটা-পাঁচের ট্রেনেই সে এসেছিল। আজ কি তাহলে আসবেই না?

ফটকের কাছ থেকে চেকারের মূর্তি যখন সরে যায়, যখন শেষ যাত্রীকেও ফটক পার হয়ে চলে আসতে দেখা যায়, তখন যেন দু'জনেই একসঙ্গে হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়। সে আসেনি। দু'জনেরই উদ্বেগের প্রতিযোগিতা যেন শান্ত হয়ে যায় এবং সামনের যাত্রীদের উপর চোখ পড়ে।

এবং তখনি যাত্রী নিয়ে উল্লাসের সঙ্গে ছুটে চলে যায় ভাগ্যলক্ষ্মী, সোজা বাজার। আর আশীর্বাদও যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে, বাজার ছাড়িয়ে একেবারে টাউন পর্যন্ত।

ভানু সিদ্দিক আর গিরধারী আশ্চর্য হয়। নিতাই আর রামচরণ, দু'জনের কেউ কারও অজানা নয়। বরং, এই দু'জনের মধ্যে যে কত গলাগালি ভাব, হাসাহাসি আর মাখামাখি ছিল, তা'ও সকলেই এক দিন দেখেছে। বেশি দিন নয়, এই বোধহয় মাস ছয়েক হবে, কে জানে কেন দু'জনের মধ্যে এমন একটা নীরব রেষারেষির ভাব দেখা দিল! আজকাল দু'জনের কেউ কারও সঙ্গে একটা সাধারণ কথাও যেন বলতে চায় না। অথচ ছ'মাস আগে এই ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ, দু'জনেই এক সারিতে পাশাপাশি দাঁড়াতো। ভাগ্যলক্ষ্মীর পাশে উর্বশীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতবার রামচরণ এসে একটা গোলমাল বাধিয়ে আর ঠেলেঠুলে আশীর্বাদকে ভাগ্যলক্ষ্মীর পাশে দাঁড় করিয়ে তবে খুশি হয়েছে। ভানুও রাগ করে কতবার বলেছে—আঃ, দু'জন যেন রামলক্ষ্মণ দুটি ভাই। একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে পারে না।

রোজই নয়, তবে সপ্তাহের মধ্যে অন্তত তিনটে দিন, এই রায়েরহাট স্টেশনেই কোন না কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নামে একটি মেয়ে। দেখেই বোঝা যায়, এই মেয়ে কেমন মেয়ে, আর কেন সপ্তাহে তিনটে দিন রায়েরহাট

স্টেশনে ওকে দেখা যায়, আর কোথায় যেতে চায়।

টাউনে যায় মেয়েটি। হাতে বই আছে। সব সাইকেল-রিক্সাই জানে, মেয়েটি টাউনের কলেজে পড়ে।

কিন্তু আসে কোথা থেকে? এ খবরও অনেকে জানে। ভানু বলে, ইনি জয়গড় থেকে আসেন। ত্রিবেনীর কাছে সেই জয়গড়, যেখানে নতুন একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

মেয়েটি একাই আসে আর একাই ফিরে যায়। টাউনের দিক থেকে যে-কোন একটা রিক্সায় চড়ে বিকালের দিকে ফিরে এসে পাঁচটা পঞ্চাশের ট্রেন ধরে মেয়েটি। কোনদিন উর্বশী, কোনদিন পক্ষীরাজ আর কোনদিন মন-রে-আমার ওকে টাউন থেকে নিয়ে আসে।

কিন্তু স্টেশন থেকে টাউনের কলেজ পর্যন্ত ওকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যেন এই স্ট্যাণ্ডের এতগুলি রিক্সার মধ্যে মাত্র এই দুই রিক্সার উপর, এই ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের উপর সঁপে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার রকম-সকম দেখলে তাই মনে হয়। স্টেশনের ফটকের কাছে মেয়েটির মূর্তি দেখা দিতেই যেন চমকে ওঠে ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিতাই; সাইকেলের একটা প্যাডেলের উপর একটা পা তুলে দিয়ে ছটফট করে ওঠে রামচরণ। দু'জনেই যেন একটা প্রতিজ্ঞার আবেগে ব্যস্তভাবে হর্ণ বাজাতে থাকে।

স্ট্যাণ্ডের কাছে মেয়েটি এগিয়ে আসতেই পথের দু'পাশের রিক্সার সারি থেকে যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে দুই রিক্সা। দুই রিক্সার সামনের দুই চাকায় একটা ঠোকাঠুকিও হয়ে যায়। দুই রিক্সার এই আক্রোশের ঠেলাঠেলিতে রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি এগিয়ে যেতে পারে না।

এগিয়ে যাবার দরকারও হয় না। হয় ভাগ্যলক্ষ্মী নয় আশীর্বাদ, দুই রিক্সার কোন একটি রিক্সায় মেয়েটি উঠে বসে। মেয়েটির কোন কথা বলতে হয় না। কারণ, জানা আছে সবারই, কোথায় যাবে মেয়েটি।

হয় ভাগ্যলক্ষ্মী, নয় আশীর্বাদ। হুহু করে স্ট্যাণ্ড ছেড়ে, হর্ণ বাজিয়ে একটা উল্লাসের সঙ্গীতের মতো বাতাসের নীরবতা শিউরে দিয়ে সড়ক ধরে ছুটে চলে যায়। ফাঁকা পথ। দু'পাশে ছোট-ছোট বাঁশবাগান আর পুরণো দেউল। বাজার পর্যন্ত যেতে পথের উপর মানুষের ভীড় তেমন কিছু নয়। বড় বড় আমের ছায়া পার হয়ে, পাখী ডাকা মুখরতার এক-একটা ছোট ছোট উল্লাসের জগৎ পার হয়ে ছুটতে থাকে রিক্সা। বাজার, তারপর কলেজ রোড, তারপর

কলেজ। ক্ষান্ত হয় রিক্সার অভিযান ; হয় ভাগ্যলক্ষ্মী, নয় আশীর্বাদ।

ভানু হাসে—যেমন নিতাইটা তেমনই রামচরণটা, দুটোই বেহায়া বটে।

সিদ্দিক খৈনি মুখে দিয়ে হাসে—দুটোরই মাথা খারাপ হয়েছে।

হ্যাঁ, সত্যিই হঠাৎ যেন মাথা খারাপ হয়েছে. তেমনই উদাস দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে নিতাই, যখন রামচরণের আশীর্বাদ মেয়েটিকে তুলে নিয়ে একটা বিপুল গর্বের কৃতার্থতায় যেন ধন্য হয়ে, আর হর্ণের শব্দে নিতাই-এর সারা আত্মাটাকেই বিদ্রূপ করে চলে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নিতাই। যেন ক্ষণিকের মতো সব খাটুনির জোর আর রোজগারের জেদ ভুলেই গিয়েছে নিতাই।

রামচরণেরও চোখে-মুখে এই রকম মাথা-খারাপ অবস্থা দেখা যায়। যখন ভাগ্যলক্ষ্মীর কোলের উপর চড়ে বসে মেয়েটি। বেশ বড় একটি বেনী দোলে, কোন কোন দিন চওড়া খোঁপা, পায়ে সবুজ রং-এর চটি, আর গায়ে রঙীন শাড়ি। কোনদিন ডুরে, কোনদিন বুটিদার, কোনদিন রঙিন-ছাপ শাড়ি। হু-হু করে ছুটে চলে ভাগ্যলক্ষ্মী, মেয়েটির কানের দুল থর থর করে কাঁপে।

আমের ছায়ার ভিতর ভাগ্যলক্ষ্মী অদৃশ্য হয়ে যেতেই আশীর্বাদের গদির উপর দুটো ঘুসি মেরে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে আবার সামনের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলে রামচরণ—কোথায় যাবেন? ক'জন আছেন? দু'জনের বেশি টানতে পারব না মশাই।

কে জানে কি হয়েছে? অনেক দিন, প্রায় একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে। মাঘের শীত শেষ হয়ে ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে কবেই। আমের গাছে মুকুল ধরেছে। কিন্তু সেই মেয়েটি কোথায়?

কলেজ বন্ধ হয়নি, ট্রেনের টাইমও বদলায়নি। দশটা পাঁচের ট্রেন আজও আসে আর চলে যায়। চেকারবাবু তেমনই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের টিকিট চেক করেন। কিন্তু কই? একমাস পার হয়ে গেল, আজও সেই রঙীন শাড়ির আঁচলকে ফটকের কাছে দুলে উঠতে দেখা গেল না।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ আজও নীরবে দুই সারির মধ্যে পরস্পরের দিকে একটা আক্রোশের আবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিতাই আস্তে আস্তে বিড়ি টানে; একমনে ছোলা চিবোয় রামচরণ। দু'জনের কেউ কারও দিকে ভুলেও একবার হাসিমুখ তুলে তাকায় না। দু'জনের মধ্যে কথার বিনিময় আজও ঘটেনি।

যাত্রী আসে ; কত রকমের যাত্রী। ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদও ছুটে ছুটে ভাড়া খাটে। স্টেশন থেকে বাজার, বাজার থেকে টাউন। কিন্তু এই খাটুনি যেন নিতান্তই খাটুনি। ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের হর্ণ বাজে, নিতান্তই হর্ণের শব্দ। সে শব্দে কোন গর্বময় সঙ্গীতের উল্লাস শিউরে ওঠে না।

অন্যদিনের মতো সেদিনও, এসেছে দশটা পাঁচের ট্রেন। দশ মিনিট লেট করে এসেছে। ফটক ভেদ করে মানুষের ভিড় কিলবিল করে এগিয়ে আসছে। আর···চমকে ওঠে নিতাই-এর চোখ। কেঁপে ওঠে রামচরণের মুখ। ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ, দুই রিক্সাই যেন শিউরে ওঠে। ফটকের কাছে চেকারবাবুর পাশ কাটিয়ে একটা রঙীন মূর্তি যেন চঞ্চল হয়ে বের হয়ে এসেছে এবং এইদিকেই আসছে।

ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে সেই রঙীন মুখটাকেও চিনতে পারা যায়। সেই মেয়েটি। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিতাই। সীটের গদির উপর ঘুসি মেরে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে আর প্যাডেলের উপর একটা পা তুলে দিয়ে ছটফট করে রামচরণ। ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের হর্ণ মরিয়া হয়ে বাজতে থাকে।

কিন্তু ধীরে ধীরে, ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ, দুই রিক্সার এই আক্রোশের উৎসাহ যেন একটা হঠাৎ ধাঁধার আঘাতে আহত হয়ে নেতিয়ে পড়তে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর হর্ণ যেন ফোঁপাতে থাকে, আর আশীর্বাদের হর্ণ স্বরভঙ্গ গলার মতো কাঁপে।

মেয়েটির চেহারা বদলে গিয়েছে। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ, মাথায় কাপড়। কানে আর সেই ছোট দুটি দুল নয়। মস্ত একজোড়া কানপাশা।

একলা নয় মেয়েটি। সঙ্গে একজন রয়েছে। অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের গায়ে সিল্কের কামিজ আর ফরাসডাঙ্গা ধুতি। পায়ে নতুন জুতো। হাতের আঙ্গুলে তিনটি আংটি!

মেয়েটির হাত ধরে আছেন ভদ্রলোক। মেয়েটি হাসছে, ভদ্রলোকও হাসছেন। এগিয়ে আসছে দু'জনে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। স্ট্যাণ্ডের এই দুই সারি রিক্সার দিকে যেন দু'জনের চোখই পড়েনি। ভুলেও এদিকে একবার তাকায় না কেউ, মেয়েটি না, সঙ্গের ভদ্রলোকও না।

ট্যাক্সির কাছে এসে থেমে গিয়েছে দু'জনেই। এবং তারপর বোধহয় এক মিনিটও পার হয়নি, সনাতনদার চকচকে নতুন ট্যাক্সি দুই সারি রিক্সার মাঝখানের পথের উপর দিয়ে যেন লাফাতে লাফাতে আর ধোঁয়া ছড়িয়ে ছুটে চলে

গেল। চলে গেল সেই মেয়েটি, আর তার সঙ্গী সেই ভদ্রলোক।

সনাতনদার নতুন ট্যাক্সির ধোঁয়া আর পোড়া পেট্রোলের গন্ধ, তা'ও বেশিক্ষণ আর বাতাস ভার করে রাখেনি। দমকা একটা হাওয়া এসে ভাগ্যলক্ষ্মীর আর আশীর্বাদের পর্দা দোলাতে শুরু করে দেয়।

সব রিক্সাই যাত্রী নিয়ে ছুটে চলে যায়। পক্ষিরাজ, মন রে আমার, উর্বশী, কত মজা, জয় মা কালী, প্রাণারাম, সুখশান্তি আর চল রে চল। শুধু ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ চুপ করে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই রিক্সাই যেন হঠাৎ ক্লান্ত শ্রান্ত আর অলস হয়ে গিয়েছে। আক্রোশ নেই, ঠোকাঠুকি আর ঠেলাঠেলির সেই প্রতিজ্ঞার রেশমাত্রও নেই। কেউ ছটফট করে না।

রামচরণ ডাকে—একটা বিড়ি দিবি নিতাই?

নিতাই বলে—নে।

কা ব্যি ক

কাব্যি করে আর স্বপ্ন দেখে জয়ন্ত। এইবার বোধহয় প্রেমেও পড়েছে। নইলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরের ঘরের জানালার কাছে ওভাবে বসে থাকে কেন, ওরকম করে তাকায় কেন, আর ঠিক ঐ মেয়েটিই যখন এই পথ দিয়ে চলে যায়, তখন রঙীন হয়ে ওঠে কেন জয়ন্তের মুখ?

গ্রামের বাড়ী থেকে জয়ন্ত যেদিন প্রথম কলকাতায় তার মেজকাকার এই বাড়িতে এল, সেইদিন থেকেই জয়ন্তের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের শুরু। আমরা দু'জনে এক কলেজে এক ক্লাসেই পড়েছি। একই বছরে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। তারপর আরও বড় বড় কয়েকটা পরীক্ষা পার হতে গিয়ে আমিই ফেল করেছি, আর খুব ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করে বেশ ভাল মাইনের সার্ভিস লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে জয়ন্ত। অ্যাকাউন্টস্-এ এত ভাল প্রতিভা সাধারণত দেখাই যায় না। এখন ইচ্ছা করলে, আর একটু চেষ্টা করলে জয়ন্ত বেশ উঁচুদরের কোন সওদাগরী কোম্পানীর অডিটর হতে পারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, শুকনো ও কঠিন যত অঙ্কের স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে এতদিন ধরে যে-মানুষটা হিসাব-বিজ্ঞানের সাধনা করলো, সেই মানুষের মনটা হঠাৎ

এমন বেহিসাবী হয়ে গেল কেমন করে ?

মেজকাকা রাগ করেছেন, এবং তারপর ভয় পেয়ে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছেন। সন্দেহ করেন তিনি, জয়ন্তের মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে। নইলে চাকরি-বাকরির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ এভাবে একটা ঘরের জানালার কাছে বসে পথের দিকে কেন তাকিয়ে থাকবে একটা সুস্থ-সবল ইয়ং ছেলে ?

মেজকাকা জানেন না, আমরা জানি, কেন পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে জয়ন্ত। কাব্যি করে, অর্থাৎ কাব্য পড়ে আর লেখে, আর পথের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে, কারণ ঐ পথ দিয়ে দিনের মধ্যে অনেকবার যায় আর আসে সেই মেয়েটি, যার সাজ-পোষাক আর গলার গয়না থেকে শুরু করে চোখের চাউনিতে পর্যন্ত কেমন একটা অদ্ভুত তীব্র আর ঝকঝকে ফ্যাশান থমথম করে।

মেয়েটিকে আমরা চিনি না। জয়ন্তও ঐ মেয়ের কোন পরিচয় জানে না। ঐ ওদিকে মার্কেটের পিছনের দিকে নতুন বাড়িগুলির কোন একটা ফ্ল্যাটে বোধহয় থাকে এই মেয়ে, কারণ ঐদিক থেকেই ওকে আসতে দেখা যায়। রাত্রিবেলা ট্রামলাইনের দিক থেকে ছোট রাস্তা ধরে এদিকে আসে। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আসে, সে-খবর আমরা জানিনা।

জয়ন্তও জানেনা। জয়ন্ত বলে, জানবার কোন প্রয়োজন নেই। এক নাম-না-জানা অপরিচিতা পথিক-তরুণী জয়ন্তের চোখের সম্মুখের পথ ধন্য করে দিয়ে চলে যায়। জয়ন্তও যেন এক আন-জগতের রূপময়ীর সেই ছন্দিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে ধন্য হয়ে যায়।

আমাদের কাছে জয়ন্ত তার মনের ভাষা গোপন করে না। জয়ন্ত বলে—ওকে সত্যিই এক স্বপ্নলোকের মেয়ে বলে মনে হয়।

আমরা বলি—কিন্তু স্বপ্নলোকের এই ধরনের একটা বস্তুর জন্য সারাদিন পথের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে লাভ কি ?

জয়ন্ত বলে—প্রেমের রীতিই যে এই। এই প্রতীক্ষাই একদিন সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ হয়ে ফুটবে।

আমরা প্রশ্ন করি—কবে ?

জয়ন্ত সোজাভাষায় উত্তর না দিয়ে শুধু বলে—একদিন। দেখতে পাই, জয়ন্ত কথাটা বলেই জানালার নিকটে দু'টো টবের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রশ্ন করি—ওখানে কি ?

জয়ন্ত বলে—রজনীগন্ধার চারা।

বুঝতে পারিনা, কি ভাবছে জয়ন্ত। জয়ন্তই বলে—এই রজনীগন্ধা হলো

আমরাই মনের তপস্যার মতো।

তারপরেই বলে—এই রজনীগন্ধা আমারই জীবনের কাব্য।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল স্বরে বলে—মানুষের কাব্যকেই আমি একটা নতুন কল্পনা দিয়ে যাব, যার জন্ত ভবিষ্যতের মানুষ আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

জয়ন্তের কাব্যিক প্রলাপ শুনে আমরা হতাশ হয়ে চলে যাই। কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার ফিরে এসে বলি—মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছ, ভালই, কিন্তু সেজন্ত এরকম ধ্যান-ট্যান আর কাব্যি করার দরকার কি? তুমি যদি কিছু বলতে না পার, তবে বল, আমরাই না হয় মেয়েটির বাপ-মা'র কাছে গিয়ে……!

জয়ন্ত ক্ষুব্ধভাবে তাকায়—কি করতে চাও?

আমরা বলি—তোমার সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব।

হঠাৎ আহত মানুষের মতো বেদনার্তভাবে তাকায় জয়ন্ত—দোহাই তোমাদের, আমার স্বপ্নকে হত্যা করো না।

—এ কথার অর্থ?

জয়ন্ত একটু শান্ত হয়ে নিয়ে তারপর আমাদের একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্ত বলে—ওভাবে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে এন না। তাকে আসতে দাও আমার জীবনে, ধীর মৃদুল চরণপাতে, মধু-মাধবী রাতে, কে তুমি পথিক বলি সুধাহাসি হেসে, মালা তুলে নিতে হাতে।

কিন্তু আমরা আরও হতাশ হই। জয়ন্তের কল্পনা শেষ পর্যন্ত জয়ন্তের মাথায় সত্যিই গোলমাল ঘটাবে, এই ভয়ে আমরা শুধু ভাবি, কি করা যায়?

জয়ন্তই একদিন আবার হেসে বলে—তোমরা শোননি, কাব্যে কি বলে?

—কি বলে?

জয়ন্ত—অশোকের মঞ্জরী ফুটে ওঠে কিসের স্পর্শে?

—জানি না।

জয়ন্ত—ঐ রকমই এক তরুণী নারীর চরণের মঞ্জীর ধ্বনির স্পর্শে।

—বেশ।

জয়ন্ত—জান কি, তিলক ফুলের কুঁড়ি ফোটে কিসের স্পর্শে?

—কে জানে কিসের স্পর্শে।

জয়ন্ত বলে—ঐরকমই সুন্দরীর আঁখির কটাক্ষে।

—ভাল কথা।

উচ্ছসিত হয়ে বলতে থাকে জয়ন্ত—বকুল পুষ্পিত হয় কামিনীর অধরমধুর ছোঁয়ায়, আর রক্তকুরুবক ফোটে রূপসীর কমনীয় তনুর আলিঙ্গনে। ধন্য কবি, ধন্য তাদের কল্পনা।

আমরা বলি—কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ।

জয়ন্ত—কি ?

—ঐ মেয়েকে নিয়ে কল্পনা-টল্পনার খেলা ছেড়ে দাও।

ক্ষুব্ধ হয় জয়ন্ত—কেন ?

—মেয়েটাকে কেমন যেন মনে হয়।

জয়ন্ত—কি রকম ?

স্বপ্নলোকের মেয়েটেয়ে বলে তো মনে হয় না। কখনো দেখি সন্ধ্যাবেলা মার্কেটে বেড়াচ্ছে, কখনো দেখি সিনেমা হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে চীনা বাদাম খাচ্ছে।

প্রভাত রূঢ়ভাবে বলে—একদিন দেখলাম চৌরঙ্গীতে, একজন অবাঙালী ভদ্রলোকের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো।

জয়ন্ত বলে—অবাস্তব, অবাস্তব। ওসব মানুষের আসল পরিচয় নয়। ওভাবে মানুষকে চিনতে হয় না।

রাগ করেই বলি—তুমিই একবার চিনে দেখ না, যেভাবে চিনতে হয়।

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বলে—চিনেছি।

আমরা অপ্রস্তুত হই।

জয়ন্ত বলে—সে'ও আমাকে চিনেছে। এই পথে ওার যাওয়া-আসা আমারই প্রতীক্ষার প্রতি তার মুগ্ধ মনের অভিনন্দন। তোমরা ওকে চিনতে পারনি। তোমরা শুধু দেখেছো ওর ফ্যাশন, যেটা জীবনের বাইরের জিনিস। ওর পরিচয় পেয়েছি আমি ওর চোখের মধ্যে। বুঝতে পারি ওর চোখের ভাষা।

—কি বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে প্রভাত।

জয়ন্ত—সে জানিয়ে গেছে, তার চোখের নীরব ভাষার ইঙ্গিত, সে আসতে চায় আমার জীবনে।

তাহ'লে তো সমস্যা মিটেই গেল। আর আমাদের কিছু করবার নেই। দু'জনে দু'জনেরই আত্মার পরিচয় যখন জেনে ফেলেছে, তখন আমরা কেন আর রুক্ষ কথায় ঘটকালি করে ওদের স্বপ্নের আর কাব্যের মধুরতা নষ্ট করে দেব ?

মিথ্যে বলেনি জয়ন্ত। আমরা বসেছিলাম নিকটেরই এক বাড়ির দাওয়ায়,

যেখানে পাড়ার পূজা-কমিটির মিটিং শুরু হবে আর একটু পরে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সকলেই দেখে চমকে উঠলাম, আসছে সেই অপরিচিতা। গলায় সোনার হাঁসুলি, লঘু ভয়েলের শাড়ি আঁটসাট করে পরা, ভাঙা খোঁপায় দুটো সরু সরু সোনার চেন ঝুলছে।

অপরিচিতা ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখের পথ পার হয়ে জয়ন্তর ঘরের জানালার কাছে দাঁড়ালো। আমরা দেখতে থাকি, একটি মৃদু কটাক্ষ তুলে অপরিচিতা সেই নারীর মূর্তি জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্যপথে ঘুরে এবং লুকিয়ে-পাকিয়ে আমরা আস্তে আস্তে জয়ন্তর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লজ্জা, ভয়, আবার কেমন একটা অজানা আনন্দ, সব মিলে আমাদের বুকে দুরু দুরু ধরিয়ে দিল। অভিসারিকার মতো, সত্যিই তাই, জয়ন্তের স্বপ্নলোকের মেয়ে যে সত্যিই ধীরে মৃদুল চরণপাতে ফটক পার হয়ে বারান্দার উপর এসে দাঁড়ালো।

বের হয়ে এল জয়ন্ত। জয়ন্ত তার কাব্যময় চক্ষুর নিয়ে এতই মুগ্ধ হয়ে আছে যে, আমাদের ছায়াগুলিকে দেখেও কিছু বুঝতে পারলো না।

জয়ন্তের হাতে একরাশ রজনীগন্ধার ডাঁটা, ডাঁটার মাথায় ঘুমন্ত কুঁড়ি।

জয়ন্ত বলে—আমি জানতাম, তুমি নিজেই একদিন আসবে।

অপরিচিতা বলে—আমিও জানতাম, আপনি নিজেই একদিন ডাকবেন।

জয়ন্ত—যখন এসেছ, তখন নাও আমার এই উপহার।

রজনীগন্ধার রাশি দু'হাতে তুলে অপরিচিতার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় জয়ন্ত।

অপরিচিতা কুণ্ঠিতভাবে বলে--এখনি কেন?

জয়ন্ত—হ্যাঁ এখনি, সবার আগে আমার তপস্যার এই উপহার তুমি নাও।

অপরিচিতা—সবার আগে এসব জিনিস কেন?

জয়ন্ত—আমার কল্পনা আজ ধন্য হবে। স্বপ্ন দেখেছি আমি, তোমারই মুখের হাসির স্পর্শে আমার রজনীগন্ধার কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

অপরিচিতার কটাক্ষ একটু তীব্র হয়ে ওঠে।—বাঃ, বলা নেই, কওয়া নেই, আগেই হাসি চাই!

জয়ন্ত—কি বললে?

অপরিচিতা—আগেই হাসি-টাসি হয় না।

জয়ন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—তবে কি?

অপরিচিতা গম্ভীর ভ্রূভঙ্গী করে বলে—আগে টাকার কথা বলে নিতে হয়।

জয়ন্ত—টাকা? জয়ন্তের ফ্যাল ফ্যাল দুই চক্ষুকে কাঁপিয়ে দিয়ে একটা হাহাকার যেন আস্তে ধ্বনিত হয়। ধপ করে জয়ন্তের হাতের রজনীগন্ধা বারান্দার মেঝের উপর পড়ে যায়।

অপরিচিতা বলে—ধেৎ!

হনহন করে হেঁটে ফটক পার হয়ে চলে যায় অপরিচিতা। খোঁপার চেনগুলি ঝোলানো সাঁপের মতো লিকলিক করে।

আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে জয়ন্তের কাছে দাঁড়ালাম। গলার স্বর বেশ কঠিন করে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—কি হে, তপস্যা শেষ হলো?

উত্তর দেয় না জয়ন্ত। আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলে তোমার কাব্য? রূপসীর হাসির ছোঁয়ায় রজনীগন্ধার কুঁড়ি ফোটে তো?

প্রভাত রূঢ়স্বরে হেসে ওঠে—ফোটে না, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

যাক্, অনেকক্ষণ রইলাম জয়ন্তের ঘরে। সকলেই দু'কাপ করে চা খেলাম। চলে যাবার সময় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম—এইবার একটা ভাল সার্ভিসের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

জয়ন্ত বলে—হ্যাঁ।

আবার প্রশ্ন করি—চেষ্টা করবে তো?

জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বলে—নিশ্চয়।

হিরো এবং ভিলেন

এই স্টুডিও হলো দি ফিল্মস লিমিটেডের স্টুডিও। মস্ত বড় বাগান আছে। বড় বড় শেড আছে। ল্যাবরেটরি আছে। অফিসঘর আছে। যা যা থাকা দরকার সবই আছে। সাজঘরও আছে।

আর, স্টুডিওর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাসাহাসি গল্প ও আড্ডার ঘর হলো এই সাজঘর। আর্টিষ্টদের কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও, মেক-আপ নামিয়ে ফেলে আবার যথাপূর্ব অকপট চেহারাটি ফিরে পাওয়ার পরেও চা-এর কাপ হাতে নিয়ে নিয়ে এই সাজঘরের ভিতরেই কিছুক্ষণ গল্প না করে কেউ চলে যায় না।

দি ফিল্মস লিমিটেডের যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিনি হলেন ছোটবাবু। কোম্পানীর বার-আনা মালিক বলতে যাঁকে বোঝায়, সেই অনাথবন্ধুবাবুর ছেলে

বলেই বোধহয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ছোটবাবু বলা হয়। যাই হোক, ছোট-বাবুও মাঝে মাঝে এদিকে আসেন, সাজঘরে আড্ডার মাঝখানে এসে দাঁড়ান এবং এই হাসাহাসির কিছুটা শেয়ার নিজেও উপভোগ করে চলে যান।

মাইনে-করা আর্টিষ্ট সুরমাও এই তিন-মাসের মধ্যেই বুঝে ফেলেছে, এই সাজঘর কেন এত হাসাহাসির ঘর। যেদিন কাজ থাকে না, কিংবা ফ্লোরে যাবার তাড়া থাকে না, সেদিনও এই সাজঘরের ভিতরে একটা ঘণ্টা গল্প করে পার করে দেওয়াও একটা কাজের মতো কাজ মনে হয়। প্রদোষবাবু, কেদার-বাবুর মতো পুরোনো আর্টিষ্টও থাকেন। বিরজা, কাজললতা আর প্রভাও থাকে। কত রকমের গল্প হয়। চীন থেকে শুরু করে চীনেবাদাম পর্যন্ত, সব বিষয়েই তর্ক মন্তব্য আর গল্প চলে। কিন্তু সব গল্পই শেষ পর্যন্ত একটা হাসির হর্‌রা জাগিয়ে দিয়ে তবে শেষ হয়।

সাজঘরের মনটাকে এত হাসিয়ে মজিয়ে রাখেন যিনি, তিনি হলেন সাজ-ঘরের প্রতুলদা। কখনও তুলি, কখনও পরচুলা আর কখনও বা পাফ হাতে নিয়ে সকলেরই সব গল্পের ওপর একটা না একটা মন্তব্য না ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারেন না প্রতুলদা। সব সময় হাসিখুশি, কিন্তু সব সময় মুখর নন প্রতুলদা। এক এক সময় বেশ গম্ভীর হয়ে গল্প শোনেন এবং বেশ সাবধানে আর্টিষ্টদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয়, মুখের ভাব দেখেই অনেককিছু বুঝে ফেলছেন প্রতুলদা।

প্রতুলদা নিজেও গর্ব করে বলেন—আরে, আমি যে ভগবানের কর্ম করি।

—তার মানে?

—তার মানে প্রত্যেক দিন ডজন ডজন বীর মহাবীর সাধু ফকীর বাদশাহ ডাকাত নিজের হাতে তৈরী করছি। আপনারাই তো বলেন, আমি হলাম মেক-আপ ম্যান।

মেয়ে আর্টিষ্টদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেশ মুখ খুলেই ঠাট্টা করেন প্রতুলদা—সধবা বিধবা করাও তো আমার হাত। কাল যাকে বিধবা করে দিই, আজ তাকে সধবা করি—এ কি যে-সে কাজ!

প্রতুলদার বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। যারা বয়সে ছোট, শুধু তারা নয়, যাঁরা বয়সে বড় তাঁরাও সাজঘরের প্রতুলকে প্রতুলদা বলে ডাকেন। মানুষটার সরল স্বভাবের জন্যই বোধহয়, সকলে প্রতুলদাকে একটু প্রীতির চোখে দেখে, এবং সেই প্রীতির মধ্যে একটু শ্রদ্ধাও যেন থাকে।

মাঝে মাঝে নিজেও একটা প্রচণ্ড হাসির কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন প্রতুলদা।

আর্টিষ্টরা সাজঘরে ঢুকেই দেখতে পায় প্রতুলদা নেই। একজন কাবুলিওয়ালা মারমূর্তি হয়ে বসে গজগজ করছে।

—এ কি? কিসকো খোঁজতা হ্যায়? একটু রুষ্টভাবে প্রশ্ন করে আগন্তুক আর্টিষ্ট। সেই মুহূর্তে মাথার চুল আর দাড়ি খুলে ফেলে হেসে ফেলেন প্রতুলদা।

এই রকম আরও অনেকবার, রূপসজ্জার অনেক কেরামতি দেখিয়ে সাজঘরের ভিড়কে হাসিয়েছেন প্রতুলদা। নিখুঁত মেক-আপ নিতেও পারেন প্রতুলদা। প্রতুলদা নিজেই বলেন, একদিন একটা মিনিস্টারের মেক-আপ নিয়ে বড়বাজারে গিয়ে……থাক্, বাকিটা আর নাই বা বললাম।

—বলতেই হবে। চেঁচিয়ে ওঠে সকলে।

—কিছু না, কিছু না। শুধু ইচ্ছে করে, ধারে কিছু মাল নিয়ে চলে আসি।

আর্টিষ্টদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘরোয়া সুখ-দুঃখের আলোচনা করেন প্রতুলদা। আর্টিষ্টরা অনেক অভিযোগের কথা এই সাজঘরে বসে এই প্রতুলদার কাছে এমন ভাষায় বলে ফেলে, যেটা ছোটবাবুর অফিস ঘরের কানে পৌঁছলে আর্টিষ্টের চাকরি আর থাকবে না। প্রতুলদাও অনেক সময় অনেকের কানের কাছে ফিসফিস করে এমন কথা বলে ফেলেন, যেটা তাঁর জানবার কথা নয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য, প্রতুলদার চোখ আর কান যেন এই সাজঘরের বাইরেও ঘুরে বেড়ায়। সব খবর রাখেন প্রতুলদা। তা না হলে পরেশবাবুকে একদিন প্রশ্ন করে চমকে দিলেন কেমন করে—সত্যিই কি বিয়ে করছেন?

—অ্যাঁ? কোথায় শুনলেন?

—শুনবো কেন, বুঝতেই পারছি।

—কি বুঝেছেন?

—প্রভার সঙ্গে আপনার বিয়ে।

—হ্যাঁ। কিন্তু……কি আশ্চর্য……আপনি প্রতুলদা কি করে……।

কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কৃতিত্বের গর্বে উৎফুল্ল হয়ে হাসতে থাকেন প্রতুলদা।

প্রতুলদা নামে এই মানুষটাকে এই তিন মাসের মধ্যে সুরমারও বেশ ভাল লেগে গিয়েছে। সুরমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে ঘরোয়া কথা বলেন প্রতুলদা।—শুনে খুবই ভাল লাগলো, আপনার মাইনে বেড়েছে। মাত্র তিনমাস চাকরি করবার পর মাইনে বেড়েছে, এই প্রথম দেখলাম। তা আপনার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিতও ছিল। মাত্র এক'শো টাকা মাইনে……অথচ আপনার খাটুনি হলো

তিনটে শকুন্তলার খাটুনির চেয়েও বেশি।

সুরমাও মাঝে মাঝে বেশ হেসে হেসে আর পাঁচজনের মতো বায়না ধরে।—অনেক দিন হলো আপনার কোন নতুন মেক-আপ দেখছি না কেন প্রতুলদা?

—কিসের মেক-আপ দেখতে চান?

প্রদোষবাবু মুখ টিপে হাসেন—খাঁটি হিরোর মেক-আপ।

—তার মানে?

—খাঁটি প্রেমিকের মেক-আপ।

—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন।

পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকেন প্রতুলদা। আর মাত্র পনর মিনিট পরেই বের হয়ে আসেন।

প্রথমে একসঙ্গে চমকে ওঠে সকলেই। তার পরে সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে হাসতে থাকে। শুধু মাথা হেঁট করে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে সুরমা।

ল্যাবরেটরির নীরেনের চেহারার মেক-আপ নিয়েছেন প্রতুলদা। ঠিক সেই ধরনের ব্যাক-ব্রাশ চুল। সেই ধরনের নীল রং-এর ট্রাউজার। ট্রাউজারের পকেটের ভিতরে একটা লাল রুমাল উঁকি দিয়ে রয়েছে। নীরেনের হাসিটারও অবিকল-নকল করেছেন প্রতুলদা। ঠিক, সেই, সেইরকম হাসির সঙ্গে সেই রকম ভঙ্গী করে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। আর চশমাটাকে হাতে নিয়ে চরকির মতো দোলাচ্ছেন। নীরেনের নাক মুখ আর চোখের ধাঁচটাও কি চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন প্রতুলদা।

সুরমা মাথা হেঁট করে আছে কেন? আর বুঝে ফেলতে কারও অসুবিধা নেই। একটু আশ্চর্য হলেও সকলেই খুশি হয়। বেশ তো, ভালই তো, ল্যাবরেটরির নীরেন খুবই ভাল ছেলে। সুরমার জীবনের কাছে নীরেন যদি খাঁটি হিরো হয়ে এসে গিয়ে থাকে, তবে দোষের কি আছে? বরং বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই ভাল।

—তাহলে আমাদের কপালে একটা নেমন্তন্নের সুযোগ থাকলো! কি বল সুরমা?

কথাটা বলেই হেসে ওঠেন কেদারবাবু। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হেসে ওঠে। সুরমার মাথাটা আরও লজ্জা পেয়ে হেঁট হয়ে যায়।

সাজঘরের আড্ডা সেদিনের মতো সমাপ্ত হয়। যাবার আগে প্রতুলদার দিকে রাগ করে তাকাতে গিয়ে হেসে ফেলে সুরমা।

রাগ করবার যে কিছুই নেই। তাই না হেসে থাকতে পারবে কেন সুরমা?

নীরেনের সঙ্গে সুরমার ভালবাসার আনন্দটাকেই ধরা পড়িয়ে দিয়েছেন প্রতুলদা। কিন্তু ধন্যি প্রতুলদার চোখ! কেমন করে বুঝতে পারেন প্রতুলদা? সত্যিই কি প্রতুলদার কান আর চোখ বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়?

প্রতুলদাও কৃতার্থভাবে হেসে ফেলেন—আমার অপরাধ নেবেন না। মোট কথা, ব্যাপার দেখে খুবই খুশি হয়েছি বলে একটু আনন্দ করে নিলাম।

কিন্তু আরও তিন মাস পার হয়ে গেলেও সুরমার বিয়ের নেমন্তন্ন খাবার সুযোগ যখন কারও হলো না, তখন কেউ কেউ একটু আশ্চর্য হলেও সুরমাকে কোন প্রশ্ন করেনি। একদিন কিন্তু একটু আশ্চর্য হতে হলো, যেদিন শোনা গেল যে, ল্যাবরেটরীর নীরেনের চাকরি গিয়েছে।

নীরেনের চাকরি যাবার খবরটা শুনে তেমন কিছু আশ্চর্য হয়নি কেউ। ছোটবাবুর রাজত্বে এরকম হঠাৎ বরখাস্তের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু নীরেনের মতো একজন অতি দক্ষ কাজের মানুষকে হঠাৎ সরিয়ে দেবার কি কারণ থাকতে পারে? শোনা গেল, ছোটবাবু নীরেনের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কেন? অসন্তুষ্ট হবার কোন একটা কারণই যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করে দিল সুরমা। সাজঘরের আড্ডার সব মানুষ যে ঘটনার কথা শুনে একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, সে ঘটনার কথা শুনে যে সুরমারই সবচেয়ে বেশি বিমর্ষ হবার কথা। কিন্তু সুরমা একটুও বিমর্ষ হয়নি। আজ এক সপ্তাহ হলো এই ষ্টুডিওতে আর আসেনি নীরেন। কিন্তু নীরেন কি আরও ভাল মাইনের চাকরি এরই মধ্যে কোথাও জুটিয়ে নিয়েছে?

না, পরেশবাবুর সঙ্গে নীরেনের আজই ট্রামে একবার দেখা হয়েছে। নীরেন বলেছে, চাকরির চেষ্টায় বোম্বাই চলে যাবো কিনা ভাবছি।

কিন্তু সুরমার মুখে খুশির উচ্ছ্বাস একটুও কাতর হয়ে উঠতে দেখা যায় না। বরং দেখা যায় যে, সুরমার চোখ দুটো যেন একটা নিবিড় অনুভবের আবেশে আরও খুশি হয়ে হাসছে। সুরমার হাসিতে নতুন রকমের ঝংকার। সুরমার কথাবার্তায় নতুন রকমের ব্যস্ততা। সুরমার চোখে নতুন অহংকারের চাহনি। সুরমার মুখে একটা নতুন বিশ্বাসের তৃপ্তি।

প্রতুলদার চোখের দিকে তাকালে সুরমার মনের ভিতরে যেন একটা নীরব ঠাট্টা হেসে ওঠে। কিচ্ছু না, প্রতুলদার চোখের সবজান্তা অহংকারটা কিচ্ছু না। সুরমার জীবনের এই নতুন উল্লাস আর বিশ্বাসের রহস্য ধরে ফেলবার সাধ্যি

প্রতুলদার নেই।

প্রতুলদা মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়ে সুরমার মুখের দিকে তাকান। এই মাত্র। বুঝতে পারে সুরমা, প্রতুলদা আজও কিছু বুঝে উঠতে পারেননি বলেই এভাবে তাকাচ্ছেন। যদি সত্যিই বুঝে ফেলতে পারতেন, কার সঙ্গে বিয়ে হবে সুরমার, তবে সুরমার সৌভাগ্যের নামে জয়ধ্বনি করে হেসে উঠতেন। প্রতুলদাও নিশ্চয় নিমন্ত্রণ পাবেন। সেদিন চমকে উঠবেন, আর আশ্চর্য হয়ে যাবেন প্রতুলদা। তার আগে নয়। কিন্তু সেদিন আর ঠাট্টা করে সুরমাকে আর এই সাজঘরকে হাসিয়ে দেবার সুযোগ পাবেন না। কারণ সেদিন এই ষ্টুডিওর চাকরির জীবনের সীমা থেকে অনেক দূরে আর অনেক উপরে চলে যাবে সুরমার অদৃষ্ট।

আরও তিন মাস পার হয়ে গেল। কিন্তু সাজঘরের আড্ডার চোখেও একটা খটকা লাগে। সাজঘরের এত হাসাহাসির মধ্যে শুধু নীরব হয়ে বসে থাকে সুরমা। সুরমার মনের ভিতরে সেই নতুন উল্লাসের মুখর প্রাণটাই যেন মরে গিয়েছে।

ছোটবাবুর বিয়ের ব্যবস্থা সব ঠিক, এত বড় খবরটা পেয়ে সাজঘরের আড্ডা যেদিন কলরব করে ওঠে, সেদিনও চুপ করে যেন একটা মূক ও বধির মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুরমা। চোখ দুটো শুধু দপদপ করে জ্বলে, যেন প্রচণ্ড নির্মম একটা বিদ্রূপের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ বর্ষণ করতে চাইছে সুরমার চোখ।

কিন্তু সাজঘরের আড্ডার মুখরতা হেসে হেসে বাজতেই থাকে। সেই সঙ্গে কত রকমের মন্তব্য! মনে হচ্ছে, এইবার একমাসের বোনাস ঘোষণা করবেন ছোটবাবু! জানেন তো খবর, ছোটবাবুর সঙ্গে কার বিয়ে হবে? জানি মশাই, ঐ তো সেই মহিলা, যার সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে ছোটবাবুর একটা ইয়ে··· অর্থাৎ বেশ অন্তরঙ্গতা চলছিল! তা জানি না মশাই, তবে এটুকু জানি যে, খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ছোটবাবুর বিয়ে হচ্ছে।···হ্যাঁ হ্যাঁ, নারায়ণ কটন মিলের মালিক পি চক্রবর্তীর মেয়ে।

প্রদোষবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—প্রতুলদা!

—বলুন স্যার!

—একটা মেক-আপের খেলা দেখান প্রতুলদা।

—বলুন, কিসের মেক-আপ নেব?

—যা ইচ্ছে হয়।

বিরজা খিল খিল করে হেসে ওঠে—ভিলেন হলে ভাল হয়।

কেদারবাবু বলেন—তাই হোক! একেবারে খাঁটি ভিলেন।

—বেশ। বলতে বলতে প্রতুলদা সেই ছোট সাজঘরের ভিতরে চলে যান।

বেশিক্ষণ নয়, মাত্র কুড়ি মিনিট পরে বের হয়ে এলেন প্রতুলদা।

সাজঘরের আড্ডার সব চোখ একসঙ্গে চমকে ওঠে। প্রাণ খুলে হাসবার জন্য তৈরী হয়েছিল যারা, তাদের প্রাণের হাসি যেন হঠাৎ আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এ কি কাণ্ড করেছেন প্রতুলদা!

মিহি আদ্দির ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি। আস্তিন গিলে করা। লম্বা কোঁচাটাকে চিমটি দিয়ে ধরে কোমরের কাছে ধরে রেখেছেন প্রতুলদা। চুলের মাঝখানে সিঁথি। খুব সরু গোঁপের কালো রেখা। চিবুকের ওপর একটা বড় আঁচিল। সিগারেটের পাইপ মুখের এক কোণে কামড়ে ধরে রেখেছেন এবং মুখের আর এক কোণ দিয়ে হাসছেন। কী চমৎকার, কী নিখুঁত ছোটবাবুর মেক-আপ নিয়েছেন প্রতুলদা। প্রতুলদার চাপা চাপা গাল দুটোও যে ভরাট হয়ে অবিকল ছোটবাবুর গাল দুটোর মতো ফুলে রয়েছে।

আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সুরমা।—ভুলের শাস্তি পেয়েছি প্রতুলদা। আর ঠাট্টা করবেন না। মাপ করুন।

আর একবার আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে চমকে ওঠে সাজঘরের আড্ডার এতগুলি মানুষের চোখ। সকলে চেয়ার ছেড়ে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়! দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ছোটবাবু।

প্রতুলদার সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন ছোটবাবু—প্রতুল বুঝি আজ ছোটবাবুর মেক-আপ নিয়ে আপনাদের হাসাচ্ছে?

সাজঘরের ভেতরে ঢুকলেন ছোটবাবু। হেসে হেসে প্রতুলদার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করেন—কি প্রতুল? কি সেজেছো বল শুনি? একটি খাঁটি ছোটবাবু?

—একটি খাঁটি ভিলেন। ছোটবাবুর হাসিভরা মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে একেবারে সোজা সরল ও স্পষ্ট ভাষায় যেন একটা জলন্ত ধিক্কার বর্ষণ করে সুরমা।

চমকে ওঠেন ছোটবাবু, ভ্রূকুটি করেন। তারপর প্রতুলদাকেই প্রশ্ন করেন—তাই নাকি প্রতুল?

প্রতুলদা বলেন—হ্যাঁ।

হনহন করে হেঁটে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ছোটবাবু।

সাজঘরের এতগুলি মানুষের চোখেমুখে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের বেদনা ছমছম করতে থাকে। এ কি হলো? কি ব্যাপার?

আজ আবার সুরমার জীবনের একটা প্রচণ্ড বঞ্চনা আর ক্ষতির রহস্য ধরে নিয়েছেন প্রতুলদা। সুরমার মুখের দিকেই সকলে আবার একসঙ্গে তাকায়। সুরমা হাসে—আমার চাকরি গেল প্রতুলদা।

প্রতুলদা বলেন—আমার চাকরিটাও কি থাকবে ভেবেছেন?

সুরমা—কিন্তু আপনি তো অনায়াসে একটা মিথ্যে কথা বলে দিতে পারতেন, তাহলে আপনার চাকরিটা যেত না।

যে প্রতুলদা কোনদিন রাগ করে আর চেঁচিয়ে কথা বলেন না, যে মানুষের প্রাণটা সব সময় হেসে আর হাসিয়ে সুখী হয়ে রয়েছে, সেই প্রতুলদাই আজ রাগ করে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠেন—এমন ভিলেনের কাছে চাকরি করবার ইচ্ছেও আর নেই।

দা ন বি ক

বিহারের সেই ভূমিকম্প! কি ভয়ানক রাগ করে ফণা নেড়েছিলেন বাসুকী নাগ! পট পট করে বেজে উঠেছিল ধরিত্রীর পাষাণের পাঁজর। বড় বড় ক্ষেত আর মাঠের বুক ফেটে গিয়ে গরম জল আর বালুর ফোয়ারা উথলে উঠেছিল। মাটির গভীরে লুকিয়ে থেকে ছোট ছোট অগস্ত্য যেন এক চুমুকের টানে উপরের এক একটা ঝিল আর পুকুরের জল শুষে নিয়েছিল। কত কুয়োর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় সড়কের জায়গায় জায়গায় বড় বড় দহ দেখা দিয়েছিল। আর, সহর বাজার ও বস্তির ছোট-বড় কত বাড়ি যে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু বিবরণ আর পরিচয় এখনও সেই রিলিফ কমিটির রিপোর্টের পুরনো ফাইলে পাওয়া যাবে, যদি সে রিপোর্টের ফাইল এখনও থেকে থাকে।

কোথা থেকে একটা অদৃশ্য আক্রোশের ঝড় হঠাৎ মত্ত হয়ে উঠে যেন প্রচণ্ড এক ধ্বংস আর হাহাকারের খেলা খেলে খেলে তার পর স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই ধ্বংসের কান্না আর হাহাকারের রেশ থেমে যেতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। এক বছর পরেও দেখা যেত বিধবা নারী পথের ধারের একটা ইটের স্তূপের

কাছে বসে কাঁদছে। সে নারীর স্বামীর লাস সেই ইটের স্তূপের ভিতর সমাধিস্থ হয়ে কবেই মাটি হয়ে গিয়েছে, তবু অবুঝ বিধবা যেন একটা প্রাণের সাড়া শোনবার লোভে ইটের স্তূপের কাছে বসে থাকে।

সেই সময় ক্যাপ্টেন দেবেশ মল্লিক দেওঘর থেকে শ্বশুরবাড়ির চিঠি পেয়ে চমকে উঠেছিল।—তুমি আর কোন চিন্তা করো না দেবেশ। সুলেখা ভাল আছে, বেবিও ভাল আছে।

থ্যাঙ্ক গড! বহু পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সুলেখা আর সুলেখার বেবি।

রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে মেডিক্যাল অফিসার হয়ে তখন নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের রাজমাক ফোর্টের ভিতরে, শান্ত-সুন্দর পাথুরে কোয়ার্টারের সামনে, আখরোট গাছের ছোট ছায়ার পাশে আরাম-চেয়ারে বসে বাংলা উপন্যাস পড়ছিল দেবেশ। চিঠি পড়তে পড়তে বুকটা বার বার কেঁপে উঠেছিল। কি অদ্ভুত রক্ষা। তিনটে দিন যেন একটা রসাতলের অন্ধকারে সমাধিস্থ থেকে, তারপর বেঁচে উঠে আর বাইরে এসে পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে সুলেখা আর বেবি।

সেদিনই ছুটির জন্য দরখাস্ত করতে চেয়েছিল দেবেশ। সেই মুহূর্তে ছুটে এসে একবার সুলেখার মাথায় হাত রাখতে আর বেবিটাকে কোলে তুলে নিতে মনটা ছটফট করে উঠেছিল। কিন্তু যাক, যখন বিপদ কেটে গিয়েছে, তখন আর এতটা উতলা হবার দরকার হয় না!

আর উতলা হয়নি দেবেশ। কয়েকদিন পরে সুলেখারই কাছ থেকে চিঠি এল। সে চিঠির লেখা পড়ে মনটা একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আহত হয়নি সুলেখা। না সুলেখা, না বেবি, কারও গায়ে সেই নিষ্ঠুর ভূমিকম্পের একটা আঁচড়ও লাগেনি।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ধ্বসে গেল। ইট পাথর কড়ি-বরগার একটা বিরাট স্তূপ কবরের মতো নিরেট হয়ে এতগুলি মানুষের প্রাণ চাপা দিল। তবু বেঁচে গেল সুলেখা আর বেবি! তিনটে দিন আর রাত সেই রসাতলের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে থাকতে সুলেখার বুকের পাঁজর ভয় পেয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়নি, এই তো আশ্চর্য! আরও আশ্চর্যের কথা, চিঠিতে কোন ভয়ের কথা লেখেনি সুলেখা। বরং, শেষ লাইনে যেন একটা উল্লাসের ঝঙ্কার আছে।—বললে বিশ্বাস করবে না, এই তিনটে দিন আর রাতকে তিনটে ঘণ্টার বেশি বলে মনে হয়নি। বুঝতেই পারিনি যে, তিন-তিনটে দিন আর রাত পার হয়ে গিয়েছে, এমনই

অদ্ভুত অন্ধকার! এক মিনিটও ঘুমোইনি! চোখ দুটো মাঝে মাঝে অবশ হয়ে ছিল, এই মাত্র।

পরের চিঠিতে একটা দুঃখের খবর ছিল, যে-খবর পড়ে কয়েকটা দিন দেবেশের মন বেশ বিমর্ষ হয়ে ছিল। দেবেশের কাকা আর কাকিমা খুব বেশি জখম হয়েছেন। প্রাণে বেঁচেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের বোধহয় আজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। দু'জনেই এখন মুঙ্গের হাসপাতালে আছেন। সুলেখা লিখেছে, বাবা আবার চলে গিয়েছেন মুঙ্গের। কাকা আর কাকিমাকে পাটনাতে নিয়ে যাবেন। তুমি ছুটি নিয়ে চলে আসবার চেষ্টা কর।

তারপরের চিঠিতে ভাল খবর। না, চিন্তা করবার আর কিছু নেই। কাকা আর কাকিমা সেরে উঠেছেন। হাড় ভাঙেনি। তবে, চোখের দৃষ্টির জোর কমে গিয়েছে, দু'জনেরই। ওঁরা উদ্ধার পাওয়ার আগে দুটো দিন সেই রসাতলের অন্ধকারে ছিলেন, আর তাইতেই চোখের জোর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু···

সুলেখার চিঠির শেষ লাইনে আবার একটা খুশির ঝঙ্কার আছে :—কিন্তু আমার চোখ দুটো তেমনই টনটনে আছে। আশ্চর্য!

সেই চিঠির পর একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। তারপর এই আজ। আজ আর রাজমাক ফোর্টের ভিতরে আখরোটের সেই ছায়ার কাছে বসে কল্পনায় সুলেখার আর বেবির মুখ দেখতে হচ্ছে না। পাটনাতে এসে, কদমকুঁয়ার এই বাড়িতে ঢুকে সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়েছে দেবেশ। সুলেখার কোলে বেবি, হেসে হেসে বেবির মুখটাকে দেখছে দেবেশ।

—এ কি? বেবির মুখের দিকে তাকাতেই যেন চমকে উঠেছে দেবেশ। বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছে।

হেসে ওঠে সুলেখা।—আগে একবার কাকা আর কাকিমার সঙ্গে দেখা করে নাও। চল।

দেবেশের চোখের বিস্ময়কে যেন হঠাৎ হাসির মায়া দিয়ে ভুলিয়ে অন্য দিকে টেনে নিয়ে গেল সুলেখা। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে, দোতলার একটি ঘরে ঢুকে কাকা আর কাকিমার সঙ্গে গল্প করে দেবেশ।

দোতলার একটি ঘরে বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে বেবি। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে। প্রকাণ্ড মিররটাও প্রকাণ্ড একটা আলো হয়ে ঝকঝক করছে। রাত হয়েছে অনেক।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা যায়। এতক্ষণে বেরিয়ে ফিরলো দেবেশ। গ্যারেজে

ঢুকেছে গাড়ি, তার শব্দও শোনা যায়। হাতের বই রেখে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা।

ঘরে ঢুকেই দেবেশ হাসে।—খাওয়ার হাঙ্গামা সেরে এসেছি। মোরাদাবাদ গিয়েছিলাম। বলাই-এর স্ত্রী পেট ভরে লুচি-মাংস খাইয়ে ছেড়েছে।

তারপরেই বিছানার উপর ঘুমন্ত বেবির দিকে তাকায় দেবেশ।—বেবিটা যে এত কালো হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি।

ঠিকই বলেছে দেবেশ। বেবির বয়স যখন তিন মাস, তখন ঘুমন্ত বেবির গালে চুমো খেয়ে রওনা হয়েছিল দেবেশ। পাটনা থেকে পেশোয়ার, তারপর পিণ্ডি, তারপর রাজমাক ফোর্টে গিয়ে রেজিমেণ্টাল হাসপাতালের চার্জ নিতে হয়েছিল। সেদিন বেবিটা কী চমৎকার ফুটফুটে ফরসা একটা ডলের মতো চেহারা নিয়ে ঘুমিয়েছিল! কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে কত কালো হয়ে গিয়েছে বেবি! কোথায় গেল সেই রঙ?

সুলেখা হাসে—হ্যাঁ, সত্যিই বেশ কাল হয়ে গিয়েছে বেবি।

ঘুমন্ত বেবির কাছে গিয়ে বেবির গাল টেপে দেবেশ। সুলেখা হাসে—ঘুমের মধ্যে আদর করো না। শেষে ঝগড়াটে স্বভাবের একটা ছুঁড়ি হয়ে উঠবে।

একটা সোফার উপর বসে ডাক দেয় দেবেশ—তুমি কি এখনই ঘুমিয়ে পড়বার মতলব করছো?

—না। সুলেখা হাসে আর হেসে হেসেই পট করে সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে দেবেশের পাশে সোফার উপর বসে।

—এ কি? একটু আশ্চর্য হয় দেবেশ।

সুলেখা—এই তো ভাল।

দেবেশ—অন্ধকার ভাল লাগে?

সুলেখা—হ্যাঁ।

দেবেশ—নতুন অভ্যেস মনে হচ্ছে!

সুলেখা বিব্রতভাবে বলে—অ্যাঁ? তার মানে?

দেবেশ—আগে দেখেছি, অন্ধকার সহ্য করতেই পারতে না।

সুলেখা যেন আনমনার মতো আস্তে আস্তে বলে—তা বটে।

গল্প করে দেবেশ। খৈবার পাস, আফ্রিদির উপদ্রব, আর পাখি শিকারের গল্প। তারপর একটা খুসির উচ্ছাসে হেসে ওঠে দেবেশ।—কিন্তু তোমার ভূমিকম্পের গল্পের কাছে এসব গল্পের আশ্চর্য কিছুই নয় বোধহয়।

সুলেখা বলে—হ্যাঁ।

দেবেশ—তবে বল।

দেবেশ—কি?

দেবেশ—ঐ তিনটে দিন চার-মাসের বেবিকে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ধ্বংস-স্তূপের ভিতরে আটক হয়ে থেকে, না খেয়ে · আমার মনে হয়, এই জন্যেই বেবিটা কালো হয়ে গিয়েছে?

সুলেখা বলে—হ্যাঁ। রেস্কু-পার্টি যখন ভিতরে ঢুকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এল, যখন ভাল করে চোখে দেখতে পেলাম, তখন দেখলাম, বেবিটা বেশ কালো হয়ে গিয়েছে।

—তোমার খুব দুঃখ হয়েছিল নিশ্চয়।

—অ্যাঁ? দুঃখ? না, এতে খুব দুঃখ করবার কি আছে?

দেবেশের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সুলেখা। তারপর দেবেশের কাঁধের উপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা হাঁপ ছাড়ে।—আশ্চর্য।

—কি? প্রশ্ন করে দেবেশ।

—এই যে বেবিটা কালো হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্পের মতো মনে হয়!

—গল্পের মতো?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কি করে বলব বল? মনে হয়, এইমাত্র।

কথা শেষ করেই একটু কেঁপে ওঠে সুলেখা। তারপরেই যেন নিঝুম হয়ে যায় শরীরটা।

মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে সুলেখা, কোলের বেবিকে কোলে নিয়ে আবার স্বামীর গা ঘেঁষে বসবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই সৌভাগ্যের আনন্দ যেন এতক্ষণে পরিপূর্ণ হয়ে সুলেখার চেতনায় রিমঝিম করে বাজছে। সুলেখার পিঠে হাত বোলায় দেবেশ।

কিন্তু সুলেখার এই সুখের আবেশের মধ্যে যেন একটা বোবা গল্পের বিস্ময় ছটফট করতে থাকে। সুলেখা নিজেও বোবা হয়ে আর দু'চোখ বন্ধ করে সেই গল্পের ছবিটাকে যেন সারা অনুভব দিয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু বলতে পারে না।

সবই মনে পড়ে সুলেখার। সেদিন মুঙ্গেরে পৌঁছে সূর্যকুণ্ড দেখবার কথা ছিল। মুঙ্গেরের চারুবাবু কাকা আর কাকিমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—একবার

সস্ত্রীক এসে মুঙ্গের বেড়িয়ে যাও পরেশ।

তাই, অন্য কোন কারণ ছিল না। তাই পরেশবাবু বললেন—তুমিও চল বউমা।

কাকিমা আপত্তি করেছিলেন—চার-মাসের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে সুলেখা আবার কেন ছুটোছুটি করে হয়রান হবে?

পরেশবাবু—কোন অসুবিধা হবে না। পাটনা থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত যেতে এখন ভাল সড়ক পাওয়া যাবে। নিজের গাড়িতে যাব। অসুবিধার কি আছে?

জায়গাটা বোধহয় বেগুসরাই থেকে মুঙ্গের যেতে পড়ে। একটা বাজার ছিল। আর নতুন একটা ধর্মশালাও ছিল।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে পরেশবাবু বললেন।—বিকাল পর্যন্ত এই ধর্মশালাতে একটু রেষ্ট নেওয়া যাক বউমা, কি বল? সন্ধ্যায় আবার রওনা হওয়া যাবে।

সেই ধর্মশালা। তিনতলা বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, দেখতে কেল্লার মতো বিরাট। সেদিন লোক গিজগিজ করছে ধর্মশালায়। সূর্যকুণ্ডে স্নানে যাবার জন্যই এই ভিড়।

বেবিকে ফ্ল্যানেল দিয়ে জড়িয়ে আর কোলে নিয়ে এই ধর্মশালার বারান্দাতে আস্তে আস্তে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল সুলেখা। আর, একটা ঘরের ভিতরে চৌকির উপর বসে খবরের কাগজ সামনে রেখে গল্প করছিলেন কাকা আর কাকিমা। সেই সময়···সেই ধরিত্রীর পাঁজর-কাঁপানো শিহরণ, সেই ভয়াল শব্দ, আর সেই প্রচণ্ড হাহাকার, আর্তনাদ। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো তিনতলা ধর্মশালা। প্রচণ্ড ধুলোর ঝাপটা আর অন্ধকারের মধ্যে যেন ছিটকে গেল সুলেখার প্রাণটা।

প্রথমে বুঝতেই পারেনি সুলেখা, একটা নিরেট অন্ধকারের মধ্যে মুখ থুবড়ে কেন পড়ে আছে সুলেখা? মূর্ছাটা তখনও ঠিক ভাঙেনি।

তারপরেই চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সুলেখা—বেবি, আমার বেবি কোথায়?

নিরেট অন্ধকারে ঢাকা কবরটা যেন সুলেখার চিৎকারের সঙ্গে ভয়ংকর আর্তনাদ তুলে প্রতিধ্বনি ছড়ায়। হাতড়ে হাতড়ে হাঁটতে থাকে সুলেখা। কিন্তু পদে পদে হোঁচট খায়। এগিয়ে যেতে পারে না।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেয়ালের টুকরো এদিকে-ওদিকে হেলে বেঁকে গড়িয়ে আর খান-খান হয়ে পড়ে আছে। গুমরে গুমরে একটা শব্দ ভেসে আসছে, যেন অনেক দূরে একটা বাজারের সোরগোল চাপা পড়ে আর দমবন্ধ হয়ে কান্নাকাটি

করছে।

ভয়ানক করুণ শব্দ, তবু তো জীবন্ত শব্দ। ওরই কাছে এগিয়ে যাবার জন্য ছটফট করে সুলেখা। আর, চারদিকে ছড়ানো ইটের উপর হাত রেখে রেখে ঘুরতে থাকে।—বেবি। আমার বেবি! শূন্য অন্ধকারকে যেন খিমচে খিমচে খোঁজে আর কাঁদতে থাকে সুলেখা।

হঠাৎ···যেন পাতালপুরীর একটা দানবের হাতের ছোঁয়া সুলেখার পিঠের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। সুলেখার পিঠের মাংস ছিঁড়ে নেবার জন্য পাঁচ আঙুলের নখ এগিয়ে দিয়েছে সেই দানবিক আগন্তুক।

লাফ দিয়ে সরে যায় সুলেখা। দম বন্ধ করে সুলেখা। যেন সুলেখার এই যন্ত্রণাক্ত বুকের এক ছিটে নিশ্বাসের শব্দও শুনতে না পায় দানবটা।

কিন্তু দানবের নিশ্বাস আর পায়ের শব্দ শুনতে পায় সুলেখা। সুলেখার পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে ঘুরছে দানবটা। মড়মড় করে ইটের স্তূপ বাজছে। সুলেখার রক্তমাংসের গন্ধ অন্বেষণ করছে রসাতলের সেই দানবিক আবির্ভাব। মস্ত বড় একটা ইট হাতে তুলে সেই মরণগুহার নিভৃতে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে সুলেখা।

দানবটা হাঁসফাঁস করে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সুলেখাকে খুঁজে পায় না। শুধু শুনতে থাকে সুলেখা, অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ছাড়ছে দানব।

চমকে ওঠে সুলেখা। হাতের ইট ঝুপ করে খসে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে উঠেছে এই মরণগুহার দানব।

—কে আপনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন? কোথায় গেলেন আপনি?

—আপনি কে? সুলেখার হৃৎপিণ্ডটা যেন উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে।

—আমিও আপনার মতো মরেছি।

—কি সব্বনেশে কথা বলছেন! ফুঁপিয়ে ওঠে সুলেখা।

—সত্যি মরিনি, কিন্তু মরতে হবে যে। লোকটাও চেঁচিয়ে ওঠে।

—কিন্তু আমার বেবি! সুলেখার কান্না এইবার সেই মরণগুহার সব অন্ধকার গলিয়ে দিয়ে গুনগুন করে বাজতে থাকে।

—আপনার কোলে ছেলে ছিল কি?

—হ্যাঁ।

—খুঁজেছেন?

—কত খুঁজলাম, পেলাম না!

—আপনি খুঁজবেনই বা কি করে? আপনার সাধ্যি কি? লোকটা যেন

বিচলিত স্বরে আক্ষেপ করে।

—আপনি দয়া করে একটু খুঁজবেন ?

—নিশ্চয়। লোকটা আবার হাঁসফাঁস করতে করতে, অন্ধকারের বুকের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে কোন দিকে যেন চলে যায়।

কি আশ্চর্য, এই মরণগুহার ভিতরে দাঁড়িয়ে সুলেখার মনের ভিতর থেকে মরণভয়ের ভ্রূকুটিগুলি যেন আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে। মরতে হবে, সে মরণ কি এই রকম জীবন্ত হয়ে থাকার চেয়েও অদ্ভুত। ভয় নয়, ভয় করবার মতো ভীরু জীবনটাই যেন মরে যাচ্ছে। সুলেখার প্রাণ শুধু একটি প্রার্থনা সাধছে। বেবিটাকে চাই। মরে যাবার আগে বেবিকে একবার কোলের উপর তুলে বুকের কাছে চেপে ধরতে চাই। বেবির গালে একটা চুমো দিয়ে এখানে এই রসাতলের অন্ধকারে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়লে দুঃখ কিসের ?

—আপনি আছেন ? বেঁচে আছেন ? লোকটা সুলেখার নিকটে এসে আবার হাঁক দিয়েছে।

—আছি। আপনি বেঁচে আছেন তো ? উত্তর দেয় সুলেখা।

হেসে ওঠে লোকটা—এখনও আছি।

—আমার বেবি কই ?

—এখনও পাইনি।

—তবে আশা কি নেই ? আবার ফুঁপিয়ে ওঠে সুলেখা।

—আছে। আশা ছাড়বেন না।

চলে গেল লোকটা। কিন্তু তখুনি ফিরে এসে চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনি জল খাবেন যদি, তবে এখানে এসে দাঁড়ান।

ইট তুলে নিয়ে একটা ভাঙা দেয়ালের উপর ঠক ঠক করে আঘাত করে জায়গাটাকে চিনিয়ে দেয় লোকটা।—এখানে একটা চৌবাচ্চা আছে, তাতে জল আছে। বলতে বলতে চলে গেল লোকটা।

হ্যাঁ, জল। এই রসাতলের সবই তাহলে দানবিক নয়। এখানেও জল আছে, করুণা আছে। সুলেখার কান্না শুনে বিচলিত হবার মতো প্রাণ আছে। এমন কিছু রিক্ত শূন্য আর শ্রীহীন নয় মরণময় এই অন্ধকারের সংসার। হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যেয়ে চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, জল খায় সুলেখা।

—আপনি বেঁচে আছেন ? আবার সেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। সুলেখার প্রাণের জন্য, সুলেখার ছেলেকে খুঁজে আনবার জন্য এই ধ্বংসের ইট-পাথরের ভিতর দিয়ে মাথা ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে মানুষটা, তারই কণ্ঠস্বর। সত্যিই মানুষ তো ?

—বেবি কই? চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা।

—এই নিন। এগিয়ে আসুন।

—পেয়েছেন, পেয়েছেন! রসাতলের সেই অন্ধকারের এক মহাকরুণার উপহার নেবার জন্য দু'হাত তুলে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলেখা।

লোকটার হাত থেকে বেবিকে তুলে নিয়ে বেবির বুকের উপর কান পাতে সুলেখা! তারপরেই বেবিকে বুকের উপর চেপে ধরে। চার মাসের একটা কোমল ও নরম শরীর, তৃষ্ণার্ত বেবি সুলেখার বুকের উপর মুখ ঘষতে থাকে।

সুলেখা ডাক দেয়—আপনি কোথায়?

—এই তো কাছেই আছি।

—এখানেই থাকুন।

—হ্যাঁ। আর পারি না! লোকটা যেন অলসভাবে একটা হাঁপ ছেড়ে বসে পড়ে।

—বেবিকে কোথায় পেলেন? প্রশ্ন করে সুলেখা।

—ওদিকের একটা ঘরের একটা তক্তাপোষের নিচে। কান্নার শব্দ শুনে, অনেক চেষ্টা করে ইটের রাশ ঠেলে ঠেলে, শেষে বাচ্চাটাকে ধরতে পেরেছি। কিন্তু···

—কি?

—যাক সে কথা।—এখনও বাঁচবার আশা আছে মনে হচ্ছে।

—কি করে বুঝলেন?

—ওদিকে যারা বেঁচে আছে, তারা খুব জোরে হল্লা করছে। বাইরে থেকে কাজ শুরু হয়েছে বলে ওদের ধারণা।

—কিসের কাজ?

—উদ্ধারের। কোদাল গাঁইতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উপরের ইট পাথর সরানো শুরু হয়েছে।

উদ্ধার! কথাটা যেন অবাস্তব স্বপ্নের প্রলাপের শব্দ বলে মনে হয় সুলেখার। উপরের সেই সূর্যের আলোক, গাছের সবুজ, আর ফুলের গন্ধকে এখানে বসে যে নিতান্তই পর বলে মনে হয়। এখানে এই নিরেট অন্ধকারের মরণময় মোহ তার চেয়ে কম মধুর নয়। এখানে দানবের হাতের নখ সুলেখার রক্তমাংস লুঠ করতে চায় না, কি আশ্চর্য। এইরকম দানবিক মায়ার গা ঘেঁষে বসে থাকতেই যে ইচ্ছা করে। উঠতে ইচ্ছা করে না। উপরের সূর্যালোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে এই শান্তির চোখ যে ঝলসে যাবে।

লোকটার হাতটাকে হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলেছে সুলেখা। সেই হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সুলেখা। লোকটা বলে—না, আমি আপনাকে একলা রেখে পালিয়ে যাব না। মরলে দু'জনে একসঙ্গেই মরব।

—বেশ ত! সুলেখার হাতটা কেঁপে ওঠে। লোকটার অবশ হাতটাকে আস্তে আস্তে কাছে টানে সুলেখা, যেন মরণবাসরের সঙ্গীকে একটা মধুর উত্তাপের ছোঁয়া দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চায় সুলেখা।

কিন্তু মরণগুহার বুকটাই ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ঘণ্টা বাজছে। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। আর টর্চের আলো যেন ঝাঁক বেঁধে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে।

উপরের রাবিশের স্তূপ সরিয়ে ভিতরে নেমেছে রেস্ক্যু-পার্টি। ভলান্টিয়ার আর পুলিশ আর স্কাউট।

একটা ষ্ট্রেচারও ছুটতে ছুটতে সুলেখার চোখের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়।
—চলে আইয়ে। হাঁক দেয় ভলাণ্টিয়ার।

বেগুসরাই ক্যাম্প হাসপাতালের বেডের উপর শুয়ে যখন ভাল করে চোখ মেলে তাকাবার মতো চোখের জোর পায় সুলেখা, তখন কোলের কাছে ঘুমন্ত বেবির মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। সুলেখার সেই বেবি নয় কিন্তু মানুষেরই বেবি! বেশ গোলগাল নরম-নরম আর বেশ কালো একটা চার মাসের মানুষ!

অনেকক্ষণ ধরে ভেজা চোখ নিয়ে আনমনার মতো বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলেখা। তারপর বাচ্চাটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকে।

—কি হলো? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সুলেখা? সুলেখার কপালে হাত রেখে ডাক দেয় দেবেশ।

—অ্যাঁ? তুমি কোথায়? চমকে ওঠে সুলেখা। সুলেখার বুকের ভিতর যেন অদ্ভুত এক দানবিক মায়ার স্মৃতি চমকে উঠেছে। যেন এক পরম নিবিড় অন্ধকারের সংসারে একটা প্রীতিময় হাত কাছে টেনে নিতে চায় সুলেখা।

দেবেশের হাতটাকে আস্তে আস্তে কাছে টেনে নেয় সুলেখা।

দেখতে পায় অজিত, সেই তরুণী শেষ পর্যন্ত জিনিসটা না কিনেই চলে যাচ্ছে। এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আধ পাউণ্ড রঙীন উল। দোকানদারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দরাদরি করেছে তরুণী। দাম কমাবার জন্ম বার বার বলেছে। কিন্তু দোকানদার এক পয়সাও দাম কমাতে রাজি হয় না।

দোকানের কাউণ্টার থেকে একটু দূরে সরে যায় তরুণী। হাতের ছোট ব্যাগের ভিতর থেকে টাকা আর পয়সা বের করে যেন চুপি চুপি গুনতে থাকে। গোনা শেষ হলেই তরুণীর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। দূর থেকেই কাউণ্টারের উপর পড়ে থাকা সেই আধ পাউণ্ড রঙীন উলের প্যাকেটটার দিকে তাকায়। আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে তরুণী। মনে হয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা হতাশার বেদনা হালকা করে নিল। তারপরেই দোকান ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তরুণীর গায়ে সাধারণ সাদা প্লেন শাড়ির সাধারণ সাজ। পায়ে এক জোড়া সস্তা চটি। কানে দুল আছে, দু'হাতে দু'গাছি মোটা চুড়ি আছে। কিন্তু গলাটা খালি, গলাতে কোন সোনার হার দোলে না।

এগিয়ে যায় অজিত।—আপনি কিছু মনে করবেন না, একটি কথা জানতে চাই।

তরুণী—বলুন।

অজিত—আপনি জিনিসটা না কিনেই চলে যাচ্ছেন কেন?

তরুণী—পয়সা কম পড়েছে।

অজিত—কত কম?

তরুণী—এক টাকা দু'আনা।

অজিত—আমি দিচ্ছি এক টাকা দু'আনা। আপনি জিনিসটা কিনে নিয়ে যান।

তরুণী—আপনি কেন এই উপকার করতে চাইছেন?

অজিত—উপকার করতে যে চায় সে কি কোন কারণ খোঁজে? আপনার পয়সার অভাব হয়েছে, আমার পয়সার অভাব নেই। আমি আপনাকে এক টাকা দু'আনা দিলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। অথচ আপনার উপকার হবে।

তরুণীর চোখ দুটো এমনিতেই খুব উজ্জ্বল। অজিতের কথা শুনে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এতক্ষণের গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখের উপর একটা হাসির আভাও

ফুটে ওঠে যেন। তরুণী বলে—কিন্তু আপনার এক টাকা দু'আনা ফেরত দেব কেমন করে?

অজিত—ফেরত দেবার দরকার কি? অসুবিধা থাকলে ফেরত দেবেন না।

তরুণী—না। ফেরত নেবেন বলুন, তবে আমি আপনার টাকা নিতে পারি। নইলে না।

অজিত—দেখুন, আপনাকে তো বলেইছি, আমি ফেরত পাওয়ার আশা করে আপনাকে টাকা দিচ্ছি না। অতি সামান্য, এক টাকা দু'আনা মাত্র। আমি তো সিনেমা দেখে এরকম কত এক টাকা দু'আনা খরচ করে দিই। অথচ এই এক টাকা দু'আনায় আপনার কত দরকারের কাজ হয়ে যেতে পারে।

তরুণী—না। যেমন করে পারি, টাকাটা আপনাকে ফেরত দেবই।

অজিত—আমার অনুরোধ রাখুন। সবই তো বুঝি, সাধারণ অবস্থার মানুষের সংসারে এক টাকা দু'আনা বাঁচানো কত কঠিন। আপনি অনায়াসে মনে করতে পারেন, আপনার কোন নিজেরই জন আপনাকে সাহায্য করেছে। হলোই বা অপরিচিত। তাতে কি আর আসে যায়?

তরুণী—না, আপনি ফেরত নেবেন বলুন, তবে আপনার টাকা নেব।

অজিত চেঁচিয়ে ওঠে।—কেমন করে ফেরত দেবেন? আমি কি এখানে এই দোকানে রোজই আসি, যে এলেই আমাকে দেখতে পাবেন? কিংবা আশা করেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় রোজই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবো?

তরুণী—না। আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন।

অজিত—কোথায়, কতদূরে আপনার বাড়ি?

তরুণী—বাইশ নম্বর সনাতন সরকার লেন।

অজিত—কোথায় আপনার সনাতন সরকার লেন, কে জানে?

তরুণী—এই তো এই দিকে। বাগবাজার যেতেই পড়বে।

অজিত—বস্তিটার কাছে?

তরুণী—বস্তিটা পার হয়ে।

অজিত—আজই যেতে বলছেন নাকি?

তরুণী কি যেন চিন্তা করে। অজিত বলে—ভেবে দেখুন ভাল করে। সত্যিই আজ যদি টাকা ফেরত দিতে পারেন, তবে বলুন। নয়তো অন্য কোন দিন গিয়ে নিয়ে আসবো।

তরুণী—কাল সকাল আটটায় আসতে পারবেন?

অজিত—পারবো।...আচ্ছা চলি।

২

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাইশ নম্বর সনাতন সরকার লেনের বাড়িটার কাছে যখন দাঁড়ায় অজিত, তখন চমকে ওঠে। সেই মহিলা কি তবে ঠাট্টা করে, অজিতকে জব্দ করবার জন্য পরের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সরে পড়েছে? এক টাকা দু'খানা পয়সা আত্মসাৎ করবার জন্য এ রকমের একটা ছলনা করবার কি দরকার ছিল? অজিত তো টাকা ফেরত চায়নি। কি আশ্চর্য!

অজিতের এই আক্ষেপই চমকে ওঠে আর আশ্চর্য হয়ে যায়। বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে ফটকের কাছে এগিয়ে এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সেই তরুণী—আসুন।

তরুণীর সাজ আর তরুণীর মুখের হাসি, দুই-ই এক বিচিত্র গর্বের কৌতুকে জলজল করছে।

তরুণীর আচরণে ভদ্রতা বিনয় আর সৌজন্যের কোন অভাব নেই। নিজেই নিজের পরিচয় জানায়।—আমাদের বাড়ি। আমার বাবা এম এল রায়—ব্যারিষ্টার। আমাদের বাড়ির সৌখীন চেহারা, এই ফুলবাগান, আর এই সব যে ফার্নিচার দেখছেন, এই সব-ই বাবার আর আমার রুচি অনুযায়ী হয়েছে।

চা এনে দেয় তরুণী—আমার নাম শমিতা। নিজেই বললাম, যদিও আপনি এখনও আমার নাম জিজ্ঞাসা করেননি। বোধহয় একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন, কিংবা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাননি।

হ্যাঁ, আপনার টাকাটা। বলতে বলতে উঠে গিয়ে একটা টেবিলের দেরাজ টেনে একটা একশো টাকার নোট বের করে অজিতের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় শমিতা। সঙ্গে সঙ্গে সেতারের ঝংকারের মতো শব্দ করে হেসে ওঠে।—যদি চেঞ্জ সঙ্গে না থাকে তবে চিন্তা করবেন না, নোটটা নিয়ে যান। বাকি আটানব্বই টাকা চোদ্দ আনা যে-দিন পারবেন ফেরত দিয়ে যাবেন,—যদিও ফেরত না দিলে আশ্চর্য হব না।

অজিত—কেন?

শমিতা—মনে করবো, টাকাটা আপনার দরকারে লেগেছে।

অজিত—কিন্তু ফেরত দেওয়া তো উচিত।

শমিতা—যেদিন সম্ভব হবে, কিংবা সাধ্যি হবে ফেরত দিয়ে যাবেন।

অজিত—না। বাকি টাকা আজই আপনাকে ফেরত দিতে চাই।

শমিতা—আমি কি আপনার টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য ঘরে বসে থাকবো?

অজিত—কেন? আপনিও তো একবার আমার বাড়িতে যেতে পারেন।

শমিতা ভ্রূকুটি করে—না।

অজিত—তাহলে আমিও আপনার এই এক'শো টাকার নোট নিয়ে যেতে পারবো না। হয় আমাকে আমার এক টাকা দু'আনা দিন, না হয়, দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন, আমার বাড়িতে। বাকিটা ফেরত নিয়ে আসবেন।

অজিতের পায়ের স্যাণ্ডেল, গায়ের পাঞ্জাবি আর আধ ময়লা রুমালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে শমিতা—আটানব্বই টাকা চোদ্দ আনা বাড়িতে এখন আছে তো?

অজিত—আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

শমিতা—কত দূরে আপনার বাড়ি?

অজিত—এই তো, নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের কাছে।

শমিতা—কোন্ গলিতে?

অজিত - রূপনাথ লেন, এগার নম্বর।

শমিতা—সেখানে এখন কি করে যাব?

অজিত—কেন? কিসের অসুবিধা?

শমিতা—বাবা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গিয়েছেন। সেটা না আসা পর্যন্ত…।

অজিত—আমি একটা প্রস্তাব করছি…।

শমিতা ভ্রূকুটি করে—না, আমি এই রকম সাজ নিয়ে পায়ে হেঁটে ওসব লেন ফেনের ভিতরে ঢুকতে পারবো না।

অজিত—তাহলে এখন আপনার সময় আছে বলুন। গাড়ি থাকলে যেতে পারতেন।

শমিতা—হ্যাঁ।

অজিত—আচ্ছা, আমি দেখছি। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।… আমি এখনই আসছি।

৩

বেশি দেরি করেনি অজিত, মাত্র পনর মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে ফিরে আসে। শমিতার বাড়ি থেকে শমিতাকে তুলে নিয়ে রূপনাথ লেনের এগার নম্বরের বাড়ির কাছে পৌঁছে যায়। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারও নেমে যায়। শমিতা বলে—এই প্যালেসের মতো বাড়িটা কার বাড়ি? এখানে থামলেন কেন?

অজিত বলে—এটাই যে এগার নম্বর রূপনাথ লেন।

শমিতা চমকে ওঠে—তার মানে?

অজিত হাসে—এটা আমাদেরই বাড়ি। এই গাড়িটা আমার নিজের ব্যবহারের জন্য। বাবার জন্য আরও দুটো আছে। ঈশ্বরী কটন মিলের নাম শুনেছেন?

শমিতা—হ্যাঁ।

অজিত—ওটা আমাদেরই মিল।...হ্যাঁ আসুন!

বাড়ির ভিতরে ঢুকে যে ঘরের ভিতরে বসে শমিতা, সে ঘরের মেঝের গালিচার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, এই ফার্নিচারের দাম কম করেও তিন হাজার টাকা হবে।

চা-এর যে-সব সরঞ্জাম টেবিলের উপর সাজিয়ে দিয়ে গেল বয়, সে-সব খাঁটি রূপোর জিনিস। রূপোর কাপ, ডিস, প্লেট।

চা-খাওয়া শেষ হবার পর শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুভাবে হাসতে থাকে অজিত। এক মিনিটের জন্য ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার ফিরে এসেই অজিত বলে।—বড় অসুবিধা হলো। আপনার একশো টাকার নোটের চেঞ্জ সত্যিই দিতে পারছি না।

শমিতা—কিসের অসুবিধা?

একগাদা নোট পকেট থেকে বের করে অজিত, বলে—এই সবই হাজার টাকার নোট!

অজিতের মুখে হাসি; সে হাসিও কৌতুকের সুখে অস্থির হয়ে কাঁপছে।

শমিতার চোখ দপদপ করে জ্বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

অজিত—নিশ্চয়।

শমিতা—রতন কটন মিল নামে যে মিলটা আছে, সেটা কেমন মিল?

অজিত—বেশ ভাল, খুব বড় মিল।

শমিতা—আপনাদের ঈশ্বরী মিলের চেয়ে অনেক ছোট বোধহয়?

অজিত—না না, এ বিষয়ে আপনার কোন ধারণা নেই। রতন মিলের তুলনায় আমাদের ঈশ্বরী মিল তো শিশু। কোথায় ঈশ্বরী মিলের সাত লাখ টাকার ক্যাপিটাল, আর কোথায় রতন মিলের একুশ লাখ টাকার ক্যাপিটাল।

শমিতা—রতন মিলের মালিক অবনীবাবুকে চেনেন?

অজিত—চিনি।

শমিতা—তাঁর ছেলে সরোজকে চেনেন?

অজিত—চিনি বৈকি। অবনীবাবুর একমাত্র ছেলে সরোজ। ঐ মিল তো

এখন সরোজেরই সম্পত্তি। সরোজই দেখাশোনা করে।...কিন্তু আপনি ওদের চিনলেন কেমন করে?

শমিতা হাসে—চিনি, চেনাশোনা হয়েছে। সরোজবাবুকে দেখতে আপনার চেয়ে অনেক সুন্দর বলে আমার ধারণা।

অজিত—তা তো নিশ্চয়। সরোজের মতো সুপুরুষের সঙ্গে আমার তুলনা করাই হাস্যকর।

শমিতা—সরোজের সঙ্গেই আমার বিয়ে, খুব সম্ভব এ মাসেরই একটি দিনে।

শমিতার মুখে এবার কৌতুকের হাসিটা যেন শিউরে শিউরে জ্বলতে থাকে। আর অজিত একেবারে সুস্থির হয়ে বসে শমিতার জীবনের এই অহংকারের উল্লাস সহ্য করতে থাকে।

—যাক, এখানে অনেক সময় নষ্ট হলো। হেসে হেসে উঠে দাঁড়ায় শমিতা।

অজিত বলে—হ্যাঁ চলুন।

নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে শমিতাকে আবার বাইশ নম্বর সনাতন সরকার লেনের সৌখীন বাড়িতে পৌঁছে দেয় অজিত।

গাড়ি থেকে নামবার আগে হাসিমুখে ভদ্রতা করে শমিতা।—আপনি কি নামবেন না? আর একবার কষ্ট করে এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যেতেন।

অজিত—না। চা খাওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু...।

শমিতা—কি?

অজিত—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শমিতা—বলুন।

অজিত—আপনাদের এই বাড়িতে আসবার পথে, ঐ মোড়ের কাছে যে ঝাউঘেরা একটা বিলিতি স্টাইলের বাড়ি দেখলাম, ওটা কার বাড়ি জানেন নিশ্চয়?

শমিতা—জানি বৈকি। রিটায়ার্ড সিভিল-সার্জেন বিকাশ মল্লিকের বাড়ি।

অজিত—ও বাড়ির কারও সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

শমিতা—বিকাশ মল্লিকের মেয়ে কবিতার সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে।

অজিত—কবিতা মল্লিক নিশ্চয়ই দেখতে আপনার মতো এত সুন্দর নয়?

শমিতা—ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছি! যে কারণেই হোক, মনে মনে বোধহয় ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

অজিত—ঠাট্টা করছি না। একটুও রাগ করিনি আমি। শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার চেয়ে দেখতে বেশি ভাল কি কবিতা মল্লিক?

শমিতা—শতমুখে স্বীকার করবো, কে না স্বীকার করবে, কবিতা মল্লিকের রূপের তুলনা হয় না। আমার চেহারার সঙ্গে কবিতার চেহারার তুলনা করলে কবিতাকে অপমান করা হয়। কিন্তু...।

কথা থামিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে শমিতা। অজিত বলে—কি বলছিলেন?

শমিতা—কবিতার সঙ্গে কি আপনার চেনাশোনা আছে?

অজিত—আছে।

শমিতা—কিরকম চেনাশোনা?

অজিত—কবিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেতে পারে, এই রকম।

শমিতা—তার মানে?

অজিত—তার মানে, বোধহয় এই মাঘ মাসেই বিয়েটা হবে। সব ব্যবস্থা এক রকম ঠিক হয়েই আছে।

শমিতা মুখ ফিরিয়ে নেয়, গাড়ি থেকে নেমে তরতর করে হেঁটে বাড়ির ভিতরে চলে যায়।

আর, অজিতও অনায়াসে গাড়ি স্টার্ট করে সনাতন সরকার লেনে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায়।

৪

সেই দোকান। সেই দোকানদার। আর দোকানের সেই কাউণ্টার। প্রায় একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, তারপর এই দোকানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অজিত।

সেই রকমই এক বছর আগের সন্ধ্যার মতো একটি আলো-ঝলমল সন্ধ্যা। কয়েকটা জিনিস কেনবার আছে। এই দোকানটাতে পাওয়া যাবে সে-সব জিনিস। তাই দোকানের ভিতরে ঢুকে খরিদ্দারের ভিড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে অজিত।

চমকে ওঠে অজিত! কি আশ্চর্য, এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়! শমিতাও দাঁড়িয়ে আছে—কাউণ্টারের ঐ দিকে। কি-যেন কিনতে চাইছে শমিতা। কিন্তু দোকানদার দর কমাতে চায় না।

দেখতে পায় অজিত, এক কৌটা মাখন কিনতে চায় শমিতা। কিন্তু কিন্তু। শমিতা যেন আর অজিতকে দেখতে না পায়। শমিতার চোখের সামনে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে নিজেকে যেন একটা লঘু ছায়ার মতো লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে অজিত। কিন্তু এরই মধ্যে, শমিতার মুখ দেখে একটা ধারণা করে ফেলেছে অজিত। মনে হচ্ছে, আজও বিয়ে হয়নি শমিতার।

আড়াল থেকেই দেখতে পায় অজিত, শমিতা তার হাতের ব্যাগ খুলে পয়সা গুনছে। তার পরেই হতাশভাবে আনমনার মতো অন্যদিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবছে।

আজও কি পয়সা কম পড়েছে শমিতার? হতে পারে। কিন্তু আজ যেন আর অজিতকে দেখতে না পায় শমিতা। ভিড়ের মধ্যে মুখটাকে আরও ভাল করে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে অজিত।

কিন্তু দেখে ফেলেছে শমিতা। কি আশ্চর্য, একেবারে অপলক চোখের বিস্ময় নিয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে কি যেন সন্দেহ করছে শমিতা। বোধহয় ধারণা করছে যে, অজিত আবার সেই রকমই ভয়ানক ভুল করে শমিতাকে সাহায্য করতে চাইবে।

কিন্তু সে ভুল আর করতে পারে না অজিত। সে ভুল আর অজিতের পক্ষে সম্ভবই নয়। শমিতার ধারণা করা উচিত যে, আবার ভুল করে শমিতার কাছে অপমানিত হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে না অজিত। সে কাণ্ডজ্ঞান অজিতের আছে।

কিন্তু এ কি! শমিতা সত্যিই কিছু বলবে বলে কাছে এগিয়ে আসছে!

অজিতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে শমিতা বলে—দু'টো টাকা দিন।

অজিতের গলা আর্তনাদের মতো কেঁপে ওঠে।—কি বললেন?

শমিতা—দুটো টাকা দিন। কিন্তু জানবেন, টাকা ফেরত দেব না।

অজিত করুণভাবে তাকিয়ে থাকে—দুটো টাকা হবে না। সামান্য কয়েক আনা খুচরো সঙ্গে আছে।

শমিতা হাসে—আপনার পকেটে সামান্য কয়েক আনা? অদ্ভুত ব্যাপার!

কথাটা বলেই দোকানের সিঁড়ি ধরে নেমে ফুটপাতের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এক মনে চলতে থাকে শমিতা। অজিত ডাকে—শুনুন!

এগিয়ে যায় অজিত। শমিতা হাসে—আপনি খুব রোগা হয়ে গিয়েছেন দেখছি।

অজিত—আপনার মুখের রং এরকম ময়লা হয়ে গেল কেন? কোন অসুখ করেছিল?

হেসে ফেলে শমিতা—হ্যাঁ।

অজিত—কি অসুখ?

শমিতা—অভাব।

অজিত—তার মানে!

শমিতা—ঠাট্টা করছি না অজিতবাবু। বাবার জন্য এক কৌটা মাখন

কিনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলো না। বাবা অসুস্থ।

অজিত—আপনার কথা শুনে আমার একটা ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

শমিতা—কি সন্দেহ, বলুন।

অজিত—সত্যিই অভাব?

শমিতা—ঠিক ধরেছেন। সে বাড়ি, সে গাড়ি, আর সে শমিতাও নেই অজিতবাবু।

অজিত যেন অনেক চেষ্টা করে একটা কুণ্ঠা জয় করে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে—রতন মিলের সরোজ কি বলে?

শমিতা হেসে ওঠে—শমিতার বাবা হঠাৎ গরীব হয়ে যাবার পর শমিতার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ করে, আর ভয় পেয়ে সরোজ নীরব হয়ে গিয়েছে। শমিতাকে বিয়ে করতে সাহস পায়নি।

অজিত—কেন? কি সন্দেহ করলো সরোজ?

শমিতা—সরোজের সন্দেহ, অজিতের সঙ্গে নাকি গোপনে প্রেম আছে শমিতার।

—শমিতা! আস্তে আস্তে, যেন বিপুল এক অভ্যর্থনার আবেগে ডাক দেয় অজিত।

শমিতা—বলুন।

অজিত—তুমি বোধহয় এখনো আমাকে ঠিক চিনতে পারছো না শমিতা।

শনিতা—একথা কেন বলছেন?

অজিত—আজ তোমাকে দু'টো টাকা দিতে পারলাম না কেন বলতে পার?

শমিতা—সঙ্গে নেই বলে।

অজিত—না, সঙ্গে নেই, বাড়িতেও নেই। নগদ দুটো টাকা আজ এই সময় আমার জীবনের মধ্যেই নেই শমিতা।

শমিতা—কি অদ্ভুত কথা বলছেন?

অজিত—বাবার মৃত্যু হয়েছে। বাবার সব সম্পত্তি আমার সৎমা পেয়েছেন।

শমিতা—কেমন করে?

অজিত—নকল উইলের জোরে। সৎমার সঙ্গে মামলা লড়তে গিয়ে আমার নিজের নামে যা কিছু ছিল সবই খুইয়ে বসে আছি। এখন আমি জোড়াসাঁকোর হাইস্কুলের মাস্টার।

কেঁদে ফেলেছে শমিতা। দেখতে পায় অজিত, শমিতার ভেজা চোখের উপর আলো চিকচিক করছে।

শমিতা বলে—আপনার কবিতা মল্লিকের কি হলো ?

অজিত হাসে—সেটা কি আর বলে দিতে হবে ?

শমিতা—আপনার ওপর একটুও মমতা হলো না কবিতার ?

অজিত—না।

শমিতা—কারণ কি ?

অজিত—কারণ হলো তুমি। ···বাবা মারা যাবার পর যখন মেসে থাকি, তখন কবিতার সঙ্গে একদিন শেষ দেখা করে চলে এলাম। কবিতা বললে, শমিতার মতো মেয়েকে গাড়িতে নিয়ে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় যে, শমিতাকে ভালবাসে যে, তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

শমিতা—এ রকম মিথ্যে কথা কেন বললে কবিতা ?

অজিত—বোধহয় খুব বেশি মিথ্যে কথা বলেনি কবিতা।

শমিতা—তাহলে শুনুন···।

অজিত—বলুন।

শমিতা—বললে বিশ্বাস করবেন কি ?

অজিত—হ্যাঁ !

শমিতা—সরোজের সন্দেহও নিতান্ত মিথ্যা নয়।

মাথা হেঁট করে শমিতা। শমিতার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকার পর অজিত ডাকে—শমিতা।

শমিতা—বলুন !

অজিত—এখন কি নিজেকে সত্যিই একলা মনে হচ্ছে ?

শমিতা—না।

অজিত—কেন ?

শমিতা—তুমি যে কাছে রয়েছ।

কর্ণফুলির ডাক

বোমা পড়েছে দেড় হাজার মাইল দূরে জোহারবারুর জাঙ্গাল আর সিঙ্গাপুরের জাহাজ ঘাটায়। হাজার লোকের জীবন্ত ধড় ছিটকে পড়লো হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে।

মামারবাড়ির গাঁ সম্পর্কে এক দিদিমাকে শেয়ালদার ট্রেনে তুলতে এসে ধ্রুবেশ এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। পালাচ্ছে সবাই—ছেলে, মেয়ে, জোয়ান,

বুড়ো সবাই,—সবজাতের লোক। আধমরা, উদ্‌ভ্রান্ত, ফ্যাকাশে সব চেহারা। চোখ ঠিকরে পড়ছে, হিসেবের ঠিক নেই—কাশছে, হাঁপাচ্ছে, চীৎকার করছে।

ভয় পেলে পালায় সবাই। শিকারীর গুলীর আওয়াজে হরিণের পালও ভয়ে ছুটে পালায়। নদীর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ছোট ছোট জলস্রোত ডিঙিয়ে, হঠাৎ ডাইনে, হঠাৎ বাঁয়ে মোড় ঘুরিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো দাপিয়ে চলে যায় তারা। অন্তরঙ্গতার ছন্দে বাঁধা সে ভয়ও কত সুন্দর, কত বেগবান।

আর এখানে? যাত্রী নেবার জন্যে একটা স্পেশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এসে ঠেকলো। বাতিক মানুষের পাল কুৎসিত গর্জনে ভূতের ঢিলের মতো এলোপাথাড়ি ছিটকে পড়লো আবার। কামরার দরজায় দরজায় সুরু হলো হুল্লোড় হাতাহাতি!

সেকেণ্ড ক্লাসের দশাও তাই। ভীড় ঠেলে দিদিমাকে নিয়ে কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ধ্রুবেশ। হঠাৎ পেছন থেকে সুটকেশ কাঁধে নিয়ে এক ভদ্রলোক হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কনুইয়ের একটি ধাক্কায় দিদিমাকে বসিয়ে দিল সেই-খানেই। ধ্রুবেশ তার গলাটা টিপে ধরবার আগেই কামরার আরোহীদের ভীড়ে লোকটা ছারপোকার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়িতে। ঝি বটার মা ছিল ভাল। বেঁকে বসলো এবার। সে এখন দেশে চলে যাবে। কোঁদল করে ধ্রুবেশ ও রমাকে অস্থির করে তুললো। তার পাওনা পয়সাকড়ি আজই মিটিয়ে দেওয়া হোক। তাকে বোঝাতে গিয়ে হার মানলো ধ্রুবেশ। ভদ্রাভদ্র কত লোকের মুখে বটার মা সেই গোপন কথা শুনে ফেলেছে—জাপানীরা এসে গেছে, মেয়েমানুষের ছদ্মবেশে। কাল রাত্তিরে তাদের ক'জনকে চকোত্তিবাবুদের আমবাগানে দেখা গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর কাছেই কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

বটার মা রইল না।

হরবিলাসবাবুর বাড়ি। অতি দূর সম্পর্কে ধ্রুবেশের মামা। বড়লোক এবং বাড়িওয়ালা। পথে যেতে সন্ধ্যেবেলা ধ্রুবেশ হঠাৎ এসে ঢুকলো।

হলঘরে জাজিমের ওপর হরবিলাস মামার চারটি ঘরজামাই চারকোণে তাকিয়া আঁকড়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছে। স্বয়ং মামা একটা নতুন বাড়ির নক্সা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

ধ্রুবেশ একটু বিস্মিত হয়েই বললো, 'এ কী? আপনারা এখনও আছেন!'

মামা, 'কেন বলতো?'

'—যুদ্ধ, চারদিকে পালাবার হিড়িক, সিঙ্গাপুরে বোমা পড়েছে!'

মামা তাকিয়ে রইলেন। ঘরজামাই চারজন চারকোণ থেকে আস্তে আস্তে

মাথা তুলে তাকালো। শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, ধ্রুবেশের কথাগুলিকে তারা যেন দেখছে। নির্বিকার নির্লিপ্ত অতি প্রশান্ত সাদা সাদা চোখ।

চাকরে একটা পাথরের বাটিতে মধু-মকরধ্বজ নিয়ে এল। মামা চাটতে চাটতে বললেন, 'দিদিমণিকে বলে দাও রাত্তিরে লুচি খাব।'

ধ্রুবেশ আবার যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে এল। '—যুদ্ধটা সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে খুব।'

কোন লাভ হলো না। জোড়া জোড়া সাদা চোখগুলি তেমনি তাকিয়ে রইল। মোহেঞ্জোদড়োর হাঁড়িতে কবর দেওয়া হাজার বছরের বাসি মড়ারা যেন তাকিয়ে আছে।

ধ্রুবেশ অগত্যা উঠলো। এরা কিছুরই ধার ধারে না। এই পরমাণুর জগৎ যদি ভেঙে গলে একটা নীহারিকার আবর্ত তোলে, তবু মামা নিশ্চয় তাঁর বাড়ি ভাড়া আদায় করে যাবেন আর রাত্তিরে লুচি খাবেন।

বেরিয়ে আসার সময় চোখে পড়লো অফিস ঘরে খাতাপত্র নিয়ে বসে আছে লক্ষ্মী মুহুরী। ধ্রুবেশ গিয়ে যুদ্ধের কথা পাড়লো।—'কি ভাবছেন লক্ষ্মীবাবু, যুদ্ধ যে এসে পড়লো!'

বুড়ো শকুনের মত চিঁ চিঁ করে লক্ষ্মী মুহুরী বললো, 'মরি এখানেই মরবো।'

এ হেন জীবকে আর ঘাঁটাতে ইচ্ছে হলো না ধ্রুবেশের। মুরছিত জনে ঘাতন নহে সমুচিত। এ তো ঘায়েল হয়েই গেছে, পালাবার শক্তিও এর নেই।

এই সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত কলকাতার মধ্যে সনাতনবাবুর বৈঠকখানা নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় গুলজার হয়ে ওঠে আর মাঝরাত্রে ভাঙে। রাজনীতি আলোচনার সঙ্গে পাশা চলে। এখানে ভাগ্যের চালই বড় কথা। কখনো রাজনীতি পাশাকে জমিয়ে দেয়, কখনো পাশা জমায় রাজনীতিকে।

ধ্রুবেশ আসে মাঝে মাঝে। যুদ্ধের কথা ওঠে, আর সনাতনবাবু সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় সব সেরে দেন।—'আমি লিখে দিচ্ছি, কিছু হবে না। মিছেই লোকগুলো পালাচ্ছে—যত মাথা খারাপের দল।

ধ্রুবেশ, 'কেন বলুন তো? জাপানীরা এতদূর এগিয়ে আসতে পারবে না?'

'—না, সে কথা বলছি না।'

'—তবে কি, সিঙ্গাপুর থেকেই ওরা মার খেয়ে ফিরে যাবে?'

'—না, তা নয়।'

'—তবে কি?'

'আমি বলছি কিছু হবে না—কিস্যু হবে না।'

এই বাঁকা ঠোঁটের ভণিতা নিয়েই সনাতনবাবু মশগুল হয়ে আছেন। সুখে আছেন।

অন্নদাচরণ মেমোরিয়াল স্কুলের ইতিহাসের মাষ্টার। বেতন চল্লিশ টাকা। ক্ষুৎপিপাসায় চৌচির সংসারের ময়দানে ক্লান্ত সওয়ারের মতো ধ্রুবেশ চলেছিল আর পাঁচজনেরই মতো। কিন্তু এটাই তার পরিচয়ের সব নয়। সে ইতিহাসের মানুষ। যে মানুষের মনের বনের শাখায় পৃথিবীর সুখদুঃখের পাখীর দল কলরব করে ফেরে। প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামে সুন্দর এই পৃথিবীর রূপের বালাই নিয়ে সে এক এক সময় মুগ্ধ হয়ে যায়। যে দ্বন্দ্বের মহিমায় হিমগিরি আকাশ ছুঁয়েছে, ধানের ক্ষেত হয়েছে সবুজ, চেতনার রঙে রাঙা হয়ে উঠলো মানুষ। যে পরিবর্তনের স্রোতে পদার্থ গলে গিয়ে হলো প্রবৃত্তি—সুখের হাসি বিরহের বেদনা। মানুষ যেখানে স্বয়ং বিধাতা হয়ে আপন পরিণাম গড়ে তোলে আপন হাতে।

স্কুলে আরও মাষ্টার আছে। পরীক্ষায় পাশ করার গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি শেখায় ছাত্রদের। তাদের সুনামও আছে, মাইনে পায় বেশি। ধ্রুবেশ দত্ত ছাত্রদের শোনায় শিয়ালকোটের খুলির কথা। কী কাহিনী লেখা আছে সেই হাড়ের ঠিকুজির জীর্ণ একটা পাতায়। আমাদেরই এক দুর্দান্ত বন্য পিতামহের কাহিনী। কে ছিল সে? সে ছিল সৈনিক, গুহার মুখে দাঁড়িয়ে পাথরের লগুড় নিয়ে যে লড়েছে বাঘ ভালুকের সঙ্গে—প্রাণ দিয়েছে। সেই সুমহৎ উৎসর্গের সঞ্চার ভেসে এসেছে হাজার বছরের বাতাসে। বর্তমানে আমরা তাই মহত্তর।

ধ্রুবেশ তাই একটা টিউশনিও পায় না। সাবধানী ছেলের বাপেরা ওসব কথা পছন্দ করে না।

রমা টুটুকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। প্রতিবেশী দীনুবাবুর বাড়ির সবাই দেখা করে গেল রমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তারাই ধৈর্য ধরে টিকে ছিল, কিন্তু আর সাহস হয় না। পাড়া একেবারে খালি। তবে দীনুবাবু স্বয়ং থাকবেন একটি চাকর নিয়ে। কারণ তাঁর চাকরী আছে আর চাকরীটা ভালই।

দীনুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আমরা চললুম রমা। হারাধন জ্যোতিষী বলেছে যা হবার তা তিন মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। এ কটা মাস তাই দেওঘরে কাটিয়ে দিয়ে আসি। বীণার বিয়ের তারিখটা তাই পিছিয়ে দিলাম।'

রমা, 'আমাকে একা রেখে সবাই তাহলে চললেন মাসীমা?'

বীণা রমার কানে ফিস ফিস করে বললে, 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না বৌদি?'

রমা মুখ টিপে হাসলো।—'সত্যি কথা শুনবে? তোমার দাদাকে একা রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না।'

কথাটা দীনুবাবুর স্ত্রীর কানে এল। উত্তর না দিয়ে পারলেন না। গলার স্বরে রাগের ঝাঁজ বেশ বোঝা যায়।—'যাবার জায়গা থাকলেই লোকে যায়। কাছে থাকতে চায় না কে? তবে আপদের সময় ঘাড়ে না চেপে পুরুষ মানুষকে একটু হাল্কা করে দিলে সাধ সোহাগ আর জন্মের মতো পুড়ে কিছু যায় না।'

দীনুবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন।

মাসীমার কথার আঘাতটা খুব সোজা আর স্পষ্ট। রমার অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই, এ সত্য সে নিজে জানে, মাসীমারাও জানেন।

মা নেই, বাপের একমাত্র মেয়ে রমা। রমার বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই বাপ সন্ন্যাস নিয়ে সরে গেছেন সংসার ছেড়ে। বাহির নেই বলেই হয়তো তার ঘরের মায়া এত বেশি। মাসীমার কথার নিষ্ঠুর সত্যটা ছুরির মতো সে সাধের প্রত্যয় কেটে ছিঁড়ে দিলে। চুপ করে বসে রইল রমা।

বোমা পড়েনি, তবু স্কুলগুলি ভেঙে গেল। ছাত্রেরা বাপমার হাতে ধরে চলে গেল যত আপদহীন রাজ্যে। মাষ্টারীগিরি ঘুচে গেল ধ্রুবেশের।

সত্যি কথা বলতে গেলে এ দুর্ঘটনায় ধ্রুবেশ দমে গেল অনেকখানি। কারণ রমা আর টুটুর কথা বড় বেশি করেই মনে পড়ে। ঘর নিয়ে পড়েছে রমা—সোণার খাঁচা গড়ার আনন্দে সে বিভোর। টুটু এই তো ছ'মাসও পার হয়নি। রমা এরই মধ্যে টুটুকে রাজা করবার প্ল্যানও তৈরী করে ফেলেছে—টুটুর খাওয়াপরা ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে সুরু করে বিয়ে পর্যন্ত। কিন্তু এই আত্মারামের খেলার জিবনকাঠি যে মাষ্টারি চাকরিটা, তাই হঠাৎ ভেঙে গেল। ধ্রুবেশের দুঃখ এইখানে।

চাকরি গেছে। শুধু এই কথাটা জানিয়ে দিয়ে ধ্রুবেশ বাইরে বেরিয়ে গেল। এই ছোট কথাটা রমার চোখের সামনে নেচে বেড়ালো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো। টুটুর গায়ে হাত রেখে রমা কেঁপে উঠতে লাগল বার বার।

চাকরি গেছে, তবু বর্তমানে ধ্রুবেশের কাছে এটাই একমাত্র সত্য নয়। টালিগঞ্জের ছোট বাসাবাড়ির ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় তার চোখে সে ছবি ভেসে ওঠে—লিবিয়ার মরুবেলায় উদ্যত সঙ্গীনের ঝলক। শোনা যায় খারকভের কঠিন তুষারে লক্ষ পায়ের পথচলা ধ্বনি। মন্থিত প্রশান্ত সমুদ্রে আহত ক্রুজারের গর্জন, মহাদেশের পথে পথে ট্যাঙ্কের ক্রেঙ্কার, আকাশে বোম্বারের গুরুগুঞ্জন।

এ এক অভিনব অর্কেস্ট্রা—নবযুগের ভোরের কাকলি।

স্বার্থে ও সর্বার্থে সংঘাত বেধেছে। এই অভ্যুদয়ের যজ্ঞে পুড়ে যাচ্ছে জাতি-বাদ, অর্থনীতির অনর্থ, প্রতাপের মূঢ়তা, পরস্ব শোষণের রসনা। সাম্রাজ্যের চর্বি গলে যাচ্ছে। ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্তি স্পর্ধার চূড়া।

ধ্রুবেশের মন প্রাণ ঘিরে অদ্ভুত এক অনুভবের রোমাঞ্চ লাগে।

রমা চা এনে দিল ধ্রুবেশের সামনে। নিজেও মুখ ভার করে বসে রইল কাছে। হঠাৎ একটা এরোপ্লেন খুব নীচু দিয়ে পেঙিয়ে উড়ে গেল—পাখার ঝাপটা যেন গায়ে লাগল তাদের। রমা চমকে উঠলো। দু'জনেরই চোখে পড়লো—টুটু হাত পা ছুঁড়ছে আর হাসছে।

ধ্রুবেশ হেসে ফেলে টুটুকে কোলে তুলে নিলে। দুদিনের কথা না বলার গুমোট এতক্ষণে যেন হাল্কা হলো খানিকটা। রমা জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি কিছু ভাবছো না?'

'—ভাবছি বৈ কি?'

রমার সন্দিগ্ধ মুখে দ্বিতীয় প্রশ্ন আর এল না। সত্যিই যদি সে জানতে পারে, ধ্রুবেশ চাকরির কথা ভাবছে, তবে তার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু এই মানুষটিকে সে কতকটা চেনে। এখুনি খবরের কাগজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ক'বছর আগে ঠিক এই রকম স্পেনযুদ্ধের ভূতে পেয়েছিল ধ্রুবেশকে। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতো। এক এক সময় ঘুমোত না। বিছানা ছেড়ে সারা রাত ঘরের ভেতর পায়চারী করতো।

ধ্রুবেশ বেরিয়ে গেল। ফিরবে হয়তো রাত্রি একটায়।

পথে নীতিশের সঙ্গে দেখা। একগাদা পোষ্টার বগলে নিয়ে চলেছে নীতিশ। ধ্রুবেশকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো—যেন পলাতক আসামীকে হাতের নাগালে পেয়েছে।

'—বাঃ ধ্রুবেশদা, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হায়রাণ। বেশ ডুব দিয়ে আছেন। আপনারা এ সময় সরে থাকলে আমরা একা কি করে সামলাই বলুন তো?'

'ব্যাপার কি তোমাদের?'

'—কাল সন্ধ্যেয় পার্কের সভায় অবশ্য আপনাকে আসতে হবে। আমরাই উদ্যোগী আপনাকে কিছু বলতেও হবে।'

ধ্রুবেশ যেন তাই খুঁজছিল। সুযোগ পেয়ে খুসিও হলো খুব। নীতিশকে জানিয়ে দিল—'আমি বলবো বটে, তবে আগেই জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আমার

মনের কথা মন খুলে বলবো। তোমাদের মতো করে হয়তো বলবো না। তাতে আপত্তি নেই তো?'

নীতিশ হেসে সায় দিয়ে বললে, 'আচ্ছা তাই বলবেন।'

রমার পৃথিবী খুবই ছোট। টালিগঞ্জের গরীবপাড়ায় দু'ঘরওয়ালা একটা বাসাবাড়ি। বছর তিন আজ তাদের বিয়ে হয়েছে। ধ্রুবেশকে সে ভালবাসে নিজের চেয়ে অনেক বেশি। শেষে এল টুটু—নতুন স্বপ্নের রঙ লাগলো রমার জগতে। কত তৃপ্তি কত নিদ্‌হারা উদ্বেগ। দিনরাত শুধু খাটতে ইচ্ছে করে। সংসারের জন্যে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে।

অকস্মাৎ এল আঘাত। এত বড় পৃথিবী পড়ে রয়েছে—সেখানে—বড় বড় সাধু, বড় বড় লোভ আর পাপ। সেখানে লাগুক না যুদ্ধের আগুন। ছোট ছোট সুখদুঃখে ধুকপুক করছে পাখীর নীড়ের মতো রমার এই জগৎ। তাকে না ভেঙে ছিঁড়ে ফতেজঙ্গদের হানাহানি কি চলতো না? যুদ্ধের নাম শুনলে রমার সকল মন বিরূপ হয়ে ওঠে। রমার কাছে ঘর-ভাঙানিয়া এ যুদ্ধ ঘোর শত্রু।

আর ধ্রুবেশের মনে লাগে অদ্ভুত এক সুরেলা উল্লাস। ধ্রুবেশের কাছে যে যুদ্ধ যেন যুগ-গড়ানিয়া তীর্থংকর। সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে—ট্রামে বাসে জনসভায়। দেশনেতাদের বিবৃতি পড়ে। ছাত্র ও শ্রমিকদের ইস্তাহার পড়ে। শোভাযাত্রা দেখে। পোষ্টারের ছবি আর লেখাগুলির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কে কী বললে? কারা বুঝেছে এ মহাযুদ্ধ মহাপরিণামের পূর্বগামিনী ছায়া। কারা কাজের কথা বলছে। কারা জেগে আছে।

সমস্ত দিন চাকরীর চেষ্টায় ঘোরা আর সন্ধ্যেয় কার্জন পার্ক—শুয়ে পড়লেই নেশাতুর হয়ে আসে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম। পার্কের ঘাসে এক রকম ক্লান্তিহরা তন্দ্রার আমেজ আছে যেন।

মনে পড়ে যায়, দূর চট্টগ্রামের এক নগণ্য পাড়াগাঁ—বিরাজপুর। কতদিন সে দেশছাড়া, ঘরের ভিটেয় হয়তো কাঁটাবন আর সজারু বাসা বেঁধেছে। ছেলে বেলায় সেই সাধের বিরাজপুর জলের দাগের মতো মিলিয়ে গেছে আজকের কর্ম কোলাহলে মুখর দিনের চিন্তা থেকে।

বিরাজপুর—যেখানে সহরের মতো ঘড়ির কাঁটায় জীবন চলে না। যেখানে প্রহরে প্রহরে কর্মের ঘণ্টা বাজে না। খালের জলে ছোট ঢেউগুলি আস্তে ওঠে, আস্তে ভাঙে। কামার স্যাকরার হাতুড়ি ধীরে ধীরে ওঠে পড়ে, চাষীরা জিরিয়ে

জিরিয়ে লাঙ্গল ঠেসে—তামুক খায়। নির্বেগ মান্দাক্রান্তা জীবন।

মনে পড়ে স্কুলের পাশ ঘেঁসে জেলাবোর্ডের কাঁচা সড়ক। জোয়ারের জলে খাল টলমল করে। কাঠের পুল থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া—নতুন মাছের আনন্দের মতো ক্রীড়া-চঞ্চল কৈশোরের দিনগুলি।

গাঁয়ের কাউকে সে চেনে না। কিন্তু এখনো চিঠি আসে মাঝে মাঝে।

'..... শুনেছি বড় হয়েছ, চাকরী করছ, বিয়ে করেছ। দেশের ছেলে দেশে একবার এলে কি তার মানহানি হবে? এস নিশ্চয়, আসছে বৈশাখে আমের সময়। বউমাকে নিয়ে এস। সকলেই তাকে একবার দেখতে চায়। ইতি—উত্তরের বাড়ির জ্যেঠামশায়।'

ধ্রুবেশ চেষ্টা করেও চিনতে পারে না—কে ইনি। এত আপনার জনের মতো ডাকে।

গাঁয়ের স্কুলের ছেলেরা চিঠি দেয়—'আপনার একটা বাণী পাঠাবেন নিশ্চয়। একটা হাতের লেখা পত্রিকা বার করেছি আমরা। অনেক আশায় অপেক্ষা করে রইলাম। ইতি—কিশলয় সংঘ।'

ধ্রুবেশ অবাক হয়ে ভাবে—কোথা থেকে তারা ঠিকানা যোগাড় করে, এত খোঁজ রাখে। ঘরের ছেলে পৃথিবীর মেলায় হারিয়ে যাবে, এটা যেন তারা সহ্য করতে পারে না। প্রস্তর যুগের পূর্বপুরুষের অনাবিল গোষ্ঠী-স্নেহের রেশ যেন আজও এই গেঁয়ো প্রীতির গায়ে লেগে আছে, ঝরা ফুলের গন্ধের মতো।

এত ভুলে থাকা উচিত হয়নি—ধ্রুবেশ মনে মনে লজ্জিত হয়ে ওঠে।

পার্কের সভায় ভীড় হয়েছে খুব। মণ্ডপ উছলে জনতা রেলিং পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে। শত শত লাল নিশানে লেগেছে ঝড়ো হাওয়ার পুলক।

ধ্রুবেশ দাঁড়ালো।

'বন্ধুগণ। আজ এক ঝড়ের রাত্রে আমরা সবাই এখানে মিলেছি। শতাব্দীর এই পরম লগনে দুরূহতম কর্তব্যের ডাক এসেছে আমাদের কাছে। আজকের এই সভা—এক যোদ্ধার ছাউনিতে আমরা সবাই দাঁড়িয়েছি। আমরা সবাই—

'নিধিরাম!'

সভার পেছন দিকে এক কোণ থেকে বিদ্রূপের বিষে ভরা ভারিগলায় কে একজন বলে উঠলো। হাসির সোর পড়ে গেল চারদিকে। দু'জন ভলান্টিয়ার হাত যোড় করে বললো, 'মশাই, ও রকম করবেন না দয়া করে।'

ধ্রুবেশের শান্ত কণ্ঠস্বর প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে বেজে উঠলো 'বন্ধুগণ, আমরা সবাই সৈনিক। আমরা ভারতবাসী। ইতিহাসের পাতা খুলে দেখুন, যুগে

যুগে আমাদের ওপর কত আঘাত এসেছে। শত্রুর সঙ্গে, ধ্বংসের সঙ্গে কখনো আমরা আপোষ করিনি। নিরন্তর সংগ্রামে উদ্দাম সে ভারতের ইতিহাসকে আমরা স্মরণ করি। আমরা ভুলিনি হূনহিংসার মিহিরকুল এখানে এসে কূল পায়নি। কুশান ধনুর্ধরের তুণীর পুড়ে গেছে ভারতের বিপ্লবী গণশৌর্যের আগুনে।'

'জয়। হিন্দু ধরম কি জয়!' সভার মাঝখানে একদল লোকের উল্লাস শোনা গেল। বিরক্তিভরা ধ্রুবেশের কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়ে উঠলো। '—না কখনো না। আমি সে কথা বলছি না। বলুন গণসংগ্রামের জয়।'

আরম্ভ হলো গোলমাল। বিক্ষুব্ধ একদল লোক মারমূর্তি হয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ আরম্ভ করলো। তারপর ধিক্কার দিয়ে চলে গেল সভা ছেড়ে।

'বন্ধুগণ। ভেবে দেখুন কোথায় আমরা আজ দাঁড়িয়েছি। পঙ্কিল বন্যার মতো শত্রুর অভিযান দেশের মাটি ভাসিয়ে দিতে আসছে! শত পুরুষের নিঃশ্বাসে সুরভিত এ মাটির প্রতিটি কণিকা। কোথায় সরে যাব আমরা?'

আবার যেন কারা কর্কশ চীৎকারে একটা হুল্লোর মাতিয়ে তুললো।— 'জয়তু অভ্যুদিত এশিয়া!'

ধৈর্য হারিয়ে ধ্রুবেশ চীৎকার করে উঠলো।—"জয়তু অভ্যুদিত মহামানব। জয়তু অভ্যুত্থিত বিশ্বগণদেবতা। এসিয়ার নাম নিয়ে যারা গর্জন করছে, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। এই একচক্ষু হরিণের বিজ্ঞতা নিয়ে তারা নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

এপাশ ওপাশ থেকে উত্তেজিত প্রতিবাদের রব উঠতে লাগলো। ঝপ করে একটা থান ইট এসে সজোরে লাগল ধ্রুবেশের ডান হাতে!

বক্তৃতা মঞ্চের টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়ালো ধ্রুবেশ।—'কোন হুংকার টিটকারী আর থান ইট আমায় দমাতে পারবে না। এইখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ লোকের সামনে আমি বলবো—আমার দেশের ওপর হাতিয়ার হাতে যারা চড়াও করতে আসছে, তারা শত্রু, নির্জলা নিছক ষোল আনা শত্রু। তারা বিংশ শতাব্দীর নতুন গরল। তাদের ভাণ্ডার ভরে আছে স্তূপীকৃত চিতাকাষ্ঠে। তারা আসছে ব্যাবিলনের প্লেগের মতো নতুন করে রাজ্য জনপদ ছারখার করতে, মুখে তাদের ভুয়ো মুক্তির স্তোকবাণী—রাংতা মোড়া ইস্পাতের হাতকড়া নিয়ে আসছে তারা।'

ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির পর প্রতিবাদীর দল সভা ছেড়ে চলে গেল। আবার শান্ত হলো সভা।

আবেগে উত্তেজনায় ধ্রুবেশের গলা ভেঙে আসছে।—'বন্ধুগণ, এ গরীবের

ডাক শুনুন। আত্মশক্তি মাথার মাণিক হারিয়েছিলাম আমরা। আজ এসেছে ডাক, ভয় ভাঙার সাধনার, শঙ্কাহরণ ব্রতে। আপনাদের চোখে সেই মশালের দ্যুতি দেখছি আমি। এই মুক্তি কাল রজনীর তিমিরপথের যাত্রীদের ঐ একমাত্র সম্বল।'

করকাপাতের মতো করতালির শব্দ। এক অপূর্ব চাঞ্চল্যের লহর সভার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে গেল।

'—শ্মশান ঘাটের সিঁড়ির মতো আগন্তুকের পদাঘাতের ক্ষত নিয়ে আমরা কি যুগ যুগ ধরে স্তব্ধ হয়ে থাকবো ? কখনই নয়। আপনাদের সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে আমি সেই অনাগত ভবিষ্যতের ছবি দেখছি। ধীরে শান্ত হয়ে আসবে এই মুখর মৃত্যুর আসর। আমাদের আত্মোৎসর্গে উজ্জ্বল সেই নতুন প্রভাতে মুক্ত মানবতার মিছিল পথ ধরে আসবে।'

সভা ছেড়ে কিছু দূর চলে আসার পর ধ্রুবেশ একবার ফিরে তাকালো। জনসমুদ্রের গহন থেকে একটা জলস্তম্ভ উঠে যেন মহারোলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। —'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' হাজার হাতের বজ্রমুষ্টি দুলছে ভৈরব গর্বে।

দেশের শ্রদ্ধাস্পদ ছিল যারা, যাদের কাছে দুটো ভরসার কথা শোনবার জন্যে—কাজের ইসারা, পথের দিশা পাবার জন্যে লোকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, তারা দিনের পর দিন বিবৃতি দিচ্ছে।—'এ যুদ্ধে আমাদের কিছু করবার নেই। এ বৃটিশে জাপানে যুদ্ধ। ভারত নিরপেক্ষ।'

ধর্মতলার এক চায়ের কেবিনে বসে পরিচিত অপরিচিত কত লোকের মুখে ধ্রুবেশ মন্তব্য শোনে।—কিছু করবার নেই। বাদপ্রতিবাদে কুতর্কের ঝড় ওঠে। ধ্রুবেশের এক একবার মনে হয়—কিছু একটা বলি। সোজা একটা প্রশ্ন করি, 'ভারতবর্ষ কার দেশ ?'

সেদিন প্রশ্নটা তুলেই বসলো। তার আগে সংকোচে, আশংকায় বার বার বুক ছম্ ছম্ করে উঠেছে—কী জানি, সত্যিই যদি সেই নিদারুণ বিপরীত কথাটা এরা বলে ফেলে।

হলোও তাই। একবাক্যে তারা জানিয়ে দিল।—'কি করে আর আমাদের দেশ বলি মশাই। দেশের জন্যে ভালমন্দ দুটো কাজ করার কতটুকু অধিকার ওরা দিয়েছে ? আমাদের কিছু করবার নেই।'

কেবিন ছেড়ে পথে নেমে ধ্রুবেশের মনে হলো সমস্ত সহরটা যেন ভেঙে চুরে কুৎসিত হয়ে গেছে। ঘরবাড়ীগুলো পুরোনো উইঢিবির মতো। ছন্নছাড়া পোকামাকড়ের মতো মানুষগুলি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ পথে পথে নিরুদ্দেশের মতো ঘুরে রোদে মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। টালিগঞ্জ পৌঁছতে তখনো মাইল দুয়েক বাকী। এতটা বিমর্ষ জীবনে সে কদাচিৎ হয়েছে।

শ্মশানের শান্তি খুঁজছে সবাই, ইতিহাসের বাণী এখনও এদের কাছে হৃদয়ের সত্য হয়ে ওঠেনি। এরা খুঁজছে এড়িয়ে যাওয়ার পথ। সর্বনাশা ক্লৈব্যবাদকে এরা কত রকমারি বচনে ফাঁপিয়ে রেখেছে। ধ্রুবেশের মনে হলো, মথুরার সেই কণিষ্কের মুণ্ডহীন প্রকাণ্ড মূর্তিটা, গোদা গোদা পা দিয়ে সারা দেশের বুক মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রমা ধৈর্য হারিয়ে বসেছিল। এখন বেলা দেড়টা, তবু ধ্রুবেশের দেখা নেই। প্রশ্ন না করলে আজকাল কোন কথা বলে না। চাকরীর খোঁজ যে কতখানি হচ্ছে, তা রমা এখানে বসেই আন্দাজ করে নিতে পারে।

ঘরে ঢুকলো ধ্রুবেশ। রমা বললো, 'কটা যুদ্ধ জয় করে এলে?'

রমার কথার উত্তর না দিয়ে ধ্রুবেশ জামা ছেড়ে গামছা নিয়ে স্নানের জন্যে বারান্দার গিয়ে দাঁড়ালো। টবে এক কোঁটা জল নেই। কাছেই রাস্তার ধারে একটা টিউবওয়েল আছে। ধ্রুবেশ স্নানের জন্যে বাইরে চলে গেল।

টবে জল নেই। এটা রমারই ভুল। তবু এই ভুলটার নিষ্ঠুরতা আজ রমার চোখে এমন কিছু ঠেকলো না। একজন ঘুরে বেড়াবে ব্যোম ভোলানাথ হয়ে, ঘরের কথা ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে। সে একা আর করবে কত? শূন্য থালায় সে অন্ন সাজাতে পারে, অন্ন ফলাতে পারে না।

রমা সবকিছু সহ্য করতে পারে, শুধু ধ্রুবেশের এই পরম নির্লিপ্ততাটুকু ছাড়া। স্বচক্ষে দেখছে—দিন দিন দৈন্য ঘনিয়ে উঠছে। শ্রীহারা হতে চলেছে সংসার। যুদ্ধ নিয়ে তার যত চিন্তা উদ্বেগ, তার এক কণাও যদি ঘরের জন্যে থাকতো তবে এ রকমটা হত না। আজ দু'মাসের ভেতর দু'জনের মধ্যে একটা ভালবাসার কথা দূরে থাক, ভাল কথাও হয়নি।

ধ্রুবেশ স্নান সেরে এসে রান্নাঘরে ঢুকলো। খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। এটা না থাকলেও অবশ্য সে আজ আশ্চর্য হতো না। রমা বসে বসে সব ব্যাপার লক্ষ্য করলো। তারপর দেখলো ধ্রুবেশ গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো মাদুরের ওপর, খবরের কাগজে চোখ ঢাকা দিয়ে।

রমা আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়ালো। ঝগড়া করতে নয়, তবে অনেক কিছু সে আজ মন খুলে বলে যাবে।

রমা ডাকলো, 'শুনছো?'

'—হ্যাঁ।'

'—টুটুর দিকে আজকাল তুমি তাকিয়েও দেখ না। এ কি করছ তুমি? তুমি নয় বাইরে যুদ্ধ করছো, এদিকে একা এ ঘরের যুদ্ধে আমি যে আর টিঁকতে পারি না। টুটুর কি হবে, সেকথা একবার তোমার ভাবনায়ও আসে না কি?'

ধ্রুবেশ বললো, 'কাজ করতে পারবে?'

'—কি?'

'—বেনারসে এক জমিদারের বাড়ি রাঁধুনীর কাজ আছে। খাওয়া-পরা আর মাইনেও পাবে। তা হলে আমাকে বাদ দিয়ে তুমি তো টুটুর ভার নিজেই নিতে পার। আমি না হলে তোমার চলবে, কিন্তু টুটু না হলে চলবে না।'

কথাগুলো এক ঝাপ্টা উত্তপ্ত কাঁকরের মতো রমার মুখে এসে যেন লাগলো।

'—তুমি পুরুষ হয়ে একথা মুখে আনলে?' ধ্রুবেশের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলো রমা। আগুন-লাগা ঘরের জ্বালায় চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে নিল ধ্রুবেশ।

উদ্‌বৃত্ত যা কিছু ছিল টেনে টেনে একটা মাস চলেছে। গয়লা ফিরে গেল দোর থেকেই দুধের কলসী দেখিয়ে। মাসকাবারী ব্যবস্থা করতে সে রাজি নয়। রোজ নগদ-নগদ কিনতে হবে। এ-বাড়িতে কপাল-ভাঙাদের ক্ষুধা এবার খুব ভালভাবেই পাকিয়ে উঠেছে। গয়লার সজাগ কারবারী চোখে সে রহস্য ধরা পড়তে দেরি হয়নি।

দু'গাছা সোনার চুড়ি বেচে দিল রমা।

সন্ধ্যেবেলা ধ্রুবেশ বাইরে বের হবার উদ্যোগ করছে। চায়ের জন্যে আজকাল আর অপেক্ষা করতে হয় না। সব খবরই সে রাখে।

যাবার সময় পেছন থেকে রমা ডাকলে, 'শুনছো? টুটুর জন্যে এক গজ ফ্লানেল নিয়ে আসবে আজ।'

এও একটা অঙ্কুশের আঘাত—ঘরের দায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এক গজ ফ্লানেল কিনে আনবার শক্তি যে আজ হারিয়েছে তার চিন্তায় বড় বড় কাজের কথা শোভা পায় না। এই সার সত্যটি রমা ধ্রুবেশকে বুঝিয়ে দিতে চায়। রমা আজকাল জেনে শুনে এই শেষ উপায় ধরেছে। যদি কিছু হুঁস হয়।

অন্যদিনের মতো সকালবেলা চাকরীর খোঁজেই বার হয়েছিল ধ্রুবেশ।

সনাতনবাবুর বৈঠকখানা থেকে সুরু করে অনেক জায়গা। আজ সে ফিরেছে এক বেদনাকর হতাশ্বাসের বোঝা নিয়ে। অপমানের তালিকা পূর্ণ হয়েছে এবার।

ধর্মতলার চায়ের দোকানে ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো দু'চারজন, 'স্পাই, স্পাই।'

নীতিশ বললো, 'ধ্রুবেশদা, আপনি নাকি আমাদের বিদ্রূপ করেছেন। আমরা নাকি শুধু কাঠপুতুলের খেলা দেখাচ্ছি?'

অনেকে অনেক কিছু বলতে আরম্ভ করেছে তার সম্বন্ধে—কেউ প্রকাশ্যে কেউ আড়ালে। কারু কাছে সে ইংরেজের পা-চাটা, কেউ এক আঁচড়ে বুঝে ফেলেছে—প্রচ্ছন্ন পাতিবুর্জোয়া। অনেক ক্রিটিকের চোখ আবার এক্সরের মতো—তারা দেখেছে ধ্রুবেশের ফুসফুস-ভরা নিপ্পনপ্রীতির রস।

কিছু আসে যায় না এতে। কিন্তু চারদিকের এই সব উপসর্গ দেখে সত্যই সব উৎসাহ শিথিল হয়ে যায়। জ্ঞানী-গুণী থেকে আরম্ভ করে ঝি বটার মা পর্যন্ত—সকলের চিন্তা এক সুরে বাঁধা। যুদ্ধের পরে কে কি করবে, কি পেতে হবে—এটাই একমাত্র সমস্যা। সকলে ঝুড়ি ঝুড়ি কর্তব্য আর দাবীর পসরা মাথায় নিয়ে বসে আছে—যুদ্ধের পরে। মাসীমা যুদ্ধের পরেই বীণার বিয়ে দেবেন। পেট্রিয়টেরা যুদ্ধের পরে এক হাত লড়বেন—যারা জিতবেন তাদের সঙ্গে। মহাবণিক সঙ্ঘ আজ থেকেই ছটফট্ করছে যুদ্ধের পরে কে কত বড় কারবার ফলাবে।

ধ্রুবেশ বাইরে যাবার পরে রান্নাঘরে বসে রমা কেঁদেছে। ধোঁয়ার জন্যে নয়, অভাবের জন্য নয়, ধ্রুবেশের গৃহবৈরাগী আচরণের জন্যে নয়।

রমার নিজের চোখেই আজ পড়েছে তার স্বার্থপর মনের পরিচয়। শুধু টুটু আর টুটু—টুটুর প্রয়োজনের কাছে পৃথিবীর কোন প্রয়োজনের যেন তুলনা হয় না। টুটুর মানুষ হবার পথে দিনরাত শুধু পাথর ভাঙতে থাকবে—এই জন্যেই কি ধ্রুবেশকে তার প্রয়োজন? এ ছাড়া কি ধ্রুবেশ আর কিছু নয়?

ধ্রুবেশ ঘরে ফিরতে রমা ভাল করে তাকিয়ে দেখলে—অনেক রোগা হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ হয়তো তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু তা না করে ঘরের ভেতর চলে গেল আর ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে।

এক গেলাস সরবৎ নিয়ে এসে বললো, 'জিরিয়ে এটা খেয়ে নাও।'

আজ যা পারলো একটু ভালো করেই রাঁধলে রমা। তার আচরণের নির্লজ্জ ক্রূরতাগুলি একে একে তাকেই পাল্টে আঘাত করে যাচ্ছে। বার বার চোখে

আঁচল দিল রমা।

স্নানের জল এগিয়ে দিয়ে বললো, 'পা দুটোর চেহারা হয়েছে কি ? ভাল করে সাবান দাও।' শেষে ধ্রুবেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজেই সাবান দিয়ে ঘসে মেজে দিল।

দুপুরে ধ্রুবেশ ঘুমিয়েছিল, রমা পাশে বসলো পাখা নিয়ে। মুখে হাত বুলিয়ে দেখলো—গাল ভেঙে গেছে, চোয়ালটা হাতে ঠেকে।

টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রমা একমনে বাতাস করে যায়।

কেন জানি মনটা আজ বেশ শান্ত ছিল—বর্ষাধোয়া গাছপালার মতো।

সেই কলকাতার সন্ধ্যা। কার্জন পার্কের ঘাস নরম বিছানার মতো আরামে ক্লান্ত শরীরটা ঘিরে ধরেছে। আলো-আঁধারী কলকাতার প্রাণ ঠুং-ঠাং করে বাজছে আরতির ঘণ্টাধ্বনির মতো।

চীৎকার করে একটা ছেলে পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। একটা কাগজের হকার। মনের অন্ধকারের কবর থেকে এক এক করে নিস্পন্দ শায়িত মূর্তিগুলি নড়ে চড়ে উঠে বসলো। হকার ছেলেটা চীৎকার করে হাঁকছে বিকালের টাট্‌কা খবর—চটগ্রামে বোমা পড়েছে—বোমা পড়েছে চটগ্রামে।

হুড়োহুড়ি আরম্ভ হলো কাগজ কেনা নিয়ে। ধ্রুবেশও হাতে পেল একটা। একরকম দৌড় দিয়েই সে এসে দাঁড়ালো একটা ল্যাম্প পোষ্টের কাছে।

দম বন্ধ করেই ধ্রুবেশ পড়লো। সামান্য বাহুল্যহীন কয়েক লাইনের একটা খবর।—তারা এসেছে। বোমা পড়েছে চট্টগ্রামে। লোক মরেছে, লোক ঘায়েল হয়েছে।

তারা এসেছে। কর্ণফুলির জলে পড়েছে তাদের কুৎসিত কালো ছায়া। পূব আকাশের তারার গায়ে কালি মাখিয়ে দেখা দিয়েছে খলস্ফুলিঙ্গের দল।

ধ্রুবেশ কাঁপছিল থরথর করে। দাঁতে দাঁত পিষে যাচ্ছিল।......কে এরা? দেশের মাটিতে আগুন ছড়ায়।

বিশ্ব ইতিহাসের সব লেখা ছাপিয়ে সোনালী আখরে ঝিলিক দিয়ে উঠলো একটি মাত্র নাম—বিরাজপুর। কর্ণফুলির জ্বালাভরা জলের ঢেউ অসহায়ের মতো ডাকছে করুণস্বরে। তাও শুনতে পাওয়া যায়।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসলো রমা। ধ্রুবেশ আসেনি। পিলসুজের আলোর শিখাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীল হয়ে আছে। কতগুলি বাদলা

পোকা আলোতে পুড়ে পুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

টুটু ঘুমোচ্ছে অঘোরে। জানালাটা খুলে রমা বাইরের দিকে তাকালো। ব্ল্যাকআউটের রাত্রি—এক অগাধ শব্দহীন কাজলসমুদ্রের তলায় সারা কলকাতা যেন ডুবে রয়েছে।

ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, অভিমান নয়। শান্ত চোখ দু'টোতে তবু দু'ফোঁটা জল দেখা দিয়েই হাওয়ায় শুকিয়ে গেল। সকলেই ঘরে রয়েছে আজ, শুধু সে ছাড়া। থাক্, কেঁদে তার পেছু ডেকে আর লাভ নেই। সে থাকবে না, সে থাকতো না। সে যে ইতিহাসের মানুষ—এতদিনে হয়তো সে হাতের কাছে পেয়েছে তার জীবনের পারানি নৌকার হাল।

শান্ত হয়ে চোখ বুজে বসেছিল রমা। তাকাতেই দেখলো ভোর হয়ে এসেছে। একজোড়া স্পিটফায়ার গোঁ গোঁ করে উড়ে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। টুটু হাসলো আবার! তাকে কোলে তুলে নিল রমা। তার বুকের গোকুলে বড় হয়ে উঠবে যে মানুষের ভবিষ্যৎ।

আস্তে আস্তে চোখ মুদে আসছিল রমার, ধীরে মাথাটা ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে—প্রণাম।

এ প্রণাম তাদেরই উদ্দেশ্যে, মাটির মান বাঁচাতে জীবনপণে দাঁড়ালো আজ যারা। কালনাগের মতো দুস্‌মনের পথ রুখে দাঁড়ালো যে নওজোয়ানের দল। বিরাজপুরের ধূলিকুটিমে যে হার-না-মানা অবুঝেরা নিজের হাতে সাজিয়ে রাখলো ভয়াল মরণবাসর। শত্রুর চণ্ড অভিযান থমকে যাবে নিশ্চয়, ঐ কাঠের পুলের কাছে—অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। আর শতাব্দীর সিঁথির মতো বিরাজপুরের ঐ সড়কে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে বুলেটের আঘাতে শতদীর্ণ এক ইতিহাসের মাষ্টারের শোণিতাক্ত চুম্বন।

নি ত সিঁ দু র

এই পথে আসতে যেতে অনেকবার দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। ট্রামে বাসেও কতবার। আর, এই যক্ষ্মা হাসপাতালের ফটকেও। শুধু মুখচেনা পরিচয়। একটা বছরের মধ্যে অনেকবার মুখোমুখি দেখা হলে যতটুকু পরিচয় হয়, ততটুকু। দু'জনের মধ্যে কোনদিন কোন আলাপ, কিংবা সামান্য দু-একটা কথারও বিনিময় ঘটেনি।

কিন্তু অনুমানে দু'জনেই দু'জনের ভাগ্যের একটা বেদনার পরিচয় বুঝে নিতে

পেয়েছে। ধারণা করতে পারে প্রভাত, এই হাসপাতালের কোন কেবিনের বিছানায় এমন কেউ একজন আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন, যিনি এই মহিলার কোন আপনজন হবেন। সুমিত্রাও অনুমান করতে পারে, ভদ্রলোক এখানে নিশ্চয় এমন কোন রোগীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন, যিনি ভদ্রলোকের কোন আপন-জন, কিংবা প্রায় আপনজনের মতো কেউ একজন হবেন।

পরিচয় হলো সেদিন, যেদিন দেখতে পেল সুমিত্রা, সেই চেনামুখ অথচ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সুমিত্রারই পরিচিত পুরনো বান্ধবী অঞ্জলি হাসপাতালের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অঞ্জলিই পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোক হলেন অঞ্জলির দাদা প্রভাতকুমার বরাট। জীবন বীমা কোম্পানির অর্গানাইজার। এতদিন আসাম সার্কেলের চার্জে ছিলেন, কিন্তু বউদির অসুখ হবার পর বাধ্য হয়ে আর চেষ্টা করে কলকাতার অফিসে ফিরে এসেছেন।

—নিরুপমাকে মনে আছে তো সুমিত্রা?

—হ্যাঁ।

—সেই নিরুপমার দিদি শোভাদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে এবং একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে সুমিত্রা—কি অসুখ শোভাদির?

কোন কথা না বলে, শুধু চোখের ইসারায় বিরাট হাসপাতাল বাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি।

অঞ্জলির দাদা প্রভাত বরাটের দু'চোখের দৃষ্টিও যেন হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। পাতা ঝরে গিয়েছে, রিক্ত হয়ে গিয়েছে ফটকের কাছের যে কৃষ্ণচূড়াটা, সেটারই দিকে তাকিয়ে আনমনার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাত বরাট।

—দাদা?

অঞ্জলির ডাক শুনে মুখ ফেরায় প্রভাত।

সুমিত্রার পরিচয় শোনাতে থাকে অঞ্জলি—এ হলো আমার বন্ধু সুমিত্রা। এক কলেজের একই ক্লাসের বন্ধু। আমার যেদিন বিয়ে হয়েছে, সেদিন সুমিত্রারও বিয়ে হয়েছে।

আরও অনেক কথা বলে অঞ্জলি, তাই জানতে পারে প্রভাত; অঞ্জলির বান্ধবী এই মহিলা হলেন সুমিত্রা ঘোষ। সুমিত্রার স্বামী লোকেন ঘোষ ইকনমিক্সের ভাল স্কলার, কলেজের লেকচারার। আর সুমিত্রা ঘোষ নিজেও মেয়ে-স্কুলের টিচার। বেশ আছে ওরা দুজন; স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে মিলে লেখাপড়ার চর্চা করে বেশ সুখেই আছে।

—কিন্তু ··· । কি-যেন সন্দেহ করে সুমিত্রার মুখের দিকে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যায় অঞ্জলি।

—কি বলছিলে? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—তুমি এখানে কেন? ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে অঞ্জলি।

—উনি যে এখন এখানেই আছেন।

কথাটা বলেই মাথা হেঁট করে সুমিত্রা। বেদনাতুর মুখের একটা দুঃসহ বিষাদের ছায়া যেন লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে সুমিত্রা। গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি। আর, প্রভাতের উদাস চোখের দৃষ্টিও করুণ হয়ে যায়।

সেদিনের পর অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। প্রভাত বরাট আর সুমিত্রা ঘোষের মুখোমুখি দেখাও হয়েছে অনেকবার। ট্রামে বাসে বা পথে, আর হাসপাতালের এই ফটকের কাছেও কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আর তো সেই অপরিচয়ের বাধা নেই। এখন দেখা হলে দু'জনের মধ্যে দু'চারটে প্রশ্নের বিনিময় হয়েই থাকে, কুশল প্রশ্ন নয়, দুটি উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের করুণ প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করে প্রভাত - এখন কেমন আছেন মিষ্টার ঘোষ?

সুমিত্রা—আছেন একরকম।

প্রভাত—কিছুটা উন্নতি নিশ্চয় হয়েছে?

সুমিত্রা—উন্নতির কোন লক্ষণ তো দেখছি না।···· শোভাদি কেমন আছেন?

প্রভাত—ভাল হয়ে যেতে পারে বলে আশা করতে পারা যাচ্ছে, এই মাত্র।

[দুই]

আজকাল আসবার সময় যদি ট্রামে বাসে বা পথে কোথাও দেখা হয়ে যায়, তবে বাকি পথটুকু দু'জনে একসঙ্গেই গল্প করতে করতে পার করে দিয়ে হাসপাতালের ফটকের কাছে এসে একবার থামে। —আচ্ছা আসি। সুমিত্রা চলে যায়, পূবের ওয়ার্ডে দিকে।

—আসুন। প্রভাত চলে যায় পশ্চিমের ওয়ার্ডের দিকে।

চলে যাবার সময় যদি ট্রামে বাসে বা পথে কোথাও দেখা হয়ে যায়, হাসপাতালের ফটকে কিংবা ঢাকুরিয়া বাজারের বাস স্টপের কাছে, অথবা যাদবপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, তবে বাড়ি ফেরবার বাকি পথের অনেকখানি দু'জনে একসঙ্গে গল্প করতে করতেই পার হয়ে যায়।

শ্যামবাজারের পাঁচ-রাস্তার মোড়ে এসে সিঁথির বাস ধরবার জন্য উত্তর দিকে

এগিয়ে যায় সুমিত্রা, আর, দমদমের বাস ধরবার জন্ত পুবদিকে এগিয়ে যায় প্রভাত।

—সিঁথিতে কোথায় থাকেন আপনি? জিজ্ঞাসা করে প্রভাত।

সুমিত্রা—জয় দত্ত ফার্স্ট লেন।

প্রভাত—আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

সুমিত্রা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চেষ্টা করে বলে।—হ্যাঁ···আর বলবেন না! এই বাড়িটাই তো···।

প্রভাত—কি বলছিলেন?

সুমিত্রা—কত আশা করে, কত চেষ্টা করে, এই বাড়িটাকে উনি কিনলেন। কিন্তু একটা মাসও এই নতুন কেনা বাড়িতে থাকবার সৌভাগ্য ওঁর হলো না। বাড়িটাকে কেনবার পনর দিন পরেই ওঁর এই কালব্যাধিটা ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে গেলেন।

আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পায় না প্রভাত। সুমিত্রা ঘোষের ভাগ্যের পরিহাস আরও কত নির্মমতা করে রেখেছে কে জানে। প্রশ্ন করলেই যদি শুধু এরকম এক-একটা দুঃসহ দুঃখের আর যন্ত্রণার কথা শুনতে হয়, তবে প্রশ্ন না করাই ভাল। প্রভাত বলে—আচ্ছা আমি এবার আসি।

সুমিত্রা—আপনি দমদমে বোধহয় অনেকদিন আছেন?

প্রভাত—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—দমদমে কোথায়?

প্রভাত—বললে চিনবেন না। একটা নতুন রাস্তা, রাম রায় স্ট্রীটে আমার বাড়ি।

সুমিত্রা—আপনার নিজের বাড়ি নিশ্চয়।

প্রভাত—হ্যাঁ, তবে কি জানেন—

কথা থামিয়ে হেসে ফেলে প্রভাত, একটা করুণ আক্ষেপের হাসি।

—কি বলছিলেন? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

প্রভাত বলে—একটা আধখানা বাড়ি।

সুমিত্রা—তার মানে?

প্রভাত—বাড়িটা মাত্র অর্ধেক তৈরী হয়ে উঠলো, বাস্···শোভাকে এই ভয়ানক রোগে ধরলো। শোভাকে হাসপাতালে ঠাঁই নিতে হলো। কাজেই ···আর কি দরকার বলুন···শোভা যদি ভাল না হয়ে উঠতে পারে, তবে এই আধখানা বাড়ি অমনি আধখানা হয়ে পড়ে থাকবে। বাকিটুকু আর তুলবোই না।

সুমিত্রা—ভাল হয়ে যাবেন, নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবেন শোভাদি। আপনি এত হতাশ হয়ে পড়বেন না।

প্রভাত—সত্যি কথা কি জানেন? আমি সত্যিই হতাশ হইনি, যদিও ডাক্তারদের কথা থেকে বুঝতে পারি যে ওঁরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন।

মনে হয় সুমিত্রার, সন্ধ্যার আলোকের মেলা, আর যান ও জনতার অফুরান আনা-গোনার এই বিপুল হর্ষময় উৎসবের মধ্যে যেন একেবারে একলাটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাত বরাট নামে এই ভদ্রলোক। ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছেন। তবু অদ্ভুত একটা আশার জোর যেন চিকচিক করে জ্বলছে প্রভাত বরাটের দুই চোখে। একটা বিষণ্ণ স্নিগ্ধতা।

সুমিত্রা বলে—আপনি তো তবু একরকম ভাল আছেন। আশা নেই জেনেও আশা করতে পারছেন। আপনার মনের জোর আছে। কিন্তু আমি···আমি যে দিনগুলি সহ্য করতেই পারছি না।

কেঁদে ফেলে সুমিত্রা। চোখের উপর রুমাল চেপে চোখের জল চেপে রাখতে চেষ্টা করে।

বিচলিত হয় প্রভাত—এ কি করছেন, ছিঃ।

চোখ মুছে নিয়ে সুমিত্রা বলে—ডাক্তাররা বলছেন বটে যে, যদিও অবস্থা সিরিয়াস, তবু একেবারে হতাশ হবারও কারণ নেই। কিন্তু আমি যে কিছুতেই আশা করতে পারছি না প্রভাতবাবু।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রায় একটা ধমক দিয়ে ওঠে প্রভাত বরাটের গলার স্বর। —এত দুর্বল মন হলে চলে না। খুব ভুল করছেন আপনি। আবোল তাবোল ভেবে মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। ডাক্তাররা যখন বলেছেন যে আশা আছে, তখন নিশ্চয় আশা আছে। হতাশ হবার কোন অধিকারই আপনার নেই।

পথের পাশের একটা দোকানের আলো-ঝলমলরঙীন চেহারার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। প্রভাতের সান্ত্বনাময় ধমক খেয়ে যেন শান্ত হতে চেষ্টা করছে। সব বিষাদ জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে চাইছে সুমিত্রার চোখ। কিন্তু ইচ্ছে করলেও পারছে না বোধহয়। প্রভাত বরাট দেখতে পায়, মহিলার চোখে যেন একটা স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা ছলছল করছে।

প্রভাতের গলার স্বর এইবার নরম হয়ে যেন সান্ত্বনার সুরে গলে যায়।—

মিষ্টার ঘোষ নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

—চলি এবার। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই সিঁথির বাস ধরবার জন্ত এগিয়ে যায় সুমিত্রা। প্রভাতও রাস্তার ওপারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। দমদম যেতে আপত্তি করবে না তো ট্যাক্সিটা?

[তিন]

হাসপাতালের একটি কেবিন। বিছানার উপর বসে আছে প্রভাতের স্ত্রী শোভা। জীর্ণ-শীর্ণ ও ধুকপুকে একটি শরীরে আলোয়ান জড়িয়ে শুধু সাদাটে মুখখানি কোনমতে বাতাসের বুকে ভাসিয়ে রেখেছে শোভা। মাথার রুক্ষ চুল ফেঁপে রয়েছে। আর সিঁথির উপর ছড়িয়ে রয়েছে এক গাদা গুঁড়ো সিঁদুর।

শোভার বিছানার কাছে একটা টুলের উপর একটি আয়না আর সিঁদুরের কৌটা। শোভার এই রক্তহীন সাদা মুখে অদ্ভুত একটা হাসি যেন ঐ সিঁদুরের আভার মতই জলজল করে।

ঘরের ভিতর পায়চারি করে ঘুরেফিরে শোভার সঙ্গে গল্প করছিল প্রভাত। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে আর হাসিমুখ তুলে আহ্বান জানায় শোভা।— আসুন। ওর কাছেই শুনলাম, আপনি আজ আমাকে দেখতে আসবেন।

কেবিনের ভিতরে ঢুকে, আর একটা চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বলে— আজ কেমন আছেন?

—আজ আরও ভাল আছি। হেসে ফেলে শোভা। হাসির শব্দটা অদ্ভুত। সেতারের তারের উপর হঠাৎ অসাবধান হাতের আঘাত পড়লে যেমন ঝনন্ করে একটা আর্ত হাসির ঝংকার চমকে ওঠে, শোভার হাসিটাও সেইরকম একটা চমকে ওঠা ঝংকার।

—আমার কথাটা বোধহয় বুঝতে পারেননি, তাই আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন। শোভা আবার নিজেই হেসে উঠে প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা—বুঝবো না কেন? আপনি ভাল থাকুন। ভাল হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করি।

—ছি ছি ছি। দয়া করে ওকথা বলবেন না। দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যেতে দিন। ভুল প্রার্থনা করে আমার সাধের মরণটাকে বাধা দেবেন না।···কিন্তু বাধা দিলেই বা কি হবে? ওষুধে না, কারও প্রার্থনাতেও না, আমার এই নিতসিঁদুর মিথ্যে হবার নয়।

কপালে হাত ছুঁইয়ে সিঁদুর-ছড়ানো সিঁথিটাকে দেখিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে

শোভা :—বিয়ের পর এক মাস যেতেই রাঙাপিসিমার পরামর্শে নিতসিঁদুর ব্রত করেছিলাম। ভাগ্যিস করেছিলাম। আমি যে সধবা মরবো মিসেস ঘোষ। কেউ আমার এই ভাগ্য খারাপ করে দিতে পারবে না। কারও সাধ্যি নেই।

আয়নাটা এক হাতে তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরে, আর এক হাতের আঙুল চালিয়ে রুক্ষ চুলের ফাঁস ভাঙতে ভাঙতে শোভা বলে—উনি বলেন, আমি নাকি স্বার্থপরের মতো কথা বলি। কিন্তু কি করবো বলুন? এই একটি স্বার্থ আমি ছাড়তে পারি না। আমি আগে যাবই।

হঠাৎ ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে শোভা। শোভার মুখের সব হাসি যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।—কি হলো? আপনি কাঁদছেন কেন?

চোখের উপর রুমালটাকে জোরে একবার ঘষে নিয়ে সুমিত্রা বলে—কিন্তু আমি যে কোনদিন নিতসিঁদুর করিনি। আমার কি আপনার মতো আগে চলে যাবার সৌভাগ্য হবে?

—হতে পারে বৈকি। বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে শোভা।

—হতে পারে কেন? নিশ্চয় হবে। আপনার মাথার সিঁদুরও নিতসিঁদুর। সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরগলায় চেঁচিয়ে ওঠে প্রভাত।

—ডাক্তারেরা কি বলেন? প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে শোভা।

প্রভাত বলে—ডাক্তারেরা বলেছেন, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। তবু উনি মিছিমিছি···তুমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে দাও শোভা।

শোভা—সত্যিই তো। আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? নিশ্চয় সেরে উঠবেন মিস্টার ঘোষ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সিঁদুরও নিত-সিঁদুর হোক।

—আজ আসি। বিদায় নেয় সুমিত্রা।

—আসবেন মাঝে মাঝে যত দিন না··। আবার চমক দিয়ে বেজে ওঠে শোভার সেই রক্তহীন সাদাটে মুখের অদ্ভুত হাসির ঝংকার।

চার

সুমিত্রা বলে—হ্যাঁ বেশ তো, চলুন না। আপনার কথা তো আমার কাছে সবই উনি শুনেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলে উনি খুবই খুশি হবেন।

প্রভাতের ইচ্ছে ছিল, সুমিত্রারও আগ্রহ আছে, প্রভাত আর সুমিত্রা

হাসপাতালের পূবদিকের ওয়ার্ডের একটি কেবিনের ভিতরে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সুমিত্রার স্বামী লোকেন।

—আপনি বসুন। আপত্তি করে বাধা দিয়ে লোকেনের কাছে এগিয়ে আসে প্রভাত। নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চেয়ারের উপর বসে।

লোকেন—আপনার কথা সবই শুনেছি সুমিত্রার কাছে।

প্রভাত—এখন কেমন আছেন?

লোকেন হাসে—ভাল আছি বলতে পারি না। কিন্তু আশা আছে, ভাল হয়ে উঠবো।

প্রভাত—নিশ্চয় ভাল হবেন। মিসেস ঘোষের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি, তাতে তো মনে হয় ডাক্তাররাও হোপফুল।

লোকেন হাসে—ডাক্তাররা কেন হোপ করছেন জানি না, কিন্তু আমি ফুলের মতো হোপ করছি ঠিকই।

প্রভাত—আপনিই যদি এরকম অন্যায় কথা বলেন তবে মিসেস ঘোষকে আর দোষ দেব কি?

লোকেন—অ্যাঁ? সুমিত্রা বুঝি আপনাদেরও কাছে কান্নাকাটি করে আপনাদের বিরক্ত করেছে?

প্রভাত—না না, বিরক্ত করবেন কেন? এসব কথা কি মানুষকে বিরক্ত করবার জন্য, না কেউ বিরক্ত হয়? তবে হ্যাঁ, মিসেস ঘোষ একটু বেশি নার্ভাস।

লোকেন—সেই জন্যেই তো দুঃখ হয় মিস্টার বরাট। ও যে শেষ পর্যন্ত কি করে ফেলবে· শোকটোক সহ্য করতে পারবে কি? না, সেন্টিমেন্টের মাথায় একটা আত্মঘাতী কাণ্ড করে ।

—থাক এসব কথা। প্লীজ! চমকে উঠে আড়চোখে ঘরের এদিকে একবার এবং ওদিকে একবার তাকায় প্রভাত। তার পরেই যেন একটা উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ে। না, কাছে দাঁড়িয়ে নেই সুমিত্রা। লোকেন ঘোষের কথাগুলি সুমিত্রার কানে যায়নি। কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে, কিংবা ফটকের কাছে কৃষ্ণচূড়াটার দিকে তাকিয়ে আছে সুমিত্রা। সেই নেড়া ও রিক্ত কৃষ্ণচূড়ার মাথায় কচি সবুজের প্রলেপ পড়েছে।

প্রভাতও গলার স্বর নামিয়ে লোকেন ঘোষের কাছে ফিসফিস করে যেন আবেদন করে।—আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

লোকেন—বলুন।

প্রভাত—মিসেসঘোষের কাছে আপনি এধরনের হতাশার কথা বলবেন না।

লোকেন—বুঝেছি, ওর কান্নাকাটি দেখে আপনিও খুব ব্যথিত হয়েছেন।

প্রভাত—ঠিকই বুঝেছেন মিস্টার ঘোষ, মিসেস ঘোষ বড় অবুঝের মতো কান্নাকাটি করেন। আপনার উচিত ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া, হতাশ হবার একটুও কারণ নেই।

লোকেন—আমি অনেক চেষ্টা করেছি মিস্টার বরাট। কিন্তু অসুবিধের ব্যাপার এই যে, আমার মনেই বিশ্বাসের জোর নেই।

প্রভাত—চেষ্টা করে বিশ্বাসের জোর রাখুন। আপনি তো মিছিমিছি, ভুল করে, ডাক্তারদের কথা অবিশ্বাস করে নিজের একটা দুর্ভাগ্য কল্পনা করছেন।

লোকেন বলে—ঠিকই বলেছেন। না…দেখি…সুমিত্রাকে নার্ভাস করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

প্রভাত—আজ তাহলে উঠি।

লোকেন—আসুন…হ্যাঁ…মিসেস বরাট এখন অনেকটা ভাল আছেন আশা করি।

প্রভাত—তাঁর ধারণা, তিনি ভাল আছেন। যদিও ডাক্তারেরা জানেন যে, তিনি অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছেন সেই অচেনা জগতের দিকে, ফ্রম হুজ ফেটাল বুন নো ট্রাভলার হ্যাজ এভার রিটার্নড্!

বলতে বলতে ছটফট করে ছোট ছেলের মতো ককিয়ে কেঁদে উঠেই ঢোঁক গিলে কান্নার শব্দটা চেপে দেয় প্রভাত।

লোকেনের শুকনো গলার শুকনো স্বরও হঠাৎ বেদনাহত হয়ে কেঁপে ওঠে—না না না, আপনি এরকম উতলা হবেন না মিস্টার বরাট। আমার অনুরোধ, প্লীজ।

আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে প্রভাত—আপনার কাছে মনের বদ্ধ যন্ত্রণার গুমোট মন খুলে একটু হালকা করে নিলাম মিস্টার ঘোষ। আপনার কাছে ধরা পড়ে যেতে লজ্জা নেই। কিন্তু মিসেস ঘোষের সামনে তো পারি না।

প্রভাতের চেয়ারের ঠিক পিছন থেকে বলে ওঠে সুমিত্রা।—আমি একাই নার্ভাস নই প্রভাতবাবু।

যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে প্রভাত। সুমিত্রার কাছে ধরা পড়ে যাবার যে ভয় থেকে এত চেষ্টা করে নিজেকে এতদিন বাঁচিয়ে এসেছে প্রভাত, সেই ভয়। বিব্রতভাবে, একটু লজ্জিত হয়েও বোধহয়, পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করতে চেষ্টা করে প্রভাত।

সুমিত্রা বলে—আমি না হয় সেন্টিমেণ্টাল মেয়েমানুষ, কিন্তু আপনি পুরুষ-

মানুষ হয়ে এ কি করলেন ?

লোকেন বলে—ঠিকই বলেছ সুমিত্রা। আপনার এতটা বেশি সেন্টিমেণ্টাল হওয়া উচিত নয় মিস্টার বরাট।

লোকেনের কাছেই অভিযোগ করে সুমিত্রা।—শোভাদি একটা নিত-সিঁদুরের গল্প হেসে হেসে বলেছেন, আর উনিও সেই গল্পটা বিশ্বাস করে বসে আছেন।

লোকেন—থাক সুমিত্রা। এসব আলোচনাই কোন কাজের আলোচনা নয়।

সুমিত্রা জেদ করে।—না, প্রভাতবাবু কথা দিন, উনি আর কখনও নিজেকে এরকম অসহায় বলে ভাববেন না, নিজেকে একলা মনে করতে পারবেন না।

হেসে ওঠে প্রভাত—চেষ্টা করবো নিশ্চয়।

লোকেন বলে—কোন চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন মিসেস বরাট। আই প্রে, তিনি ভাল হয়ে উঠুন।

[পাঁচ]

লেকে যাবার রাস্তা, গোল পার্ক ঘিরে বড় বড় আলো জলছে যেখানে, সেখানে একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে চুপ করে একলাটি কেন দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাতবাবু। বাসের জানালা দিয়ে দেখতে পেয়েই বাস থেকে নেমে পড়ে সুমিত্রা।

—আপনি কি বাড়ি ফিরছেন ?

—হ্যাঁ ?

—তবে এখানে এভাবে চুপটি করে কেন···।

—এখনই ফিরতে ইচ্ছে করছে না, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ হাসপাতালে যাননি ?

—গিয়েছিলাম।

—কখন্ ?

—বিকালে।

—কেমন আছেন শোভাদি ?

—জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিলে না আপনার শোভাদি

থরথর করে কেঁপে ওঠে সুমিত্রার চোখ—কি বলেছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন প্রভাতবাবু।

প্রভাত—শোভার আজ আর কথা বলবার শক্তি নেই। ডাক্তাররা বলেছেন, বড় জোর আর পাঁচ-সাত দিন।

—না না, হতে পারে না। এরকম ভয়ানক কথা বিশ্বাস করবেন না প্রভাতবাবু। বলতে বলতে সুমিত্রার হাত দুটো বার বার উতলা হয়ে ওঠে। যেন কারও চোখ মুছে দিতে গিয়ে ভুল করে নিজেরই চোখ মুছতে থাকে সুমিত্রা।

অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর হাসতে চেষ্টা করে প্রভাত।—মনে হচ্ছে, বোধহয় আপনারই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—ভাগ্যিস দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আজ আপনাকে…।

প্রভাত—কি?

সুমিত্রা—আপনাকে অন্তত দুটো সান্ত্বনার কথা বলবার সুযোগ পেলাম।

প্রভাত—মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

সুমিত্রার চোখ দুটো যেন হঠাৎ বেদনায় আহত হয়।—মিথ্যে? একথা কেন বলছেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত—শোভা তো সত্যিই বাঁচবে না।

সুমিত্রা—আপনি বারবার ওকথা বললে আমি কি আর বলবো বলুন?

প্রভাত—না, সে তো ঠিক কথা।…কিন্তু আপনি আর রাত করবেন না।

সুমিত্রা অনুনয়ের সুরে বলে—আপনিই বা রাত করছেন কেন প্রভাতবাবু? বাড়ি ফিরে যান।

প্রভাত—বিশ্বাস করুন, বাড়ি ফিরে যাব ঠিকই। কিন্তু এখনই যেতে ইচ্ছে করছে না।

সুমিত্রা—একথা বললে আমাকেও বিপদে ফেলা হয়।

প্রভাত—কেন?

সুমিত্রা—আপনাকে আজ এভাবে একা একা ছেড়ে দিয়ে আমারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

প্রভাত বলে—চলুন তাহলে।…একটা ট্যাক্সি ডাকি, কেমন?

সুমিত্রা—ডাকুন।… ভালই হবে। কেউ একজন সঙ্গে না থাকলে আমারও ট্যাক্সিতে যেতে অস্বস্তি হয়, ভয় ভয়ও করে।

চলন্ত ট্যাক্সির ভিতরে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ ছটফট করে ওঠে, জোরে একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়ে প্রভাত।—ভাগ্যের ঠাট্টাটা বুঝুন একবার!

সুমিত্রা—কি বললেন?

প্রভাত—আমার লাইফ-পলিসিটা শোভার নামে অ্যাসাইন করে দিয়েছিলাম। খুব বিশ্বাস ছিল, আমিই বেচারাকে একা রেখে আগে চলে যাব। কিন্তু কি যে হলো, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। শোভা আমার লাইফ-পলিসিটাকে যেন ঠাট্টা করে ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সুমিত্রা—আমি ঠিক এর উলটো কাণ্ডটি করেছি প্রভাতবাবু। আমিই রাগ করে আর জোর করে ওর লাইফ-পলিসিটাকে সারেণ্ডার করিয়ে সেই টাকায় বাড়ি কেনবার দেনা শোধ করিয়েছি। এখন দেখুন, সেই বাড়ি পড়ে রইল কোথায়, আর উনি এখন কোথায়?

প্রভাত—আপনি আবার ভুল ভাবনা করছেন! মিস্টার ঘোষ আবার বাড়িতে ফিরে আসবেন। আপনার দুঃখ করবার কোনই কারণ নেই।

সুমিত্রা—জানি প্রভাতবাবু, আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার মানুষ নন। কিন্তু…।

প্রভাত—কি বলুন?

সুমিত্রা—সৌভাগ্যে আর বিশ্বাস করার মতো মনের জোর পাই না।

প্রভাতই যেন মনের সব জোর দিয়ে সুমিত্রার ভয় ভেঙে দিতে চায়।—বিশ্বাস করুন, আপনাকে কখনো একা-একা অসহায় হয়ে পড়ে থাকতে হবে না।

সুমিত্রা—এই যে শ্যামবাজার এসে পড়েছে। আমি এখানে নেমে যাই।

প্রভাত—আসুন।

[ছয়]

বিকাল হয়েছে। হাসপাতালের ফটকের কাছে কৃষ্ণচূড়ার মাথা লাল হয়ে উঠেছে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই দেখতে পায় সুমিত্রা, হাসপাতালের অফিস ঘরের দিক থেকে প্রভাতবাবু আস্তে আস্তে হেঁটে ফটকের দিকেই আসছেন।

থমকে দাঁড়ায় সুমিত্রা। প্রভাত কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করে সুমিত্রা—কখন এসেছিলেন?

প্রভাত—এই মিনিট দশেক আগে।

সুমিত্রা—এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন?

প্রভাত—হ্যাঁ, সামান্য একটু কাজ ছিল। হাসপাতালের কিছু পাওনা হয়েছিল। টাকাটা দিয়ে এলাম।

সুমিত্রা—কিন্তু……।

প্রভাতের মুখে একটা রুক্ষ শুষ্ক ও তীক্ষ্ণ হাসির জ্বালা যেন ঝিকঝিক করে।

—বুঝতে পারলেন কিছু ?

চেঁচিয়ে ওঠে সুমিত্রা—শোভাদি কেমন আছেন ?

প্রভাত— নেই। কালই শেষ রাতে চলে গিয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত বাকি বেডভাড়া যা জমা হয়েছিল, সব হিসেব করে চুকিয়ে দিয়ে এলাম।

চোখের উপর রুমাল চেপে ফোঁপাতে থাকে সুমিত্রা।—আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব, বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু। শোভাদি এ কি ভয়ানক কাণ্ড করলেন ?

প্রভাত হাসে—আপনার শোভাদি তাঁর নিতসিঁদুরের জেদ রাখলেন। আমাকে একলা রেখে পালিয়ে গিয়ে সুখী হলেন।…আচ্ছা চলি।

চোখের উপর রুমাল চেপে ফোঁপাতে থাকে সুমিত্রা।—আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু। শোভাদি এ কি ভয়ানক কাণ্ড করলেন ?

প্রভাত হাসে—আপনার শোভাদি তাঁর নিতসিঁদুরের জেদ রাখলেন। আমাকে একলা রেখে পালিয়ে গিয়ে সুখী হলেন।…আচ্ছা চলি।

চমকে ওঠে সুমিত্রা। বিদায় চাইছেন প্রভাতবাবু। সত্যিই তো, এই হাসপাতালের কোন ওয়ার্ডের কোন কেবিন, এই কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার কাছে প্রভাতবাবুর জীবনের আর কোন কাজ নেই। এতদিনে শূন্য হয়ে, মুক্ত হয়ে, একেবারে একলা হয়ে চলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। প্রভাতবাবু আর এখানে আসবেন না। একটা দুঃখের তীর্থে আসা-যাওয়ার পথে সুমিত্রার এতদিনের সঙ্গী মানুষটা এবার সঙ্গছাড়া হয়ে গেল।

সুমিত্রা— সত্যিই তাহলে যাচ্ছেন, বিদায় নিচ্ছেন প্রভাতবাবু ?

প্রভাত—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—এখন কোথায় যাবেন ?

প্রভাত— এখন তো আর দমদমের ঐ আধখানা বাড়িতে পড়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না।

সুমিত্রা—তার মানে ?

প্রভাত—আবার আসাম সার্কেলে চলে যাব।

সুমিত্রা—কলকাতাতে কি আর আসবেন না ?

প্রভাত—আসবো বৈকি। এবং আসলেই আপনার খোঁজও নেব নিশ্চয়। হ্যাঁ, আপনার সিঁথির ঠিকানা ?

সুমিত্রা—এগার নম্বর জয় দত্ত ফার্স্ট লেন।

বিদায় নেবার জন্যেই বোধহয় একটা শেষ কথা বলতে চায় প্রভাত, কিন্তু কি-যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে।—হ্যাঁ, ডাক্তারদের কাছ থেকে একটা সুখবর শুনে এলাম।

সুমিত্রা—কিসের সুখবর?

প্রভাত—ভিয়েনার একজন বিখ্যাত স্পেশ্যালিষ্ট সার্জন নাকি আর এক মাসের মধ্যেই আসবেন। মিস্টার ঘোষের কেস তাঁর কাছে রেফার করা হবে এবং তাঁরই পরামর্শ মতো অপারেশন করা হবে। ডাক্তারদের ধারণা, এই অপারেশন সফল হবে, যদিও এধরনের জটিল কেসের প্রায় ক্ষেত্রে অপারেশন বিফল হয়ে যায়।

সুমিত্রার মুখে একটা করুণ হাসির ছায়া কাঁপতে থাকে।—বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু, আপনার কথায় হতাশ হব, না আশা করবো?

প্রভাত—নিশ্চয় আশা করবেন।

নীরব হয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। প্রভাতের কথার মধ্যে হেঁয়ালি নেই। তবু যেন মনের ভিতরে এলোমেলো হয়ে একটা হেঁয়ালির বেদনা ছুটোছুটি করছে! কা'কে আশা বলে আর কা'কে হতাশা বলে, বুঝতে গিয়ে সুমিত্রার মাথাটাই ক্লান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। না, এই ভদ্রলোকের কাছে আজ আর কিছু বলবার নেই।

[সাত]

আজ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সেই যে বিছানার উপর পড়ে আর বালিশ আঁকড়ে অসাড় হয়ে শুয়েছিল সুমিত্রা, সন্ধ্যা হলেও সেইভাবে শুয়ে পড়ে থাকে। সিঁথির জয়দত্ত ফার্স্ট লেনের এগার নম্বরের বাড়িটার এই ঘরের অন্ধকার, সুমিত্রার অদৃষ্টের সবচেয়ে নির্মম আতঙ্কটারই মতো নিরেট হয়ে উঠতে থাকে। আলো জ্বালতেও ভুলে গিয়েছে সুমিত্রা।

কাল বিকালে হাসপাতালের কেবিনে লোকেনের করুণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখের অজস্র ভাষায় সাহস দিয়ে, লোকেনের মাথার উপর অনেকক্ষণ মাথা রেখে সেই যে চলে এসেছে সুমিত্রা, তার পর থেকে সুমিত্রার স্যাঁতসেঁতে চোখ আর শুকনো হয়নি। আজই সকালে লোকেনের ফুসফুসে অপারেশন হয়েছে। কি হয়েছে কে জানে? পাশের বাড়ির টেলিফোনের নম্বরটা হাসপাতালের অফিসে লিখিয়ে রেখে এসেছিল সুমিত্রা। কথা আছে, যথাসময়ে টেলিফোনে হাসপাতাল থেকে খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু কই? সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখনও খবর আসে না কেন?

কিন্তু খবরটা অনুমান করতে কি কোন অসুবিধা আছে? প্রায় ক্ষেত্রে যে অপারেশন সফল হয় না, সে অপারেশন কি সুমিত্রার উপর বিশেষ দরদ করে সফল হয়ে যাবে? এত বড় সৌভাগ্য যে কল্পনা করতেই পারে না সুমিত্রা। কল্পনা করবার, বিশ্বাস করবার শক্তিই নেই, বরং বিশ্বাস করতে হয়, এখনও লজ্জা করে সুমিত্রাকে ভয়ানক খবরটা দিতে পারছে না হাসপাতালের অফিস।

হঠাৎ সুমিত্রার কান দুটো চমকে ওঠে। শুনতে পায় সুমিত্রা, পাশের বাড়ির কাকিমা চেঁচিয়ে···না কাঁদতে কাঁদতে নয়, হাসতে হাসতে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছেন, এই ঘরের দিকে আসছেন।—সুমিত্রা, সুমিত্রা! কোথায় তুমি?

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে সুমিত্রা। ঘরে ঢুকেই কাকিমা হেসে ওঠেন—এইমাত্র হাসপাতাল থেকে খবর এল। খুব ভাল অপারেশন হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, আর চিন্তা করবার কিছু নেই। একেবারে নিরাপদ।

সুমিত্রার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন হাসির এক ঝলক আলো উথলে ওঠে। অদৃষ্টের করুণ কান্নাটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। পাশের বাড়ির কাকিমাকে প্রণাম করেই নিজের মনের আবেগে ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুমিত্রা।

কাকিমা বলেন—আমি চলি। আমি এখনি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে যান কাকিমা। হঠাৎ নিথর হয়ে, দু'চোখ অপলক করে যেন একটা আর্তনাদহীন বেদনায় বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। আর হতাশ হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই, কিন্তু কি অদ্ভুত এই হতাশাঘাতক আশা।

জীবনের এত বড় সৌভাগ্য আশা করতে পারেনি সুমিত্রা। এবং যেন এই সৌভাগ্যকে সহ্য করবার মতো শক্তি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না সুমিত্রা। আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে সুমিত্রা। কান্না চাপতে গিয়ে হাঁসফাঁস করে আর, বার বার বালিশে চোখ ঘষে ছটফট করতে থাকে।

[আট]

আর দেখতে হয়নি সুমিত্রার, হাসপাতালের ফটকের কাছের কৃষ্ণচূড়া আবার কবে রিক্ত হয়ে কেমনতর উদাস হয়ে গেল। এদিকের পথে আসা-যাওয়ার পালা শেষ হয়ে গিয়েছে কবেই।

সিঁথির জয়দত্ত ফার্স্ট লেনের এগার নম্বর বাড়ির উপরতলার একটি ঘরের ভিতর হেসে হেসে গল্প করে সুমিত্রা—এখন মনে পড়লেও লজ্জা লাগে।

লোকেন—কি ?

সুমিত্রা—এই বাড়িটাকে অপয়া বাড়ি মনে করে কত ভয়ই না পেয়েছিলাম, কত আক্ষেপও করেছি।

লোকেন হাসে—আপাতত ভয় নেই।

সুমিত্রা ভ্রূকুটি করে হাসে—আবার অপয়া কথা ? প্রভাতবাবুর ওয়ার্নিং ভুলে গিয়েছ ?

লোকেন—প্রভাতবাবু কে ?···ও হ্যাঁ, সেই চমৎকার কোমল স্বভাবের জেণ্টেলম্যান।

সুমিত্রা—হ্যাঁ। ভদ্রলোক প্রায় প্রত্যেক মাসেই একটি করে চিঠি লিখে আশ্চর্য করে দিচ্ছেন।

লোকেনও আশ্চর্য হয়—সে কি ! চিঠিতে কি লেখেন ভদ্রলোক ?

সুমিত্রা—আমাকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন। চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। অনুরোধ করছেন, যেন আশা রাখি।

হো হো করে হেসে ওঠে লোকেন—চমৎকার কমেডি অব এরর।

সুমিত্রা—কমেডি কেন বলছো ? ভদ্রলোক যে সত্যিই দুশ্চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছেন। বোধহয় ধারণা করছেন যে, তোমার অসুখ সারেনি, ভয়ানক একটা কিছু হয়ে গিয়েছে।

লোকেন—ট্র্যাজেডি অব এরর।

সুমিত্রা—ভদ্রলোক জীবন বীমার কাজে আসামের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই বোধহয় ঠিকানা দেন না। তা না হলে সুখবরটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতাম যে, তুমি ভাল হয়ে গিয়েছ, আর আশা করবার···চিন্তা করবার কিছু নেই।

উঠে দাঁড়ায় সুমিত্রা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। —আমি চললাম। স্কুলে আজ টিচার্সদের একটা মিটিং আছে।···তুমি বেশি ওঠা-নামা করবে না, এক কাপের বেশি চা খাবে না। সুপ তৈরী করে রেখেছি, মীটসেফের ভেতরে আছে।

নীচে নেমে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুমিত্রা। প্রভাতবাবু আসছেন।

—আসুন, কবে ফিরেছেন ? হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—আজই। হেসে হেসে উত্তর দেয় প্রভাত।

সুমিত্রা—আপনার খবর ভাল ?

প্রভাত—হ্যাঁ, আপনার খবর বলুন।

সুমিত্রা—সুখবর। উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন এই মাসের শেষেই কাজে জয়েন করবেন।

প্রভাতের চোখের কৌতূহল হঠাৎ বিস্ময়ের একটা চমক লেগে কেঁপে ওঠে। যেন সুমিত্রার সিঁথির সিঁদুরের ছায়াটা হঠাৎ প্রভাতের চোখের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

অদ্ভুত এক খুশির উচ্ছ্বাস তুলে হাসতে থাকে প্রভাত।—তাই বলুন! আমি বলেছিলাম কি না, আপনার সিঁদুরও নিতসিঁদুর। এখন বিশ্বাস করছেন তো?

সুমিত্রা—করছি বৈকি!

প্রভাত—তাহলে এখন স্বীকার করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিইনি।

সুমিত্রা—স্বীকার করি।

প্রভাত হাসে—স্বীকার করুন, আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

মাথা হেঁট করে সুমিত্রা—না।

কৃতার্থভাবে যেন একটা সফল স্বপ্নের আনন্দে চোখের চাহনি নিবিড় করে নিয়ে হাসতে থাকে প্রভাত—যাক, শুনে খুবই সুখী হলাম। আপনাকে ভুল বুঝিনি তাহলে। আচ্ছা···আমি এবার চলি, মিসেস ঘোষ।

বৈ পি ত্র ক

পরিচিতা মহিলারা প্রায়ই আসেন এবং আত্মীয়ারা খুব কমই আসেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলাপের পর তাঁরা মুক্তিময়ীকে আজও একটি সান্ত্বনার কথা জানিয়ে চলে যান।—তবু, আপনি একরকম ভালই আছেন।

মুক্তিময়ী বলেন—একরকম ভাল আছি ঠিকই, শুধু দুঃখ এই যে, তিনি আগে চলে গেলেন।

আজ বেশ শান্তভাবেই এই কথাটা বলতে পারছে মুক্তিময়ী। কিন্তু দু' বছর আগে এই দুঃখ সহ্য করবার কল্পনাকেও সহ্য করতে পারেননি। ভবতোষ ঘোষ যেদিন মারা গেলেন, সেদিন মুক্তিময়ীর মনের অবস্থা দেখে এই সব মহিলা এবং আত্মীয়ারাও বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই বৈধব্যের বেদনা সহ্য করে আবার শান্ত ও সুস্থ হতে পারবেন মুক্তিময়ী। প্রায় দুটো দিন জ্ঞান হারিয়ে, একটা শোকাক্রান্ত ছিন্নভিন্ন মূর্তি নিয়ে এই বাড়ির মেঝের উপর পড়েছিলেন

মুক্তিময়ী। মুক্তিময়ীর দুই ছেলে সঞ্জীব আর অজয় মুক্তিময়ীর দুই হাত ধরে যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল, তখন আস্তে আস্তে হারানো জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন। দুই ভাই-এর সেই কান্নার শব্দ বোধহয় মুক্তিময়ীর বৈধব্যের জ্বালাকেও বিচলিত করেছিল। সঞ্জীব আর অজয়, দুই ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে অনেকক্ষণ বসেছিলেন মুক্তিময়ী। তারপর শান্ত হয়েছিলেন।

এই সব পরিচিতা এবং আত্মীয়ারাও জানতেন যে, মুক্তিময়ীর জীবনে এই শোক প্রথম বৈধব্যের শোক নয়, দ্বিতীয়বার বিধবা হলেন মুক্তিময়ী। মুক্তিময়ীর মনে বড় আশা ছিল এবং বোধহয় বিশ্বাসও করতেন যে, এইবার আর তাঁর অদৃষ্টটা করুণাহীন হবে না। তিনি নিজেই আগে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের অকরুণাই সত্য হয়ে উঠলো। এবং তাই বোধহয় পঞ্চান্ন বছর বয়সের এই কপালটাকে মেঝের উপর লুটিয়ে দিয়ে তাঁর অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়েছিলেন।

পরিচিতা মহিলারা এবং আত্মীয়ারা সান্ত্বনা দিতে এসে মনে মনে একটু বিস্মিতও হয়েছিলেন। এই দুঃখটা যে মুক্তিময়ীর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। পঁচিশ বছরেরও বেশি হবে বোধহয়, এই রকমেরই একটা দুঃখের আঘাত মুক্তিময়ীকে সহ্য করতে হয়েছিল। মুক্তিময়ীর বয়সও তখন পঁচিশ বছরের মতই ছিল। আজকের এই সঞ্জীবের বয়স তখন তিন বছর। সঞ্জীবের বাবা দিনেশ দত্তের বয়সও তখন ত্রিশ বছর। যুবক স্বামীর অকাল মৃত্যু সেই দিন মুক্তিময়ীকে অকালে বিধবার সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। সেই শোক সহ্য করতে এবং শান্ত হতে পেরেছিলেন সেদিনের মুক্তিময়ী।

প্রথম স্বামী দিনেশ দত্তের মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পরে ভবতোষ ঘোষের সঙ্গে মুক্তিময়ীর বিয়ে যেদিন হয়ে গেল, সেদিনও পরিচিতা মহিলারা আর আত্মীয়ারা বিস্মিত হননি। ভালই তো, শোক ভুলে গিয়ে আর শান্ত হয়ে আবার একটা ভালবাসার জীবন স্বীকার করে নিল মুক্তিময়ী। এরকম না হলেই বরং ব্যাপারটা আরও বেশি দুঃখের হতো।

এই সব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারাও দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, মুক্তিময়ীর প্রথম স্বামীর ভালবাসার দান, সেই ছোট্ট সঞ্জীবও মুক্তিময়ীর দ্বিতীয় বিবাহিত জীবনে কোন সমস্যা হয়ে উঠলো না। দ্বিতীয় স্বামী ভবতোষ ঘোষ পাঁচ বছর বয়সের সঞ্জীবকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন, এবং অপরিচিত কোন ব্যক্তির পক্ষে বোঝবার সাধ্যিও ছিল না যে, এই সঞ্জীব ভবতোষ ঘোষের নিজের ছেলে নয়। সঞ্জীব দত্ত, সন অব লেট দিনেশ দত্ত, এই পরিচয় শুধু সঞ্জীবের স্কুলের নাম ভর্তির রেজিষ্টারে লেখা রইল। কিন্তু লোকের চোখে কোন

সহন্দে রইল না যে, ভবতোষ ঘোষ বাপেরই স্নেহ মমতা আর আগ্রহ নিয়ে সঞ্জীবকে মানুষ করে তুলছেন। হৃদয়ের বিচারে, ভবতোষ ঘোষই যে সঞ্জীবের বাপ, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় ছিল না।

আর একটা সমস্যা, যেটা মুক্তিময়ী আর ভবতোষ ঘোষ এবং এই সব পরিচিত মহিলা ও আত্মীয়ারা আশঙ্কা করে একটু চিন্তিত হয়েছিলেন, সে-সমস্যাটাও দেখা দিল না। ভবতোষ ঘোষ আর মুক্তিময়ীর ভালবাসার জীবন যখন একটি সন্তান উপহার পেয়ে হেসে উঠলো, তখন সেই হাসির আড়ালে একটা প্রশ্নও ছিল। ভাইকে হিংসে করবে না তো সঞ্জীব?

এক মায়ের পেটের, পিঠাপিঠি দুই ভাই শিশুকালে পরস্পরকে যে হিংসে করে, সে রকম হিংসে থাকুক না সঞ্জীব আর অজয়ের মনে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি, এবং অন্য রকমের অদ্ভুত কোন হিংসে দেখা দেবে না তো?

কিন্তু নিতান্তই অনর্থক ও অহেতুক আশঙ্কা। এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারাই দেখে খুশি হয়ে গেলেন, এবং মুক্তিময়ী ও ভবতোষের চোখের দৃষ্টিও যেন একটা গৌরবের অনুভব পেয়ে ধন্য হয়ে গেল। সাত বছর বয়সের সঞ্জীব কী অদ্ভুত আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ভাই-ভাই বলে ছুটে আসে, আর এক বছর বয়সের অজয়কে বুকের উপর সাপটে ধরে নিয়ে টলমল করে হাঁটে।

আবার চিন্তিত হয়েছিলেন এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারা। আজ না হয় দু'জনে নেহাতই দুটি শিশু কিন্তু বড় হবে যখন, তখন? তখন কি আর ভাই-ভাই ভাব থাকবে? সঞ্জীব দত্ত কি অজয় ঘোষকে আপন-ভাই বলে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারবে? এবং অজয়ও কি পারবে?

এই আশঙ্কাও মিথ্যে হয়ে গেল। এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন, এবং খুশিও হলেন বোধহয়। বাইশ বছর বয়স হয়েছে সঞ্জীবের, এম-এ পাশও করেছে, কিন্তু কী অদ্ভুত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে রয়েছে সঞ্জীবের মন! অজয়টা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে তো? এগিয়ে এসেছে অজয়ের পরীক্ষা। দিন ও রাতের মধ্যে প্রায় আঠার ঘণ্টা অজয়কে পড়ায় সঞ্জীব—লজ্জার কথা, আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা হবে বাবা, যদি অজয় ফেল করে। সঞ্জীবের মনের এই উদ্বেগ দেখে ভবতোষ ঘোষ আর মুক্তিময়ীর মন যেন একটা গর্বের আনন্দে হেসে ওঠে। পৃথিবীর কোন দুই ভাইও কি এর চেয়ে বেশি ভাই-ভাই হতে পারে?

অথচ, আজ তো এই দুই ভাই দুটি শিশু নয়, শিশু-মনের মানুষও নয়, এবং ছেলেমানুষী খেলার আনন্দের দুই সঙ্গীও নয়। দু'জনেই বড় হয়েছে। সঞ্জীবের

বয়স বাইশ এবং অজয়ের বয়স ষোল। ওরা কি ওদের দুই জীবনের সব মিলের মধ্যে একটি অমিলের কথা জানে না।

সঞ্জীব দত্ত আর অজয় ঘোষ, দুই ভাই-এর দুই নামের মধ্যে কেন একটা পরিচয়ের অমিল থেকে গিয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর ওরা পেয়ে গিয়েছে। বড় হয়েছে দু'জনে, সবই বুঝতে পেরেছে দু'জনে, তবু দু'জনের ভাই-ভাই মনটার উপর সে উপলব্ধির একটা টোকাও পড়লো না যেন, আঘাত দূরে থাকুক। আর ভাবনা করবার কি আছে?

কিন্তু, আবার ভেবেছিলেন এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারা ভবতোষ ঘোষের সম্পত্তি কি সঞ্জীব আর অজয়ের এই ভাই-ভাই ভাবের আনন্দ ছিন্নভিন্ন করে দেবে না? ভবতোষ ঘোষ যেদিন আর থাকবেন না, সেদিনও কি দু'জনের মনে ঠিক এইরকমই ভাই-ভাই ভাবের জোরটুকু থাকবে?

কিন্তু এই সমস্যাও দেখা দিল না। ভবতোষ ঘোষ তাঁর সব বাড়ি বাগান শেয়ার আর নগদ টাকা একেবারে চুলচেরা সমানভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ সঞ্জীবের নামে উইল করে রেখেছিলেন। ভবতোষের মৃত্যুর পর এই তথ্য যেদিন জানলেন এই সব পরিচিতা মহিলা ও আত্মীয়ারা, সেদিন তাঁরা সবচেয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবনা করাই ছেড়ে দিলেন। না, আর কোন সমস্যাই দেখা দিল না, দেখা দেবেও না।

তাই মুক্তিময়ী বলেন, একরকম ভালই আছি। দুই ছেলে নিয়ে একরকম নিশ্চিন্ত মনেই জীবনের সন্ধ্যাকালের মুহূর্তগুলি পার করে দিচ্ছেন। শুধু দুঃখ এই যে, উনি আগে চলে গেলেন! এবং এই দুঃখটাও শান্ত-চিত্তে সহ্য করবার মতো শক্তি কেমন করে আর কেন পেয়ে গেলেন তিনি, তাও বুঝতে পারেন।

সঞ্জীব আর অজয়, তাঁর দুই ভিন্ন জীবনের দুই ছেলে আজ দু'টি আপন ভাই হয়ে গিয়েছে। এইবার নিজেও পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও নির্ভাবনার আনন্দ নিয়ে চোখ বুজতে পারবেন।

[দুই]

এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারা আবার একদিন একটা ভাবনায় পড়লেন; কারণ মুক্তিময়ী কথায় কথায় হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে আর চোখ মুছে একটা নতুন কথা বলে উঠলেন।—না, মোটেই ভাল নেই। একটুও ভাল লাগছে না। শেষ পর্যন্ত ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন বলে মনে হচ্ছে,—নিশ্চিন্ত মনে মরবার সৌভাগ্য আর হলো না!

পঞ্চাশ বছর বয়সের বিধবা। মাত্র দু'বছর আগে যাঁর স্বামী বিগত হয়েছেন

কিন্তু দুই ছেলেকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বামী হারাবার শোক শেষ পর্যন্ত শান্ত করতে পেরেছিলেন যিনি, তিনি আবার অশান্ত হয়ে উঠলেন কেন ?

শুনে বিস্মিত এবং দুঃখিত হলেও বুঝতে পারেন না কেউ, আজ মুক্তিময়ীর এই শান্ত ও সাদা জীবনের উপর আবার নতুন করে কোন্ ব্যথিত চিন্তার ঝড় এসে লাগতে পারে, যার জন্যে এত উতলা হয়ে উঠেছেন ?

সাদা ফ্রেমের চশমাটাকে নামিয়ে দিয়ে ধবধবে সাদা থান-শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন মুক্তিময়ী। দু'বছর আগে, যে সময় ভবতোষ ঘোষ মারা গেলেন, সে সময়ে মুক্তিময়ীর মাথার অনেকখানি কালো ছিল। কিন্তু এই দু'বছরের মধ্যে সেই কালোর সবই প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে। তাঁর এলোমেলো খোঁপাটাকে সাদা রেশমের খোঁপা বলে মনে হয়। এই মুক্তিময়ী এই তো সেদিনও বলেছেন যে, বড় ছেলে সঞ্জীবের বউ-এর মুখ দেখবার দিন পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে কোন দুঃখ নেই। আজ তবে তাঁর মনে এ কেমন দুঃখের ছোঁয়া নতুন করে লাগলো, যার জন্য মানুষটা বেদনা সামলাতে না পেরে এতগুলি বাইরের লোকের কাছে কেঁদেই ফেলেছেন ?

পরিচিত মহিলারা এবং আত্মীয়ারা মুক্তিময়ীর এই নতুন দুঃখের কারণ আর চোখের জলের অর্থ বুঝতে পারেন না, তাই আশ্চর্য হন। এবং শেষ পর্যন্ত এই ধারণা করেন যে, মুক্তিময়ী মাঝে মাঝে যে শ্বাসকষ্টে ভুগতেন, সেই কষ্টই বোধ-হয় এইবার একটু বেশি তীব্র এবং বেশি দুঃসহ হয়ে উঠেছে। হবার কারণও যে আছে। মানুষটির বয়সও তো কম হয়নি।

পরিচিত মহিলারা এবং আত্মীয়ারা চলে যাবার পরেও ঘরের নিভৃতে একটি চেয়ারের উপর বসে আরও কয়েকবার চোখ মোছেন মুক্তিময়ী। হাতের বইটার একটা লাইনও মন দিয়ে পড়তে পারেন না, এবং হাতের বইটাও যেন একটা করুণ আক্ষেপের মতো বার বার কেঁপে ওঠে।

আজ শুধু নয়, এই একটা বছর ধরে মুক্তিময়ীর মন এই অশান্তি সহ্য করছে। এতদিন সহ্য করেও চুপ করে ছিলেন, কিংবা চুপ করে সহ্য করেছিলেন, কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারছেন না।

তাই বাইরের মানুষের সামনে কেঁদে ফেলেছেন।

যে সমস্যার আশংকা থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল মুক্তিময়ীর মন, সেই সমস্যা একেবারে নিদারুণ রূঢ়তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। সঞ্জীব আর অজয়ের মধ্যে সেই ভাই-ভাই ভাব যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়েছেন

মুক্তিময়ী, অজয় কি কোনদিন বড় ভাই সঞ্জীবের সঙ্গে কোন রূঢ় ব্যবহার করেছে?

কোনদিনও না। অজয় নিজেই মুক্তিময়ীর কাছে এসে ছলছল চোখে অভিযোগ করেছে, দাদা আজকাল কেন এত গম্ভীর হয়ে গিয়েছে মা? আমার সঙ্গে যেন কথা বলতেই চায় না।

মুক্তিময়ী—তুই নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছিস।

অজয়—দাদা বলুক, কি অন্যায় করেছি। আমি তখুনি মাপ চাইব।

মুক্তিময়ী—তুই তাহলে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

জিজ্ঞাসা করেছিল অজয়। কিন্তু সঞ্জীব আরও গম্ভীর হয়ে অজয়কে যে-কথা বলেছে, তাতে অজয় আরও আশ্চর্য হয়েছে, এবং মুক্তিময়ীর বুকটা আতঙ্কে ভরে গিয়েছে।

—তুমি অন্যায় করবে কেন অজয়? অন্যায় করেছে আমার অদৃষ্ট। সঞ্জীবের এই কথার যে কি অর্থ হয়, বুঝতে পারে না অজয় কিন্তু মুক্তিময়ী মনে করেন, একথার অর্থ যদি কিছু থাকে, তবে সেটা এই যে, আজ এই পঁচিশ বছর বয়সের যুবক সঞ্জীব কারও না কারও উপর একটা ঘৃণা সহ্য করতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছে।

রাগ করে কাকে ঘৃণা করছে সঞ্জীব? নিজেকে এত গম্ভীর করে রেখে কিসের বেদনা সহ্য করছে সঞ্জীব?

স্মরণ করতে পারেন মুক্তিময়ী, আজ থেকে ঠিক এক বছর আগের এমনই একটি বিশেষ দিনের সকাল-বেলায় সঞ্জীবের মুখ সেই যে গম্ভীর হয়ে গেল, সে গম্ভীরতাই আজ সকালে একটা রূঢ় বিদ্রোহের মতো যেন চাপা গর্জন করে মুক্তিময়ীর মনের শান্তিকে আতঙ্কিত করেছে। মুক্তিময়ীর বুকের ভিতরটা যেন অপমানে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে।

আজই সকালে ভবতোষ ঘোষের বড় ফটোটার কাছে উপাসনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলেন মুক্তিময়ী, অজয়ও ছিল। আজ হলো ভবতোষ ঘোষের মৃত্যুর তারিখ। আজ থেকে দু'বছর আগে এমনই একটি এগারই বৈশাখে ভবতোষ ঘোষ চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছিলেন।

সঞ্জীব উপাসনায় এসে বসবে, বোধহয় কোন কারণে দেরি করছে; ভবতোষ ঘোষের ফটোর সামনে ফুলের স্তবক আর ধূপের ধোঁয়া; সঞ্জীবের অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিলেন মুক্তিময়ী আর অজয়। কিন্তু খুব বেশি দেরি দেখে খোঁজ নিলেন এবং বুঝতে পারলেন বাড়িতে নেই সঞ্জীব। এই কিছুক্ষণ আগে একটা সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে গিয়েছে।

ভবতোষ ঘোষের স্মৃতিকে আজ কী ভয়ানক অপমান করছে সেই ছেলে, যাকে বুকে তুলে মানুষ করেছেন ভবতোষ ঘোষ, আর সম্পত্তির দু'ভাগের এক ভাগ উইল করে দিয়ে গিয়েছেন! শুধু অজয়কে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে উপাসনা করে উঠে গেলেন মুক্তিময়ী।

কিন্তু নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন মুক্তিময়ী। না, নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে, যে জন্য আজ উপাসনায় এসে বসতে পারেনি সঞ্জীব। ইচ্ছে ছিল নিশ্চয়।

সঞ্জীব বাড়ি ফিরে আসতেই মুক্তিময়ী বললেন—আজ বিকালে আমাকে একবার ওঁর সমাধিতে ফুল দিতে নিয়ে যাবি সঞ্জীব।

সঞ্জীব গম্ভীর হয়ে বলে—আমার সময় হবে না।

মুক্তিময়ীর যন্ত্রণাক্ত চোখ দুটো থরথর করতে থাকে। বুকের ভিতরের আর্তনাদটাও যেন এই দারুণ অপমান সহ্য করতে না পেরে বোবা হয়ে যায়।

আর কোন সন্দেহ নেই, মুক্তিময়ীর এক বছরের আশংকা চরম সত্য হয়ে উঠেছে। ভবতোষ ঘোষের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকী দিনটাতে ফটোর সামনে উপাসনায় বসে হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সঞ্জীব, সেই রহস্য এতদিনে বুঝতে পারা গেল। যার কোলে-বুকে চড়ে চার বছর বয়স থেকে বাপের স্নেহ পেয়েছে, বেঁচেছে, বড় হয়েছে, সেই মানুষকেই ঘৃণা করছে সঞ্জীব। এ কি করে সম্ভব হয়?

মুক্তিময়ীর এই যন্ত্রণাক্ত বিস্ময় আর একবার নীরবে আর্তনাদ করে ওঠে। অজয় এসে মুখ ভার করে মুক্তিময়ীর কাছে বসে, আর আস্তে আস্তে আতঙ্কিতের মতো বলে—দাদা এসব কি বলছে মা?

মুক্তিময়ী—কি?

অজয়—দাদা বলছে, সম্পত্তির ওর অংশ আমাকে গিফ্‌ট করে দেবে।

মাথা হেঁট করলেন মুক্তিময়ী। অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। ধবধবে সাদা থান-শাড়ির আঁচল ভেজা চোখের উপর চেপে আস্তে আস্তে বললেন—তবে আজ বিকালে তুই-ই আমাকে নিয়ে যাবি অজয়—

অজয়—কোথায়?

মুক্তিময়ী—ওঁর সমাধিতে ফুল দিতে।

অজয়—আচ্ছা।

তিন

বিকাল হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে এক ভয়ানক অভিমানের ভারে

যেন স্তব্ধ হয়ে অনড় পাথরের মতো বসে থাকে সঞ্জীব। সঞ্জীবের এই অভিমান এই বাড়ির আজকেরই এই বিকাল বেলার জীবনের কোন বিশেষ অভিমান নয়। এক বছর ধরে সঞ্জীবের মনের ভিতরে একটা বেদনা গুমরে রয়েছে।

ভবতোষ ঘোষের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে ফটো আর ফুলের স্তবকের কাছে উপাসনায় বসতে এসে মা'র মুখের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছিল সঞ্জীব। জলভরা চোখ নিয়ে ভবতোষ ঘোষের যে ফটোর দিকে তাকিয়ে আছেন মা, সেই ফটোর উপর বিন্দুমাত্র রাগ অভিমান ও অশ্রদ্ধা নেই সঞ্জীবের মনে। কিন্তু কেন যেন মুক্তিময়ীর এই জলভরা চোখের উপর একটা হঠাৎ ক্ষোভের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে সঞ্জীবের মন।

যে-বছর মারা গিয়েছেন ভবতোষ ঘোষ সেই বছরেরই একটি দিনে, মৃত্যুর দু'মাস আগে তোলা হয়েছিল ঐ ফটো। ষাট বছর বয়সের এক বৃদ্ধের কী সুন্দর শান্ত স্নেহশীল একটি মুখের ছবি। বৈধব্যের বেদনা আর সঙ্গীহারা জীবনের শূন্যতার দুঃখ চোখের জলে ভিজিয়ে নিয়ে ফটোর দিকে তাকিয়ে আছেন মুক্তিময়ী। কিন্তু·····কই, সঞ্জীব দত্তের বাবা দিনেশ দত্তের ফটো কই? দিনেশ দত্তের ফটোর দিকে এইভাবে জলভরা চোখ নিয়ে বছরের একটি দিনও তাকাবার দরকার কেন হয়নি মুক্তিময়ীর? দিনেশ দত্তের মৃত্যুও তো মৃত্যু, মুক্তিময়ীর স্বামীর মৃত্যু, সঞ্জীবের বাপের মৃত্যু; সেই মৃত্যু কি মুক্তিময়ীর জীবনে কোন বেদনার ঘটনা হয়ে ওঠেনি?

এমন করে কেন মিথ্যে হয়ে গেলেন দিনেশ দত্ত? কে জানে কেন, সঞ্জীবের বুকের ভিতরটাও যেন ছটফট করে কেঁদে উঠেছিল। মুক্তিময়ী যে তাঁর প্রথম স্বামীর স্মৃতিকে, সঞ্জীবের বাপকে তুচ্ছ করে আর ভুলে গিয়ে অপমান করছেন। শুধু একজনের ফটো মুক্তিময়ীর মনের ভিতরে চিরন্তন হয়ে থাকবে, এবং আর একজনের ফটো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ কেমন মন?

এই অভিযোগ যে মুক্তিময়ীর কঠিন হৃদয়টারই বিরুদ্ধে সঞ্জীবের অভিযোগ। ভাবতে গিয়ে যেন নিজেরই প্রাণটার উপর সন্দেহ হয়—তবে কি সঞ্জীবের এই প্রাণটা মুক্তিময়ীর ভালবাসার সৃষ্টি নয়? দিনেশ দত্তকে কি তুচ্ছ করতেই ভালবাসতেন মুক্তিময়ী?

আজ সঞ্জীবের এই অভিযোগে ভরা আর অভিমানে কাতর যে মনটা গুমরে রয়েছে, সেই মনটা যে বাইশ বছর অতীতের একটি মানুষের, মুক্তিময়ীর স্বামী আর সঞ্জীবের পিতা দিনেশ দত্তের ফটো দেখবার আর ফটোর কাছে বসে উপাসনা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

দিনেশ দত্তের স্মৃতি যদি মুক্তিময়ীর কাছে তুচ্ছতা পায়, তবে দিনেশ দত্তের ছেলে সঞ্জীব দত্তের উপর সেই মা-এর স্নেহে কি ফাঁকি থেকে যায় না ? সঞ্জীব আর অজয়কে সম্পত্তির সমান ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন ভবতোষ ঘোষ। তাঁর কথা ভাবলে সঞ্জীবের মন প্রণাম করবার জন্যই ঝুঁকে পড়ে। তাঁর স্নেহে কোন মিথ্যে ছিল না।

কিন্তু মুক্তিময়ী কি তাঁর স্নেহ সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চেয়েছেন ? না না না, কখনই নয়। দিনেশ দত্ত যার কাছে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, তার কাছে দিনেশ দত্তের ভালবাসার উপহার এই সঞ্জীব দত্তও অজয়ের তুলনায় কম আপন হয়ে গিয়েছে। হতে বাধ্য।

মনে পড়ে না তাঁকে, দেখতে কেমন ছিলেন সঞ্জীবের বাবা দিনেশ দত্ত, যাঁর রক্তমাংসের স্নেহ সঞ্জীবের এই শরীরের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। তিনিও তো এই মুক্তিময়ীকে ভালবেসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মুক্তিময়ীর মনে তিনি একদিন সত্যিই একেবারে একটা ছায়ার চেয়েও বেশি নিরবয়ব একটা মিথ্যে হয়ে যাবেন ? সঞ্জীবের কল্পনাতেও যেন এক ব্যথিত স্বামীর মূর্তি তাঁর সারা মুখে অভিমানের বেদনা নিয়ে সঞ্জীবকে বলছে, আমি ভাবতেই পারিনি সঞ্জীব, তোমার মা আমাকে একদিন এমন করে একেবারে ভুলে যাবে।

কিন্তু এই অভিযোগ কি মুখ খুলে কোন দিন মা'র কাছে বলতে পারা যাবে ? বলে লাভই বা কি ? মুক্তিময়ী যদি এখনও সঞ্জীবের অভিমানের অর্থ না বুঝে থাকেন, তবে তো বুঝতেই হয় যে, দিনেশ দত্তকে একেবারে মিথ্যে করে দিয়ে শুধু ভবতোষ ঘোষের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছেন মুক্তিময়ী।

দেখতে পায় সঞ্জীব, গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছে অজয়। সঞ্জীবের চোখ জ্বলে ওঠে। হ্যাঁ, ঠিকই, ভবতোষ ঘোষের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ ঘোষের সমাধিতে ফুল দিতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন মা। যাবেনই তো। স্বামী দিনেশ দত্ত আজ যেমন তাঁর স্মৃতিতে অবান্তর হয়ে গিয়েছে, ছেলে সঞ্জীব দত্তও তেমনি অবান্তর হয়ে যেতে চলেছে।

তবে আর দ্বিধা কেন ? মুক্তিময়ীর কাছে গিয়ে এই অভিযোগ স্পষ্ট করে বলে দিতেই তো পারা যায়—তবে আর কেন ? ভবতোষ ঘোষের স্মৃতিকে নিয়ে, ভবতোষ ঘোষের ছেলেকে নিয়ে আর ভবতোষ ঘোষের সব সম্পত্তি নিয়ে তুমি থাক। আমি যাই, ভবতোষ ঘোষের সম্পত্তির ভাগ আমার নেওয়া উচিত নয়।

ঘর থেকে বের হয়ে মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো ব্যস্তভাবে হেঁটে মুক্তিময়ীর ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় সঞ্জীব।

কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হয়। কারণ ঘরে নেই মুক্তিময়ী। বোধহয় স্নানের ঘরে গিয়েছেন।

একটু অপেক্ষা করতে গিয়েই হঠাৎ চমকে ওঠে সঞ্জীব এবং মনটা আবার একটা দুঃখের ঠাট্টায় করুণভাবে হেসে ওঠে। দিনেশ দত্তের ফটো যাঁর মনের ঘর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে, তিনি দিনেশ দত্তের ছেলে সঞ্জীবের ফটোকে মাথার বালিশের কাছে রেখে দিয়েছেন! ফটোটা মুক্তিময়ীর বিছানায় বালিশের তলা থেকে অর্ধেক মুখ বের করে রয়েছে।

মার উপর রাগ আর অভিমানের জ্বালা চরিতার্থ করবার আর একটা সুযোগ হাতের কাছে পেয়েছে সঞ্জীব। সঞ্জীবের এই ফটোকে এখনি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বুঝে নিক মা, তাঁর এই নাটকীয় স্নেহের অসারতা বুঝে নিয়েছে সঞ্জীব।

অভিমানী দিনেশ দত্তের ছেলে সঞ্জীব দত্ত যেন মুক্তিময়ীর নকল স্নেহের বন্ধন থেকে নিজেকে একেবারে ছিন্ন করে সরিয়ে নেবার জন্ম একটা থাবা দিয়ে ফটোটাকে আঁকড়ে ধরে; চলে যায় সঞ্জীব।

কিন্তু একি? নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে এবং নিজেরই এই ফটোর দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে সঞ্জীব। সঞ্জীবের ফটো নয়। সঞ্জীবেরই মতো দেখতে এক যুবকের ফটো। সেই ফটোর উপর নাম লেখা আছে—দিনেশ দত্ত।

ফটোটার উপর মাথা ঠেকিয়ে একেবারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সঞ্জীব। দৌড়ে গিয়ে মুক্তিময়ীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়।

না, এখনও স্নানের ঘর থেকে ফিরে আসেননি মুক্তিময়ী। ফটোটাকে মুক্তিময়ীর বালিশের তলায় রেখে দিয়ে আবার ঘর ছেড়ে চলে যায় সঞ্জীব।

কিন্তু আর ঘরের ভিতরে নয়। সোজা হেঁটে এগিয়ে যেয়ে গ্যারেজের কাছে দাঁড়ায় সঞ্জীব। একটা ধমক দিয়ে অজয়কে সরিয়ে দেয়—তুই পিছনে বস গিয়ে। আমি ড্রাইভ করবো।

তারপরেই চেঁচিয়ে ডাক দেয় সঞ্জীব।—কত দেরি করছো মা? শিগগির কর।

ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসেন মুক্তিময়ী। ভেজা চুল, আর ধবধবে সাদা-থানের শাড়ি, মুক্তিময়ীর ব্যাকুল চেহারাটা যেন একটা পরম প্রশান্তির স্বপ্নময় আহ্বান শুনে ছুটে বের হয়ে এসেছে।—কি, কি বলছিস সঞ্জীব?

সঞ্জীব—বাবার সমাধিতে ফুল দিতে চল।

সবই জানেন, সবই বুঝতে পেরেছেন বড়দা আর বড়-বউদি। কোন আপত্তি নেই বড়দার, এবং বড়-বউদিরও, সিপ্রার সঙ্গে যদি নীহার মজুমদারের বিয়ে হয়ে যায়। সিপ্রার জীবনটা বিনাদোষে একটা দুর্ভাগ্যের আঘাত পেয়েছে। তিন বছর ধরে এই আঘাতের বেদনা সহ্য করেছে সিপ্রা। কিন্তু আর সহ্য করতে চায় না বোধহয়। বেশ তো! যে বিয়ে সুখের বিয়ে হলো না, যে বিয়ে একটা অভিশাপ হয়ে উঠলো, সেই বিয়ের মিথ্যা শাসন অস্বীকার করে সিপ্রা যদি এখন নীহার মজুমদারকে বিয়ে করে, তবে সেটা মোটেই অশোভন কিছু হবে না।

কোন সন্দেহ নেই, সিপ্রার মতো মেয়ের সঙ্গে নীহার মজুমদারের মতো মানুষকেই মানায়। এমনও মনে হয়, সিপ্রার সঙ্গে ভালবাসা হবে এবং সিপ্রাকে জীবনের সঙ্গিনী করে নিতে হবে বলেই যেন নীহার মজুমদারের জীবনটা একটা লগ্নের অপেক্ষায় ছিল, তাই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও বিয়ে করেনি নীহার মজুমদার।

পাঁচ বছর আগে এই নীহার মজুমদারের সঙ্গেই সিপ্রার বিয়ের কথা উঠেছিল। অজন্তা স্পিনিং এণ্ড উইভিং-এর বার-আনা মালিক নীহার মজুমদার। কিন্তু সেদিন এই সিপ্রাই নিজের মুখে বলেছিল—এমন কি পয়সাওয়ালা মানুষ নীহার মজুমদার, যার জন্যে তোমরা……।

সিপ্রার আপত্তি। কথাটা বেশ হেসে হেসে বলেছিল সিপ্রা। কিন্তু কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সিপ্রার এই হাসিটাই একটা আপত্তি। বড়দা তারপর আর নীহার মজুমদারের নাম উচ্চারণ করেননি। সিপ্রার ইচ্ছার দাবিটা সেদিন আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন বড়দা।

পয়সাওয়ালা মানুষেরই সংসারে গিয়ে ঠাঁই নিতে চায় সিপ্রা কিন্তু সে-মানুষ অন্তত নীহার মজুমদারের চেয়ে বেশি পয়সার মানুষ হবে। সিপ্রার ইচ্ছাটা খুবই স্পষ্ট। বড়-বউদির কাছে আরও স্পষ্ট করে একদিন বলেই দিয়েছিল সিপ্রা, আমাকে লোভী বল আর নির্লজ্জ বল, সোজা কথা এই যে, বেশ বড়লোক পাত্র যদি না পাও তবে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টাই করো না।

সিপ্রার মতো মেয়ের জন্য বেশ বড়লোক পাত্র পাওয়াই বা যাবে না কেন?

বড়-বউদিও খোঁজ নিলেন, চেষ্টা করলেন। তারপর একদিন সিপ্রাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন,—ষ্টেভেডর হর্ষ রায়ের নাম শুনেছ সিপ্রা?

—শুনেছি বৈকি।

—তাঁর বাড়িটা দেখেছ?

—দেখেছি বৈকি। যোধপুর ক্লাবের কাছে নতুন রাস্তার পাশে।

—হর্ষ রায়ের একটা কেমিক্যাল ওয়ার্কসও আছে!

—হ্যাঁ, ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌।

—তা ছাড়া কয়েকটা চা-বাগানও আছে।

—হ্যাঁ, লোহাবাড়ি টি এষ্টেট।

—তুমি এত খবর জানলে কেমন করে?

—হর্ষ রায়ের ভাগ্নী যমুনা নিজেই বলেছে।

—যমুনার সঙ্গে তোমার চেনা হল কবে?

—যমুনা আর আমি যে এক কলেজের বান্ধবী।

—হর্ষ রায়ের ছেলে অরুণ। হর্ষ রায়ের একমাত্র ছেলে, সে খবর জান?

—তাও জানি।

—অরুণকে দেখেছে কখনও?

—একবার দেখেছি।

—কেমন?

—ভালই।

সেই অরুণ রায়ের সঙ্গে সিপ্রার বিয়েটা এতো আনন্দের উৎসব হয়ে উঠেও চারটি বছর যেতে না যেতে একটা আনন্দহীন অভিশাপে পরিণত হবে, এমন পরিণাম কল্পনা করতে পারেননি বড়-বউদি, এবং বড়দাও। বড়দার চেয়ে বড়-বউদি একটু বেশি লজ্জিত এবং দুঃখিত। সিপ্রার সৌভাগ্যের এতো সুন্দর ছবিটা যে একটা মরীচিকার ছবি, সেদিন একটুও সন্দেহ করতে পারেন নি বড় বউদি।

বিয়ের পর দেখতে পাওয়া গেল, হর্ষ রায়ের ঐশ্বর্যের সবই ভুয়া। ঐশ্বর্যের পিছনে বিপুল দেনার কালো-ছায়াও লুকিয়ে ছিল। যেন সিপ্রার এই বিয়ের আনন্দটাকে একটা নির্মম বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে একটা আবর্জনা করে পথের ধুলোর উপর ফেলে দেবার জন্য অপেক্ষায় ছিল ঐ কালো-ছায়া। বিয়ের পর তিনটি মাস যেতে না যেতে হর্ষ রায় মারা গেলেন। তারপর যেন ঝড়ের ফুৎকারে আহত তাসের ঘরের মতো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে গেল হর্ষ রায়ের সেই ফাঁকা ঐশ্বর্যের প্রাসাদ।

বেশি দিন লাগেনি, চার বছরের মধ্যে সবই দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল।

যে অরুণ রায় সকাল বিকাল গাড়ি বদল করে বেড়াতো, সেই অরুণ রায় ট্রামে ওঠবার আগে পকেটে হাত দিয়ে একবার থম্‌কে দাঁড়ায়। পকেটের পয়সা গুণে দেখতে চেষ্টা করে।

তারপর একদিন, যেদিন যোধপুর ক্লাবের কাছে নতুন রাস্তার পাশে সেই বাড়ির দখল নেবার জন্য পাওনাদার ব্যাঙ্কের লোক এসে বাড়ির ফটকে দাঁড়ালো, সেদিন অরুণ রায়ের মুখের দিকে আর না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলে, শুধু তিন বছর বয়সের নীতুর হাত ধরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল সিপ্রা।

তারপর আজ ; সিপ্রার বড়দা এবং বড়-বউদিও ভাবছেন, নীহার মজুমদারের সঙ্গে সিপ্রার বিয়েটা হয়ে গেলে ভালই হয়। কিন্তু……।

এর মধ্যে শুধু একটি কিন্তু আছে, যে জন্য বড়দা একটু ভাবছেন, আর বড় বউদিও বলছেন,—বেশ তো বিয়েটা আগে হয়ে যাক না কেন ; কিন্তু সিপ্রা এখনই কেন বোকার মতো এতটা……।

বড়দা আরও গম্ভীর হয়ে বলেন—এতে আমারও আপত্তি আছে। একটু অশোভন বলে মনে হচ্ছে।…তুমি একবার বলে দেখ।

বড়-বউদি—বলেছি।

বড়দা—কি বলে সিপ্রা ?

বড়-বউদি—আমাদের আপত্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে সিপ্রা।

বড়-বউদির কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে সিপ্রা। নীহার মজুমদারের সঙ্গে সিপ্রার বিয়ে হয়ে যাক, এই শুভ কামনা পোষণ করেন যে বড়দা আর বড়-বউদি, তাঁরা আবার হঠাৎ এত চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেন ?

শুধু বড়দা আর বড়-বউদি কেন, অরুণ রায়ও যে জানে এবং সে ভদ্রলোকও কোন আপত্তি না করে সিপ্রার জীবনের এই পরিবর্তনের আবির্ভাব স্বীকার করে নিয়েছে। বড়দার কাছে কথায় কথায় অরুণ রায় একদিন স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছে যে, না, সিপ্রার জীবনে আমি কোন বাধা হয়ে থাকতে চাই না।

সুতরাং নীহার মজুমদারের সঙ্গে আজ একবার বেড়াতে বের হবে সিপ্রা, এতে বড়দা আর বড়-বউদির আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে ? আশ্চর্য ! আর কিছুক্ষণ পরে নীহারের গাড়ি আসবে। এখান থেকে সোজা পানাগড়। রেষ্টহাউসে কিছুক্ষণের জন্য রেষ্ট। তারপরই ফিরে আসা। ফিরতে একটু রাত হবে, এই যা। হোক রাত। আপত্তি করবার কি আছে ?

মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর মুখ আর সুগঠন দেহের সাজ ছাঁদ আর

প্রসাধনের একটা উৎসবের মধ্যে যেন মত্ত হয়ে রয়েছে সিপ্রা। বেছে বেছে সেই ফিকে নীল বেনারসীকে গায়ে জড়িয়েছে সিপ্রা, যেটা পরলে সিপ্রার ফরসা চেহারা আরও ফুল্ল হয়ে ঢলঢল করে। শাড়ি পরবার ভঙ্গিমাটিও সুন্দর, একটু অদ্ভুত রকমের সুন্দর, যেটা সিপ্রার অদ্ভুত রকমের সুন্দর চেহারার সঙ্গে খুবই ভাল মানায়। কোমরের সঙ্গে শক্ত ও গ্রন্থিল বন্ধনে বাঁধা হয়ে থেকেও শাড়িটা খোলা-খোলা এলোমেলো একটা উৎফুল্লতা। ঠোঁট দু'টি এমনিতেই লালচে, তবুও একবার লিপষ্টিক বুলিয়ে নিতে ভুলে যায় না সিপ্রা। সুন্দর নন-স্মীয়ার রক্তিমতা। চোখের পাতা এমনিতেই বেশ বড়বড় আর বেশ কালো। তবু মাসকারা পেনসিল হাতে তুলে নিয়ে মিররের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সিপ্রা। তার আগে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নেয়! মাত্র সন্ধ্যা ছ'টা। নীহার আসবে সাতটায়।

প্রায় রোজই আসে নীহার। যে'দিন প্রথম এসেছিল নীহার, সেদিন নীহারের সঙ্গে এসে দেখাও দেয়নি সিপ্রা। বড়দার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কারবারের আর অনেক প্রফিটের গল্প বলে চলে গেল নীহার। কিন্তু ঘরের ভিতরে বসে, একটা আহত অহঙ্কারের বেদনায় তপ্ত হয়ে সিপ্রার মনটা নীহারের গল্পের আর হাসির দুঃসাহসকে একটু ঘৃণাই করেছিল। ভদ্রলোক যেন সুযোগ পেয়ে সিপ্রার দুর্ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করতে এসেছে। বড় আশা আর উৎসাহ নিয়ে যে সিপ্রা বসু বড়লোক অরুণ রায়কে বিয়ে করেছিল, সেই সিপ্রা রায় স্বামীকে ঘৃণা করে, তিন বছর বয়সের ছেলের হাত ধরে একটা ট্যাক্সি করে আবার দাদার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। নীহার মজুমদারের বুকের ভিতরটা যেন প্রতিশোধের তৃপ্তিতে হো হো করে হাসছে। নীহার মজুমদার যে জানে, এই সিপ্রা একদিন নীহার মজুমদারকে বিয়ে করতে চায়নি, কারণ সেদিন নীহার মজুমদার এমন কিছু পয়সাওয়ালা ছিল না।

কিন্তু নীহার মজুমদারের আগমন, গল্প আর হাসির উপর সিপ্রার আক্রোশও একদিন লজ্জা পেয়ে মুখ লুকোতে চাইলো। ড্রইংরুমে ঢুকে মাথা হেঁট করে একটা সোফার উপর বসে নীহার মজুমদারের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেছিল সিপ্রা। বড়দা চলে যেতেই, হঠাৎ বলে উঠলো নীহার—আমি সত্যিই দুঃখিত সিপ্রা।

—কেন?

—তোমার জীবনের দুঃখ দেখে। আমি ভাবতেই পারিনি যে, তোমার মতো মেয়েকে কখনও এরকম দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হবে।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে নীহার মজুমদারের সেই বিষণ্ণ ও বিমর্ষ মুখের দিকে তাকায় আর আশ্চর্য হয়ে যায় সিপ্রা।

নীহার বলে—তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে আর আমি এখানে আসবো না সিপ্রা। বল।

সিপ্রা বলে—কোন আপত্তি নেই। আসবেন বৈকি।

আজ আর কোন সন্দেহ নেই, নীহার মজুমদার সিপ্রাকে ভালবাসে, সিপ্রা নীহারকে ভালবাসে। আর, সেই অরুণ রায় আজ সিপ্রার জীবনে একেবারে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। অরুণ রায় এখন অতীতের একটা তিক্ত স্মৃতি মাত্র। অরুণ রায় এখন নিরর্থক সম্পর্কের একটা ছায়া মাত্র। কিন্তু…।

কিন্তু একটা অস্বস্তি এই যে, সেই ছায়া মাঝে মাঝে এখানে আসে। বড়দা আর বড়-বউদি একেবারেই পছন্দ করেন না যে, অরুণ এখানে আসে। সিপ্রা বিরক্ত হয়ে উপরতলার একটি ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, যখন শোনা যায় যে অরুণ এসে নীচের তলার বারান্দার চেয়ারের উপর বসে আছে।

সবচেয়ে বেশি দুঃসহ অস্বস্তি বুড়ো দারোয়ানটা এখনও চেঁচিয়ে হাঁক দিয়ে বলে—জামাইবাবু এসেছেন। আর, চার বছর বয়সের নীতু বলে—বাবা এসেছে।

শুধু নীতুকে একবার দেখবার জন্যই আসে অরুণ রায়। এই একটা স্বস্তি; এবং এই জন্যই বড়দা খুব বেশি বিরক্ত হতে পারেন না। একদিকে বিরক্তি আর অপছন্দ, আর একদিকে কেমন-যেন একটা দুর্বলতা, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন বড়দা, আসুক না অরুণ, তাতে কি আসে যায়? শুধু ছেলেটাকে দেখবার জন্যে আসে। এই মাত্র। এসে কোন তর্ক করে না, কারও সঙ্গে কোন কোথাও বলে না। বেহায়ার মত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, আর নীতুকে একবার দেখে নিয়েই চলে যায়। এর জন্য ওর ওপর রূঢ় হবার কোন দরকারই হয় না। অরুণের এখানে আসা পছন্দ না করলেও সহ্য করেন বড়দা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

বড়দার বিরক্তি দেখে একদিন শুধু তর্ক করেছিল অরুণ।—আপনাদের যদি আপত্তি থাকে তবে আমি আসবো না।

বড়দা—আপত্তি ঠিক করছি না…তুমি তোমার ছেলেকে দেখতে আসবে তাতে…

অরুণ হাসে—আমার ছেলে বলে কোন দাবি আমার নেই।

বড়দা—কেন?

অরুণ—যে ছেলেকে আপনারা খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তার ওপর

আমার অধিকার কেমন করে হবে বলুন?

বড়দা—বুঝলাম, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, সিপ্রা এটা পছন্দ করে না।

—কেন?

—সিপ্রা একটু ভয় পায় বোধহয়।

—কোন ভয় নেই। সিপ্রাকে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন!

—আর একটা কথা।

—বলুন।

—তুমি যদি সিপ্রার সঙ্গে কথাটথা বলবার জন্য কোন দিন···।

—কোনদিনও না। সিপ্রার সঙ্গে কথা বলবার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

রোজ নয়, বড় জোর মাসে একবার আসে অরুণ। প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে একবার আসতো। কলকাতায় নয় চন্দননগরে থাকতে হয়, কোন্ এক কারখানার অফিসে কেরানীর কাজ করে অরুণ। দারোয়ান একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিল বলে এই তথ্যটুকু জানতে পেরেছেন বড়দা। জানতে পেরেছে সিপ্রাও।

অস্তিত্বটা এই বাড়ির যেন গা-সহা হয়ে গিয়েছে। অরুণ আসে আর চলে যায়, সত্যিই ছায়ার মতো একটা বস্তু আসে আর চলে যায়। এমন কি অনেক সময় বাড়ির উপরতলার কোন মানুষ বুঝতেও পারে না যে, অরুণ এসে চলে গিয়েছে। উপরতলা থেকে নীতুকে নীচে নামিয়ে অরুণের কাছে নিয়ে আসে দারোয়ান; তারপর আবার উপরে তুলে দিয়ে আসে। উপরের বারান্দায় ছুটে ছুটে খেলা করে নীতু।

অরুণ নামে একটা ছায়া দু'দিন আগেও দুপুরে একবার এসেছিল। ঠিক কখন এসেছিল কে জানে। বড়দা জানেন, বড়-বৌদি জানেন, নীতু সেদিন দুপুরে কি কথা বলেছিল।

দুপুর বেলা উপরতলার হলঘরে তখন বড়দার সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলছিল সিপ্রা। আর, বড়-বউদি গল্পের বই পড়ছিলেন। দৌড়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল নীতু।

—কি নীতু? নীতুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খায় সিপ্রা।

নীতু বলে—বাবা বিচ্ছিরি।

হলঘরের মনটা যেন চুপ করে আর উৎকর্ণ হয়ে নীতুর মুখের আধ-আধ ভাষায় এক প্রচণ্ড বাস্তব সত্যের প্রতিধ্বনি শুনতে থাকে।

—বাবা একটুও ভাল নয়। ছেঁড়া জামা। ময়লা জুতো। পকেটে নস্যি। দাড়ি ঘষে।

নীতুর কাছে বাবা কথাটা একটা কথা মাত্র। একটা লোকের নাম। মাঝে মাঝে আসে আর চলে যায়, একটা মানুষের নীরব অস্তিত্ব। কিন্তু সন্দেহ হয় সিপ্রার, নীতুর গালে বোধহয় গাল ঘষেছে লোকটা।

এমন যে চার বছর বয়সের নীতু, যাকে দেখবার জন্য একটা লজ্জাহীন পাগলামির টানে এখানে আসে অরুণ, সেই নীতুও যে ওকে সহ্য করতে পারে না। নীতুর মুখের এই ঘোষণা যে অরুণ রায়ের চরম অদৃষ্টের ঘোষণা।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভেবেছিলেন বড়দা। তারপরেই বলেছিলেন—তুই কি নীহারকে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না?

সিপ্রা—করেছি।

—কি বলে নীহার?

—যা বলবার তাই বলেছে।

—বিয়ে করতে চায়?

—হ্যাঁ।

—তুই!

—হ্যাঁ।

আবার কি যেন ভেবেছিলেন বড়দা। তারপর টেনিস-ব্যাট রেখে দিয়ে আর মাথার সাদা চুলের স্তবকে হাত বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ ধমকের সুরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।—অরুণকে এবার স্পষ্ট করেই বলে দিতে হবে, আর যেন এখানে না আসে।

ঘড়ির দিকে আবার তাকায় সিপ্রা। ছটা বেজে মাত্র দশ মিনিট হয়েছে। এখনও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

বাইরের বারান্দা থেকে ছুটে এসে ঘরের ভিতর ঢোকে নীতু। সিপ্রার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার পরেই সিপ্রার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে লোভীর মতো ছটফট করে লাফাতে থাকে—মা, চুমু।

নীতুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নীতুর দু'গালে চুমো খেয়ে খেয়ে সিপ্রা ছটফট করে। নীতু বলে তুমি বেড়াতে যাবে?

—হ্যাঁ নীতু।

—কার সঙ্গে?

—নীহারবাবুর সঙ্গে।

দরজার দিকে একবার সাবধানে তাকায় সিপ্রা। তারপর গলার স্বর একেবারে মৃদু করে নিয়ে আরও সাবধানে ফিসফিস করে বলে—যাব নীতু?

—যাও।

—তুমি রাগ করবে না তো?

—না।

—কেন?

—নীহারবাবু খুব ভাল।

হাঁপ ছাড়ে সিপ্রা, আর মুখটাও হেসে ওঠে। কে জানে, হয় তো সিপ্রারই নিঃশ্বাসের ভিতরে একটা ভীরুতা হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছিল। সেই ভীরুতা যেন এই চার-বছর বয়সের নীতুর মিষ্টি কথার সান্ত্বনায় মুছে গেল।

মিথ্যে ভয় করছেন বড়দা, মিথ্যে চিন্তা করছেন বড়-বউদি। নীতুর মতো এই শিশুর চোখও যে ভুল করে না, সেই ভুল করেছেন বড়দা আর বড়-বউদি। যেন নীহার মজুমদারকে একটু অবিশ্বাস করছেন দু'জনে। তা না হলে নীহারের সঙ্গে সামান্য একটা বেড়াতে যাবার ঘটনাকে বাধা দেবার কথা ওদের মনে হয় কেন।

আজই তো নীহার মনের ভিতরে কোন কুণ্ঠা না রেখে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করেছে,—মনের ভেতর কিছু চাপা না রেখে সোজা স্পষ্ট করে বলে দাও সিপ্রা।

—কি বলবো?

—যদি কোন সন্দেহ থাকে।

—কিসের সন্দেহ?

—কেউ কেউ যে সন্দেহ করে?

—কে করে?

—আমারই কোন কোন বন্ধু এবং হয়তো তোমার দাদাও। আমি নাকি আমার পুরনো রাগের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমার সঙ্গে একটা নকল ভালবাসার খেলা খেলছি।

নীহার মজুমদারের চোখে একটা অদ্ভুত কৌতুকের জ্বালা যেন জ্বলছে। সিপ্রাও যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে।—একি অদ্ভুত সন্দেহের কথা বলছো নীহার? তুমি এমন ভয়ানক মতলব নিয়ে···একি কখনও সম্ভব?

—তাহলে স্পষ্ট করে বল, তুমি বিশ্বাস কর।

—কি?

—আমি তোমাকে ভালবাসি।

—নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

—বিশ্বাস কর কি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই ?

—নিশ্চয় চাও নীহার, আমি একটুও অবিশ্বাস করি না।

—তাহলে চল আজ বেড়িয়ে আসি।

নীহার মজুমদারের গলার স্বরে একটা প্রচণ্ড মোহময় আবেদন আর দু'চোখের ঐ অপলক চাহনিতে একটা দুর্বার আকর্ষণ সিপ্রার মনের শেষ কুণ্ঠার প্রাণটাকেও যেন ধীরে ধীরে শিথিল করে দিচ্ছে। কুণ্ঠা করে লাভ কি ? কিসের ভয় ? এই ভয় ভয়ই নয়। সিপ্রার স্বামী হবে যে নীহার মজুমদার, তার কোন আশার দাবী সিপ্রার কাছে ভয়ের ব্যাপার হতে পারে না।

আজই সকালে ড্রইংরুমের ভিতরে সোফার উপর বসে আর নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে শিপ্রাও একেবারে স্পষ্ট করে সিপ্রার জীবনের চরম স্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে।—বেশ তো আমার কোন আপত্তি নেই।

নীতুকে ছেড়ে দিতেই চলে গেল নীতু। ঘড়ির দিকে তাকায় সিপ্রা। ছটা বেজে পনর মিনিট।

দরজার কাছে একটা ছায়া। বড়দা এসে দাঁড়িয়েছেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর বেশ একটু বিচলিতস্বরে বড়দা হঠাৎ বলে ওঠেন—নীহারের সঙ্গে আজই, এত রাত্রি করে, এত দূরে বেড়াতে যাওয়া ভাল দেখায় না সিপ্রা।

—কেন ? সিপ্রা হাসে।

—এসব ব্যাপার বিয়ের পরেই ভাল দেখায়।

—তার মানে নীহারবাবুকে এখনও অবিশ্বাস করতে বলছো ?

—ছি ছি, এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। শোভনতা আর অশোভনতার কথা।

—আমার ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগছে বড়দা।

—কি ?

—তোমরা আজ কেন হঠাৎ এরকম একটা অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করেছ ?

বড়দার মুখের ভাব অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, কিন্তু আর কোন কথা না বলে আবার শান্তভাবে চলে যান।

কিন্তু সিপ্রার মনের ভিতরে চার বছরের একটা বিদ্রোহের জ্বালা যেন নতুন করে জ্বলে ওঠে। আজ সব ভুলে গেলেন কেন বড়দা ? বড়দা নিজেই কতবার যোধপুর ক্লাবের কাছে সেই বাড়িতে গিয়ে, অরুণের সামনেই আক্ষেপ করেছিলেন —তোমার ভাগ্যটা যেন সিপ্রাকে কষ্ট দেবার মতলব করে এত শিগগির দরিদ্র

হয়ে গেল। এরকমটা আমি ভাবতেই পারিনি। ছিঃ!

সেই বড়দা আজ সিপ্রার মুক্তির লগ্নকে বাধা দিতে চান কেন? না, নীহার মজুমদারের সঙ্গে অভদ্রতা করে আবার ভুল করতে পারবে না সিপ্রা। কখনই না।

ঘড়ির দিকে তাকায় সিপ্রা। সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছে।

কি আশ্চর্য, বড়দা এবং সেই সঙ্গে বড়-বউদিও আবার এসে সিপ্রার ঘরের দরজার কাছে দু'টি প্রশ্নের প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়ালেন।

বড়দা বলেন—না গেলেই ভাল হয় সিপ্রা।

বড়-বউদি—সামান্য একটা বেড়াতে যাবার ব্যাপার তো, না গেলে নীহার অখুশি হবে না।

বড়দা—তার চেয়ে অনেক খুশির ব্যাপার হবে, যদি এখন তুমি আর নীহার এখানেই টেবিল টেনিস খেলে আর গল্প করে।...

সিপ্রা—না। নীহারকে আবার অপমান করবার পরামর্শ আমাকে দিও না।

কোন কথা না বলে, বিরক্তি আর আপত্তির দু'টি হতাশ ছায়ার মতো নীরবে চলে যান বড়দা আর বড়-বউদি।

সিপ্রাও ঘর ছেড়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে টবের গোলাপের গায়ে হাত বোলায়। আবার ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ও ঘাড়ের উপর পাউডার পাফ করে। নিজেরই চোখের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সিপ্রা। মাসকারা বোলানো চোখের পাতায় যেন নিবিড় মেঘের মায়া কালো হয়ে কাঁপছে।

আর কত দেরি? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এইবার একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে সিপ্রা। সাতটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের পৃথিবীর আলোছায়াময় শোভার দিকে একবার তাকায় সিপ্রা। বাগানের ঝাউ-এর গায়ে আলো। সে ঝাউ-এর ছায়া ব্যাকুল হয়ে কাঁপে। যেন বুঝতে পেরেছে এই সন্ধ্যা সাতটার আলো-ছায়া, সিপ্রার জীবন আজ সত্যিকারের সৌভাগ্যের দীক্ষা পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট লাফানির শব্দ নাচতে নাচতে সিপ্রার কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। নীতু আসছে।

নীতুকে বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে বার বার চুমো খায় সিপ্রা।

নীতু বলে—বাবা ভাল।

চমকে ওঠে সিপ্রা।—কে বললে ?

নীতু—হ্যাঁ, খুব ভাল।

নীতুর মুখের ভাষাটাও কি বড়দার চিন্তার মতো হঠাৎ অকারণে এলোমেলো হয়ে গেল ? আশ্চর্য হয়ে, নীতুর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে সিপ্রা—কেন নীতু ?

নীতু—বাবার ছেঁড়া জামা, ময়লা জুতো, পকেটে কিছ্‌ছু নেই। দাড়ি ঘষে।

কি অদ্ভুত যুক্তি ! অরুণ রায় নামে একটা লোকের জীবনের গ্লানিগুলিকেই যেন গৌরব বলে ঘোষণা করছে নীতুর মুখের আবোল-তাবোল ভাষা। ছেঁড়া জামা আর ময়লা জুতোও দেখতে ভাল লেগে গেল নীতুর ? পকেটে কিছুই নেই, তা'ও যেন লোকটার জীবনের একটা মহিমা ! নীতুর গাল জ্বলিয়ে দেয় যার খসখসে গালের ঘষা, তাকে ভাল বলে মনে হয় নীতুর ? নীতুর চার বছর বয়সের প্রাণটা যেন একটা বিরাট অনুভবের মায়ায় বদলে গিয়ে ভয়ানক সুরের আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে।

—কেন নীতু ? কেন ভাল ? ছেঁড়া জামা ভাল কেন হবে ? ময়লা জুতো দেখতে ভাল লাগবে কেন ?

যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে নীতুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ছটফট করে ওঠে সিপ্রা। নীতুকে চোখের সামনে রেখে যেন নিজের অদৃষ্টেরই একটা নির্মম কৌতুককে প্রশ্ন করে করে মাথা খুঁড়ছে সিপ্রার অন্তরাত্মা—কেন ? কেন ? কেন ?

নীতু বলে—বাবা কাঁদে।

মাসকারা বোলানো, মধুর কালিমার প্রলেপ দিয়ে নিবিড় করা চোখের-পাতা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। দু'চোখ বন্ধ করে সিপ্রা। ফিকে নীল বেনারসির এলোমেলো উৎফুল্লতাও যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

ফুঁপিয়ে ওঠে সিপ্রা।—তুমি কি ভয়ানক, কি অদ্ভুত কথা বললে নীতু !

অদ্ভুত বটে। একটা লোক শুধু কেঁদে ফেলেছে বলেই তার জীবনের সব বিচ্ছিরি দীনতা একটা সুন্দরতার ঐশ্বর্য হয়ে গিয়েছে, নীতুর চোখে এ কোন্ অদ্ভুত ক্ষমা আর অদ্ভুত যুক্তি !

—নীতু। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সিপ্রা।

নীতু—বলে—কি ?

সিপ্রা—কোথায় তোমার বাবা ?

নীতু—নীচে।

গেটের দিকে তাকায় সিপ্রা। সিপ্রার ভেজা চোখ দুটো একটা নীরব আর্তনাদের বেদনায় চমকে ওঠে। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে সেই মানুষটা, অরুণ নামে একটা ছায়া, এক বছর আগে যার মুখের দিকে না তাকিয়ে আর কোন কথা না বলে চলে এসেছিল সিপ্রা।

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না সিপ্রা। যেন একটা উতলা আক্রোশের আবেগে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যায়।

—শুনছো! ডাক দেয় সিপ্রা। গেটের কাছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অরুণ রায়। কামিজের কাঁধের কাছে একটা ফুটো, আর আস্তিনের একটা জায়গা ছেঁড়া, অরুণ রায়।

এগিয়ে যায় সিপ্রা, আর. যেন এই চার বছরের সব আক্রোশের ও ঘৃণার একটা ভয়ানক পরাজয়ের বেদনায় ছটফট করে উঠে আস্তে আস্তে বলে—চলে যাচ্ছ কেন?

আশ্চর্য হয়ে সিপ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অরুণ রায়। সিপ্রা ডাকে —এস।

অরুণ—কিন্তু, তুমি যে কোথায় যাবে বলে তৈরী হয়েছ।

কটমট করে তাকায় সিপ্রা—কে বললে? নীতু?

অরুণ রায়—হ্যাঁ।

সিপ্রা—তাই কেঁদে ফেলেছো।

চমকে ওঠে অরুণ। মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সিপ্রা বলে—ছিঃ।

নীহার মজুমদারের গাড়ি উতলা হয়ে ছুটে এসে গেটের কাছে থামে আর উল্লাসের হর্ণ বাজাতে থাকে।

অরুণ রায়ের একটা হাত ধরে ব্যস্তভাবে টান দেয় সিপ্রা।—ঘরে চল।

—তুমি? প্রশ্ন করে সিপ্রার মুখের দিকে তাকায় অরুণ।

হেসে ফেলে সিপ্রা।—আমি আবার কি? আমি সিপ্রা।

অরুণ—কিন্তু…

সিপ্রা—কোন কিন্তু নেই। আমি কোথাও যাচ্ছি না। কোন দিন যাবও না। বেশি আশ্চর্য হয়ে তাকিও না।

এই কলকাতা শহরে আজও এমন পাড়া আছে, যে পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বাজে। প্রতি বৃহস্পতিবারে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়। শাঁখের শব্দে পাড়ার বাতাস যেন গম্ভীর হর্ষের একটা উৎসব জাগিয়ে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাটাকে যেমন মুখর তেমনই চঞ্চল করে তোলে। পাড়ার নাম দেউলপাড়া।

দেউলপাড়া লেন পার হলেই হাটখোলা। তারপর গঙ্গার ঘাটে পৌছতে কতক্ষণই বা সময় লাগে? দেউলপাড়ার ভিতর দিয়েই অন্য অনেক পাড়ার মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে যায়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, এমন কি রাত্রিতেও দেখা যায়, ভেজা কাপড়ে চবচবে হয়ে নারী আর পুরুষের এক একটা মূর্তি এই দেউলপাড়া লেনের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে।

দেউলপাড়াতে একটা দেউল ছিল ঠিকই এবং সেই দেউলটার অন্তিমকালের কিছু কিছু ইট এখনও নবীন মিত্রের বাগানের এক কোণে পড়ে আছে দেখা যায়। নবীন মিত্র বলেন, দেউলপাডার এই মিত্তিররাই হলেন এই পাড়ার আদিমতম অধিবাসী। নবীন মিত্রের বাড়িটার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এবং বিশ্বাস করতেও কোন আপত্তি হয় না, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন নবীন মিত্র। এই বাড়ির চেয়ে পুরনো চেহারার কোন বাড়ি দেউলপাড়াতে আর নেই। বাড়িটা যেন একটা পুরনো ইতিহাসের স্মৃতি গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। নবীন মিত্রের বাড়ির ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলেই প্রথমে যে ঘরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে হয়, সেই ঘর বৈঠকখানা নয়। সেই ঘর হলো ঠাকুরঘর। রাস্তার উপর থেকেই নবীন মিত্রের বাড়ির এই ঠাকুরঘর দেখা যায়। এবং ঠাকুরঘরের দরজা খোলা থাকলে বিগ্রহকেও দেখা যায়।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি। মূর্তিটা বেশ বড়। শ্বেতপাথরের যে বেদীর উপর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই বেদীও বেশ উঁচু। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর চকচকে কালোপাথরের বিষ্ণুমূর্তি। দেখতে বেশ ভালই দেখায়।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুর চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। পাথরের চক্র পাথরের গদা ও পাথরের পদ্ম। কিন্তু শঙ্খটা সত্যই শঙ্খ। এরকম ধবধবে সাদা এবং এতবড় আকারের শঙ্খ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

এই কালোপাথরের বিষ্ণুমূর্তি কেমন করে আর কোথা থেকে পাঁচপুরুষ আগের এক অতি গরীব মিত্তিরের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে গল্প

আজকের নবীন মিত্রও ভুলে যাননি। তা ছাড়া, আরও একটা ঘটনার মহিমা এই বিষ্ণুমূর্তির ইতিহাসে আছে; এই বিষ্ণুর হাতের ঐ প্রকাণ্ড শ্বেতশঙ্খ একদিন বেজে উঠেছিল।

কে বাজিয়েছিল? স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই বাজিয়েছিলেন। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার আরতির পর বাইরে থেকে দরজার কড়ায় তালা বন্ধ করে পূজারী রোজই যেমন চলে যেতেন, সেই সন্ধ্যাতেও তেমনই চলে গিয়েছিলেন। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। আজকের প্রৌঢ় নবীন মিত্র সেদিন দশ বছর বয়সের ছেলেমানুষ ছিলেন। রাত্রিবেলা হঠাৎ বেজে উঠলো শঙ্খ, সে শঙ্খের স্বরও অদ্ভুত। আজও স্মরণ করতে পারেন নবীন মিত্র, কি অদ্ভুতরকমের একটা গম্ভীর শব্দের শিহর ছড়িয়ে দিয়ে সেই শঙ্খ বেজেছিল।

বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং আশ্চর্য হয়েছিল সবাই। কোথায় বাজছে এই শঙ্খ! কে বাজাচ্ছে? শব্দটা যে ঠাকুরঘরের ভিতর থেকেই বের হয়ে আসছে। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার উপর কান পেতে বাড়িসুদ্ধ মানুষ, এবং দশবছর বয়সের নবীন মিত্রও শুনেছিল। এবং কোনই সন্দেহ ছিল না যে, বিষ্ণুমূর্তির হাতের ঐ শঙ্খই বাজছে।

দরজা বন্ধ, ঠাকুরঘরের ভিতরে কেউ নেই। সুতরাং বুঝতে পারা গিয়েছিল, এবং সকলেই বিশ্বাস করতে বাধ্য না হয়ে পারেনি, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু ছাড়া আর কে বাজাবেন ঐ শঙ্খ? ঠাকুরঘরের দরজা খুলে দেখতেও পাওয়া গিয়েছিল, শঙ্খের মুখের উপর যে ফুলটা ছিল, সে ফুলটা নীচে পড়ে গিয়েছে। পড়ে যাবেই তো! ঠাকুর যে নিজেই শঙ্খটাকে নেড়েছেন, মুখের কাছে তুলেছেন আর ফুঁ দিয়েছেন।

পরের দিনই বিলেত থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল। প্রিভি কাউন্সিলের রায় বের হয়েছে। নবীন মিত্রের বাপ মাধব মিত্রের চরম আপীল সার্থক হয়েছে। মামলায় জয়ী হয়েছেন মাধব মিত্র। জ্ঞাতিভাই গোষ্ঠ মিত্র এই দেউলপাড়ার সম্পত্তি দাবি করে যে মামলা করেছিলেন, সে মামলায় হেরে গেলেন গোষ্ঠ মিত্র। দেউলপাড়ার সব জমি, সব বাগান, দু'টি পুকুর, আর পুরনো বাড়ির সব অংশের উপর নবীন মিত্রের বাপ মাধব মিত্রের মালিকানা একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে গেল।

গোষ্ঠ মিত্রের এক বংশধর আজও আছেন। তিনি থাকেন ঐ হাটখোলার একটা গলিতে। খবরের কাগজের ঠোঙার একটা দোকান করেন। তাঁর ঠাকুর ঘরে বেশ বড় একটা শিবমূর্তি দেখা যায়।

নবীন মিত্রের পারিবারিক জীবনের একটা নিয়মও সেই থেকে চলে আসছে, পিতা মাধব মিত্রের জীবনের সেই জয়ের ঘটনার পর থেকে। শাঁখ বাজানো নিষেধ। বাড়ির মানুষ আর কখনো শাঁখ বাজাবে না। যে বাড়ির বিগ্রহ-দেবতা নিজেই শাঁখ বাজিয়ে বাড়ির সুখ শান্তি আর পুণ্য আহ্বান করেছেন সেই বাড়ির মানুষের পক্ষে নিজের হাতে শাঁখ তুলে ফুঁ দেবার আর দরকার হয় না। সে অধিকারও নেই। নিজেরা শাঁখ বাজালে যে ঠাকুরের কৃপাকেই অবিশ্বাস করা হবে! বিশ্বাস করেন নবীন মিত্র, যেমন বিশ্বাস করতেন তাঁর বাবা মাধব মিত্র, যেদিন ঠাকুর এই বাড়ির জীবনে, এই দেউলপাড়ার জীবনে, আবার নতুন করে কোন সুখ শান্তি আর পুণ্য দিতে চাইবেন, সেদিন তিনি নিজেই শঙ্খ বাজাবেন। নবীন মিত্রের ঠাকুরঘরের শ্রীবিষ্ণুকে পূজারী চক্রবর্তী মশাই শুধু ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করে চলে যান। শাঁখ বাজান না।

আজ দেউলপাড়া লেনের দু'পাশে ছোটবড় এতগুলি বাড়িতে যারা থাকে, তারা নবীন মিত্রের জ্ঞাতি নয়। তারা হলো বাড়িওয়ালা নবীন মিত্রের এতগুলি ছোটবড় বাড়ির ভাড়াটিয়া বাসিন্দা। কিন্তু এইসব বাড়িতে শাঁখ বাজে। যে-কোন উৎসবের দিনে, যে-কোন পুণ্যক্ষণে শাঁখ বাজে। নবীন মিত্র মোটেই পছন্দ করেন না যে, দেউলপাড়ার কোন বাড়িতে শাঁখ বাজুক। তাঁর বিশ্বাস, চকচকে কালোপাথরের এই শ্রীবিষ্ণু শুধু তাঁরই গৃহবিগ্রহ নন, সমস্ত দেউলপাড়ার বিগ্রহ। এই বিগ্রহ যে দেউলপাড়ার সুখ শান্তি আর পুণ্য নিরাপদ করে রাখবার ভার নিয়ে, সেই শ্বেতশঙ্খ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা পাড়ার এইসব বাড়ির মানুষগুলি অবিশ্বাস করে না। কিন্তু তারা নবীন মিত্রের সেই ইচ্ছা আর অনুরোধের মূল্যও বোঝে না। নিজেরাই শাঁখ বাজায়।

শুধু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতে নয়, বছরের আরও কতগুলি বিশেষ বিশেষ দিনে দেউলপাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দ বেজে ওঠে। এবং নবীন মিত্রের মনটা কেন যেন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

দেখতে পান নবীন মিত্র, পাড়ার এ-বাড়ি আর সে-বাড়ির যত কাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ে শাঁখ বাজায়। যেন একটা ছেলেমানুষী উৎসবের আনন্দে মত্ত হয়ে শাঁখ বাজায় ওরা। এটা না হলেই ভাল ছিল। বাড়ির বুড়োরা যদি একটু বিবেচনাশীল হতো, তবে বোধহয় শাঁখ বাজিয়ে এক-একটা শুভদিন আর পুণ্য-লগ্নে এরকম ফষ্টি করতে ওরা ভয় পেত, সাবধানও হতো।

নবীন মিত্রের আর একটা বিশ্বাস—দেউলপাড়ার ঘরে ঘরে এভাবে শাঁখ বাজে বলেই বোধহয় বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর হাতের শঙ্খ নীরব হয়ে গিয়েছে। আর

তো, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর হাতের ঐ শ্বেতশঙ্খ বেজে উঠলো না। নবীন মিত্র সন্দেহ করেন, পাড়ায় মানুষ শাঁখ বাজিয়ে ধর্ম আর উৎসবের পুণ্যের সঙ্গে চটুলতা করে বলেই শ্রীবিষ্ণুর কৃপা কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তা না হলে এত দিনের মধ্যে অন্তত কয়েকবার, এবং পাড়ার এতগুলি দুঃখ আর আপদের ঘটনার মধ্যে অন্তত অনেকবার এই বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর হাতের শ্বেতশঙ্খ বেজে উঠতো, আর দেউলপাড়ার বিপদ কেটে যেতো।

স্বাধীনতা দিবস নামে একটা রাজনীতিক পুণ্যের দিবস দেশের মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। গবর্ণমেণ্টও খুব ঘটা করে এই দিনটিকে মাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। পনরই আগস্ট দেউলপাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে।

কিন্তু কি লাভ হলো? খুব চিন্তা করে আর হিসেব করে দেখেছেন নবীন মিত্র; পাড়ার দু'চার জন প্রবীণের কাছেও বলেছেন, কি লাভ হলো? এই স্বাধীনতা কি সত্যিই স্বাধীনতা হলো? দেশের সরকারকে এত পস্তাতে হচ্ছে কেন? দেশের মানুষের দুর্গতি এত বেড়ে গেল কেন? স্বাধীনতা যে ব্যর্থই হয়ে গেল।

নবীন মিত্র তাঁর বিশ্বাসের কথাটাকে অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন। আমার ধারণা, এবং আপনারা বেঁচে থাকলে দেখতেই পাবেন, দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হবে যেদিন, সেদিন দেউলপাড়ার বিগ্রহ এই শ্রীবিষ্ণুর হাতের শঙ্খ বেজে উঠবেই উঠবে।

স্বাধীনতা হবার আগে, এক একটা স্বরাজী হাঙ্গামার দিনে এই দেউল-পাড়ার মানুষ শাঁখ বাজিয়েছে। শাঁখ বাজিয়ে বিলাতী কাপড় পুড়িয়েছে। শাঁখ বাজিয়ে একজন নেতার শোভাযাত্রাকে সম্মান জানিয়েছে। এমন কি, সেই উনিশশো বিয়াল্লিশের কয়েকটা দিনে, যখন গুলী চালিয়ে মানুষ মারবার জন্য ইংরাজ সরকারের পুলিশ দেউলপাড়ার এই সরু পথের দিকে বন্দুক হাতে ছুটে এসেছে, তখন ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠেছে আর হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে পাড়ার ছেলেরা।

নবীন মিত্র হিসাব করে দেখেছেন, বুঝেছেন, এবং পাড়ার প্রবীণদের কাছে বলেছেন, কি লাভ হলো মশাই? এত শাঁখ বাজানো হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সবই ব্যর্থ হলো।

সেই বিলাতি কাপড় আবার পরতে হয়েছে। সেই নেতা ভদ্রলোক জেলে গিয়েছে আর অসুখে মরেছে। উনিশশো বিয়াল্লিশের হাঙ্গামার ছেলেগুলো আজ আর চাকরি পায় না। সব পরিণাম এইভাবে হিসেব করে বুঝিয়ে দিতে

পারেন নবীন মিত্র।

দেউলপাড়াতে আরও একটা বিশেষ ঘটনার দিবসে শঙ্খধ্বনির উৎসব জাগে। জন্মক্ষণের অভিনন্দন। পাড়ার কোন বাড়িতে নবজাতক মানুষের প্রথম কান্নার স্বর বেজে উঠতেই পাড়ার যত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের অন্তরাত্মা যেন একটা হঠাৎ উৎসবের আবেগে একেবারে হুল্লোড় করে জেগে ওঠে। এক-একটা শাঁখ হাতে নিয়ে সকলেই নবজাতকের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, আর শাঁখ বাজায়। টেনে টেনে, থেমে থেমে, কাড়াকাড়ি করে সকলেই শাঁখ বাজিয়ে একটা আগন্তুক নতুন প্রাণের ধ্বনিকে অভ্যর্থনা করে। এই মাসেও দেউলপাড়াতে এইরকম চারটে দিবসে শাঁখ বাজানো হুল্লোড় হয়ে গিয়েছে। ভোলাবাবুর একটি মেয়ে হয়েছে। জিতুর একটা ভাই হয়েছে। প্রমথবাবুর মেয়ের যমজ ছেলে হয়েছে। আর, বিয়ের পর পনর বছরের মধ্যেও যে প্রতিমা-বউদির কোন সন্তান হয়নি, তাঁরও একটি ছেলে হয়েছে।

এই ধরনের ঘটনার উপর মন্তব্য করতে নবীন মিত্র একটু অসুবিধায় পড়েন। শাঁখ বাজাবার পরিণাম যে খুবই খারাপ হয়েছে, প্রমাণ করতে পারেন না নবীন মিত্র। কারণ, যে মানুষগুলির জন্মক্ষণের কান্নাকে দেউল-পাড়ার শাঁখের শব্দ অভ্যর্থনা করেছে, সে মানুষগুলির সবারই প্রাণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন নির্মম সত্য প্রমাণ করতে পারেন না নবীন মিত্র। কিন্তু আরও তলিয়ে বুঝেছেন এবং হিসেব করে দেখেছেন নবীন মিত্র। দেউলপাড়ার এই-সব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে মানুষ হতে পারেনি। অর্থাৎ সুখী হতে পারেনি, অর্থাৎ গরীব হতে হয়েছে।

গরীবের ঘরে জন্মালে গরীব হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। অন্তত কেউ-না-কেউ ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পায়। কিন্তু দেউলপাড়ার কোন ছেলে, হিসাব করে দেখেছেন নবীন মিত্র, আশি টাকার বেশি মাইনের চাকরি করে না। সবাই আশি টাকার নীচে। তবে? জন্মক্ষণে শাঁখ বাজিয়ে সত্যিই কিছু লাভ হলো কি?

এই নবীনবাবুই সেদিন পরেশবাবুর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে ফেললেন, যদিও আস্তে একটা ভ্রুকুটিও করলেন।—এইবার বুঝুন।

পরেশবাবু সত্যিই একটা উদ্বেগের সংবাদ নিয়ে এসেছেন, এবং পাড়ার সব বাড়ির মানুষও বুঝতে পেরেছে, এইবার বেশ একটু সাবধান হতেই হয়। শাঁখ বাজানো উচিত নয়।

পরেশবাবুর বাড়ির পাশেই ছোট একতলা বাড়িতে এই একবছর হলো ভাড়াটিয়া হয়ে যে লোকটা সস্ত্রীক থাকতো, নাম যার জীবন মজুমদার, সেই লোকটা আজ প্রায় দশদিন হলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতর শুধু একা একা মেজের উপর গড়াচ্ছে আর কাঁদছে জীবন মজুমদারের স্ত্রী।

আজ জানতে পারা গিয়েছে, জীবন মজুমদার নামে লোকটা এতবড় পাড়ার এতগুলি মানুষের চোখের দৃষ্টিকে একেবারে বোকা করে দিয়ে ঐ বাড়িতে সস্ত্রীলোক থাকত। স্ত্রী নয়, সেই স্ত্রীলোকটাই আজ একা একা ঘরের মেজের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছে।

জীবন মজুমদারের সঙ্গে পাড়ার প্রায় সকল বয়স্ক ব্যক্তির আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। কেউ কোন মুহূর্তেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, জীবন মজুমদারের জীবনটা ঠিক এই পাড়ার আর পাঁচজন ভদ্রলোকের জীবনের মতো নয়। বয়সে ত্রিশের বেশি হবে না, দেখতে শুনতে ভদ্রলোকেরই মতো সেই জীবন মজুমদার স্টীফান ব্রাদার্সের অফিসে বেশ ভাল মাইনের চাকরি করতো। পাড়ার থিয়েটারে দশ টাকা চাঁদাও দিয়েছিল। সেই জীবন মজুমদার হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে। এবং, আজই আরও জানতে পারা গিয়েছে যে, সেই জীবন মজুমদার আসলে জীবন মজুমদার নয়। স্টীফান ব্রদার্সের অফিসে টেলিফোন করে জানতে পারা গিয়েছে, কোন জীবন মজুমদার সেই অফিসে চাকরি করে না।

পরেশবাবুর বাড়ির পাশের একতলা বাড়ির ঘরের ভিতর একা একা মেজের উপর গড়িয়ে কাঁদছে যে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে সে-ই হলো নতুন কাকিমা। একবছর ধরে এই নামে যে মানুষটাকে ডেকে এসেছে দেউল-পাড়ার প্রায় সব বাড়ির ছেলেমেয়ে, সেই মানুষটার পরিচয় জানতে পেরে আজ ভয় পেয়েছে প্রায় সব বাড়ির বাবা আর মা। সকলেই পরেশবাবুর মতো উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

একটা লোক তার স্ত্রীলোককে ছেড়ে দিয়ে আর একলা রেখে পালিয়ে গেল, সেইজন্য কি?

না, সেজন্য নয়। জীবন মজুমদারের মতো লোক এ রকম কাণ্ড করেই থাকে। এ রকম কাণ্ড করলে কোন ঐ ধরনের স্ত্রীলোকের পক্ষে সেটা এমন কিছু ভয়ানক বিপদও হয়ে ওঠে না। চুপচাপ আবার চলে যেতে হবে, এবং যে জায়গায় গেলে জীবন মজুমদারের মতো অন্য অনেক মানুষ পাওয়া যাবে, সে জায়গাতে চলে যাবে স্ত্রীলোকটা।

কিন্তু জীবন মজুমদারের পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকটা আজ এখনই চলে যেতে

পারবে না। কাল রাত থেকে একটা ধাই সেই যে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে, এখনও আছে, চলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, স্ত্রীলোকটা এখনও প্রসববেদনায় কাতরাচ্ছে।

দেউলপাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সকলেই জানতো, নতুন কাকিমার ছেলে হবে। গত তিন-চারদিন ধরে রোজই ধাইকে আসতে দেখে ওদের উৎসাহ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেয়েছে পরেশবাবুর মেয়ে চিনু আর মীনু এবং পাড়ার যত সন্তু, খুকু, কানু, বুলি, বিনু, জয়ন্তী, সুধা, নির্মল আর অরুন্ধতীও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কানামাছি খেলা থামিয়ে ওরা রোজই একবার-না-একবার এসে নতুন কাকিমার সঙ্গে গল্প করে গিয়েছে।

ওদের কাছ থেকেই পাড়ার প্রবীণারা জীবন মজুমদারের বউ-এর নানা খবর আর নানা পরিচয় আরও ভাল করে জানতে পেরেছিল। শুনে খুশিই হয়েছিল সবাই। ছেলেমেয়েগুলি জীবনবাবুর বাসাতে গেলেই জীবনবাবুর বউ ওদের কিছু না খাইয়ে ছাড়ে না। হয় বিস্কুট নয় বাতাসা, নয় রসবড়া, নয় মুড়কি। একএক দিন কেক। নতুন কাকিমার চেয়ে ভাল কাকিমা এই পাড়াতেই নেই, চিনু আর মীনু একদিন এই কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল।

সুধার মা আর সন্তুর পিসিমাও আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এই পাড়াতে ওরকম লাজুক স্বভাবের বউ দ্বিতীয়টি আর নেই। কি আশ্চর্য, কত আস্তে হাসে, কি রকম মুখ নামিয়ে কথা বলে আর, একটা কথা বলতে গিয়ে সাতবার মাথার কাপড় টানে জীবনের বউ।

কানুর বড়-বউদি আর জয়ন্তীর মেজদিও কত না প্রশংসা করেছে—জীবনবাবুর স্ত্রীর গুণ আছে অনেক, ঘরদোর একেবারে যেন মেজেঘষে তকতকে করে রাখে। জিনিসপত্র কী চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে জানে। যখনই যাও না কেন, দেখতে পাবে, জীবনবাবুর বাসার ঐ ছোট ঘর দুটোর ভিতরটা যেন ছবির মতো ঝকঝক করছে।

খুকুর ঠাকুমা আর নির্মলার মাসিমা একদিন ঐ বাড়ির রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে জীবনের বউ-এর রান্নাবান্নার রকম নিজের চোখে দেখেছেন। এবং পাড়া ঘুরে প্রশংসা রটিয়েছেন। রাঁধবার কী চমৎকার একটা লক্ষ্মীশ্রী! হাতা-খুন্তি নড়ে, কিন্তু শব্দ পর্যন্ত হয় না, এমনই পাকা হাত। নিজের হাতে নোড়া চালিয়ে শিলের উপর সব মশলা পিষে নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনরকম ঝোল আর ঝাল রেঁধে ফেললো, কিন্তু কাপড়ে এক ফোঁটা হলুদের দাগও লাগলো না।

সেই মানুষটারই জীবনের ছদ্মবেশ আজ ধরা পড়ে গিয়েছে। দেউলপাড়ার প্রবীণারা যেমন শতমুখ হয়ে প্রশংসা করেছিলেন, আজ তেমনই সহস্রমুখ হয়ে তাঁরাই নিন্দা করেছেন। ছি, ছি, ছি, একটা পাপের জীব এতদিন ধরে পাড়ার এতগুলি মানুষকে কী ভয়ানক চালাকির জোরে ঠেকিয়েছে! স্বামী-স্ত্রী সেজে দিব্যি একটি বছর কাটিয়ে দিলে দু-দুটো মানুষ, যারা স্বামী স্ত্রী নয়। প্রবীণারা নিন্দে করতে করতেই হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু

কিন্তু ওদের, ঐ চিনু মীনু সন্তু বুলি বিনু আর জয়ন্তীদের সামলানো যায় কি করে, আর বোঝানোই বা যায় কি করে? নতুন কাকিমা যে একটা কাকিমাই নয়, এ কথা চেঁচিয়ে আর ধমক দিয়ে বললেও ওরা বুঝবে কি? ওরা যে আজ সকাল থেকে বার বার যাচ্ছে, আর জানালায় উঁকি দিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে। মেঝের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করছে আর কাঁদছে নতুন কাকিমা। আজই নতুন কাকিমার ছেলে হবে। ধাইটার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়েছে ওরা।

পরেশবাবু বলেন—আপনার নাতনী মালতীকেও দেখলাম।

—অ্যাঁ? কোথায় দেখলেন? আর্তনাদ করে ওঠেন নবীন মিত্র।

—ঐ ঘরের জানালার কাছে।

—ভেতরে যায়নি তো?

—না।

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন নবীন মিত্র। নবীন মিত্রের জীবনে সেই পুরনো আভিজাত্যের একটা অহঙ্কার আজও সজীব হয়ে আছে। দেউলপাড়ার কোন বাড়ির ভিতরে যায় না নবীন মিত্রের নাতি-নাতনী। যেতে হলে বাড়ির কোন লোকের সঙ্গে কিংবা চাকরের সঙ্গে যায়। নবীন মিত্র পছন্দ করতেন না, তাঁর নাতি-নাতনী এইসব ভাড়াটিয়া বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি করুক।

সমস্যা এই নয় যে, একটা নারী অসহায়ভাবে একলা ঘরের মেঝের উপর পড়ে প্রসববেদনায় কাঁদছে! সমস্যা এই যে, এইসব চিনু মীনু আর সন্তুর দল শাঁখ বাজাবার একটা নতুন সুযোগের লগ্ন আসন্ন হয়েছে বলে বুঝতে পেরে সারাটা দিন কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে রয়েছে। বার বার যাচ্ছে, জানালায় উঁকি দিয়ে ধাই-এর সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসছে, আর রাস্তার উপর কানামাছি খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে যেন চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে সেই বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

জীবন মজুমদার নামে লোকটার উপর ঘৃণা হয়, এবং ঘৃণার সঙ্গে রাগও হয়

এই স্ত্রীলোকটার উপর। কেন মরতে ভদ্রলোকের পাড়ার ভিতর এসে ঢুকেছিলে? তোমার ছায়া দেখাও উচিত নয় যেখানে, সেখানে তোমার কাছে এগিয়ে যাবে কে? পুলিশে খবর দিয়ে স্ত্রীলোকটাকে হাসপাতালে পাঠানো যেত, যদি একটু আগে ওর পরিচয়টা ধরা পড়ে যেত। স্ত্রীলোকটা আজ সকালে ধাই-এর কাছে বলেছে যে, সাতদিন হলো ওর বাবুটা পালিয়েছে। ধাই-এর কাছ থেকে প্রথম খবরটা শুনতে পেয়েছেন পরেশবাবু, এবং এতক্ষণে পাড়ার প্রায় সব বাড়ির মানুষ জানতে পেরে গিয়েছে।

কিন্তু নবীন মিত্রের চোখের ভ্রূকুটি আস্তে আস্তে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে। —আমার ঐ একতলা বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আর আসতে চাইবে কি পরেশবাবু?

—আজ্ঞে?

—বলছি, বাড়িটার একটা দুর্নাম হয়ে গেল না কি? যে বাড়িতে বেশ্যে বাস করে গেল, সেই বাড়িতে সস্ত্রীক কোন ভদ্রলোকের থাকতে বাধো-বাধো ঠেকবে না কি?

পরেশবাবু—তা কি আর করবেন বলুন? নতুন চুনকাম করিয়ে, পরে একটা হোম-টোম করে বাড়িটাকে শুদ্ধ করে নিলেই ভাল হয় বোধহয়।

নবীন মিত্র বলেন—দেউলপাড়াতে এরকম বিশ্রী অশুচিকর কাণ্ড এই প্রথম হলো পরেশবাবু।

যাই হোক, এইবার শুধু পরেশবাবু নন, পাড়ার প্রায় সকলেই একটু সাবধান হয়েছেন। বোকা অবুঝ ছেলেমেয়েগুলি হঠাৎ শাঁখ বাজিয়ে একটা অশুভ আবির্ভাবের প্রথম কান্নার স্বরকে যেন অভ্যর্থনা না করে ফেলে। লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যায়, এক-একটা মহাঘটনার আর মহাপুণ্যের লগ্নে যে শাঁখ বাজে, সে শাঁখ এরকম কুৎসিত একটা ঘটনার লগ্নে যেন বেজে না ওঠে।

পরেশবাবু বলেন—ছেলেমেয়েগুলোকে তো ঘরে ঘরে বন্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না। তাই তো সমস্যা। কি করা যায় বলুন?

নবীন মিত্র বলেন—এইবার বুঝুন।

পরেশবাবু—কি?

নবীন মিত্র—আপনাদের ঘরে ঘরে যে-সব শাঁখ আছে, যেগুলি অনর্থক আর অকারণে বাজানো হয়ে থাকে, সেইসব শাঁখ এইবার লুকিয়ে ফেলুন।

পরেশবাবু মাথা হেঁট করেন। যেন দেউলপাড়ার এতদিনের একটা ভুল নিজের গ্লানি বুঝতে পেরে মাথা হেঁট করেছে। এই নবীন মিত্র কতবার

অনুরোধ করেছিলেন, শাঁখ বাজাবার অভ্যাস বর্জন করুন মশাই, নইলে এই পাড়ার কোন মঙ্গল হতে পারছে না। নবীনবাবুর সেই অনুরোধের দাম যেন এতদিনে বুঝতে পারা গেল। পাড়াতে অমঙ্গলের ঘটনা ঘটেছে। অশুচি জীবনের ছায়া ঢুকেছে। এবং পুজার শাঁখগুলির আজ অশুদ্ধ হয়ে যাবার মতো বিপদ দেখাও দিয়েছে। সত্যিই তো, যে শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, সে শঙ্খ কি ঐ স্ত্রীলোকের প্রসববেদনার মুক্তির আনন্দকে জয়ধ্বনি দিয়ে বরণ করবে।

পরেশবাবু বলেন—অগত্যা……হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, শাঁখগুলি লুকিয়ে ফেলাই ভাল।

চলে গেলেন পরেশবাবু। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাড়ার সব বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাড়ির মানুষকে সচেতন আর সতর্ক করে দিলেন। স্বীকার করলেন সবাই, হ্যাঁ, সত্যিই তো, পূজার শাঁখ এরকম একটা বিশ্রী ঘটনায় বেজে উঠলে অমঙ্গল হবে। ছেলেমেয়েগুলোর দোষ কি? ওরা তো অবুঝ। ওরা তো পৃথিবীর সব আলো ছায়া আর শব্দকে বরণ করবার খেলা খুঁজছে। জীবন মজুমদারের স্ত্রীলোকটা যে কে, এবং তার যে ছেলেটা হবে সেটাই বা যে কী হবে—এতটা বিচার করে বুঝবার মতো বুদ্ধি ওদের নেই।

সন্ধ্যা যখন হলো, যখন একটু নীরব হয়ে গেল দেউলপাড়া লেন, তখন চিনু মীনু আর সন্তুর দল সেই বাড়ির জানালায় উঁকি দিয়ে নতুন কাকিমার কান্না শুনে আর ধাই-এর সঙ্গে অনেক আবোলতাবোল কথা বলে ঘরে ফিরে এল।

নিশ্চিন্ত হয়ে গেল দেউলপাড়া। এখন যদি জীবনের স্ত্রীলোকটার প্রসব-বেদনা চরম হয়ে ওঠে, এবং যদি একটা কচি কান্নার স্বর এই সন্ধ্যার নীরবতার মধ্যে কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে, তবু ভয় নেই। শাঁখ বাজবে না, সব শাঁখ লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। এই অবুঝের দল বড়জোর ছুটে যাবে আর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কান্না শুনে চলে আসবে।

সন্ধ্যাটা আর একটু নীরব হয় যখন, তখন জীবন মজুমদারের স্ত্রীলোকটার আর্তনাদ আরও স্পষ্ট হয়ে বেজে ওঠে। দেউলপাড়া লেনের বাতাসে যেন বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছে একটা করুণ যন্ত্রণা।

নবীন মিত্রের বাড়িতে এসে, এবং সোজা নবীন মিত্রের বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা নিশ্চিন্ততার হাঁপ ছাড়েন পরেশবাবু, এবং নবীন মিত্রও খুশি হন।

পরেশবাবু বলেন—আপনার পরামর্শ মতো সকলেই খুশি হয়ে··

নবীন মিত্র—শাঁখ লুকিয়ে ফেলেছে ?

পরেশবাবু—হ্যাঁ।

নবীন মিত্র—কিন্তু আর একটা কথা। এই শিক্ষা ভুলে যাবেন না। যদি শ্রীবিষ্ণুর করুণার উপর বিশ্বাস থাকে, তবে আপনাদের এই পাড়ার মঙ্গলের শান্তির আর সুখের শঙ্খ বাজাবার ভার স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর উপর ছেড়ে দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কি যেন বলতে চেষ্টা করেন পরেশবাবু, কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠেন, এবং মুখের কথাটা মুখেই থেকে যায়।—ও কি ? কিসের শব্দ ?

নবীন মিত্র আস্তে আস্তে বলেন—হ্যাঁ, স্ত্রীলোকটা প্রসব করেছে বলে মনে হচ্ছে।

এই তো, নবীন মিত্রের এই বনেদী বাড়ির পাঁচিলের পাশেই পরেশবাবুর বাড়ি, এবং তার পাশেই সেই একতলা বাড়িটা, যেটা জীবন মজুমদার নামে সেই লোকটা ভাড়া নিয়েছিল। সেই বাড়ির একটা ঘরের ভিতর থেকে নবজাতকের কান্নার স্বর কেঁপে কেঁপে একটা বিদ্‌ঘুটে উল্লাসের শিহরের মতো ভেসে আসছে।

—কিন্তু ওকি! ওটা আবার কিসের শব্দ! শঙ্খের ? চেঁচিয়ে ওঠেন পরেশবাবু।

—এ কেমন শঙ্খ ? বলতে বলতে কেঁপে ওঠেন, এবং আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নবীন মিত্র। টান হয়ে দাঁড়িয়ে, সারা শরীরকে যেন কাঠ করে দিয়ে সেই অদ্ভুত শঙ্খের অদ্ভুত শব্দ শুনতে থাকেন।

—কে বাজালো এই শঙ্খ ? বলতে বলতে পরেশবাবু এগিয়ে আসেন। বৈঠকখানার দরজা পার হয়ে বারান্দায়, শেষ পর্যন্ত ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে নবীন মিত্রও লাঠি ভর দিয়ে ব্যস্তভাবে, একটা বিস্ময়ের আবেশে কাঁপতে কাঁপতে পথের উপর এসে দাঁড়ান।

এ-বাড়ি আর সে-বাড়ির দরজা আর জানালাগুলিও খুলে যেতে থাকে। জানালায় মেয়েদের মুখ উঁকি দেয়, আর পুরুষেরা বের হয়ে পথের উপর এসে ভিড় করে। কেউ নীরবে তাকিয়ে এবং কেউ বা ফিসফিস করে বিস্ময় প্রকাশ করে—কি ব্যাপার ? শাঁখ বাজলো কেমন করে ? কে বাজালো ?

এইবার একেবারে স্পষ্ট করে বোঝা যায়, একটা অদ্ভুত শঙ্খের অদ্ভুত শব্দ জীবন মজুমদারের স্ত্রীলোকটার সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের কান্নাময় প্রাণটাকেই অভিনন্দিত করে বাজছে।

নবীন মিত্রের বাড়ির ফটকের কাছে একে একে সকলেই এসে জমা হতে

থাকে। হীরুবাবু, পুলকবাবু, নৃপেনবাবু, যতীশবাবু এবং আরও অনেকেই। কি ব্যাপার? এ কিরকমের কাণ্ড হলো? সকলের মুখে এই প্রশ্নই ফিসফিস করে।

হঠাৎ ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠেন নবীনবাবু—অ্যাঁ, আমার শ্রীবিষ্ণুর হাতের শঙ্খ নয়তো মশাই?

একটা সোরগোল জেগে ওঠে।—সে কি সম্ভব? সে কি সম্ভব? আপনি একি বলছেন নবীনবাবু!

কিন্তু নবীনবাবু যেন ছটফট করে কাঁপতে কাঁপতে আর টলতে টলতে ঠাকুর-ঘরের দিকে ছুটে যান। ঠাকুরঘরের দরজা ঠেলে দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন।—একি! আমার শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খ গেল কোথায়?

ভিড়টাও ছুটে এসে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় আর উঁকি দেয়। ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছে। চকচকে কালোপাথরের শ্রীবিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন। গদা চক্র এবং পদ্ম আছে—কিন্তু, শুধু শঙ্খটি নেই। সেই প্রকাণ্ড শ্বেতশঙ্খ—মহা-কল্যাণ আর মহাপুণ্যের প্রতিশ্রুতির শঙ্খ; ঐতিহাসিক মহিমার শঙ্খ।

পাগলের মতো চোখ করে চিৎকার করে উঠলেন নবীন মিত্র—কোথায় গেল? কোথায় গেল?

সেই মুহূর্তে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে ভিড়টাকে চমকে আর এলোমেলো করে দিয়ে একটি আটবছর বয়সের মেয়ের ফুটফুটে চেহারা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নবীন মিত্রের নাতনী মালতী। পথের দিক থেকে যেন নাচতে নাচতে ছুটে এসেছে মালতী।

ঠাকুরঘরের ভিতরে ঢুকে, চকচকে কালোপাথরের শ্রীবিষ্ণুর একটা শূন্যহাতে শঙ্খটাকে তুলে দিয়ে, আবার তেমনি খুশির উচ্ছ্বাসে ছুটে চলে গেল মালতী।

চেঁচিয়ে ওঠেন নবীন মিত্র—মালতী? মালতী?

উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে যেতে থাকে মালতী।

—কি হলো মালতী? আবার চেঁচিয়ে ওঠেন নবীন মিত্র।

মালতীও চেঁচিয়ে ওঠে—নতুন কাকিমার ছেলে হলো।

সুনীতিবালা বলেন—হোক অপমান, তবু আমি যাব।

বিপিনবাবু বলেন—না সুনীতি, তুমি একটু বুঝে দেখ।

সুনীতিবালা—না, চিরটা কাল অনেক বুঝেছি। আজ একটু অবুঝপনা করতে দাও।

বিপিনবাবু—এত জেদ করা তোমার একটু অন্যায় হয়ে যাচ্ছে সুনীতি। আবার বলছি, বুঝে দেখ।

সুনীতিবালা কেঁদে ফেলেন—জলজ্যান্ত বেঁচে থাকবো, অথচ নিজের চোখে মেয়ের বিয়েটা দেখবো না। এমন শাস্তি কি মানুষে সহ্য করতে পারে। তুমিই বুঝে দেখ।

বিপিনবাবু সান্ত্বনা দেন—বিয়ের সব গল্প আমার কাছেই শুনতে পাবে। আমি সব বলবো।

সুনীতিবালা—চোখ থাকতে, আর এত কাছে থাকতেও মেয়ের বিয়ে দেখবো না, তোমার কথা শুনে অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে।

বিপিনবাবু যেন আবেদন করেন—ওরকম করে বলো না সুনীতি। তোমার কষ্ট যে আমি বুঝতে পারছি না, তা নয়। কিন্তু উপায় নেই সুনীতি। তুমি ওখানে গেলে বিজয়া বড় বিশ্রী কাণ্ড করে বসবে। তোমার তো অপমান হবেই আমারও অপমান হবে। দশজনের চোখের সামনে আমাকে অপ্রস্তুত না করে দিয়ে ছাড়বে না বিজয়া। বিজয়ার মেজাজের কথা তো তোমার অজানা নয়।

ফুঁপিয়ে ওঠেন সুনীতিবালা—সবই বুঝি, কিন্তু ছাই মনটা যে বোঝে না। মিণ্টুর বিয়েটা দেখবো বলে যে আমি বড় আশা করেছিলাম গো।

ফুঁপিয়ে উঠেছেন যিনি, পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে যাঁর, হাতে শাঁখা-নোয়া আছে আর সিঁথিতে সিঁদুরও আছে যাঁর, তিনি এই এটর্ণি বিপিনবাবুর জীবনের পঁচিশ বছরের সঙ্গিনী, স্ত্রী নন। কোন শুভলগ্নে অগ্নি সাক্ষী করে শঙ্খরব আর উলু-উলু-উলু কলরবের মধ্যে দু'জনের জীবনের বন্ধন স্বীকৃত হয়নি। পঁচিশ বছর আগে ঠিক স্বামী স্ত্রী হয়ে নয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো একটা সম্পর্কের বন্ধন আহ্বান করে এই দুই মানুষের যে অধ্যায় শুরু হয়েছিল, সে জীবনকে আইনমত বিবাহিত জীবন বলা যায় না।

কিন্তু এটর্ণি বিপিনবাবুর আইনসম্মত ঘর-সংসারও আছে। স্ত্রী আছেন, ছেলেমেয়ে আছে এবং মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে, সেই মিণ্টুরই আজ বিয়ে।

সুনীতিবালা আজ স্মরণ করতে পারেন, একটি পাঁচ বছর বয়সের মেয়ের কচি মুখের ছবিটা। তখন এক-একদিন মিণ্টুকে সঙ্গে নিয়েই বিপিনবাবু তাঁর এই অবৈধ সংসারের বাড়িতে আসতেন। এই সুনীতিবালাও মিণ্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কত গল্প করতেন। নিজের হাতে সন্দেশ ভেঙে মিণ্টুকে খাওয়াতেন। পাঁচ বছর বয়সের মিণ্টুর কপালে কুমকুমের ছোট টিপ পরিয়ে দিয়ে হাসতেন। মাঝে মাঝে রাগও করতেন।—কি আশ্চর্য, মেয়েটার চোখে একটু কাজল এঁকে দিতেও পারেনি কেউ? মেয়ের মা কি এতই ব্যস্ত কাজের মানুষ?

কাজলদানি তুলে নিয়ে এসে মিণ্টুর চোখে কাজল পরিয়ে দিয়ে তারপর আবার হেসে উঠতেন সুনীতিবালা।

সেই মিণ্টুর বয়স এখন বাইশ বছর হয়েছে। হিসেব করে দেখেছেন সুনীতিবালা। কিন্তু, এই সতর বছরের মধ্যে আর একটি দিনও এখানে আসেনি মিণ্টু। কারণ, বিপিনবাবু নিজেই মিণ্টুকে আর এখানে আনেননি। কারণ মিণ্টুর মা বিজয়া এক দিন রাগ করে বিপিনবাবুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়েছিলেন—দিব্যি রইল, আর কোনদিন মিণ্টুকে ঐ অমঙ্গলের কাছে নিয়ে যাবে না। কথা দাও।

কথা দিয়ে দিলেন বিপিনবাবু—বেশ। কথা দিলাম।

সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন সুনীতি। কিন্তু সমস্যাটা বুঝেছিলেন, যেটা বিপিনবাবুর জীবনেরই একটা সমস্যা। বিজয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তুচ্ছ করে মিণ্টুকে এখানে নিয়ে আসবার সাহস বিপিনবাবুর নেই। এমন সাহস করতে হলে যে বিপিনবাবুর জীবনের সামাজিক সম্মানটাও ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

প্রতিবেশী গগনবাবু একদিন তাঁর স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন—মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিতাটার বাড়িতে যান বিপিনবাবু, এটা খুবই খারাপ ব্যাপার হচ্ছে। বিপিনবাবুর কাণ্ডজ্ঞান বোধহয় একটু কম। এবং, গগনবাবুর স্ত্রী এসে একদিন বিজয়ার কানের কাছে খবরটা জানিয়ে যেতে দেরী করেননি। এবং তার পরেই সাবধান হয়ে গেলেন বিজয়া। এবং তার পর বিপিনবাবুর ঐ প্রতিজ্ঞা।

ঘটনার এই ইতিহাসও জানা আছে সুনীতিবালার। সতর বছর আগের সেই কান্না আজ আর তাঁর চোখে নেই, কিন্তু মনে বোধহয় আছে। তা না হলে আজও বিপিনবাবুর কাছে বারবার এমন কথা বলবেন কেন, মিণ্টুটা এখন দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে বোধহয়?

বিপিনবাবুর সব ছেলেমেয়ের ফটো এখানেও আছে। সুনীতিবালার ঘরের টেবিলের উপর ফটোগুলি সাজানো আছে; শুধু নেই বিপিনবাবুর স্ত্রী বিজয়ার ফটো। বিপিনবাবু নিজে ইচ্ছে করেই বিজয়ার ফটো এখানে আনেননি, আর সুনীতিবালাও বোধহয় ইচ্ছে করেই কোনদিন বিজয়ার ফটো এখানে এনে রাখতে বিপিনবাবুকে অনুরোধ করেননি।

সুনীতিবালা নিঃসন্তান। কিন্তু আজ তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হবে যে, যেন এক ঘর ছেলেমেয়ে তাঁর চোখের সামনেই আছে। ফটোগুলির দিকে যখন তাকিয়ে থাকেন, আর ফটোর ঐ ছোট ছোট মুখগুলির বয়সের হিসেব করেন সুনীতিবালা, তখন মনে হবে, যেন সত্যিই তাঁর সারা মন জুড়ে একটা ভাবনা ছটফট করছে। এখন কে কত বড়টি হল? মেজটা আজকাল পড়ায় মন দিয়েছে তো? ছোটটা আর বেশি রোগা হয়নি তো? এরকম প্রশ্ন সুনীতিবালার মুখে যখন তখন মুখর হয়ে উঠছেই। সব প্রশ্ন শোনেন বিপিনবাবু এবং উত্তর দিতে গিয়ে অনেক কথা বলতে হয়, তবে সুনীতিবালার দুর্ভাবনা থামে।

সেই সুনীতিবালা আজ অবুঝ হয়ে উঠেছেন। আর, শুধু গল্প শুনে মন জুড়োতে চায় না, শুধু ফটো দেখে চোখ জুড়োতে চায় না। আজ মিণ্টুর বিয়ের উৎসবের কাজে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন সুনীতিবালা।

বিপিনবাবু বলেন—মেয়ে আর জামাইয়ের ফটো তোমাকে এনে দেব। কাজেই···।

সুনীতিবালা রাগ করে ওঠেন—ফটোতে কি হবে?

বিপিনবাবু—ওখানে গেলে যা দেখবে ফটোতেও তাই দেখবে।

সুনীতিবালা—না।

বিপিনবাবু বিব্রতভাবে চুপ করে বসে চিন্তা করেন। কিন্তু সত্যিই যে কোন উপায় নেই। বিজয়া যে আজও সাবধান করে দিয়েছেন। কথায় কথায় আভাসে একটু জানাতে চেষ্টা করেছিলেন বিপিনবাবু, সুনীতির ইচ্ছার কথাটা একটু ঢেকে-ঢুকে বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিজয়া স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—সাবধান! শুভ কাজের দিনে ওসব অলক্ষুণে অমঙ্গল যেন এখানে না আসে!

পঁচিশ বছরের মধ্যে এই অলক্ষুণে অমঙ্গলকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি বিজয়া। হোক না পঞ্চাশ বছরের বুড়ি, কিন্তু ভুয়ো শাঁখা নোয়া আর সিঁদুর নিয়ে ভালমানুষটির মতো সেজে থাকা ঐ পাপ যদি এখানেও আসবার সাহস করে, তবে সকলের সামনেই দারোয়ানকে দিয়ে···।

দুটো জলন্ত চক্ষুর অভিযোগ বিপিনবাবুর ভীরু মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিজয়া আজই শুনিয়ে দিয়েছেন—ওকে সকলের চোখের সামনেই দারোয়ানকে দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেওয়া হবে।

সুনীতিবালা গুণগুণ করে কাঁদেন—তোমার পায়ে পড়ি। একটা উপায় কর।

বিপিনবাবুর চোখও ছলছল করে—তুমিই বল, কি উপায় করতে পারি। আমি তো ভেবে কিছু পাচ্ছি না।

সুনীতিবালা—বিয়ে বাড়িতে কত লোক আসবে, সবাইকে নিশ্চয় চেনে না বিজয়া, আমাকেও একজন নেমন্তন্নের মানুষ মনে করে···।

বিপিনবাবু হাসেন—মহিলারা যাঁরা আসবেন, অন্তত তাঁদের সবাইকে সে চেনে। তোমার মতো একজন অচেনা মানুষকে দেখলেই সন্দেহ করবে।

সুনীতিবালা—বিজয়াকে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারবে?

বিপিনবাবু চমকে ওঠেন—কি মিথ্যা কথা?

সুনীতিবালা—বিজয়াকে বলে দিলেই তো পার যে, তোমার কোন নতুন বন্ধুর স্ত্রীকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছ।

মাথা ভরা সাদা চুলের উপর অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে তারপর জোরে একটা শ্বাস ছাড়েন বিপিনবাবু—আচ্ছা, তাই বলবো।

সুনীতিবালা—কি বলবে?

বিপিনবাবু—বলবো, কেশববাবুর স্ত্রী।·· যেয়ো তুমি। রাত ন'টায় বিয়ে।

রাত এগারটায়, মিণ্টুর বিয়ের মন্ত্র পড়া অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়ে গেল, আর বাসরঘরে চলে গেল বর-কনে, তখন বিদায় নিলেন কেশববাবুর স্ত্রী।

বিজয়া বললেন—আপনি এতক্ষণ এত কষ্ট করে রইলেন, কিন্তু একটা মিষ্টিও মুখে না দিয়ে চলে যাবেন, এ কি ভাল হয়?

সুনীতিবালা হাসেন—মেয়েজামাই-এর মুখ দেখে মন মিষ্টি হয়ে গিয়েছে আবার কোন্ মিষ্টির দরকার?

বিজয়াও কৃতার্থভাবে বলেন—যখন পরিচয় হয়েই গেল, তখন আসবেন মাঝে মাঝে।

সুনীতিবালার মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। কি যেন ভাবেন। তারপর আনমনার মতো বিড়বিড় করেন—আসতে তো ইচ্ছে করেই, কিন্তু ·।

বিজয়া—কি বললেন?

সুনীতিবালা—হ্যাঁ·· মেয়েজামাই যাবে কখন?

বিজয়া—কাল বিকালে যাবে। আসুন না একবার দয়া করে, মেয়ে বিদায় দেখে যাবেন।

সুনীতিবালা—আসবো।

বিজয়া আর একবার খুশির স্বরে অনুরোধ করেন।—অবিশ্যি আসবেন, আপনার নিমন্ত্রণ রইল। .

বিজয়ার এই খুশির স্বর আর একবার আরও খুশি হয়ে বেজে উঠল, পরের দিন বিকাল হতেই যখন দেখলেন, কেশববাবুর স্ত্রী এসেছেন।—আসুন। আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারিনি যে, সত্যিই আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন।

কেশববাবুর স্ত্রীর কথা আর ব্যবহার, দুই-ই অদ্ভুত। সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন বিজয়া। কোন সন্দেহ নেই। কাল বিয়ের রাতে যতগুলি শাড়ি উপহার পেয়েছে মিণ্টু, তার মধ্যে সবচেয়ে দামী শাড়ি হলো সেই বিষ্ণুপুরীটা যেটা কেশববাবুর স্ত্রী দিয়েছেন। অন্তত দু'শো টাকা দাম হবে।

যেন কতকালের চেনাশোনা। মিণ্টুর ঘরের দরজার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মিণ্টুর সাজ দেখেছেন কেশববাবুর স্ত্রী! মিণ্টুকে কনের সাজে সাজাবার কাজে ব্যস্ত ছিল যারা মালতী, অর্চনা আর ইভা, তাদের বার বার উপদেশ দিয়েছেন।—আঁচলটা ওরকম শক্ত করে টেনে দিও না। কানের কাছে চুলটা একটু চেপে দাও।

মিণ্টুর চোখে কাজল পরানো যখন হয়ে গেল, তখন কেশববাবুর স্ত্রীর চোখে অদ্ভুত একটা আহ্লাদের হাসি উথলে উঠেছিল।

—দেখি মা, মুখটি এদিকে ফেরাও তো।

মিণ্টু লাজুকভাবে মুখ ফিরিয়ে কেশববাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতেই যেন আনন্দে ডুকরে উঠেছিলেন কেশববাবুর স্ত্রী--আহা!

ঠিক কথা, বিশ্বাস করেন বিজয়া, একটুও বাড়িয়ে বলেননি কেশববাবুর স্ত্রী। মেয়েজামাই-এর মুখ দেখে তাঁর মনটাই মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। এমন মানুষ আবার মেয়ে-জামাইয়ের মুখ দেখবার লোভে ছুটে আসবেন বৈকি! বিপিনবাবুর কাছেই কতবার বলেছেন বিজয়া, বিয়ে বাড়িতে কত লোক এল, কিন্তু কেশববাবুর স্ত্রীর মতো এমন সুন্দর মন আর ব্যবহার···সত্যি, ওঁকে নেমন্তন্ন না করলে খুবই অন্যায় হতো।

আর কিছুক্ষণ পরেই, বিকালের রোদ একটু নরম হয়ে আসতেই, বিপিনবাবুর এত বড় বাড়ির মুখরতাও যেন হঠাৎ নরম হয়ে গেল। আর বেশি সময় নেই। এইবার মেয়েবিদায়ের সেই বিষাদের লগ্নটি আসন্ন হয়ে উঠেছে।

উপরতলার ঘরে মিণ্টুর কান্না শোনা যায়। বার বার চোখ মোছেন বিজয়া। আর, কেশববাবুর স্ত্রী সান্ত্বনা দেন, আপনি এসময় এরকম উতলা হয়ে পড়বেন না, তাহলে মেয়েটা যে আরও কাঁদবে।

—ঠিকই বলেছেন। শান্তভাবে মেয়ে বিদায় দেবার জন্য তৈরী হন বিজয়া, যদিও চোখ ছলছল করে।

আর দেরী করবারও সময় নেই। গেটের কাছে তিনটে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর হর্ণ বাজাচ্ছে। বরযাত্রীরা গাড়িতে উঠেছে। শুধু সেই গাড়িটা খালি, যে গাড়িতে মেয়ে-জামাই যাবে।

পাড়ার মহিলারাও এসে পড়েছেন। উপরতলা থেকে নেমে এল মেয়েজামাই। মেয়েজামাই-এর সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ন মুখের একটা ভিড়ও অনেকদূর এগিয়ে এসে বারান্দার উপর থামলো।

বিপিনবাবু চোখ মোছেন। আর বিজয়ার ছলছল চোখের করুণতা সহ্য করতে না পেরে মহিলারাও চোখ মোছেন।

সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করলেন কেশববাবুর স্ত্রী। হঠাৎ মিণ্টুর কাছে এগিয়ে এসে আর মিণ্টুর চিবুকে হাত দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কেশববাবুর স্ত্রীর দু'চোখ থেকে জলের ধারা যেন অঝোরে ঝরে পড়তে থাকে।

ওদিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে কাছে এগিয়ে আসেন মিণ্টুর শ্বশুর। কেশববাবুর স্ত্রীর কাছে কি যেন বলতে চান। কিন্তু কথা বলবার আগে ভদ্রলোক নিজেই একবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। তারপর চোখ মুছে নিয়ে বললেন—বুঝি, সবই বুঝি, মেয়েকে ছেড়ে দিতে মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠবেই তো।

বুঝতে পারেন বিজয়া, মিণ্টুর শ্বশুর ভুল করে কেশববাবুর স্ত্রীকেই মেয়ের মা বলে মনে করেছেন। এগিয়ে যান বিজয়া, বোধহয় মিণ্টুর শ্বশুরের ভুল অনুমান শুধরে দিয়ে দু'টো কথা বলতে চান।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কেশববাবুর স্ত্রী যেন মিণ্টুর শ্বশুরের ভুল ধারণাটাকে একেবারে প্রাণ দিয়ে লুফে নিয়ে আরও জোরে ফুঁপিয়ে ওঠেন।—এটা যে অনেকেই বোঝে না, সেই জন্যেই তো ভয় হয়…।

মিণ্টুর শ্বশুর হাতজোড় করে আশ্বাস দেন—আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আপনার মেয়ের কোন কষ্ট হবে না। যখন মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হবে তখনই লিখবেন, মেয়েকে তখনই পাঠিয়ে দেব।

কেশববাবুর স্ত্রী—সে সৌভাগ্য কি হবে? আর কি দেখতে পাব?

এ কেমন প্রলাপ বকছেন কেশববাবুর স্ত্রী? বিজয়ার চোখের বিস্ময় হঠাৎ

যেন দপ্ করে জলে ওঠে। দু'চোখের জলন্ত সন্দেহ নিয়ে বিপিনবাবুর মুখের দিকে তাকান বিজয়া।

মিণ্টুর শ্বশুর আবার বিনীত স্বরে সান্ত্বনা দেন।—ছিঃ আপনি বেশী উতলা হয়ে পড়েছেন। মেয়েকে আর দেখতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হলো? যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই মেয়েকে দেখতে পাবেন। কোন চিন্তা করবেন না।

কেশববাবুর স্ত্রী বললেন—বেঁচে থাকলেও যে দেখতে পাওয়া যায় না।

বিপিনবাবুর মুখে একটা আতঙ্ক থমথম করে। ভীরু মাথাটা হেঁট করেন বিপিনবাবু। বিজয়ার দুই চোখের জলন্ত দৃষ্টিটা এইবার কেশববাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে যেন নীরব ধিক্কারের আগুনের মতো জলতে থাকে।

দারোয়ান ডাকতে হবে। অলক্ষুণে অমঙ্গলকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হবে, সবই মনে আছে বিজয়ার।

কিন্তু বিজয়ার জলন্ত দৃষ্টিও যেন হঠাৎ ভীরু হয়ে যায়। মিণ্টুর শ্বশুরের ভুল শুধরে দিতে পারা যাবে কি? উনি মেয়ের মা নন, কথাটা কি চেঁচিয়ে বলে দিতে পারা যাবে?

মাথা হেঁট করে, যেন মেয়ে-বিদায়ের শেষ মাঙ্গলিক সেরে দেবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে মিণ্টুর কাছে দাঁড়ালেন বিজয়া। তারপরেই মিণ্টুর কানের কাছে ফিসফিস করেন বিজয়া—কেশববাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করেছিস?

—না।

—প্রণাম কর।

কা ল পু রু ষ

যাঁর নাম তিনকড়ি দত্ত তাঁরই নাম কালপুরুষ।

জীবনবাবু বলেন—শুনেছ তিনকড়ি, ছেলেরা তোমার যে নতুন একটা নাম দিয়েছে?

—কি?

—কালপুরুষ।

তিনকড়ি দত্তের গম্ভীর মুখের উপর যেন একটা সূক্ষ্ম হাসির শিহর সিরসির করে ওঠে। আস্তে আস্তে মুখ তুলে জীবনবাবুর মুখের দিকে তাকান তিনকড়ি দত্ত। তারপরেই মুখ নামিয়ে নিয়ে আবার কাজ করতে থাকেন। এবং হেঁট

মুখেই যেন আনমনার মতো বিড়বিড় করেন—তা একরকম ঠিকই বলেছে।

নিকেলের ফ্রেমের চশমা। পুরু কাচ। ঘাড় ঝুঁকিয়ে যখন কাজ করেন তিনকড়ি, তখন চশমা আলগা হয়ে চোখের কাছে ছোট একটা দূরবীনের মতো ঝুলতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘাড় টান করে যখন পথের দিকে তাকান, তখন তিনকড়ি দত্তের চোখদুটোকে ড্যাবা-ড্যাবা-দুটো কাচের ঢেলার মতো দেখায়।

তিনকড়ি দত্তের এই ঘড়ির দোকানকেই ছেলেরা কালপুরুষের দোকান বলে। তিনকড়ি দত্তের চেহারা, তাঁর এই দোকানের চেহারা এবং তাঁর গম্ভীর মুখের ভাষার মধ্যেও এমন কিছু আছে, যে জন্য মনে হয়, হ্যাঁ, ছেলেরা ঠিকই বলেছে। লোকটা কালপুরুষই বটে।

ঘড়ির দোকানের চেহারাটা এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বলতে গেলে একটুও বদলায়নি। সেই একটি টুল, তার সামনে কাঠের ছোট একটা ডেস্ক। তিন তাকের একটা ছোট আলমারি আর দেয়ালের গায়েঁ গোটা দশেক ক্লকের খোলস। টেবিলের উপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে ছোট ছোট কাঁটা আর চিমটে নিয়ে ঘড়ি মেরামত করেন তিনকড়ি দত্ত। মাঝে মাঝে নিকেল-ফ্রেমের চশমার পুরু কাচ একেবারে ঘড়ির ধড়ের উপর ঠেকিয়ে দিয়ে ঘড়ির ব্যাধি সন্ধান করেন।

ঘড়ি মেরামত করতে এসেছেন যে ভদ্রলোক, তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন তিনকড়ি।

—কালচক্র! এর মরজি ঠাহর করা চারটিখানি কথা নয় মশাই!

ঘড়ির ধড়ের উপর আবার সেই ড্যাবা-ড্যাবা চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নাড়েন তিনকড়ি দত্ত।—হুঁ এই ব্যাপার!

—কি? আগন্তুক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

তিনকড়ি বলেন—ব্যালেন্স স্টাফ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। চার্জ পড়বে তিন টাকা দু-আনা।

কোন মক্কেল তিন টাকা দু-আনা দিতে রাজি হয়, অনেকেই আবার রাজি হয় না। কেউ কেউ দর কমাবার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনকড়ি দত্ত এককথার মানুষ। বেশ ভদ্রভাবে এবং শান্ত স্বরে, সেই ড্যাবা-ড্যাবা কাচের গোলকের মতো দুটি চোখ তুলে একই কথা বলেন—এ তো হেলা-ফেলা করে সেরে দেবার মতো নিতান্ত একটা কারিগরী কাজ নয় মশাই। এসব হলো কালের ব্যাপার। এক চুল এদিক-ওদিক হলে কত অঘটন ঘটে যেতে পারে।

লোকে বলে টাইম, সময়! তিনকড়ি বলেন কাল! যখন ঘড়ির টাইম টিউন করেন তিনকড়ি, তখন তাঁর গম্ভীর মুখের রকম-সকম দেখলে মনে হয়, যেন

নিগূঢ় কালের মহিমা কিংবা রহস্যের সঙ্গে একটা জানাজানি কানাকানি আর ধরাছোঁয়ার খেলা খেলছেন তিনকড়ি।

সন্ধ্যাবেলা যাঁরা তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানে এসে বসেন, তাঁদের কারও ঘড়ি নেই। ঘড়ি মেরামতের কোন দরকার বা তাগিদও তাঁদের নেই। সন্ধ্যার সময়টা শুধু সংসারের সুখ-দুখের কথা বলে পার করে দিতে হয়; তিনকড়ির দোকানটা এরকম সান্ধ্য আসরের জায়গা হিসাবে মন্দ নয়। খরিদ্দারের ভিড় নেই। ক্বচিৎ ও কদাচিৎ দু-একজন মেরামতের মক্কেল আসে। আর আসে তারা, যাদের সংসারে একটা শুভ ঘটনার লগ্ন আসন্ন হয়েছে। শুভ বিবাহের, শুভ যাত্রার, অথবা শুভকর্মের ঘটনা।

—টাইম ঠিক করে দিন তিনকড়িদা।

ছোট-বড় ও মাঝারি, নানা আকারের হাতঘড়ি, কিংবা বড় দেয়ালঘড়িও কেউ কেউ নিয়ে আসে। ঘড়িটার ধড় খুলে একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে, ঘড়ির গায়ে দু-একটা টোকা দিয়ে, এবং কখনও বা কাচের কভার খুলে ডায়ালের উপর ফুঁ দিয়ে, ঘড়ির চাবি ঘুরিয়ে দম পুরো করে দেন তিনকড়ি। তারপর আলমারির ভিতরে রাখা একটা মলিন চেহারার টাইম-পীসের দিকে তাকান। টিক-টিক করে সময় বাজিয়ে চলেছে তিনকড়িদার ত্রিশ বছরের পুরনো টাইম-পীস। এই টাইম-পীসের সময়ের সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিয়ে হাতের ঘড়িটাকে একবার কানের কাছে তোলেন, তারপরেই আগন্তুকের হাতে ফিরিয়ে দেন। সকলেই জানে, এর জন্য মাত্র আট আনা চার্জ করেন তিনকড়িদা।

তিনকড়ি দত্তের ঐ ত্রিশ বছরের পুরনো টাইম-পীসের একটা সুনাম আছে, যেটা তিনকড়ি দত্তেরই কারিগরী জীবনের একটা সুনাম। তিনকড়ি দত্তের হাতে টাইমের টিউনিং একেবারে নিখুঁত হয় বলে অনেকেরই বিশ্বাস আছে। তিনকড়ি দত্তের হাত বড় পয়া। ডাকঘরের ঘড়ির সঙ্গে দু-তিন মিনিট যদি অমিলও হয়ে যায়, তবেই কি আসে যায়? অনেকেই বিশ্বাস করে, তিনকড়ি দত্তের ঐ টাইম-পীসই ঠিক টাইম রাখে। শুভলগ্নগুলিকে একেবারে ঠিকঠিক কাঁটায় কাঁটায় ধরে ফেলে তিনকড়ি দত্তের হাতে টিউন করা ঘড়ি।

জীবনবাবু বলেন—ঠিকই, সত্যেনবাবুর জামাই বেচারা সেদিন যদি ওর নিজের ঘড়িকে বিশ্বাস করে রওনা হতো, তবে বেচারার প্রাণ শেষ হতে যেত।

অনাথবাবু—কি ব্যাপার?

জীবনবাবু—পঞ্জিকামতে যাত্রা শুভ ছিল আটটা একান্নতে। জামাই

বেচারা ওর নিজের ঘড়ির আটটা একান্নতেই রওনা হবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু বাধা দিলেন সত্যেনবাবু। আমাদের তিন-কড়ির ঘড়ির মতে সত্যেনবাবুর ঘড়িতে তখন আটটা আটচল্লিশ। কাজেই জামাই বাবাজীকে আরও তিন মিনিট পরে রওনা হতে হলো। বেঁচে গেলেন বাবাজী।

অনাথবাবু—তার মানে?

জীবনবাবু—প্রথম বাসটা ধরতেই পারলেন না বাবাজী। চকে পৌছবার এক মিনিট আগেই বাসটা চলে গিয়েছিল। কাজেই পাঁচ মিনিট পর দ্বিতীয় বাসটিতে জায়গা নিতে হয়েছিল।

অনাথবাবু—কিন্তু শেষ পর্যন্ত···কি···ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?

জীবনবাবু—প্রথম বাসটা এক মাইল পর্যন্ত গিয়েই আর একটা বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়েছিল, আর তিনজন যাত্রী প্রাণে মারাও গিয়েছিল।

জীবনবাবুর গল্পটা থামতেই আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকান তিনকড়ি দত্ত। সেই গম্ভীর মুখের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রসন্নতার শিহর।

তিনকড়ি বলেন—সবই কালের খেলা।

সবই কালের বিধান। কালের নিয়ম। কালের নির্দেশ। কাল পূর্ণ হলে হয়, না হলে হয় না, শুভ কিংবা অশুভ। তিনকড়ি দত্তের গম্ভীর মুখে এই ধরনের গম্ভীর কথাগুলি যখন গম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে বাজে, তখন আর একবার মনে হয়, এবং বিশ্বাসও হয়, ঠিকই বলেছে ছেলেরা, লোকটা কালপুরুষই বটে।

তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের এহেন সান্ধ্য আসরে বসে গল্প করতে করতে জীবনবাবু একদিন হেসেই ফেললেন—কি ব্যাপার তিনকড়ি?

—কি?

—মনে হচ্ছে, কাল জয় করবার চেষ্টা করছ!

—বুঝলাম না জীবনবাবু।

—তোমার বয়স কত?

—আপনার চেয়ে কিছু কমই হবে।

—তা জানি, কিন্তু কত কম?

—বছর সাত-আট।

—তার মানে, তোমার বয়স এখন তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন।

—তা হবে।

—মাথার চুল সাদা হবার বয়স।

—হ্যাঁ।

—ক'দিন আগেও তো তোমার মাথায় বেশ সাদার ঘটা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

—তা দেখেছেন বৈকি।

—কিন্তু আজ এতো কালো কেন? কলপ দিয়ে কাল জয় করেছ বোধহয়।

মাথা হেঁট করেন তিনকড়ি দত্ত। আর নিকেল ফ্রেমের চশমা ঝুঁকিয়ে একমনে কাজ করতে থাকেন।

এবং, তার কিছুদিন পরে আর এক সন্ধ্যায় তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের এই ছোট বারান্দায় একটি চৌকির উপরে মাত্র মিনিট দশেক বসেই চলে গেলেন জীবনবাবু আর অনাথবাবু।

জীবনবাবুর বিরক্তভাবে বললেন—না, তুমি একটা কাণ্ডই করলে তিনকড়ি।

বিয়ে করেছেন তিনকড়ি দত্ত। এটা হলো তৃতীয় বিয়ে। ত্রিশ বছর আগে প্রথম বিয়ের পর এক বছর যেতে না যেতেই স্ত্রীর মৃত্যু হলো। তার দশ বছর পরে দ্বিতীয় বিয়ে। সে স্ত্রীও তিন বছরের বেশি রইল না। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর ষোলটা বছর একলা জীবন পার করে দিতে পেরেছে যে মানুষ, সে মানুষ কালের কোন্ নির্দেশে আবার বিয়ে করে? তিনকড়ি দত্তকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল জীবনবাবুর কিন্তু একটু বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে, এবং বোধহয় বেশ একটু ঘৃণাবোধ করেছিলেন বলেই রূঢ় প্রশ্নটা আর মুখ খুলে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল জীবনবাবুর, কিন্তু একটু বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে, এবং বোধহয় বেশ একটু ঘৃণা বোধ করেছিলেন বলেই রূঢ় প্রশ্নটা আর মুখ খুলে উচ্চারণ করতে পারেননি। মোট কথা, তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের সান্ধ্য গল্পের প্রৌঢ় আসরটাই ভেঙে গেল।

এইতো, সরু গলির মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার ছোট একটা বাড়ি। ভিতরে দুটো ঘর, আর বাইরে একটা বারান্দা। বারান্দাটার একপাশে দোকান, আর এক পাশে একটা চৌকি। বড় একটা ঝাঁপ নামিয়ে দিলেই দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়, আর বারান্দাটা বন্ধ হয় একটা দরজা বন্ধ করে দিলে।

রোজগার বলতে ঐ তো রোজগার। একটা একলা পেট চলে যায়, এইমাত্র। সে মানুষ বিয়ে করলো কোন্ সাহসে আর কোন্ লজ্জায়?

এমন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়েই বা দিল কে? আর মেয়েটাই বা কেমন?

তিনকড়ি দত্তের বিয়ের পর অনাথবাবু আর জীবনবাবু যতখানি রাগ করে সান্ধ্য আসরটা ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন, তারচেয়ে বেশি রাগ করলেন, যখন

শুনতে পেলেন যে, তিনকড়ি দত্তের বউ সত্যিই যা-তা একটা মেয়ে নয়। খেঁদি-পেঁচি নয়, বুড়ি-ধাড়িও নয়। জীবনবাবুর স্ত্রী আর অনাথবাবুর স্ত্রী, দু-জনেই তিনকড়ি দত্তের নতুন বউকে দেখে এসে আশ্চর্য হয়ে আক্ষেপ করলেন —আহা, মেয়েটা দেখতে সত্যিই বড় সুন্দর। বয়স একটু বেশি হলেও তেমন কিছু বেশি নয়। বউটা নিজের মুখেই যখন বললে যে ত্রিশ বছর বয়স, তখন সত্যি করে বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হতেই পারে না।

কার মেয়ে—কোথাকার মেয়ে—সে-সব তথ্যও কিছু কিছু জেনে নিয়েছেন জীবনবাবুর স্ত্রী আর অনাথবাবুর স্ত্রী। খুব গরিবের মেয়ে নয়। বাপ আছে, মা আছে। বাপের একটা কাপড়ের দোকান আছে। দোকানের আয়ও কম নয়।

জীবনবাবু বলেন—তবে তো তিনকড়ির কথাই মেনে নিতে হয়। সবই কালের নির্দেশ। কালের ইচ্ছা।

অনাথবাবু বলেন—রেখে দিন মশাই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কি-না-কি ধাপ্পা দিয়ে মেয়ের বাপকে ভুলিয়েছে তিনকড়ি। অনেক টাকা পয়সা আছে বলে একটা বড়াই দেখিয়ে, ভাঁওতা দিয়ে……।

জীবনবাবু—কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মেয়ের বাপটাই একটা বেহদ্দ কৃপণ। টাকা-পয়সা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি ছিল না।

অনাথবাবু—তাই হবে বোধহয়। নইলে মেয়েটারই বা বিয়ে হতে এত দেরি হবে কেন?

এমন বিয়ের পরিণাম কি হতে পারে? রোজই সন্ধ্যায় আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে পথের এক কিনারা ধরে বেড়াতে বেড়াতে যখন আলোচনা করেন জীবনবাবুর আর অনাথবাবু, তখন তাঁরাও কল্পনা করতে পারেন না যে, এই প্রশ্নটা তিনকড়ি দত্তের ঘরের ভিতরেও একটা কঠোর বিস্ময়ের স্বরে কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে। নিয়তি হঠাৎ বলে ওঠে—আশ্চর্য!

তিনকড়ি—কি?

নিয়তি—বুঝে দেখ।

তিনকড়ি—সত্যি বুঝতে পারছি না নিয়তি।

নিয়তি—এ বিয়ে কেন হলো?

তিনকড়ি—হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি ভাবতেও পারিনি যে, যে-মানুষের দু-দু-বার বিয়ে হয়েছে আর স্ত্রী মারা গিয়েছে, সে মানুষের আবার এই বয়সে নতুন করে একটা বিয়ে হয়ে গেল কেন?

নিয়তি হাসে—বাঃ।

তিনকড়ি—কি ?

নিয়তি—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কেউ যেন তোমাকে জোর করে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে।

তিনকড়ি হাসেন—কতকটা সে-রকমই ব্যাপার নিয়তি। কালের ইচ্ছায়···

মুখ ফিরিয়ে নেয়, সরে যায় নিয়তি। আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাঁধা বিনুনীটা খুলতে থাকে আর, বোধহয় দু-চোখের ভ্রূকুটি চাপতে চেষ্টা করে। তারপরেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

—কি হলো নিয়তি ? আমার কথা শুনে হাসছো ?

—না, আমি ভাবছি আমার কথা।

—কি ?

—ভাবছি, এই বিয়ে হবে বলেই কি আমিও কালের ইচ্ছায় এতদিন ধাড়ি হয়ে বাড়িতে বসেছিলাম ?

তিনকড়ি বলেন—তুমি ঠিকই ভেবেছ নিয়তি।

নিয়তির চোখের বিস্ময় এইবার যেন দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে। একটা ভয়ের বিস্ময়, বোধহয় একটা ঘৃণারও বিস্ময়। মানুষটার মনে একটা সন্দেহও নেই যে, বিয়ে করে ভুল করেছে। মনের ভিতরে একটা আক্ষেপও নেই যে, এই বয়স আর এই রকম একটা ঘড়ির দোকানের রোজগার নিয়ে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে শুধু বিয়ে করাই হয়, সে মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না। নিয়তির জীবনকে ঠকাতে গিয়ে ওর নিজেরও জীবন ঠকেছে, এই বোধও কি নেই মানুষটার ?

যেন একটা দুঃসহ অভিযোগের জ্বালা চাপতে চেষ্টা করে নিয়তি।—এমন বিয়ে যেন কারও না হয়।

তিনকড়ির চোখে-মুখে যেন একটা নির্বোধ ও বেহায়া প্রসন্নতার মৃদু হাসি থমথম করে।—কালের কৃপা না হলে হতে পারে না নিয়তি। আমার মতো মানুষের ঘরে তোমার মতো মানুষ আসবে, এ তো চারটিখানি সৌভাগ্যের কথা নয়।

মাথা হেঁট করে নিয়তি। আস্তে আস্তে, যেন একটা করুণ অলসতার ভারে অবশ হয়ে মেজের উপর বসে পড়ে, তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে নিয়তি।

—ছিঃ, ছটফট করে কাছে এগিয়ে আসেন তিনকড়ি। তিনকড়ির চোখ দুটো যেন বেদনার ভারে এই মুহূর্তে ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরাবে। একটা পাখা

হাতে নিয়ে নিয়তির মাথার উপর বাতাস দিতে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে তাকায় নিয়তি। নিয়তির চোখ দুটো যেন ঘুম-ঘুম ক্লান্তির ভারে ছোট হয়ে গিয়েছে। তিনকড়ির হাত থেকে পাখাটাকে কেড়ে নিয়ে নিয়তি বলে—যাও।

—কোথায় ?

—শুনতে পাচ্ছ না, খদ্দের হাঁকডাক করছে ?

হ্যাঁ, কে একজন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছে—কোথায় গেলে তিনকড়িদা, ঘড়ির টাইমটা একটু ঠিক করে দাও।

ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়ে আবার দোকানের সেই ছোট টুলের উপর বসেন তিনকড়ি, আর চোখের উপর নিকেল-ফ্রেমের মোটা চশমাটাকে চাপতে থাকেন।

—তোমার কি একটুও ভয় নেই ? পিছনে না তাকিয়ে, শুধু পিছনের একটা ছায়ার স্পর্শে যেন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করে নিয়তি, আর, ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে খোলা চুলের বোঝা নেড়ে-চেড়ে খোঁপা বাঁধতে থাকে।

—কিসের ভয় ? আশ্চর্য হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনকড়ি।

—হঠাৎ এই যে একটা বিয়ে করে ফেললে, যে বিয়ের ফল ভালো হতে পারে না।

—কাল শুভ হলে বিয়ের ফল ভালো হবে না কেন নিয়তি ?

—তার মনে ?

—খুব শুভলগ্নে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে যেন ছুটে বের হয়ে যায় নিয়তি। উঠোনের উপর এসে দাঁড়িয়ে একটা হাঁপ ছাড়ে। যেন প্রচণ্ড একটা ঠাট্টার সাপ নিয়তির হৃৎপিণ্ডের উপর ছোবল দেবার জন্য ফণা তুলে হিসহিস করে উঠেছে।

উঠোনের ওপারে একটা ছোট ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় নিয়তি। কপাটের শিকলটাকে ঝনঝনিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—রান্না ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে যাবে ?

—অ্যাঁ ? কি হয়েছে ? কি বলছো নিয়তি ? বলতে বলতে এগিয়ে আসেন তিনকড়ি।

কপাটটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দেয় নিয়তি।—শুধু চাল আছে আর কিছু নেই। কি রাঁধবো বলে যাও।

এগিয়ে এসে নিয়তির একটা হাত ধরে সান্ত্বনা দেন তিনকড়ি।—এই কথা !···বেশ তো···এর জন্যে চিন্তা কি ? ··আমি এখনি আসছি !

ঘরের ভিতরের তাকের উপর থেকে একটা কৌটা তুলে নিয়ে কৌটার ঢাকনি খোলেন আর টাকা বের করেন তিনকড়ি। পাঁচ-টাকার পাঁচটা নোট।

নিয়তি বলে—তুমিই না বললে, ও টাকাটা করালীবাবুর দেনা শোধের জন্য রেখেছ ?

তিনকড়ি—হঁ্যা সেই জন্যেই রেখেছিলাম। যাকৃগে, এখন তো কাজে লাগিয়ে দিই। আগে ভাত-কাপড়ের খরচ, তারপর···নয় কি নিয়তি ?

বাজার করতে বের হয়ে যাবার আগে নিয়তির কাছে এগিয়ে এসে নিয়তির মাথায় হাত বোলাতে থাকেন তিনকড়ি।—তুমি আসবার পর থেকে আমার সাহস বেড়ে গেছে নিয়তি।

—কি বললে ? নিয়তির চোখদুটো কটকট করে জ্বলে।

—আগে হলে দিনটা উপোষ করেই কাটিয়ে দিতাম, দেনা শোধের টাকা দিয়ে বাজার করবার সাহসই হতো না।

কেঁপে ওঠে নিয়তির চোখ। এবং শরীরটাও হঠাৎ অবশ হয়ে যায়। দরজার কপাট ধরে কপাটের আড়ালে মুখ লুকোয় নিয়তি।

চলে যান তিনকড়ি। গলাবন্ধ কোট গায়ে, এবং গলার দু-পাশে এলিয়ে দেওয়া পাকানো চাদরের দুটি ঝুল। তাই আর দেখতে পেলেন না তিনকড়ি, নিয়তি তখন কপাটের উপর কপাল ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে আর চোখ মুছছে।

এমনই শুভলগ্নে বিয়ে হয়েছে যে, দেনাশোধের টাকা খরচ করে উপোষের অভিশাপ থেকে প্রাণটাকে বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করতে হচ্ছে। কালের ইচ্ছার ইঙ্গিতটা কি এখনও দেখতে পাচ্ছে না মানুষটা ?

কি অদ্ভুত শুভক্ষণ ! এবং কি তার মহিমা ! যেন একটা শীতল ও শান্ত অভিশাপের ঘরে এসে বন্দী হয়েছে নিয়তির ভাগ্যটা। মানুষটার মুখের দিকে জ্বালাভরা চোখ নিয়ে তাকালেও মানুষটা প্রসন্নভাবে হাসে। একটুও ভয় নেই, সন্দেহও নেই যে, নিয়তির মতো নারী ওর মতো পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। শুভক্ষণের কীর্তি এরই মধ্যে কত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে কিন্তু দেখেও দেখতে পাচ্ছে না মানুষটা। মানুষটার চোখ দুটো প্রচণ্ড একটা অন্ধতায় খুশি হয়ে রয়েছে।

এই তিন মাসের মধ্যে ভুলেও কোন মুহূর্তে তিনকড়ির গা ছোঁয়নি নিয়তি। রোজই খেয়ে উঠে যখন পান চেয়ে হাত বাড়িয়ে দেন তিনকড়ি, তখন পানের ডিবেটাকে তিনকড়ির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে যায় নিয়তি। নিজের হাতে তিনকড়ির হাতে পান তুলে দেয় না। তিনকড়ির ঐ স্পর্শলোভাতুর হাতের ছোঁয়া পেতে যেন ভয় করে নিয়তির, এবং বুঝতে পারে নিয়তি, ঘৃণাও করে। কিন্তু কি আশ্চর্য, নিয়তির সেই সতর্ক কুণ্ঠা আর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে একটুও ব্যথিত হয় না তিনকড়ির হাতটা। ব্যস্তভাবে, আর মুখের উপর তেমনই শান্ত হাসি টেনে নিয়ে ডিবের পান তুলে মুখে দেন তিনকড়ি।

দেনাশোধের টাকা নিয়ে বাজার করতে চলে গিয়েছে মানুষটা। আর কিছুক্ষণ পরেই হাসতে হাসতে চাল ডাল ঘি তেল মশলার বোঝা নিজের হাতেই বয়ে নিয়ে ফিরে আসবে। সেই চাল ডাল আর মশলার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করবে না নিয়তির। তবু ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে, আর রাঁধতে হবে। অদৃষ্টের একটা ক্ষুধিত ঘৃণাকে ভাত খাইয়ে তোয়াজ করতে হবে। কেন ? কিসের জন্ম ? এই প্রশ্নের জালা আর সহ্য করতে পারে না নিয়তি। ছটফট করে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে, আর একটা বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে। নিয়তির প্রাণটাই যেন একটা ঘুম-ঘুম অবসাদের আবেশে নিঝুম হয়ে যায়।

—নিয়তি !

ডাক শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে নিয়তি। কে জানে কখন ফিরে এসেছে মানুষটা ! বাজার নিয়ে ফিরে এসেছে। এখনই রান্না করতে হবে। কি ভয়ানক শাস্তি ! ছিঃ, এমন রান্না না রাঁধলে আর এমন খাওয়া না খেলে কি নিয়তির অদৃষ্টটা শুকিয়ে মরে যেত ?

তিনকড়ির মুখের দিকে না তাকিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিথিল খোঁপাটাকে ভেঙে নিয়ে বাঁধতে বাঁধতে নিয়তি যেন একটা ঘুমভাঙা আক্রোশের সুরে আস্তে চেঁচিয়ে ওঠে।—পারবো না।

তিনকড়ি হাসেন—কি ?

নিয়তি—রাঁধতে পারবো না।

তিনকড়ি—রান্না হয়ে গিয়েছে। খাবে চল।

কেঁপে ওঠে নিয়তির চোখ দুটো। তিনকড়ি বলেন—বাটা মাছের ঝোল রেঁধেছি।

—কি বললে ? যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিয়তি।

তিনকড়ি বলেন—খবরটা তোমার মায় কাছেই শুনেছি নিয়তি, তুমি বাটা

মাছের ঝোল খেতে ভালবাসো।

ঘরের দেয়ালের কোণের কাছে মুখটাকে লুকিয়ে ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিয়তি। আঁচল তুলে চোখ ঢাকা দেয়। তিনকড়ি বিচলিতভাবে ডাকেন—কি হল নিয়তি?

নিয়তি ফুঁপিয়ে ওঠে—যাও, তুমি খেয়ে নাও। আমার যখন ইচ্ছে হয় খাব।

নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের কাছে ঝুলছে। টুলের উপর বসে কাজ করছেন তিনকড়ি আর ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখতে থাকে নিয়তি। নিয়তির জীবনের একটা নির্মম পরিহাস কেমন নিশ্চিন্ত মনের আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ করে চলেছে।

—ইমপালস্ পিন বদলাতে হবে, দু-টাকা পাঁচ আনা চার্জ পড়বে। বলুন।

আস্তে আস্তে কথা বলেন তিনকড়ি।

আগন্তুক বলে—না দরকার নেই। অত বড় ওয়াচ ডিলার আর মেকার মুখার্জী ব্রাদার্স দেড় টাকায় সারিয়ে দেবে বলেছে।

চলে যায় আগন্তুক। আর একজন আসে। আগন্তুকের হাতে ছোট একটা ঘড়ি তুলে দিয়ে তিনকড়ি বলেন—স্প্রিং বদলে দিয়েছি, আর প্যালেট ও লিভার-টাতে যে গোলমাল ছিল, তাও ঠিক করে দিয়েছি। এইবার আপনার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে কোন শুভক্ষণের একচুল এদিক-ওদিক হবে না। কবে আপনার বাস্তু প্রতিষ্ঠা?

—কাল সকাল আটটা আটাশতে।

—ঠিক আছে। আগন্তুকের হাতে ঘড়িটা তুলে দিয়ে চার টাকা চার আনা আদায় করেন তিনকড়ি।

পিছনের দরজার ফাঁকটা যেন ছোট্ট একটা হাসি হেসে তারপরেই খট্ করে একটা তুচ্ছতার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের উপর চেপে ধরে আর মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকান তিনকড়ি। তারপরেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেন।

আবার দরজা খুলে যায়। নিয়তি এগিয়ে এসে দোকানের সেই জীর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে যেন হাসতে থাকে।

তিনকড়িও হাসেন—তুমি তো জানো না নিয়তি, পাড়ার ছেলেরা আমার কি নাম দিয়েছে।

—কি নাম?

—কালপুরুষ।

মুখ কুঁচকে হাসি চাপে নিয়তি।—বাঃ, বেশ ভালো নাম!

আলমারির দিকে হাত তুলে মলিন চেহারার সেই টাইম-পীসটাকে দেখিয়ে দিয়ে তিনকড়ি যেন অদ্ভুত এক অহংকারের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—দেখছো নিয়তি?

—কি?

—ঐ টাইম-পীস।

—হ্যাঁ।

—এই ঘড়িটার ভুল হয় না।

—তার মানে?

—শুভক্ষণ ধরিয়ে দিতে একটুও ভুল করে না। এই ঘড়ির সময় দেখে যারা শুভক্ষণ ধরেছে, তাদেরই শুভ হয়েছে। আশ্চর্য! ত্রিশ বছর ধরে এই আশ্চর্য দেখে আসছি। এমন কি…।

—কি?

—তোমার বাবার সঙ্গে হঠাৎ যেদিন এখানেই দেখা হয়ে গেল, সেদিন এই ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম যে, একটা শুভ ব্যাপার হবেই হবে। তোমার বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশে দেখা হয়েছিল। পাঁজি খুলে দেখলাম, এগারই বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশের চেয়ে ভালো শুভক্ষণ খুব কমই হয়।… তার পরের আষাঢ়েই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

নিয়তির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে হাসতে থাকেন তিনকড়ি।

—এইবার বুঝতে পারছো নিয়তি, কেন এই বিয়ে হলো। একেই বলে কালের ইচ্ছা…নয় কি নিয়তি?

নিয়তি বলে—হ্যাঁ।…কিন্তু আজ আর কিছুক্ষণ পরেই ছোটকাকা আসবেন।

—কেন?

—আমি আজ যাব।

—কোথায়?

—কোথায় যাব বুঝতে পার না? তাও বলতে হবে?

—কাশীপুরে? বাবার কাছে?

—হ্যাঁ। বাবার চিঠি এসেছে। আজই চলে যেতে লিখেছেন।

—কেন নিয়তি? তিনকড়ির মুখের হাসি যেন মুমূর্ষু মানুষের মুখের করুণ যন্ত্রণার মতো কাতরে কাতরে কাঁপতে থাকে। নিয়তি চলে যাবে, কালের ইচ্ছাতেও এমন অঘটন ঘটতে পারে বলে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তিনকড়ি।

নিয়তির চোখে একটা কঠোর সংকল্পের উল্লাস ঝিকঝিক করে হাসে। কালের ইচ্ছার রকম দেখে এতদিনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন এক সখের কাল-পুরুষ! বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না এবং বিয়ে করা উচিত ছিল না যার, একটা নারীর জীবনকে কোন্ সুখে সুখী করবার শক্তি নেই যার, সে মানুষ, কে জানে কেন, একটা নিষ্ঠুরতার নেশায় পাগল হয়ে নিয়তির মতো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এল? কালের ইচ্ছার অজুহাত দেখিয়ে একটা মেয়ের ত্রিশ বছর বয়সের স্বপ্ন আর পিপাসাকে খুন করেছে যে, সেই মানুষের চোখের এই আতঙ্ক দেখলে আরও ঘৃণা হয়। কি আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত নিয়তির মনের এই ঘৃণাকে দেখতেই পায়নি মানুষটা। নিয়তির মনের ঘৃণা যখন এক-এক বার হঠাৎ ভয়ে দুর্বল হয়ে কেঁদে ফেলেছে, তখনও বুঝতে পারেনি যে এটা অভিমানের কান্না নয়, এটা একটা ত্রিশ বছর বয়সের মেয়ের জীবনের বিদ্রোহ।

কাশীপুরের বাড়িতে পর পর চিঠি দিয়েছে নিয়তি—আর সহ্য করা সম্ভব নয়। কাশীপুরের বাড়িও শেষ পর্যন্ত চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, না, আর সহ্য করার দরকার নেই। চলে এস।

তিনকড়ির হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়তির সেই কঠোর চোখের সংকল্প একটুও হতভম্ব হয় না। নিয়তি বলে—চলে যাচ্ছি, যাওয়া উচিত। এ ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে, বললে বুঝবেই বা কি?

—তুমি কি আমাকে ঘেন্না করে চিরকালের মতো⋯⋯।

তিনকড়ির করুণ প্রলাপ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ দরজার বাইরের কড়া নেড়ে কে যেন হাঁক দিয়েছে—নিয়তি, আমি ছোটকাকা এসেছি।

ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনকড়ি। চমকে ওঠে নিয়তি। কেঁপে ওঠে নিয়তির হাতটা। নিয়তির মুক্তির লগ্নটাকে বাধা দিয়ে একটা অন্ধ আবদার ডুকরে উঠেছে। আঁচল দিয়ে তিনকড়ির মুখটাকে চেপে ধরে ভ্রূকুটি করে নিয়তি! এই প্রথম তিনকড়ির জীবনের উপর নিয়তির স্পর্শের স্বাদ লুটিয়ে পড়েছে। নিয়তি বলে—চুপ কর।

হেসে ওঠে তিনকড়ির মুখ। আলমারির টাইম-পীসের দিকে তাকায়। তারপরেই পঞ্জিকা খুলে চেঁচিয়ে ওঠে।—সাতটা এগার। চমৎকার শুভক্ষণ। দেখছো নিয়তি, আমার টাইম-পীসও কাঁটায় কাঁটায় বলছে, সাতটা এগার। খুব শুভক্ষণে তুমি যাত্রা করলে নিয়তি।

টাইম-পীসের দিকে দু-চোখের একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে নিয়তি

বলে—এই বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকো, খুব হাসতে থাকো, আমি যাই।

তিনকড়ি—সত্যি নিয়তি। তুমি ফিরে এসে নিশ্চয় দেখতে পাবে, আমি হাসছি। আমার আর কোন দুঃখ নেই। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বড়ই শুভক্ষণ। এস····· এস।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিয়তি—হ্যাঁ, চলুন ছোটকাকা, আমি তৈরি।

নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের কাছে ঝুলতে থাকে, কাজ করেন তিনকড়ি। মাঝে মাঝে খরিদ্দার আসে। কেউ কেউ হেসে প্রশ্ন করে—এত রোগা হয়ে গেলেন কেন কালপুরুষদা?

তিনকড়ি হাসেন—কালের ইচ্ছা।

ঘড়ির দোকানের সান্ধ্য আসর আবার জমে উঠেছে। জীবনবাবু আসেন, অনাথবাবু আসেন, এবং আরও অনেকে আসে। সকলেই সন্দেহ করেন, যদিও সেই সন্দেহ নিয়ে কেউ আলোচনা করেন না, তিনকড়ির স্ত্রী বোধহয় আর আসবে না। আসবার হলে কি এই এক বছরের মধ্যে অন্তত একবারও আসতো না?

কিন্তু তিনকড়ির মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, ওরই মনে কোন সন্দেহ নেই। বেশ নিশ্চিন্ত মনে, সেই গম্ভীর মুখ, আর মাঝে মাঝে মুখের উপর সেই শান্ত হাসি টেনে নিয়ে কথা বলেন তিনকড়ি।

শুধু দিন দিন রোগা হয়ে যেতে থাকেন তিনকড়ি। কোন অসুখ নেই, তবু গাছের ভাঙা ডালের মতো শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। কলপ ক্ষয়ে গিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে তিনকড়ির যে মাথার চুল, সেই মাথার চুল এইবার যেন দিনে দিনে ফিকে হয়ে শেষে একেবারে সাদা হয়ে যায়। পাড়ার ছেলেরা আড়ালে আড়ালে বলে—এইবার সত্যিই মানিয়েছে তিনকড়িদাকে, একেবারে খাঁটি কালপুরুষ।

জীবনবাবু জানেন, তিনকড়ির শ্বশুরবাড়ি কাশীপুরে। তবু এই এক বছরের মধ্যে, টালিগঞ্জের এই বাড়ি আর দোকানের ঝাঁপ একটি দিনের মতো বন্ধ রেখে একবারও কাশীপুর ঘুরে এলনা তিনকড়ি। অনাথবাবু বলেন—কিন্তু প্রতি মাসে ত্রিশ চাল্লশটা টাকা কাশীপুরে স্ত্রীর কাছে ঠিক পাঠিয়ে দেয় তিনকড়ি, সে খবর জানেন তো?

—জানি। একটু বিস্ময় প্রকাশ করেন জীবনবাবু।

টালিগঞ্জের গলির ভিতর দিয়ে শীতের হাওয়া বয়ে যায়। বৈশাখের জ্বালাও লাগে। আর বর্ষার-জলে গলির কাদা পিছল হয়ে যায়। তিনকড়ির নিকেল-ফ্রেমের চশমা তেমনই নাকের কাছে ঝুলতে থাকে, কাজ করেন তিনকড়ি।

ত্রিশ বছর বয়সের টাইম-পীসে ঠিক নিয়মমত দম দিয়ে এবং কানের কাছে তুলে নিয়ে শব্দ শোনেন, টিক-টিক-টিক, কালের ইচ্ছায় কত শুভক্ষণ আসছে আর যাচ্ছে, শুনতে পান তিনকড়ি।

তিনকড়িকে একদিন হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করেন সান্ধ্য বৈঠকের জীবনবাবু—এ কি হলো তিনকড়ি?

তিনকড়ি হাসেন—কালের ইচ্ছায় যা হয়, তাই হয়েছে জীবনবাবু।

একদিন মুখ খুলে বলেই ফেলেন অনাথবাবু—কাশীপুরের ব্যাপার কি তিনকড়িবাবু? উনি আসবেন কবে?

কাচের গোলকের মতো দুটো চোখ তুলে আস্তে আস্তে হাসেন তিনকড়ি।—কাল সহায় হলেই আসবেন।

আবার ঘাড় ঝুঁকিয়ে খুটখাট করে কাজ করেন তিনকড়ি। এবং নিজের মনেই বিড়বিড় করেন—কাল পূর্ণ না হলে কেউ আসে না, যায়ও না!

জীবনবাবু আর অনাথবাবু ওঠেন। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকান তিনকড়ি।—আমিও যাব।

অনাথবাবু হেসে ওঠেন—কোথায়? কাশীপুর?

তিনকড়িও যেন গম্ভীর মুখের একটা শীর্ণ হাসি চেপে চেপে বললেন—ভোর পাঁচটা তিন মিনিটটা খুব শুভক্ষণ।—এত ভোরে ট্রাম পাওয়া যাবে তো অনাথবাবু?

জীবনবাবু বলেন—বাস পাবেন।

রাত দশটাও পার হয়নি। জীবনবাবু ছুটে এসে তিনকড়ি দত্তের দোকানের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। অনাথবাবুও আসতে দেরি করলেন না। দুজনেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। চন্দ্র ডাক্তারের চাকরটাই খবর দিয়েছিল।

—কখন মারা গেলেন কালপুরুষদা? ঘড়ির দোকানের সামনে পাড়ার ছেলেদের ভিড় আলোচনা করে। চন্দ্র ডাক্তার বললেন, পাশের দোকানদার খবর দিয়েছিল। আমি এসেই দেখি, হয়ে গিয়েছে। একটা ঘড়ির ওপর কান পেতে পড়ে আছেন। হার্ট ফেলিওর!

বারান্দার উপর, মাদুরের উপর তিনকড়িকে এরই মধ্যে কারা যেন শুইয়ে দিয়েছে। বোধহয় চন্দ্র ডাক্তারের চাকর আর পাশের দোকানদার।

তারপর? একটা ব্যবস্থা করতে হয়। জীবনবাবুর নির্দেশে পাড়ার ছেলেরা সব ব্যবস্থা করে ফেলে। শবযাত্রার সব আয়োজন।

কিন্তু তারপর ? আর দেরি কেন ? পাড়ার ছেলেরা প্রশ্ন করে, এবার ঘাটে রওনা হলেই তো হয়।

জীবনবাবু বলেন—একটু অপেক্ষা কর !

অনাথবাবু বলেন—কাশীপুরে লোক পাঠিয়েছি। তিনকড়িবাবুর স্ত্রী একবার আসুক, শেষ দেখা দেখে নিক্। তারপর—

কাশীপুর থেকে আসতে এত দেরি হবার কথা নয়। সত্যিই তিনকড়ির স্ত্রী আসবেন কি ? জীবনবাবু আর অনাথবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেন।

ভোর হয়ে এসেছে। তিনকড়ির স্ত্রী আসবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে। ছেলেদের ভিড়ের সঙ্গে কারা যেন আলোচনা করে. এবং হেসে ওঠে ছেলেরা।—আপনি কি পাওনা টাকা আদায় করতে এসেছেন তারকবাবু ?

তারকবাবু হাসেন—লোকটাই যখন চলে গেল, তখন আমার তিনশো টাকাও যাবেই। দুঃখ করে লাভ নেই।

পরমেশবাবু বলেন—আমার একটা দামী ঘড়ি সারতে দিয়েছিলাম। কে জানে, সেটা আর ফেরত পাওয়া যাবে কি না ?

হেসে ওঠে ছেলেরা। এবং একটি ট্যাক্সি এসে থামে। তিনকড়ির স্ত্রী এসেছে।

—তোমরা একটু সরে যাও। সবাইকে অনুরোধ করেন জীবনবাবু।

তিনকড়ির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল নিয়তি। নিয়তির চোখ দুটো যেন দুটো শক্ত পাথরের চোখ। চোখের উপর থরথর করছে একটা ভ্রূকুটি।

—চল এবার। ডাক দেন জীবনবাবু।

তিনকড়িকে খাটের উপর তোলবার জন্য এগিয়ে আসে ছেলেরা। কিন্তু একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের চমক লেগে সকলেই থমকে যায়। কেউ দু-পা পিছিয়ে যায়, কেউ হাত সরিয়ে নেয়, কেউ কেঁপে ওঠে। তিনকড়ির টাইম-পীসের অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।

পাঁচটা তিন মিনিট।

একটা ছেলে ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করে—কালপুরুষদা, কালপুরুষদার টাইম-পীস, কি সাংঘাতিক, একেবারে একদম কাঁটায় কাঁটায়…।

জীবনবাবু বলেন—কি আশ্চর্য !

অনাথবাবু বলেন—তাইতো।

আর, নিয়তি যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে এসে ঘড়িটাকে আঁকড়ে

ধরে। শাড়ির আঁচল মুঠো করে ঘড়িটাকে চেপে চেপে সেই শব্দের ঝংকার বন্ধ করতে চেষ্টা করে। যেন কারও মুখ বন্ধ করতে চাইছে নিয়তি।

—মাগো! ফুপিয়ে ওঠে নিয়তি।

এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কাছে এগিয়ে গিয়ে ভীতস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—ওকি? ওকি? কি করছিস নিয়তি?

নিয়তি বলে—মানুষটা যে খিলখিল করে হাসছে ছোটকাকা।

খ দ্যো ত

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলেও পঁয়ত্রিশের চেয়ে কম বয়সের মানুষ বলে মনে হয় এবং গৌরকান্তি বললে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশি ফরসা গায়ের রং, পুষ্কর রায়চৌধুরীর চেহারাটা সত্যিই সব সময় যেন ধবধব করে। ঠোঁট দুটোও সব সময় যেন দুরন্ত রক্তের আভায় লালচে হয়ে টুকটুক করে। দেখে মনে হয়, একজন খাঁটি বিলিতী সাহেবমানুষ আলখাল্লার মতো প্রকাণ্ড ঢিলে একটা পাঞ্জাবি আর জরি পাড়ের ধুতি পরে রয়েছে।

যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, তাকেই প্রথম আলাপে মুগ্ধ করে দিতে পারে পুষ্কর রায়চৌধুরী। বড় সুন্দর করে কথা বলতে পারে পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং গলার স্বরেও যেন সুরেলা মধুরতার ধ্বনি রিমঝিম করে। কিন্তু শুধু কথার ভঙ্গী নয়, এবং সুন্দর চেহারার আবেদনও শুধু নয়, যে-সব কথা বলে পুষ্কর রায়চৌধুরী, সে-সব কথাও যেন বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল। যে শোনে তারই মনে পুষ্কর রায়চৌধুরীর জন্য একটা শ্রদ্ধাময় সমবেদনার আবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে।

এই সহরের শেষ প্রান্তে শেষ ল্যাম্পপোস্টের ছায়া থেকে একটু দূরে, শুধু পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে থাকা একটা নিরালাতে যে বাগান-বাড়িটা প্রায় বিশ বছর ধরে ছাড়াবাড়ির মতো সাড়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে পড়েছিল, সেই বাগান-বাড়িকে সহরের মানুষ কলকাতার সেই বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর একটা সম্পত্তি বলে জানতো। আরও জানতো, বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর এই রকমের আরও কত সম্পত্তি দেশের আরও কত সহরের কত নিরালাতে পড়ে আছে। আজকাল যে পুষ্কর রায়চৌধুরী সস্ত্রীক এই বাড়িতে থাকে, সে হলো সেই বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর একমাত্র ছেলে।

বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরী আজ আর বেঁচে নেই। এবং সহরের অনেকেই জানে, তাঁর সেই সব সম্পত্তিও আর বেঁচে নেই। সব গিয়েছে। বি বি রায়-

চৌধুরী মারা যাবার আগেই তিনি তাঁর সেই বিপুল সম্পত্তির অন্তর্ধানের দুঃখ সহ্য করে গিয়েছেন। এবং বোধহয় এই সহরের এই বাগানবাড়িটাই তাঁর ঐশ্বর্যের বিপুল ধ্বংসের মার থেকে কোনমতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। এবং একমাত্র ছেলে পুষ্কর সস্ত্রীক এসে সেই বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে।

একটা যে-সে মানুষের ছেলে নয় পুষ্কর রায়চৌধুরী; এবং একদিন যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার গৌরবও যে-সে ধরনের ছিল না। আজও গল্প করে পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং প্রথম আলাপে বিমুগ্ধ শ্রোতা সে গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে যায়। আজই সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে পুষ্কর রায়চৌধুরী। তিনদিন হলো দুমকা থেকে বদলি হয়ে এই সহরে এসে সবেমাত্র চার্জ নিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে ভারিক্কি নয়, মেজাজও ভারিক্কি নয়, হাসিখুশি ও স্পোর্টপ্রিয় মানুষ যে মিস্টার দত্তগুপ্ত, তিনিও পুষ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে পুষ্কর রায়চৌধুরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধাবিচলিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিলেন।

পুষ্কর বলে—বাবার নিউমোনিয়ার সংবাদ যেদিন কাগজে বের হলো, সেদিন স্টক এক্সচেঞ্জের সেই বিচলিত অবস্থা আজও আমার মনে পড়ে মিস্টার দত্তগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান আয়রণ পঁচিশ টাকা পনর আনা থেকে চট করে পঁচিশ টাকা আট আনায় ডিক্লাইন করে গেল। সিলভারেও বেশ প্যানিক দেখা দিয়েছিল। একশো ছেষট্টি টাকা আট আনা থেকে স্টার্ট করে একশো চৌষট্টি টাকা পনর আনাতে ফিনিশ হয়ে গেল।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, একটু আশ্চর্যেরই ব্যাপার হয়েছিল মিস্টার দত্তগুপ্ত। কোন স্টেটের প্রেসিডেণ্টের হঠাৎ মৃত্যু হলেও মার্কেটের উপর এ রকম রিয়্যাকশন হয় না, কিন্তু আমার বাবা...।

বলতে বলতে পুষ্কর রায়চৌধুরীর লালচে ঠোঁট দুটো যেন একটা অভিমানের ব্যথায় শিউরে ওঠে। যেন বলতে চায় পুষ্কর রায়চৌধুরী, আমি তো সেই বিপুল প্রভাব ক্ষমতা ঐশ্বর্য আর গৌরবেরই সন্তান। অথচ...।

অথচ, সেই বি বি রায়চৌধুরীর ছেলে পুষ্কর আজ টাকার অভাবে ছোট একটা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না।

এই সহরটা কালচারের দিক দিয়ে বড় দরিদ্র। দুটো লাইব্রেরী ছাড়া বলতে গেলে আর কোন আয়োজনই নেই যার সাহায্যে এই সহরের মানুষের মন আর রুচির রিফাইন্‌মেণ্ট সম্ভব হতে পারে। তাই পাঁচ বছর ধরে একটা

কাজের পরিকল্পনা যেন পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবনের স্বপ্ন হয়ে রয়েছে। একটা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা।

দেশের আর বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির রেপ্লিকা আনাতে হবে। আর চাই, প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে তৈরী যত ঐতিহাসিক কীর্তির—তাজমহলের, হুমায়ুনের কবরের, বুদ্ধগয়া কোনারক আর মাদুরার মন্দিরের মিনিয়েচার। সারনাথের ও মথুরার ধ্যানী বুদ্ধের, আর জৈন গোমতেশ্বরের এক-একটা মডেল মূর্তি। এই সব শিল্পকীর্তির নমুনা দিয়ে গ্যালারি সাজাতে হলে যে টাকা দরকার, সে টাকাটা মোটামুটি যোগাড় হয়েই আছে।

—তা ছাড়া ক্র্যাফটেরও একটা ওয়্যারহাউস হবে এই ইনস্টিটিউট। এর জন্য আমি সারা ভারত তোলপাড় করবো মিস্টার দত্তগুপ্ত। মহীশূরের চন্দনকাঠের কাজ, জয়পুরের মীনা, উড়িষ্যার ফিলিগ্রি, মুর্শিদাবাদের আইভরি। তা ছাড়া বার্মার ল্যাকার, পাঞ্জাবের কামানগিরি, কাশ্মীরের ল্যাটিস ওয়ার্ক। নেপাল আর তিব্বত থেকে কিছু গ্রোটেস্কও আনাবো।

দত্তগুপ্ত বলেন—বড় চমৎকার আপনার পরিকল্পনা। আমি মনে প্রাণে আপনার সাফল্য কামনা করি।

মুখে যা বলে পুষ্কর রায়চৌধুরী তার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যের বর্ণনায় ভরে আছে মোটা একটা ফাইল, যেটা এই ধরনের আলাপের সময় পুষ্কর রায়-চৌধুরীর হাতেই থাকে। ইনস্টিটিউটের জন্য প্রথমেই একটা ভবন চাই। সেই ভবনের একটা প্ল্যানও ফাইলের ভিতরে আছে। এবং সেই প্ল্যান ফাইলের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নিজেরই চোখের সামনে রেখে গম্ভীর হয়ে যায় পুষ্কর রায়চৌধুরী।

—ওটা কি? প্রশ্ন করেন দত্তগুপ্ত।

পুষ্কর হাসে—আমার দুশ্চিন্তা। আর্ট আর ক্র্যাফটের নমুনাগুলি যোগাড় করে ফেলতে যে টাকা দরকার হবে, সে টাকা অবশ্য আমিই দেব। কিন্তু…।

—আজ্ঞে? চোখ বড় করে প্রশ্ন করেন দত্তগুপ্ত।

পুষ্কর হাসে—নেই নেই করেও বি বি রায়চৌধুরীর ছেলের এখনও যা আছে, তাতে ওসব বস্তু কেনবার মতো লাখ খানেক টাকা হয়েই যাবে। কিন্তু…

আবার গম্ভীর হয় পুষ্কর।—কিন্তু এই বিল্ডিংটা তৈরীর খরচের জন্য একটু ভাবনায় পড়তে হচ্ছে। বিল্ডিংটা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজ এগুতেই পারছে না। আশা করি…আপনি আমার এই দুশ্চিন্তার ভার লঘু করতে কিছুটা সাহায্য করবেন।

—আমি কি করতে পারি, বলুন ? আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

—তবে আজই সন্ধ্যায় একবার গরীবের আশ্রমে দয়া করে পদার্পণ করুন না কেন ? একটু চা খাবেন এবং আমার কাছ থেকে আরও ডিটেল্‌স্‌ জানবার পর নিজেই বুঝতে পারবেন যে…।

দত্তগুপ্ত—আজ নয়, কাল সন্ধ্যায় অবশ্যই যাব।

[দুই]

এই বাড়িটা যেন একটু গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বাগানটা প্রায় একটা জঙ্গল হয়ে বাড়িটার গায়ের উপর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। দিনমানে নানারকম ছায়া আর আবছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই বাড়ির চেহারাটা তবু কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হলে বাড়িটা যেন অন্ধকারের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

বাড়িটা অন্ধকার ভালবাসে বোধ হয়। তা না হলে সন্ধ্যা হলে এবং বেশ একটু রাত হয়ে গেলেও বাড়ির ভিতরে বা বাইরে আলো জ্বলতে দেখা যায় না কেন ?

কিন্তু বাড়িটার ভিতরে ও বাইরে যে ভালরকমের আলোর ব্যবস্থা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, এক মাস দু'মাস বা কয়েক মাস ধরে অন্ধকারের সঙ্গে যেন একটানা মাখামাখি করবার পর হঠাৎ কয়েকটা দিন অন্ধকারের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে আর আলো ছড়িয়ে এই বাড়ির রাতের জীবনটা হেসে ওঠে। বাড়ির জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে, বাড়ির বারান্দায় আলোর ভূম জ্বলজ্বল করে।

যে সন্ধ্যায় এই বাড়িতে কোন ব্যক্তির চা-এর নিমন্ত্রণ থাকে, শুধু সেই সন্ধ্যায় এবং সন্ধ্যার পর থেকে আরও দু'তিন ঘন্টা পর্যন্ত বাড়িটা আভাময় হয়ে জংলা বাগানটাকেও হাসিয়ে দেয়।

তা না হলে রোজই অন্ধকার। আকাশে চাঁদ থাকলেও বাড়িটার চেহারা জংলা বাগানের যত গাছের ছায়ার আবরণে আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেখে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, বাইরের বারান্দার উপর কোন মানুষ বসে আছে কি নেই।

সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার অন্ধকারে দুটি চেয়ারের উপর বসে গল্প করে দু'টি মানুষ, স্বামী আর স্ত্রী ; পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং নীরজা রায়চৌধুরী। নিবিড় প্রীতির ডোরে বাঁধা দুটি জীবনের তৃপ্তি গল্প

করে। টুকরো টুকরো মিষ্টি ঝংকারের মতো মিষ্টি হাসির শব্দ উথলে ওঠে।

যতক্ষণ না বুড়ো খানসামা এসে ডাক দেয়, মেজ লাগায়া হুজুর, ততক্ষণ এইভাবে সংসারের এক টুকরো নিরেট অন্ধকারের নীড়ে একেবারে বুকে-বুকে কাছাকাছি আর লাগালাগি হয়ে বসে থাকে পুষ্কর ও নীরজা।

মাঝে একবার বুড়ো খানসামাকে ডাক দিয়ে জেনে নেয় নীরজা, আজ কি রান্না করছে খানসামা? পুষ্কর যা খেতে ভালবাসে, ঠিক তাই তো? চিকেন গ্রিল আর দেরাদুন চালের ভাত? একমুঠো মনক্কা আর বাদাম ছেঁচে রাখতে বুড়ো খানসামাকে বলা হয়েছিল। ভুলে যায়নি তো খানসামা?

হ্যাঁ, পুষ্করের আর একটা শখের অভ্যাস আছে। মেজ লাগিয়ে যতক্ষণ না বুড়ো খানসামা ডাকতে আসে, ততক্ষণের মধ্যে পাঁচ আউন্স হুইস্কির স্বাদ পেতে চায় পুষ্কর রায়চৌধুরীর সান্ধ্যকালীন তৃষ্ণাটা। নীরজা নিজের হাতে একটা ট্রের উপর হুইস্কি-ঢালা ছোট একটা জার আর ক্রিস্ট্যালের একটা গেলাস সাজিয়ে নিয়ে বারান্দার ছোট টেবিলের উপর রেখে দেয়। মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে উঠে, ক্রিস্ট্যালের গেলাসে চুমুক দিয়ে দিয়ে, আর পায়চারী করে ঘুরে ঘুরে নীরজার সঙ্গে গল্প করতে থাকে পুষ্কর রায়চৌধুরী।

জংলা চেহারার বাগানের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হাজার হাজার জোনাকী যেন গুচ্ছ ধরে মিট মিট করে জ্বলছে। দেখলে হাসি পায়। গুচ্ছ গুচ্ছ কতগুলি দুর্বল লোভের পোকা মিছামিছি আলোর ঝলক ছাড়বার চেষ্টা করছে। পুষ্কর রায়চৌধুরী হেসে ফেলে—জান তো নীরজা, বাংলা কবিতায় জোনাকীকে বলে খদ্যোত।

হাসতে হাসতে কেশে ফেলে পুষ্কর রায়চৌধুরী।—খদ্যোত, কি ভয়ানক ভাষা রে বাবা! আমি ঐ খদ্যোত দেখে ঘেন্না করে বাংলা কবিতা পড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা ঠিকই, বাংলা কবিতা পড়া ছেড়েই দিয়েছে পুষ্কর। কিন্তু কবে ছেড়েছে সেটা নীরজার জানা নেই।

কিন্তু ঘেন্না করে বাংলা কবিতা পড়া ছেড়ে দিয়েছে বলে ভালবেসে ইংরেজী কবিতা পড়ে থাকে পুষ্কর, এটাও সত্যি নয়। শুধু বাংলা কবিতাকে কেন, সারা সংসারের সব আলো-ছায়াকে বোধহয় ঘৃণা করে পুষ্কর রায়চৌধুরী। এই জংলা বাগানের ইউকালিপটাসের ঠিক মাথার উপরের আকাশে যে চাঁদ ভাসতে থাকে, সে চাঁদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পুষ্করের ইচ্ছে করে না, ভালই লাগে না, এবং ঘৃণাই করে বোধহয়। সরকারী চাকরি নিতে ইচ্ছে করে না,

মেয়গুলি পুষ্কর ; কারণ দেশের সরকারকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে পুষ্কর। দেশী ক্যাপিটালিস্টগুলোকে দেখতেই গা ঘিনঘিন্ করে ; কাজেই কোন দেশী কনসার্নে সার্ভিস নেওয়া সম্ভব নয়। বিদেশী মার্চেন্টগুলিকে ইতর বলে মনে হয়, ওদের কাছে চাকরি করা পুষ্কর রায়চৌধুরীর সম্মানে পোষায় না। এই সবই জানে নীরজা। পুষ্কর রায়চৌধুরী যা বলেছে, মনে প্রাণে তাই বিশ্বাস করেছে এবং নীরজা নিজের চোখেই দেখেছে, মানুষের ছায়া আর ছোঁয়াও পুষ্করের সহ্য হয় না। তাই ট্রেনে চড়তে ঘৃণা বোধ করে এবং গত পাঁচ বছরের মধ্যে যে এই সহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেনি পুষ্কর, তার একমাত্র কারণ হলো, জানে নীরজা, মানুষের ভিড়ের ছোঁয়াচ বড় ঘেন্না করে পুষ্কর, সহ্য করতেই পারে না।

—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি? বলতে বলতে হেসে ফেলে পুষ্কর। নীরজার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথাগুলি পুষ্করের গলার একটা অদ্ভুত স্বরের বিদ্রূপে মাঝে মাঝে নাকিসুরের ধিক্কারের মতো বেজে ওঠে।

—আমি সত্যিই সবকিছু ঘৃণা করি নীরজা। ভগবান-টগবান সমাজ-টমাজ সব কিছুকে ···আমার অদৃষ্টটাকেও আমি ভয়ানক ঘৃণা করি নীরজা! ভালবাসি শুধু······।

নীরজাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নীরজার মুখটাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় পুষ্কর।

পুষ্করের কথাগুলিকে হুইস্কির প্রলাপ বলে মনে করে না নীরজা। নীরজা জানে, মানুষটা শুধু একজনকে ভালবেসে এবং শুধু সেই জনেরই ভালবাসার জোরে সারা সংসারের সব আলো-ছায়াকে ঘৃণা করেও খুশি হয়ে আছে। নীরজা পুষ্করকে ভালবাসে, এটাই যেন পুষ্করের জীবনের একমাত্র অহংকার।

এবং নীরজার জীবনটাও যেন একটা জেদ। পৃথিবীর কত গবেট কুৎসিত আর ইতর মানুষ বছরে লক্ষ টাকার সুখ ভোগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শুধু পুষ্কর, নীরজার জীবনের পনর বছরের সঙ্গী, শোবার আগে নীরজার কপালটা যার ভালবাসার চুমো না পেলে ঘুমই আসে না নীরজার, সেই মানুষটা টাকার অভাবের জন্য সামান্য চিকেন গ্রিল আর পাঁচ আউন্স হুইস্কির স্বাদ থেকেও মাঝে মাঝে বঞ্চিত হয়। টাকার কথা চিন্তা করতে হয়। নীরজার বুকের ভিতরেও যেন একটা প্রচণ্ড অভিযোগের আগুন ধিকধিক করে জ্বলে। এই পৃথিবী আর এই সংসারের সবকিছুর উপর একটা নির্মম ঘৃণায় কঠোর হয়ে গিয়েছে নীরজারও বুকটা। এত মানুষ সুখে আছে, শুধু কষ্ট পাবে কি তারই

স্বামী? নীরজার জীবনের বিরুদ্ধে অদৃষ্টের এই চক্রান্তের আহ্লাদ কি ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যায় না।

পুষ্কর বলে—আমি কোন ভয়কে ভয় বলেই মনে করি না। কারও পরোয়া করি না, তুমি থাকতে আমার অদৃষ্টের কোন বদমাইশী আমাকে জব্দ করতে পারবে না, এবং···। বলতে বলতে প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ফেলে পুষ্কর—এবং আজ পর্যন্ত যে জব্দ করতে পারলোও না, সেটা তোমারই ভালবাসার জন্য।

নীরজার খোঁপার উপর হাত দিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে পুষ্কর। নীরজা বলে—কি করছো?

পুষ্কর হাসে—একটা খদ্যোত!

টোকা মেরে জোনাকিটাকে নীরজার খোঁপা থেকে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একটু আশ্চর্য হয়ে ফটকের দিকে তাকায় পুষ্কর।

—কে আসছে? আজতো কারও আসবার কথা নয়।

ফটকের কাছ থেকে ছায়াটা আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দার কাছে পৌঁছতেই গম্ভীর স্বরে হাঁক দেয় পুষ্কর—কে?

—আমি হেমন্ত।

—হেমন্ত? কোন্ হেমন্ত?

—পুষ্করদা কথা বলছেন বোধহয়।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমিতো তোমাকে ঠিক চিনে উঠতে···।

—আমি আপনার শ্যামলী বউদির ভাই।

—শ্যামলী বউদির ভাই, হেমন্ত···ও ইয়েস, মনে পড়েছে।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর জেঠতুতো দাদার স্ত্রী সেই শ্যামলী বউদি যে আজ আর বেঁচে নেই, সেকথা জানে পুষ্কর। এবং মনেও আছে, বিয়ের পর নীরজাকে দার্জিলিং-এর বাড়িতে রেখে দিয়ে কার্সিয়ং-এ শ্যামলী বউদির বাড়িতে যখন গিয়েছিল পুষ্কর, তখন এই হেমন্তরই সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা টেনিস খেলে বেশ কটা দিন আনন্দ করা গিয়েছিল। সেই হেমন্ত আজ এতদিন পরে, এখানে, এই সন্ধ্যাতে, কেমন করে আর কিসের জন্য আসে?

হেমন্ত বলে—আমি একটা চাকরি নিয়ে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি পুষ্করদা। আজই জানতে পেরেছি, আজকাল আপনি এখানে এই বাড়িতে থাকেন। তাই ইচ্ছা হলো একবার দেখা করে আসি। তাছাড়া বউদির সঙ্গেও দেখা হবে। ওঁকে তো আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

বারান্দায় থামের গায়ে হাত রেখে সুইচ টেপে পুষ্কর। দপ্ করে আলো

জলে ওঠে। পুষ্করও যেন দপ্ করে হেসে ওঠে।—এই যে তোমার বউদি।

আলোটা আর পুষ্কর রায়চৌধুরীর হাসিটা দপ্ করে জলে উঠেছে, কিন্তু বোধহয় সেজন্য হেমন্তর চোখ দুটো ওভাবে ধাঁধিয়ে যায়নি। পুষ্করদার স্ত্রী নীরজা বউদির রূপ কি অদ্ভুত রূপ! মনে হয়, নীরজা বউদির মুখে ওরকম সুন্দর একটা হাসি শিউরে উঠেছে বলেই আলোটা জলে উঠেছে।

—নমস্কার বউদি! নীরজার দিকে হাত তুলে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বারান্দার উপরে উঠে দাঁড়ায় হেমন্ত। নীরজাও মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে—বসুন।

পুষ্কর এবং নীরজা, দুজনের চোখেচোখে একটা পরামর্শের বিনিময়ও হয়ে যায়। দুজনের মনে একই প্রশ্ন। কেমন ধরনের মানুষ হেমন্ত? বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে চা-এর টেবিলের কাছে বসতে অনুরোধ করা উচিত, এমন মানুষ কি?

পুষ্কর—এখানে কিসের কাজে এসেছ হেমন্ত? কেমন চাকরি?

হেমন্ত—আমি সেটেলমেন্টের কাজে এসেছি, সার্ভেয়ারের চাকরি। মাত্র দেড়শো টাকার মাইনেতে স্টার্ট পেয়েছি। বাবা মারা যাবার পর থেকে বাড়ির যা অবস্থা হয়েছে, তাতে এই দেড়শো টাকাই একটা সৌভাগ্য।

পুষ্কর আর নীরজা, দুজনেরই চোখের উজ্জ্বল কৌতূহল যেন হঠাৎ একটা হতাশার আঘাত পেয়ে অপ্রসন্ন হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে নীরজা। পুষ্করও হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—আচ্ছা তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। এখন··· তাহলে···।

বলতে বলতে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য এক পা এগিয়ে যেয়ে পুষ্কর বলে—তুমি এখন তাহলে এস হেমন্ত।

হেমন্তর বিহ্বল চাহনিটা যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, একটা সুস্বপ্নের শোভা হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে যেমন করে চমকে ওঠে ঘুমন্ত চোখ।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় হেমন্ত।—হ্যাঁ, হঠাৎ এসে আপনাদের একটু বিরক্ত করে ফেললাম বোধহয়···আচ্ছা, আসি তবে পুষ্করদা।

পুষ্কর—এখানে তোমাদের কাজ কতদিন চলবে?

হেমন্ত—বোধহয় মাস কয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

পুষ্কর—কাজটা বোধহয় নিতান্ত মীন ম্যানুয়াল কাজ?

হেমন্ত—কি বললেন?

পুষ্কর—দৌড়দৌড়ির কাজ বোধহয় ?

হেমন্ত—তা তো বটেই। প্রায় রোজই গাঁয়ে গাঁয়ে আর মাঠে মাঠে ঘুরতে হয়। আজই তো সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেলিমপুরের সব আবাদী জমির জরিপ শেষ করে তবে…।

পুষ্কর—সেলিমপুর ?

হেমন্ত—হ্যাঁ।

পুষ্কর—সেলিমপুরের মুর্গীর খুব সুনাম শুনেছি।

হেমন্ত হাসে—কথাটা ঠিকই, দামও বেশ সস্তা।

পুষ্কর—কিন্তু তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে ?

হেমন্ত—কি ?

পুষ্কর—ডজন দুই মুর্গী একটা ঝাঁকায় ভরে আমার এখানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার, তবে…।

হেমন্ত হাসে—খুব পারা যাবে।

চলে গেল হেমন্ত। এবং সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর—একটা খদ্যোত।

হেসে ফেলে নীরজা। বুড়ো খানসামা এসে ডাক দেয়—মেজ লাগায়া হুজুর।

[তিন]

যেমন নতুন ম্যাজিস্ট্রেট দত্তগুপ্ত তেমনই আরও অনেকে পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই আর্ট ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবার আগ্রহ নিয়ে এই বাড়িতে এসেছেন। চা খেয়েছেন আর চলে গিয়েছেন। এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু টাকা সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ পাঁচশত, কেউ এক হাজার, কেউ আরও কিছু বেশি।

যিনি পাঁচ টাকা সাহায্য করবেন বলে মনে করে পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই বাড়িতে চা-এর টেবিলে এসে বসেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত পাঁচশত টাকা সাহায্য করেছেন, এমন ব্যাপারও হয়েছে। যিনি একবার চাঁদা দিয়েই মনে করেছিলেন যে, যা দেবার ছিল তা দিয়ে দেওয়া হলো, তিনিও শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন। কারণ তাঁকে আরও তিনবার এসে এই বাড়ির চা-এর টেবিলে বসতে এবং আরও তিনবার চাঁদা দিয়ে চলে যেতে হয়েছে।

দত্তগুপ্তও ভেবেছিলেন যে, শ' তিনেক টাকা দিয়ে তিনি পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবন ও সাধনার প্রতি তাঁর মমতা ও শ্রদ্ধার কর্তব্যটা সেরে দেবেন। কিন্তু পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই বাড়ির চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নেবার পর দত্তগুপ্তের

ভাবনা যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

পুষ্কর রায়চৌধুরী বলে—আপনি তিন'শ টাকা দেবেন, ভাল কথা, আমি খুশি হয়ে এই সামান্য টাকাকে আপনার অসামান্য সহৃদয়তার উপহার বলে গ্রহণ করবো। কিন্তু · এ ছাড়া, আপনি যদি শুধু চীফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জিবাবুকে একবার বাংলোতে ডাকিয়ে নিয়ে এসে শুধু একটু বলে দেন যে···।

—কি বলবো? দত্তগুপ্তের গলার স্বর হঠাৎ যেন একটু বিরক্ত হয়ে চমকে ওঠে।

পুষ্কর—মুখার্জিবাবু যেন সরকারী কণ্ট্রাক্টর পার্থসারথিবাবুকে একটু বলে দেয় যে···।

—কি?

—পার্থসারথিবাবু যেন অন্তত পাঁচটা হাজার টাকা আমার এই আর্ট-ইনষ্টিটিউটের জন্য দান করেন। জানেনই তো, পার্থসারথিবাবু হলেন টাকার কুবের।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের সব ডিটেল্‌স্ যেন এইবার স্পষ্ট হয়ে একেবারে খোলাখুলি ভাষায় কি-ভয়ানক গুঞ্জনের মতো বাজতে শুরু করে দিয়েছে! দত্তগুপ্তের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। পুষ্কর রায়-চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দত্তগুপ্ত। তারপরেই দত্তগুপ্তের চোখের চাহনি শক্ত হয়ে ওঠে।

—না। পুষ্কর রায়চৌধুরীর পরামর্শের এই গুঞ্জনকে যেন ঘৃণা করে চেঁচিয়ে ওঠেন দত্তগুপ্ত।

—আপনি ভেবে দেখুন মিস্টার দত্তগুপ্ত। পুষ্কর রায়চৌধুরীর দুই ঠোঁটে একটা লালচে হাসি জ্বলতে থাকে।

—না, ভেবে দেখবার কিছু নেই।

পাশের ঘর থেকে দরজার পরদা সরিয়ে এই ঘরের চা-এর টেবিলের কাছে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে একটি রঙীন মূর্তি; বিরক্ত দত্তগুপ্তের দিকে দু'হাত তুলে ছোট্ট একটি কোমল অভিবাদনের ভঙ্গী নিবেদন করে হেসে ওঠে পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী নীরজা।—নমস্কার।

—নমস্কার! পাল্টা অভিবাদন জানাতে গিয়ে দত্তগুপ্তের হাত দুটো যেন আর-এক বিস্ময়ের হঠাৎ-আবেশ সহ্য করতে চেষ্টা করে এবং চোখের শক্ত চাহনিটা টলমল করে ওঠে।

পুষ্কর রায়চৌধুরী বলে—দেখে সুখী হও নীরজা, ইনিই মিষ্টার দত্তগুপ্ত,

আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু ওঁর সামনেই বলে দিতে আমার একটুও বাধবে না, ওঁর মতো রিফাইণ্ড মনের মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। অফিসারদের কথা ছেড়েই দাও, বড় বড় আর্টিস্টদের কথাই ধর, তাঁরাও অনেকে মন-প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসতে শেখেননি।

নীরজা হাসে—দেখে সুখী হয়েছি এবং জেনেও সুখী হলাম। আমার সৌভাগ্য।

রূপ তো অনেক নারীরই আছে, কিন্তু পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী নীরজার মতো এমন মনোহরা রূপ খুব কম দেখতে পাওয়া যায় বললেও কম বলা হয়। এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী যে এত বড় রূপসী, এই সত্য সহরের খুব কম মানুষেরই চোখে দেখে উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য হয়েছে; কারণ এই বাড়ির বাইরে কখনও বের হয় না নীরজা। পথ দিয়ে যেতে এই বাড়ির বারান্দা ও জানালার কাছে, কিংবা বাগানের গাছের ছায়ার কাছে নীরজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে যারা দেখেছে, তারা শুধু দূর হতে দেখা ফুলের স্তবকের মতো একটা শোভাকেও দেখেছে। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, নীরজার চোখের তারাতে কি সুন্দর একটা দ্যুতিময় তীব্রতা চিকচিক করে জ্বলে। নীরজার ঠোঁট দুটো কি অদ্ভুত এক রঙীন হাসির রং-ঝারি। নীরজার বুটিদার জামদানির আঁচলটা যখন কাঁধের কাছ থেকে একটু আলগা হয়ে সরে যায়, তখন নীরজার ঘাড় আর গলার গড়নও যেন একটা ছন্দের বিস্ময়ের মতো উথলে উঠে। সেই সঙ্গে গলার সোনার হারটাও দুলে ওঠে, আর ঝিক করে হেসে ওঠে হারের লকেটের হীরাটা। লাল পাউডারে মাজা এবং প্রায় অর্ধেক খোলা বুকের রংও যেন শিউরে হেসে ওঠে।

দত্তগুপ্তের হাতের কাপের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে নীরজা রায়চৌধুরীর চোখে ছোট্ট একটা মিষ্টি ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে—এ কি!

বলতে বলতে দত্তগুপ্তের চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা।—আর এক কাপ চা নিন মিস্টার দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্ত বিব্রতভাবে বলেন—না, আর নয়। ডাক্তারের নির্দেশ আছে যে···।

নীরজা রায়চৌধুরীর গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। টেবিলের উপর হাত রেখে আর মাথা ঝুঁকিয়ে এবং দত্তগুপ্তের একেবারে চোখের কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে যেন একটা নিবিড় অনুরোধের নিঃশ্বাস ছাড়ে নীরজা। যেন এই পৃথিবীর কেউ শুনতে না পায়, আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে কথা বলে নীরজা—আমার অনুরোধ, প্লীজ।

নীরজার খোঁপার সৌরভ, নীরজার পাউডারে মাজা বুকের সৌরভ এবং সেই সঙ্গে নীরজার সেই অদ্ভুত চোখের দ্যুতিময় তীব্রতা যেন সিক্ত হয়ে গিয়ে আবেদন করছে, আর এক কাপ চা খান মিস্টার দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্ত ব্যস্তভাবে বলেন—বেশ তো, আর এক কাপ চা খাব, তাতে আর…।

পট হাতে তুলে নিয়ে দত্তগুপ্তের পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে নীরজা। নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে পুষ্কর বলে—আমার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য বিল্ডিং তৈরীর টাকা তোলবার একটা উপায় হিসাবে আমি মিস্টার দত্তগুপ্তকে একটা চেষ্টা করবার জন্য অনুরোধ করেছি নীরজা, কিন্তু উনি বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েছেন।

দত্তগুপ্ত বলেন—না না, সে কি কথা…বিরক্ত হব কেন?

দত্তগুপ্তের মুখের দিকে দু'চোখের চাহনি একেবারে অপলক করে দিয়ে তাকিয়ে থাকে নীরজা। দত্তগুপ্তের চোখের কত কাছে নীরজার মুখটা। নীরজার চোখের তারার মধ্যে দত্তগুপ্তের গলার লাল টাই-এর লাল ছায়াটা কাঁপছে। ফিসফিস করে যেন নিঃশ্বাসের শব্দ দিয়ে দত্তগুপ্তের কানের কাছে কথা বলে নীরজা।—যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, তবে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এখানে আসতে ভুলবেন না, আমার অনুরোধ।

দত্তগুপ্ত—আসবো বৈকি, নিশ্চয় আসবো।

সিগারেট ধরিয়ে আর মুখভরা ধোঁয়া ফুরফুর করে ছেড়ে দিয়ে পুষ্কর বলে—আমার প্রস্তাবটা যখন আপনার কাছে এতই কঠিন বোধ হচ্ছে, তখন…।

দত্তগুপ্ত লজ্জিতভাবে বলেন—কঠিন ঠিকই…কিন্তু…যাক্‌গে…এমন কিছু কঠিন নয় যে ।

পুষ্কর—তাহলে মুখার্জিবাবুকে বলে পার্থসারথিবাবুর কাছ থেকে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা আপনি পাইয়ে দেবেন বলে আশা করতে পারি।

দত্তগুপ্ত—হ্যাঁ, আশা করতে পারেন বৈকি।

চার

হেমন্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। সেলিমপুর থেকে এক ঝাঁকা মুর্গী মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এবং নিজেও মুটের সঙ্গে এসে এই বাড়ির বারান্দার কাছে দাঁড়িয়েছে। হেসে উঠেছে পুষ্কর, হেসে উঠেছে পুষ্করদার স্ত্রী নীরজা বউদি।

হেমন্ত হাসে।—আপনার জন্যে আরও কতকগুলি অদ্ভুত জিনিষ এনেছি বউদি।

—সর্বনাশ। একটা লাজুক অস্বস্তির শিহর সামলাতে গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকে নীরজা।

হেমন্ত—অভয়নগরের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। জিনিসগুলি সেখানেই কিনেছি।

জিনিসগুলি হলো, লাল টুসটুসে এক হাজার লিচুর একটা গুচ্ছ, একটা সাঁওতালী চিরুনী, গালার তৈরি একটা ঝাঁপি আর পিতলের একটা পিলসুজ। পিলসুজের গায়ে সামান্য একটু মীনার কাজ আছে, গড়নটা মন্দিরের মতো।

—বাঃ চমৎকার জিনিস। মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ফুরফুরিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর।

—আপনি খুশি হলেন তো বউদি? নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা আশাবিহ্বল চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত। যেন নীরজা বউদি খুশি হলে হেমন্তর বুকের সব নিঃশ্বাস আর ধমনীর সব রক্তকণা খুশি হয়ে যাবে।

নীরজা বলে—যখন এত সব দামী দামী জিনিস এনেছেন, তখন খুশি হতেই হচ্ছে।

হেমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে—এমন কিছু দামের জিনিস নয় বৌদি। সবসুদ্ধ ন টাকা দাম পড়েছে। তা, কি আর এমন দাম? পুষ্করদার বিয়েতে আমি উপস্থিত হতে পারিনি, আপনাকে সামান্য একটা উপহার দেবার চান্স পাইনি। আজ যখন চান্স পেয়েছি, তখন…।

—ওয়েল ডান হেমন্ত। হেসে হেসে কাশতে থাকে পুষ্কর। তোমার উপহার পেয়ে নীরজা নিশ্চয় ধন্য হয়ে গিয়েছে।

যে কাজের জন্য এসেছিল হেমন্ত সে কাজ শেষ হয়েই গিয়েছে। এবং কথাও ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনই যে চলে যেতে হবে, চলে যাওয়া উচিত, সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছে হেমন্ত। নীরজা বউদির চোখের সামনে বসে থাকা একটা মুহূর্তের অনুভব যেন একটা বিপুল তৃপ্তির স্বর্গ। নীরজার মুখের দিকে যে-রকম মুগ্ধতার আবেশ নিয়ে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত, তাতে এই ধারণাই করতে হয় যে, ভয়ানক ভুল করেছে খাদ্যোতটা। অন্ধকার ছেড়ে প্রচণ্ড একটা আলোর দিকে লুব্ধ হয়ে তাকাতে গিয়ে ঝলসে গিয়েছে চোখ; তাই বসে থাকতে পারছে না, চলে যেতেও পারছে না, শুধু ছটফট করছে।

—এখন তবে এস হেমন্ত। পুষ্করের কথায় হেমন্তর আত্মাটা যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে চমকে ওঠে এবং আর দেরি না করে চলে যায় হেমন্ত।

মুখের উপর রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে নীরজা।

দত্তগুপ্তও তাঁর প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষা করেছেন। কণ্ট্রাক্টর পার্থসারথিবাবু খুশি হয়ে এসে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। কারণ এই সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে মিস্টার দত্তগুপ্ত আর মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে তিনি যে উপকার পেয়েছেন তার দাম পাঁচ হাজারের দশ গুণেরও বেশি। তিন মাইল রোড আর তিনটে ব্রিজ তৈরীর কণ্ট্রাক্ট পেয়েছেন পার্থসারথিবাবু।

কিন্তু মিস্টার দত্তগুপ্ত আরও দুবার এই বাড়িতে এসে চা খেয়ে যাবার পর তৃতীয়বার হঠাৎ কেন যেন সাবধান হয়ে গেলেন। হঠাৎ সন্দেহ করেন দত্তগুপ্ত, পুষ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি এই চায়ের টেবিলও যেন একটা ভয়াল ইন্দ্রজাল।

দত্তগুপ্ত—না, আর আমার কাছে টাকার দাবি করবেন না।

পুষ্কর হাসে—ভাল কথা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন দত্তগুপ্ত। টেবিলে চা-এর পট নেই, এবং নীরজাও আসছে না। দত্তগুপ্ত বলেন—মিসেস রায়চৌধুরী কোথায়?

পুষ্কর হাসে—বলতে পারছি না।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দত্তগুপ্তের চোখ দুটো। তারপর যেন তাড়া-খাওয়া একটা ভীরু ছায়ার মতো ধড়ফড় করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে যান।

পাশের ঘরে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নীরজা রায়চৌধুরী।

মিঃ দত্তগুপ্তের জানতে ও বুঝতে একটু সময় লেগেছিল যে, পুষ্কর রায়চৌধুরীর আর্ট ইনষ্টিটিউটও কাগজপত্রে আঁকা আর লেখা-জোখা করা একটা ইন্দ্রজাল। ওটা স্বর্গত বি বি রায়চৌধুরীর ছেলের জীবিকা। অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করেছে পুষ্কর রায়চৌধুরী, কিন্তু সে টাকা দিয়ে কোন ভবন নির্মাণের জন্য এক গুজন ইটও কেনেনি।

ভয়ানক এক ভুলের লজ্জা থেকে পালিয়ে যাবার জন্য শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে করে আর অনেক চেষ্টা করে মুঙ্গেরে বদলি নিয়ে চলে গেলেন দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্তের মতো আরও অনেকে বুঝতে দেরি করেছে, কিন্তু বুঝে ফেলবার পর তারা আর এই বাড়ির ছায়ার কাছেও আসেনি। লজ্জা পেয়ে কিংবা রাগ করে অথবা হতাশ হয়ে তারা সরে গিয়েছে। সন্ধ্যা আর রাত্রির অন্ধকারে বাড়িটার আশে-পাশে গাছের গা ও মাথা ছেয়ে জোনাকির আলো কি ভয়ানক দপ্ দপ্ করে! বাড়িটাকে একটা অভিসন্ধির দুর্গ বলে মনে হয়। যে একবার ভিতরে ঢুকেছে, সে অন্তত একটা মোটা অঙ্কের চেক উৎসর্গ না করে ফিরে

আসতে পারেনি। যে টাকা একবার এই বাড়ির চা-এর টেবিলের কাছে এসেছে সে টাকা আর এখান থেকে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই সব মানী আর ধনীদের কারও মনে এমন সাহসের সঞ্চার দেখা দিল না যে, একদিন এসে পুষ্কর রায়চৌধুরীকে একটা ঘৃণায় ধিক্কার শুনিয়ে দিয়ে চলে যায়।

স্টেভেডর মিস্টার কাঞ্জিলাল কলকাতা থেকে হাওয়া বদল করতে এই শহরে এসে কিছুদিন হলো আছেন। এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়ে পুষ্কর রায়চৌধুরীর আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে দু'শো টাকা দিয়ে সাহায্য করবার জন্য এই বাড়িতে এসে চা খেয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে নগদ আরও দু'হাজার টাকা ছিল। সেই দু'হাজার টাকাও চা-এর টেবিলের উপর, অর্থাৎ নীরজা রায়চৌধুরীর সেই সুন্দর চোখের দ্যুতিময় চাহনির সামনে সঁপে দিয়ে তারপর বিদায় নিয়েছেন মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—দেখছো নীরজা, মিস্টার কাঞ্জিলালের কাছে ঠিক দু'হাজার টাকা রয়েছে। কি আশ্চর্যের ব্যাপার!

কাঞ্জিলাল আশ্চর্য হয়েছিলেন।—অ্যাঁ, কিসের আশ্চর্য পুষ্করবাবু?

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে পুষ্কর।—তুমি ওরকম লজ্জায় মরে গিয়ে একেবারে নীরব হয়ে আছ কেন নীরজা?

চা-এর পট হাতে নিয়ে মিস্টার কাঞ্জিলালের কাপে চা ঢালতে ঢালতে আরও লজ্জিতভাবে লাজুক হাসির মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় নীরজা।

পুষ্কর বলে—কাল রাতে নীরজা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—অ্যাঁ, স্বপ্ন?

—হ্যাঁ, কে যেন একজন নীরজার কানের কাছে বলছে, তোমার একখানা অয়েল আঁকবার জন্য কলকাতার আর্টিস্ট যে দু'হাজার টাকা চেয়েছে, সে টাকা আমি দেব। তুমি আপত্তি করতে পারবে না। আমি তোমার গত জন্মের বন্ধু।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে হাসতে থাকে নীরজা।—তুমি একটু চুপ কর তো।

মিস্টার কাঞ্জিলাল নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন—অদ্ভুত, খুব অদ্ভুত স্বপ্ন।

নীরজার চোখ ছলছল করে ওঠে; নীরজার নিঃশ্বাসের বাষ্প মিস্টার কাঞ্জিলালের কানের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এবং সেই সঙ্গে নীরজার চাপা-গলার একটা কাতর অনুরোধের স্বরও কাঞ্জিলালের কানের কাছে ফিস-

ফিস করে ওঠে।—আমার একটা স্বপ্নের ওপর আপনি কোন মায়াটায়া দেখাবেন না। আপনি আমার কেউ নন।

—না, তা হয় না। আপনার ধমক-ধামক আমি গ্রাহ্য করবো না মিসেস রায়চৌধুরী। এই দু'হাজার টাকা আমি এখানেই রেখে যাব।

—কাল আবার আসছেন তো? কাঞ্চিলালের মুখের দিকে অপলক চোখের ভেজা-ভেজা চাহনি তুলে ধরে এবং সেই চাহনিকে চোখ বুঁজে নিংড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে নীরজা।

কাঞ্চিলাল বলেন—দেখি···আসতে তো ইচ্ছে করছেই·· কিন্তু··।

নীরজার গলার স্বর যেন চারদিকের একটা উৎকর্ণ সংসারের ভয়ে ভীরু হয়ে ফিসফিস করে—আসবেন মিস্টার কাঞ্চিলাল। আমি আশায় থাকবো।

বার বার কয়েকবার এসেছিলেন কাঞ্চিলাল। কিন্তু শেষের সেইবার কি-যেন সন্দেহ করে, ভ্রূকুটি করে, অর্থাৎ বেশ বিরক্ত হয়ে পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।—না, মিস্টার রায়চৌধুরী হাজার টাকা পারবো না। বড়জোর একশো টাকা দিতে পারি।

পুষ্কর হাসে—তাই দিন তাহলে।

একশো টাকার চেক পুষ্করের হাতে তুলে দিয়ে কাঞ্চলাল বলেন—নীরজাদেবীকে এখনও দেখছি না কেন?

পুষ্কর—বেঁচে আছেন, কিন্তু···।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পুষ্কর বলে—কিন্তু বেশ রাত হয়েছে মিস্টার কাঞ্চিলাল।

কাঞ্চিলালের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, এবং সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কাঞ্চিলাল।

পাশের ঘরে মুখের উপর রুমাল চেপে খিলখিল করে হেসে হেসে ছটফট করে নীরজা।

[পাঁচ]

আজ আর কারও এই বাড়িতে চা খেতে আসবার কথা নেই। আজ না, কালও না। এবং দেখতে দেখতে প্রায় একটা মাস পার হয়ে যাবার পরেও এই বাড়িতে চা-এর জন্ম লোলুপ হয়ে ছুটে আসবে, এমন কোন উদ্‌ভ্রান্তের সন্ধান পায়নি পুষ্কর রায়চৌধুরী। মিসেস জোন্সের হোটেলে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে এসেছে পুষ্কর। শুধু জানতে পারা গিয়েছে যে, মল্লিক ব্রাদার্স নামে একটা কোল কোম্পানীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, একজন পি মল্লিক কিছুদিন পরে আসবেন। একটা

মাস থাকবেন এবং শিকারের শখ মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবেন।

বুড়ো খানসামা আজকাল রাত্রিবেলায় মেজ লাগিয়ে যখন ডাক দেয়, তখন খাবার টেবিলে গিয়ে শুধু আটার পরোটা আর তরকারি আর সামান্য এক বাটি পায়েস দেখে নীরজার চোখ দুটো ছলছল করে। এ খাবার খেতে পুষ্করের যে একটুও ভাল লাগে না, ভাল করে জানা আছে নীরজার। ছলছল চোখ দুটোও যেন হঠাৎ দপ্‌ করে জলে ওঠে। অদৃষ্টের এই চক্রান্ত ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবার জন্য বুকের ভিতরে একটা দুরন্ত জেদ ছটফট করতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে নীরজা—পি মল্লিকের খবর কি ?

পুষ্কর—এখনও কোন খবর নেই। খুব সম্ভব আরও এক মাস পরে আসবে।

একটা মাসের এক একটা দিন যেন আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে পার হতে থাকে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে যে আসে, আর চলে যায়, সে হলো হেমন্ত।

দু আউন্স হুইস্কি শেষ হয়ে যাবার পর পুষ্করও একদিন বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—খদ্যোতটা, যেটাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না, সেটা কিন্তু ঠিক নিয়ম করে নিয়ে মাঝে মাঝে আসছে।

ডেভিলের কথা মনে পড়তেই ডেভিল এসে হাজির হয়। কী অদ্ভুত সত্য কথা! ফটকের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর—সত্যিই যে খদ্যোতটা আসছে নীরজা।

বারান্দার আলো জলে ওঠে আর হেমন্ত এসে বারান্দার উপরে উঠেই হাসতে থাকে—বউদির জন্য একটা নতুন জিনিস এনেছি।

নতুন জিনিসই বটে। এক সের চিনির পাখি, অর্থাৎ গোলাপী রং-এর কতগুলি নিরেট মিষ্টি শরীরের চিল হাঁস আর কবুতর।

হেমন্ত বলে—হীরাগঞ্জে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা দোকানে এগুলিকে দেখতে পেয়েই ইচ্ছে হলো, বউদির জন্য কিনে নিয়ে যাই।

পুষ্কর—কিন্তু তোমার হাতে এত বড় একটা ব্যাগ কেন হেমন্ত ?

হেমন্ত—হীরাগঞ্জে এখন ক্যাম্প পড়েছে কিনা; স্টাফের প্রায় সকলেই সেখানে আছে। কাল হলো মাইনের তারিখ। ট্রেজারি থেকে টাকাটা নিয়ে যাবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

পুষ্কর—কত টাকা ?

হেমন্ত—হাজার দুই হবে।

পুষ্কর—তুমি বেশ ক্লান্ত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে হেমন্ত।

হেমন্ত—আমাদের মতো মানুষের আবার ক্লান্তি কিসের পুষ্করদা ? এসব

খাটুনি গ্রাহ্যই করি না।

পুষ্কর—হেমন্তকে আজ চা না খেয়ে চলে যেতে দেবে না নীরজা।

নীরজা ডাকে—আসুন।

এবং তারপর আর কতক্ষণই বা সময় লাগে? সেই চা-এর টেবিল এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর চোখে সেই উজ্জ্বলতা, এবং নীরজা রায়চৌধুরীর চোখের তারায় সেই দ্যুতিময় তীব্রতা। চা-এর পট হাতে তুলে নিয়ে হেমন্তর পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে নীরজা।

পুষ্কর বলে—তোমার নীরজা বউদি তোমাকে কি-যেন বলতে চায় হেমন্ত, কিন্তু লজ্জার জন্য বলতে পারছে না।

—বলুন বউদি।

নীরজা বউদির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হেমন্তর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়। যেন নীরজা বউদির মুখের একটা কথা শোনবার জন্য হেমন্তর অদৃষ্টটা পিপাসিতের মতো এতদিন ধরে নিদারুণ প্রতীক্ষার দুঃখ সহ্য করছিল।

পুষ্কর বলে—হাজার দুই টাকা নীরজার বড় দরকার ছিল। আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল, কালও বন্ধ থাকবে, কাজেই টাকা তুলতে পরশু হয়ে যাবে। অথচ কাল সকালেই টাকাটা নীরজার ভয়ানক দরকার। না পেলে নীরজার ভয়ানক অপমানের ব্যাপার হবে।

—বউদির অপমান? হেমন্তর চোখ দুটো কুঁচকে যায়, যেন হেমন্তর বুকের হাড়ে একটা চোট লেগেছে।

পুষ্কর—হ্যাঁ হেমন্ত, নীরজার এক গরীব বান্ধবী তার মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য নীরজার কাছে সাহায্য চেয়েছে। নীরজাও দু'হাজার টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছে। কাল সকালেই টাকা নিতে আসবে নীরজার বান্ধবী।

হেমন্ত—আপনি যদি এখনই একটা চেক লিখে আমাকে দেন পুষ্করদা, তবে আমি এই রাতেই একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পুষ্কর—কি চেষ্টা করবে?

হেমন্ত—আগরওয়ালার গদিতে গিয়ে চেকটা ক্যাশ করে আনতে পারি। আগরওয়ালা আমাকে বেশ একটু খাতির করে।

পুষ্কর—তা হয় না হেমন্ত। সেটা আমার অপমান। পুষ্কর রায়চৌধুরীর টেবিলের দেরাজে নগদ দু'হাজার টাকা থাকে না, একথা বাইরের মানুষকে জানানোর অর্থ পুষ্কর রায়চৌধুরীর প্রেস্টিজ নষ্ট করা।

হেমন্ত উদ্বিগ্ন হয়—তাহলে কি উপায় হবে?

পুষ্কর—তুমি যদি একটু সাহস কর, তবেই উপায় হতে পারে।

হেমন্ত—আমি? আমি কি সাহস করতে পারি বলুন?

পুষ্কর—তুমি তোমার এই টাকা নীরজাকে দুদিনের জন্ত লোন দাও।

হেমন্ত—সর্বনাশ! এ যে পরের টাকা, স্টাফের পেমেণ্টের টাকা! এ-টাকা আমি কেমন করে দিই, বলুন?

পুষ্কর—আমি আর কিছু বলতে চাই না হেমন্ত। যাকৃগে···হেমন্তকে আর এক কাপ চা দাও নীরজা। হেমন্তর কাপে চা ঢালে নীরজা। কিন্তু চা-এর কাপের দিকে নয়, হেমন্তর মুখেরদিকে তাকিয়ে নীরজার সুন্দর চোখের বড় বড় পাতাগুলি কাঁপতে থাকে।

নীরজা বউদি কি দুঃখিত হলেন? অপরাধীর মতো ক্ষমাভিক্ষু চাহনি তুলে ছটফট করে ওঠে হেমন্ত—আমি বড় দুঃখিত বউদি, বিশ্বাস করুন, সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে এই টাকাটা দিয়ে যেতে পারতাম।

নীরজার নিঃশ্বাস যেন সিরসির শব্দ করে কেঁপে কেঁপে বুকের উপর পড়ে থাকা লকেটের হীরাটাকে কাঁপাতে থাকে।—সম্ভব নয় যখন, তখন দেবেন না।

হেমন্ত—কিন্তু আপনাকে যে কাল বড় অপ্রস্তুত হতে হবে।

নীরজা—হবে বৈকি, কিন্তু সেজন্য আপনি ভাবেন কেন?

হেমন্ত—সত্যি, না ভেবে থাকতে পারছি না বউদি।

নীরজা—আমি আপনার এমন কোন আপন-জন নই যে, আমার মান-অপমানের জন্য আপনার এত ভাবনা করবার দরকার হতে পারে।

হেমন্ত—এত শক্ত কথা বলবেন না বউদি। আপনাকে নিতান্ত আপন-জন বলে মনে করি বলেই···।

নীরজার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে গিয়ে ফিসফিস করে—বিশ্বাস করি না!

হেমন্তর নিঃশ্বাস যেন দুঃসহ একটা বেদনা সহ্য করতে গিয়ে মৃদু হয়ে এবং বিপুল অনুনয়ের বেদনায় ফিসফিস করে।—বিশ্বাস করুন বউদি।

—তবে? প্রশ্ন করে নীরজা। নীরজার চোখের তারার সেই ভয়ানক সুন্দর দ্যুতিময় তীব্রতা ঝিকঝিক করে জলতে থাকে।

হেমন্ত যেন আনমনার মতো বিড় বিড় করতে থাকে—ওরা চোর বলে সন্দেহ করবে, সসপেণ্ড করবে, চাকরিটাও যাবে, জেলও হয়ে যেতে পা ···।

কিন্তু নীরজা বউদির খোঁপার সৌরভ যেন হেমন্তর করুণ হৃৎপিণ্ডটার চারদিক ঘিরে ছুটোছুটি করছে। চেঁচিয়ে ওঠে হেমন্ত—ঠিক আছে, ঠিক আছে। টাকাটা আপনি নিন বউদি।

—দাও, আমার কাছেই দাও। হাত বাড়িয়ে দিয়ে টাকার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে টেবিলের এক-পাশে হাতের কাছেই রেখে দেয় পুষ্কর।

নীরজার কপালের উপর ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে হাসছে। রুমাল দিয়ে মুখের হাসি চাপা দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যায় নীরজা।

হেমন্ত বলে—আজ তবে আসি পুষ্করদা।

পুষ্কর—এস।

চলে যায় হেমন্ত; এবং তখনি শুনতে পায় পুষ্কর, ভিতরের ঘরে রুমাল-চাপা একটা সুন্দর মুখের অদ্ভুত এক উল্লাসের চাপা-চাপা হাসির শব্দ যেন নেচে নেচে বাজছে। আস্তে আস্তে উঠে ভিতরের ঘরের ভিতর ঢুকে হেসে ওঠে পুষ্কর। —খদ্যোতটা শেষ পর্যন্ত একটা কাজ দিল তবে নীরজা।...একি? তুমি কি করছো নীরজা?

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকফাটা একটা বিস্ময়ের আর্তনাদ ছেড়ে তারপরেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্কর। শুনতে বড় ভুল করেছে পুষ্কর। নীরজা রায়চৌধুরী আজ আর রুমাল দিয়ে মুখের হাসি চাপছে না। চাপছে একটা ফোঁপানো কান্নার স্বর।

—খদ্যোতটার জন্য? চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর।

কথা বলে না নীরজা, মুখ তুলে তাকায়ও না।

—তুমি বড় বেশী হাঁপাচ্ছো, বড় বিশ্রী কান্না কাঁদছো নীরজা দাঁতের উপর দাঁত চেপে কথা বলে পুষ্কর।

কিন্তু কোন উত্তর দেয় না নীরজা।

—মনে হচ্ছে খদ্যোতটা যেন তোমারই সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

উত্তর দেয় না নীরজা।

—ছিঃ, ট্রেচারি দাই নেম ইজ উওম্যান! আবার দাঁতে দাঁতে শব্দ করে যেন একটা ধিক্কারের জ্বালা আছড়ে দিয়েই নীরব হয়ে যায় পুষ্কর; চোখের চাহনিও ফ্যালফ্যাল করতে থাকে। পুষ্কর রায়চৌধুরীর অদৃষ্টের সব গর্ব অসহায় হয়ে গিয়েছে।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র অহংকার, একমাত্র শান্তি হঠাৎ যেন একটা অভিশাপে বিষাক্ত হয়ে সর্বময় শান্তির জ্বালা হয়ে উঠছে। ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর—তুমি বোধহয় আর হাসতে পারবে না নীরজা?

উত্তর দেয় না নীরজা। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে আর নিথর হয়ে বসে

থাকে।

পুষ্কর—কিন্তু তুমি না হাসলে আমি বাঁচবো কি করে?

তবু উত্তর দেয় না নীরজা।

পুষ্কর—তা হলে এখনই টাউনে গিয়ে হেমন্তর খোঁজ করে ওকে ওর টাকাটা দিয়ে আসি, কেমন?

চোখের উপর চাপা রুমালটা সরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে নীরজা—এস।

বি জ য়ি নী

কোন উপায় যখন নেই, তখন চিন্তা করে লাভ কি?

তবু চিন্তা করে বরুণা, আর, বরুণার উপর রাগ করে সোমেশ। যেখানে মায়া করবার কোন অর্থ হয় না, সেখানে মায়া করে লাভ কি?

কিন্তু মায়া না করে পারে না বরুণা, এবং চিন্তাই করে।

যার সম্পর্কে সব সময় যত মায়ার কথা বলে বলে সোমেশকে বিরক্ত করে বরুণা, সে হলো বরুণারই বোন অঞ্জনা। বয়সে বরুণার চেয়ে খুব বেশি ছোট নয় অঞ্জনা, বড়জোর চার বছরের ছোট হবে।

সোমেশ মাঝে মাঝে বলে—তা'ও যদি বুঝতাম যে, এক মায়ের পেটের আপন বোন, তবে না হয় বোনের কথা ভেবে একটু আধটু ···।

ঠিকই, ঠিক আপন বোন নয়, বরুণার সৎ-বোন অঞ্জনা। এবং কে না জানে, বরুণার সেই ভয়ানক সৎ-মা মানুষটি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন বরুণাকে কিরকম হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে আর কষ্ট দিয়ে খুশি হয়েছিলেন।

বরুণার বয়স তখন মাত্র দু'বছর, যখন বরুণার মা হঠাৎ একদিন বুকের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই জোরে জোরে তিনবার শ্বাস ছেড়ে দিয়ে মরে গেলেন। এবং তারপর একটা বছরও পার হয়নি, নতুন করে একটা মা'কে যেদিন বাড়িতে নিয়ে এলেন বাবা, সেদিন বরুণার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক চোখ তুলে দিয়ে তাকিয়েছিলেন নতুন মা, এবং নতুন মা'র চোখ দুটো বেশ ছলছলও করেছিল।

এসব ঘটনার ছবি বরুণার সেই দু'বছর বয়সের আরও অনেক স্মৃতির মতো বরুণার মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে। বড় হয়ে বাবার কাছ থেকে সে ঘটনার গল্প শুনেছিল বলেই নিজের জীবনের সেই অতীতটাকে, শিশুকালের

সেই সব সুখ আর দুঃখগুলিকে কিছু কিছু কল্পনা করতে পারে বরুণা। এবং আজও মনে পড়ে বাবার সেই করুণ মুখের ছবি, আর করুণ আক্ষেপের ভাষা। বরুণা তখন বেশ বড়টি হয়েছে। বরুণাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে কতবার বলতেন বাবা।—তোর নতুন মা আগে এমনটি ছিল না বরু, বিশ্বাস কর। কত ভালবাসতো তোকে; আমি রাত করে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেছি, তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে রয়েছে তোর নতুন মা। সেই মানুষ আজ একবার খোঁজও নেয় না যে, তুই ভাত খেলি কি খেলি না। ছিঃ ছিঃ, কি ছিল, আর কি হলো!

আজ বরুণা তার জীবনের সবচেয়ে পুরনো অতীতের ছবি বলতে যে ছবিকে আবছায়ার মতো মনের ভিতরে দেখতে পায়, সে ছবি বরুণার পাঁচ বছর বয়সের একটা অনুভবের আবছা স্মৃতি মাত্র। নতুন মা'র কোলে ফুটফুটে একটা কচি মানুষ শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, আর বরুণা সেই ছোট ছোট হাত-পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার জন্য নতুন মা'র কোলের উপর ঢলে পড়েছে। নতুন মা একটু বিরক্ত হয়ে বলেছেন—আঃ, বিরক্ত করিস না বরু। সর দেখি।

সেই যে বরুণাকে সরিয়ে দিলেন নতুন মা, তারপর ··তারপর আর কোনদিন নতুন মা'র কাছে এসে গা ঘেঁষে বসতে পেরেছিল বলে মনে পড়ে না বরুণার। এবং আজও বেশ স্পষ্ট করে মনে পড়ে, একদিন নতুন মা বাবার উপর ভয়ানক রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ও মেয়েকে আঁতুড়ে নুন খাওয়ানো উচিত ছিল। সেদিন, বরুণার জন্য একটা সিল্কের শাড়ি কিনে এনেছিলেন বাবা।

নতুন মা'র সন্দেহ ছিল যে, বাবা বরুণাকে ভালবাসে, এবং অঞ্জনাকে ভালবাসেই না। বাবা দুঃখিত হয়ে নতুন মা'কে বলতেন—ছিঃ, তুমি এত মিথ্যে সন্দেহও করতে পার। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

মনে পড়ে বরুণার, বরুণারই বিয়ের আগের দিনে রাগ করে না খেয়ে, আর ঘরের কপাটে খিল এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন নতুন মা। তার আগে বাবার সঙ্গে সারা সকাল ঝগড়া করেছিলেন—সর্বস্ব খুইয়ে, ধার করে আর অফিসের ফণ্ডের সব জমা টাকা তুলে তুমি বরুর বিয়ে দিচ্ছ, আমার অঞ্জুর কি উপায় হবে তাহলে? অঞ্জু কি বানের জলে ভেসে এসেছে? অঞ্জু তোমার মেয়ে নয়?

ঘরের ভিতরে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন নতুন মা। নতুন মা'র সেই কান্নার করুণ স্বর আজও বরুণা যেন কানে শুনতে পায়।

এবং সেই বিয়ের দিনের একটা ঘটনার ছবিও মনে পড়ে বরুণার। সেদিন

বাইরের ঘরে বরুণাকে কাঁদ-কাঁদ মুখ নিয়ে একলাটি পড়ে থাকতে দেখে অঞ্জনা ভয়ানক রাগ করেছিল।—তুই দিদি একটা ভয়ানক মুখ্খু। মা'র ওসব আবোল তাবোল কথা শুনিসই বা কেন, আর ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করিসই বা কেন?

সেই অঞ্জনা আজ কোথায় আছে? ভাবতে গিয়ে মন খারাপ না করে পারে না বরুণা, সোমেশ যতই রাগ করুক না কেন।

বরুণার বিয়ে হয়েছে এই তো মাত্র পাঁচটা বছর হলো। বাবা মারা গিয়েছেন বরুণার বিয়ের মাত্র দুটি বছর পরেই। আর নতুন মা মারা গিয়েছেন, এই সেদিন, এক বছরও হয়নি।

বেচারা নতুন মা'র সেই সন্দেহভরা দুঃস্বপ্নটাই সত্য হয়ে উঠেছে। আজ নতুন মা'র কথা মনে পড়লে বরুণার চোখ দুটো বার বার ভিজে যায়। সত্যিই যে, আজ সেই ভয়ানক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নতুন মা'র সেই রাগের কথাগুলিই যেন ভয়ানক আর্তনাদের স্মৃতির মতো করুণ হয়ে বরুণার মনের ভিতর বাজছে। আমার অঞ্জুর কি উপায় হবে?

বরুণার বাবা চাকরি করতেন গয়ার পুরনো সহরের যে মাড়োয়াড়ীর অফিসে, সে অফিস আজও সেখানে আছে। দোকানের পিছনে যে গলির ভিতরে ছোট একটা বাড়িতে বরুণার জীবনের ষোলটা বছর পার হয়েছিল, সেই বাড়িতে এখন অন্য ভাড়াটে থাকে। অঞ্জনা থাকে ঐ গলিতেই আর একটা বড় বাড়িতে, নিবারণকাকার বাড়ি।

বাবার খুড়তুতো ভাই নিবারণকাকা। এত বড় বাড়িটা নিবারণকাকার নিজেরই বাড়ি। নিবারণকাকার অবস্থা ভাল, তামাকের আড়তদারী করেন। নিবারণকাকার বাড়িতে অনেক লোক। সব নিয়ে চল্লিশ জনেরও বেশি হবে। বড়-বউদির চারটি, মেজ-বউদির তিনটি আর ছোট-বউদির দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া, নিবারণকাকার দুই মেয়ে আর দুই জামাইও এই বাড়িতে থাকে। তাদেরও ছেলে-পিলে আছে। এত বড় সংসারের কাজে, মাত্র একটি ঝি রেখেছিলেন নিবারণকাকা।

কিন্তু, খবর পেয়েছে বরুণা, অঞ্জনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার পরে সেই ঝি-টাকেও ছাড়িয়ে দিয়েছেন নিবারণকাকা।

এই অঞ্জনার উপায় কি হবে? কথায় কথায় সোমেশকে বিরক্ত করে বরুণা—তুমি কি ভেবেছ, টাকা খরচ করে অঞ্জনার বিয়ে দেবেন নিবারণকাকার মতো মানুষ? কখ্খনো না। স্বপ্নেও এমন আশা করো না। মেয়েটাকে শুধু

দু'মুঠো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, আর চিরকাল খাটাবে, যতদিন না মেয়েটা মরে যায়।

সোমেশ—কিন্তু তুমিই বা স্বপ্নে কি আশা করছো? তুমি অঞ্জনার বিয়ে দেবে?

বরুণা—তুমি আশা দিলেই আশা করতে পারি।

সোমেশ ভ্রূকুটি করে।—আমি আশা দেব? আমি? যে মানুষ একটা জমিদারের সেরেস্তায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে, সে মানুষ তোমার সৎ-বোনের বিয়ের খরচ যোগাবে? তা…সৎ-বোনের জন্য মনে মনে যত খুশি মায়া কর বরুণা, কিন্তু পাগলের মতো কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।

চুপ করে বরুণা। সোমেশেরই মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। অভিযোগ করবার কিছু নেই; সোমেশের যুক্তির মধ্যে একটুও ভুল নেই। কোথা থেকে টাকা দেবে বেচারা সোমেশ? নিজেরই স্ত্রী বরুণাকে আজ পর্যন্ত একটা সোনার জিনিস কিনে দিতে পারেনি যে সোমেশ, সে কেমন করে ষোল ভরি সোনার জিনিস, মোটামুটি দানসামগ্রী আর শয্যাদ্রব্য, একটা হারমোনিয়ম আর নগদ এগার'শ টাকা বরপণ দিয়ে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়াতে পারবে? রাজগীরে থাকে, এক পাত্রের খোঁজ পেয়েছে বরুণা। বার বার চিঠি লিখে সেই পাত্রের মা'র সঙ্গে অনেক কথা আলোচনা করেছে, অনেক অনুনয় আর মিনতি জানিয়েছে। এবং পাত্রের মা শেষ পর্যন্ত, মাত্র এই সামান্য দাবির সর্তে বরুণার বোন অঞ্জনার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। অঞ্জনার একটা ফটোও পাত্রের মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বরুণা।

বরুণার নিজের গায়ের জিনিসগুলির সবই যদি থাকতো, তবে নয় তাতেই বা কি? ষোল ভরির দাবির মধ্যে মাত্র সাত ভরি যোগাড় হতো। বাকি খরচ কোথা থেকে আসতো?

বরুণারই একবার টাইফয়েড হয়েছিল, এবং টাইফয়েডের পর প্রায় পঙ্গু ধরনের একটা অবস্থা হয়েছিল বরুণার। একটা বছর হাঁটা-চলাও করতে পারেনি। এহেন একটা কঠিন রোগের চিকিৎসা করবার জন্য যে টাকা দরকার, সে টাকাও যোগাড় করবার সামর্থ্য হয়নি সোমেশের। বরুণারই গায়ের জিনিস-গুলি বেচে দিয়ে ওষুধপত্র আর ডাক্তারের দাবি মেটাতে হয়েছিল। সোমেশ আজও অপরাধীর মতো মুখ করে নিজেকেই ধিক্কার দেয়—টাকা যোগাড় করবার ক্ষমতা থাকলে কি তোমার ঐ সামান্য দু'চারটে গয়না বেচে ওষুধ কিনতাম, আজ পর্যন্ত একটা দেড় ভরির জিনিসও তোমাকে…।

—ওসব কথা ছেড়ে দাও। বলতে গিয়ে বরুণার মুখটা করুণ হয়ে যায়।

সোমেশ বলে—আমিও বলি, তুমি ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও। রাজগীরের ছেলের মা'র কাছে মিছিমিছি চিঠি লেখালেখি করো না।

বরুণা—কিন্তু···।

সোমেশ—কি ?

বরুণা—গয়াতে গিয়ে অঞ্জনাকে একবার কি দেখেও আসতে পারবো না ? সেটাও কি খুব খরচের ব্যাপার ?

নতুন মা মারা যাবার পর সেই যে একবার গয়াতে গিয়েছিল বরুণা, তারপর আর যায়নি। নিবারণকাকা এসে গম্ভীর হয়ে অঞ্জনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, বাস্, তারপর আর নয়। সেদিনের অঞ্জনার সেই জলভরা চোখ দুটোকেই বার বার মনে পড়ে। এবং সেই অঞ্জনার চিঠি এসেছে—তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে দিদি।

একবার গয়া ঘুরে আসতে ক'টা টাকাই বা খরচ করতে হবে ? সে খরচও কি দিতে পারবে না সোমেশ ?

সোমেশ হাসে—তা···একবার গয়াতে যাওয়া আর ঘুরে আসা, হ্যাঁ, সে খরচ যোগাড় হয়েই যাবে।

দুই

রফিকাবাদ নামে যে জায়গাতে একটা মাটির বাড়িতে সোমেশ ও বরুণা থাকে, সেখান থেকে গয়া যেতে হলে রোজকার ডাক-বহা মোটর সার্ভিসের বাসেই যাওয়া যায়। ভাড়া লাগে বার আনা। দুটি মানুষের যাওয়া-আসার জন্য খরচ পড়ে দেড় টাকা আর দেড় টাকা, মোট তিন টাকা।

কিন্তু সোমেশ জানে, এবং বরুণাও জানে, নিবারণকাকার বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাবে না। ওঠা উচিতও নয়, কারণ মুখে কিছু না বললেও খুশি হবে না নিবারণকাকা। গয়াতে গিয়ে কোন হোটেলে হয়তো একটি দিনের মতো থাকবার আর দু'বেলা ভাত খাওয়ার খরচও যোগাড় করতে হবে। সে জন্য অন্তত আরও চারটে টাকা চাই। অর্থাৎ মোট দশটা টাকা হলেই হয়ে যায়।

কিন্তু আর কয়েকটা দিন দেরি করতে চেয়েছিল সোমেশ। দশটা টাকাও এখন হাতে নেই। মাইনেটা পাওয়া যাক্, তারপর একদিন···।

কিন্তু বরুণা আবার সোমেশকে বিরক্ত করেছিল—না,আর দেরি করতে ভাল লাগছে না।

সোমেশ আশ্চর্য হয়—আর মাত্র পনরটা দিন পরেই বোনকে দেখতে পাবে,

তবু···কি আশ্চর্য, কেন যে এত ঘ্যানর ঘ্যানর কর ? এরই মধ্যে তোমার বোন মরে যাবে না।

বরুণা—কিন্তু এই পনেরটা দিন তো কষ্ট পাবে মেয়েটা। ভাববে, দিদি বুঝি আসবেই না। যাবই যখন, তখন বেচারাকে আরও পনরটা দিন চিন্তায় রেখে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

অগত্যা বাধ্য হয়ে সাহুজীর কাছ থেকে একমাসের জন্য এক টাকার সুদ স্বীকার করে দশটা টাকা ধার নিতে হয়। তিন দিনের ছুটি নিতে হয়, এবং গয়াতে এসে একটা হোটেলেও উঠতে হয়।

এবং তারপর যা হয়ে গেল, তার জন্য একেবারে গম্ভীর হয়ে, মনের রাগ মনের ভিতর চেপে রেখে, আবার রফিকাবাদে ফিরে যাবার জন্য চকের বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ায় সোমেশ। ঝোঁকের মাথায়, একটা অদ্ভুত জেদের অহংকারে একি কাণ্ড করে ফেললো বরুণা! এরকম কঠোর একটা দায় মাথায় তুলে নিতে একটুও ভয় করলো না বরুণার ?

নিবারণকাকার বাড়িতে যাওয়া হলো। বোনকে বুকে জড়িয়ে একেবারে আহ্লাদে গলে পড়লো বরুণা। সবই ভাল হতো, যদি ঘটনাটা সেখানেই ফুরিয়ে যেত। কিন্তু তারপরেও কেন মিছিমিছি···।

অঞ্জনার দোষ নেই। অঞ্জনা বার বার আপত্তি করেছিল। বার বার বরুণার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর লুকিয়ে লুকিয়ে বরুণার শাড়ির আঁচল ধরে এক একটা টান দিয়ে বরুণাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল অঞ্জনা—তুমি চুপ কর দিদি।

কিন্তু চুপ করতে পারেনি বরুণা। কাকা আর কাকিমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা ঝগড়া বাধিয়ে ফেললো বরুণা।

নিবারণকাকা ঠাট্টা করে বললেন—আঃ, কোত্থেকে আজ হঠাৎ এসে সৎ-বোনের জন্য দরদ দেখাতে শুরু করেছেন, এতদিন ছিলেন কোথায় আপনি ?

কাকিমা বলেন—অঞ্জু সুখে আছে কিনা, সে খোঁজ তোমাকে নিতে হবে না। তুমি ঘরে গিয়ে নিজের সুখের খোঁজ নাও।

বরুণা তবু চেঁচিয়ে তর্ক করে—আমার বোনের সুখ দুঃখের খোঁজ আমি নেব না তো কে নেবে ?

তিন বউদি বরুণার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসে আর ফিসফিস করে—ইস্, কত বড় সুখের মানুষটি! কত ক্ষ্যামতা!

বরুণা বলে—আমি শুধু জানতে চাই, অঞ্জনার বিয়ে দেবার জন্য কি চেষ্টা আপনারা করেছেন ?

নিবারণকাকা—চেষ্টা করি বা না-করি, তুমি জিজ্ঞেস করবার কে ?

কাকিমা বলেন—এত বড় গলা করে কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার ?

বরুণা—কিসের লজ্জা ?

কাকিমা—দাও না বোনের বিয়ে, দেখি কত মুরোদ ?

বরুণা চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, মুরোদ আছে।

বড়-বউদি মুখ টিপে হাসে আর ফিসফিস করে।—কত টাকা মাইনে পান সোমেশবাবু ?

বরুণা আবার বেহায়ার মতো চেঁচিয়ে ওঠে—পঞ্চাশ টাকা !

নিবারণকাকা—তবে চুপ কর এবং চুপচাপ চলে যাও।

বরুণা—না

নিবারণকাকা—তার মানে ?

বরুণা—অঞ্জনাকে নিয়ে যাব।

অঞ্জনাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বরুণার কানের কাছে ফিসফিস করে—না, দিদি। তুমি চলে যাও, আমি বেশ আছি দিদি।

অঞ্জনার হাত ধরে টান দেয় বরুণা—চল।

অঞ্জনা আবার কি-যেন বলতে চেষ্টা করে। বরুণা ধমক দেয়—চুপ কর।

নিবারণকাকা সোমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে একটা হুংকার ছাড়েন—কি হে, তুমি নীরব কেন ? তোমার স্ত্রীর রকম-সকম চোখে দেখতে পাচ্ছ না ? তোমারও কি ইচ্ছা··· ?

সোমেশ বলে—আজ্ঞে···আমি তো—আমি এসব কাণ্ড ঠিক পছন্দ করতে পারছি না।

কাকিমা চেঁচিয়ে ওঠেন—তোর মতলব কি অঞ্জনা ? তুইও কথা বলছিস না কেন ? বড়লোক দিদির বাড়িতে যাবি ?

অঞ্জনা মাথা হেঁট করে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তিন বউদি একসঙ্গে ভ্রূকুটি করে আর কলকল করে ওঠে—যেতে দিন, যেতে দিন। আপনি আপত্তি করবেন না, মা। গয়া সহরে কি আর··· !

বরুণা পাল্টা ভ্রূকুটি করে।—ঝি পাওয়া যায় না ? তাই না ?

তিন বউদি একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, তাই।

অঞ্জনার হাত ধরে নিবারণকাকার বাড়ির দরজা পার হয়ে আর গলির ধুলোর উপর পা দিয়েই খিলখিল করে হেসে সোমেশের মুখের দিকে তাকায় বরুণা।—কেমন জব্দ করে দিলাম।

রফিকাবাদে যাবার জন্ম মোটর বাসের তিনটে টিকিট কিনতে হবে। পকেটে হাত দেয় সোমেশ। এবং ভয়ানক গম্ভীর হয়ে, ছোট একটা ভ্রূকুটি করে বরুণার দিকে তাকায়—কাকে জব্দ করলে?

বরুণা হাসে—নিবারণকাকাকে।

সোমেশ—মোটেই না, কাকে জব্দ করলে, সেটা বুঝতে এখনও… ।

কথা শেষ না করেই বাসের টিকিট কেনবার জন্ম এগিয়ে যায় সোমেশ।

তিন

অগুনার কি উপায় হবে? অনেক দিন তো পার হয়ে গেল। একটা বর্ষা শেষ হয়ে গিয়ে, অনেকগুলি মাস পার হয়ে, আবার একটা বর্ষা প্রায় এসে পড়লো। রফিকাবাদের জলন্ত আকাশের এদিকে ওদিকে ছোট ছোট মেঘ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। আর ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় বরুণা।

বড় গলা করে নিবারণকাকার মুখের উপর যে কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে বরুণা, আজ যদি সেই কথার জের ধরে জবাব চাইতে আসেন নিবারণকাকা, তবে কি উত্তর দেবে বরুণা?

মাঝে একদিন সোমেশও ভয়ানক রুক্ষ স্বরে এবং রাগ করে একটা অভিযোগও করে ফেলেছে।—তোমার জন্যেই আজ একটা অপমান সহ্য করতে হলো!

বরুণা ভয় পায়—অপমান?

সোমেশ—হ্যাঁ। গয়াতে আদালতের কাছে নিবারণকাকার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

বরুণা—কি বললেন নিবারণকাকা?

সোমেশ—যা বলা উচিত, তাই বললেন। বিশ্রীভাবে মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করলেন, কি হে সোমেশ, তোমার স্ত্রী বরুণা মহাশয়া লাখ টাকা খরচ করে সৎ-বোনের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে বোধহয়?

মাথা হেঁট করে বরুণা। চোখ দুটো জলে ভরে গিয়ে ছলছল করতে থাকে। নিবারণকাকার উপর রাগ করা যায় না। ঠিকই বলেছেন, যে মেয়ের কানে সোনার গিল্টি করা এক জোড়া পিতলের কানপাশা দোলে, আর হাতে কাচের চুড়ি, যার স্বামী জমিদারের সেরেস্তায় খাতা লিখে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে আর শুধু ডালভাত খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে, সে মেয়ে কোন্ মুখে সৎ-বোনের বিয়ে দেবে বলে বৃথা মুরোদের কথা বলে?

এই ক'মাসের মধ্যে বার বার অনেকবার বড় ভয়ানক রকমের গম্ভীর হয়েছে,

এবং বরুণার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলাও বন্ধ করেছে সোমেশ।

বরুণার আনমনা মুখটাও মাঝে মাঝে বড় করুণ হয়ে যায়। ঠিকই তো, বেচারা সোমেশকেও বড় অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বরুণা। বরুণার একটা নতুন শাড়ির দাবি মেটাতে গিয়ে যে-মানুষ বার বার হিসেব করেছে, টাকার অভাব সহ্য করতে গিয়ে বিরক্ত হয়েছে, সে মানুষকে আজকাল মাঝে মাঝে একই সঙ্গে দুটো নতুন শাড়ি কেনবার কথা ভাবতে হয়। অঞ্জনার জন্যও যে একটা নতুন শাড়ি চাই।

অঞ্জনা যখন ঘরের বাইরে এদিক-ওদিক থাকে, তখন বরুণাকে দু'কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না সোমেশ।—একজনের দাবি মেটাতেই হিমসিম খাই, কোথা থেকে আবার আর-এক জনের দাবি এসে জুটলো। তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকেই জব্দ করলে বরুণা।

আরও উদাসভাবে কিছুক্ষণ সোমেশের সেই বিরক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে বরুণা। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে।—আমিই বা কি কম জব্দ হয়েছি?

সোমেশ চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি ছাই জব্দ হয়েছ। লজ্জা থাকলে তবে তো জব্দ হবে?

চুপ করে বরুণা। সোমেশকে আর বিরক্ত করতে চায় না। তাই বলতে পারে না বরুণা, আমারই সব অহংকার যে জব্দ হয়ে গেল। নিবারণকাকার কাছে বড় গলা করে যে-কথা বলে এলাম, সেটা যে আমারই আশা আর প্রতিজ্ঞার কথা। অঞ্জনার বিয়ে দেবার মুরোদ হলো না, সে তো আমারই পরাজয়ের কথা।

কিন্তু অঞ্জনা যখন ঘরের দিকে এগিয়ে আসে, তখন সোমেশও সাবধান হয়ে যায়। এই দুঃসহ সমস্যার কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য সমস্যার কথা নিয়ে বকবক করতে থাকে সোমেশ। ছোট সজনে গাছটাকে এমন করে মুড়িয়ে দিয়ে গেল কাদের গরু?...অঞ্জনা এত দেরি করে স্নান করে কেন?...তুমি কি আর চা খাবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ?

হেসে ফেলে বরুণা। চলে যায় সোমেশ। আর, অঞ্জনা বারান্দার উপরে ঘুর ঘুর করে দাঁড়ের টিয়া পাখিটার সঙ্গে আবোল তাবোল ঠাট্টার কথা বলতে থাকে, ঠাট্টা হাসি হাসতে থাকে।

এবং বরুণার প্রাণটাও যেন হঠাৎ একটা দুরন্ত স্বপ্নের আবেশে বিভোর হয়ে উঠতে থাকে। জ্বল জ্বল করতে থাকে বরুণার চোখ দুটো।

অঞ্জনা ডাক দেয়—তুমি এবার খেয়ে নাও দিদি। আর কত দেরি করবে?

বরুণা বলে—আমি খাব না রে অঞ্জু।

—তার মানে।

—আমি দিনে দু'বার ভাত ডাল গিলতে পারবো না।

—কেন?

—শরীরে সহ্য হয় না। আমি একবেলা যা পারি দুটো খেয়ে নেব।

কোথা থেকে ছুটে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় সোমেশ। আর, রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—আবার পঙ্গু হবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি? মনে রেখ, আবার যদি অসুখে পড়, তবে…।

বরুণা হাসে—তবে কি? চিকিৎসা হবে না এই তো?

কোন উত্তর না দিয়ে, কটমট করে বরুণার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চলে যায় সোমেশ।

চার

সাতদিন ধরে একটানা জ্বর ভুগে নিয়ে যেদিন দেয়াল ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে বরুণা, সেদিন বরুণার মুখের দিকে আবার কটমট করে তাকিয়ে বরুণার হাত ধরে সোমেশ। হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বিছানার উপর শুইয়ে দেয়।—সাবধান, তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। তোমার আদুরে বোনটি আছে কি করতে? আরও কিছু দিন রান্নাবান্না করলে তোমার বোনের রূপ কালো হয়ে যাবে না।

বিছানার উপর বসে বরুণা বলে--কিন্তু আমি ভাবছি…।

—কি?

—মেয়েটা কি দিদির বাড়িতে এসেও দাসীর মতো শুধু খাটবে?

—তার মানে?

—অঞ্জনার একটা গতি হওয়া চাই তো।

—কি গতি?

—অঞ্জনার কি বিয়ে হবে না?

—কেমন করে হবে? কে বিয়ে করবে? ক' লাখ টাকা তোমার আছে যে বোনের বিয়ে দেবে? বলতে বলতে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে সোমেশের চোখ দুটো।

—কোন উপায় কি নেই? বরুণার মুখটা যেন ভয়ানক একটা জেদের স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সোমেশ।—হ্যাঁ, একটা উপায় আছে।

—কি?

—আমাদের দেশ-গাঁয়ে আগে যে নিয়মটা ছিল।

—কি?

—এরকম হতভাগা মেয়েকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথের কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়ে আসা হতো।

—তারপর?

—তারপর আর কি? সে মেয়ের যা হতো তা বিশ্বনাথই জানেন।

হঠাৎ সোমেশের উগ্র চোখের দৃষ্টিটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। বরুণার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝড়ে পড়ছে। চোখ মুছে নিয়ে বরুণা বলে—ছি ছি, তুমি এমন ভয়ানক কথাও বলতে পার। শত হোক, আমারই তো বোন, তোমারই স্ত্রীর বোন, তার ওপর তোমার কোন মায়া নেই?

সোমেশ কুণ্ঠিতভাবে বলে—অনেক দুঃখে বলেছি বরুণা। সত্যিই কি আমি চাই যে, অঞ্জনার এরকম একটা ভয়ানক দশা হয়ে যাক্। ও বেচারা কি দোষ করেছে বল? ওর ভাগ্যের দোষ।

চুপ করে সোমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বরুণা। সোমেশ যেন অনুতপ্ত হয়ে নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে।—এখানে থেকেও কত কষ্ট পাচ্ছে অঞ্জনা, তবু তো বেচারা সব সময় হাসে। নিজেই বলে, বেশ তো আছি, চিরকাল এখানেই থাকবো।

সেরেস্তায় যেতে হবে। সময় হয়ে এসেছে। আলনা থেকে কামিজটাকে তুলে নিয়ে গায়ে দিতে থাকে সোমেশ। আর, তেমনই মুখর হয়ে, যেন মনের একটা বদ্ধ বেদনার কাহিনীকে একেবারে অবাধ করে দিয়ে বলতে থাকে।—আমিও তো তাই বলি। বেচারার যখন কোন গতি হবেই না, কোন উপায়ই নেই, তখন এই বাড়ির কষ্টের মধ্যেই…কষ্ট হোক, তবু এখানে ওকে মায়া করবার মতো মানুষ তো আছে, এ তো আর নিবারণকাকার বাড়ির মতো একটা নিষ্ঠুর বাড়ি নয়।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ বের হয়ে এসে এই ঘরের ভিতরে ঢোকে আর হাসতে থাকে অঞ্জনা। অঞ্জনার হাতে হলুদের দাগ, শাড়ির আঁচলটা ভেজা।

বরুণা—শাড়িটা ভেজালি কেন অঞ্জু?

অঞ্জনা—ইচ্ছে করে কি ভিজিয়েছি? বাসন মাজতে গিয়ে টবের জলের উপর আঁচলটা পড়ে গেল, তাই…।

বরুণার মুখে অদ্ভুত হাসির আভা ঝিকঝিক করে।—কি রান্না করছিস অঞ্জু?

অঞ্জনা—আলুর দম, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুরির ডাল, আর…।

বরুণা—খুব হলুদ বেটেছিস্ বুঝি?

অঞ্জনা—হলুদ নয়, জাফরান গুলেছি।

বরুণা—জাফরান কেন?

সোমেশের দিকে ছোট একটা ভ্রূকুটি তুলে খিলখিল করে হেসে ওঠে অঞ্জনা—এই ভদ্রলোক হলুদ পছন্দ করেন না, জাফরানে খুব রুচি।…যাই হোক্, আপনি এখনই সেরেস্তায় যাবেন না, একটু পরে যাবেন।

সোমেশ—কেন?

অঞ্জনা—এখনো রান্না শেষ হয়নি।

সোমেশ—আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।

পাঁচ

সন্ধ্যা হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে আর উদাসভাবে তাকায় না বরুণা। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে যাবার শক্তি নেই। জ্বর আর হয়নি, কিন্তু কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরটা যেন একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবার জন্য সমস্তক্ষণ থরথর করে কাঁপে; আর বুকের ভিতর একটা বেদনার ভারে নিঃশ্বাসটা ভারি হয়ে যায়।

কিন্তু বরুণার চোখ দুটো যেন সফল স্বপ্নের আনন্দে ঝিকঝিক্ করে হাসে। যেন, এই রকমই একটা অনড় হয়ে যাওয়া জীবন কামনা করেছিল বরুণা। বেশ চেষ্টা আর চিন্তা করে, অনেক হিসেব করে আর রোজ একবেলার উপোস সেধে এতদিনে একটা আশার কাছাকাছি এসে পৌছে গিয়েছে বরুণা।

বিছানার কাছেই একটা কাঠের বাক্সের উপর একটা ওষুধের শিশি রয়েছে। শিশির ভিতরে টলটল করছে তরল ওষুধ, যেমন গাঢ় তেমনই কালো। এই ওষুধটা বরুণার কোমরে মালিশ করতে হয়। ক'দিন ধরে নিজের হাতে আর মালিশ করতে পারে না বরুণা। সোমেশই মালিশ করে দেয়। মালিশের পর, সাবান আর গরম জল দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়। ডাক্তার বলে দিয়েছেন. সাবধান, ভয়ানক বিষাক্ত এই ওষুধ।

সাহুজীর বাড়িতে রামলীলার গান শোনবার জন্য নিমন্ত্রণ হয়েছে। গান শুনতে চলে গিয়েছে সোমেশ আর অঞ্জনা। দু'জনের কেউ রামলীলার গান শোনবার জন্য একটুও উৎসাহিত হয়নি। কিন্তু বরুণাই বার বার বলে, অনেক সাধাসাধি করে শেষ পর্যন্ত দু'জনকে রামলীলার গান শোনবার জন্য সাহুজীর

বাড়িতে যাইয়ে ছেড়েছে।

দু'হাতে চোখ চেপে ধরে একবার ফুঁপিয়ে ওঠে বরুণা। যেন নতুন মা'র সেই করুণ কান্নার স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার অঞ্জনার কি উপায় হবে?

বালিশের গায়ে চোখ ঘষে ঘষে মনে মনে বিড়বিড় করে বরুণা—নিশ্চয়ই উপায় হবে নতুন মা। আমি থাকতে কেন উপায় হবে না?

নিবারণকাকা ঠাট্টা করছেন, বোনের বিয়ে দেবে বলে যে খুব বড় গলা করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেমাক দেখিয়েছিলে, কই, কোথায় তোমার বোন? বিয়ে দিতে পেরেছ কি?

বরুণার বুকের ভিতরটা যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। বেশ তো আর কিছুদিন পরে একবার যেন এই ঘরের ভিতরে ঢুকে ঠাট্টা করতে আসেন নিবারণ কাকা। তাহলে···কল্পনা করতে পারে বরুণা, তাহলে কি-ভয়ানক জব্দ হয়ে চলে যাবেন নিবারণকাকা। অঞ্জনার সিঁথির দিকে তাকিয়ে লাল টুকটুকে সিঁদুরের চিহ্ন দেখতে পেয়েই চমকে উঠবেন, আর বোকা বনে গিয়ে সরে পড়বেন। হাড়ে হাড়ে বুঝবেন, বোনের বিয়ে দেবার মুরোদ ছিল কিনা বরুণার।

টিম টিম করে জ্বলছে ছোট একটা বাতি। বাতিটাতে অনেক তেল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে অঞ্জনা। যেন তেল ফুরিয়ে বাতিটা নিভে না যায়। দিদির তো শরীরে আর সাধ্যি নেই যে, উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ঢালতে পারবে।

—না না না, আর দেরি করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। চুপ করে পড়ে থাকলে আরও দেরি হয়ে যাবে। বিড়বিড় করে বরুণার শুকনো সাদা রক্তহীন ঠোঁট।

বালিশের পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল হাতে তুলে নেয় বরুণা। আস্তে আস্তে, যেন সফল প্রতিজ্ঞার উল্লাসে চোখ দুটোকে হাসিয়ে নিয়ে কথাগুলিকে লিখে ফেলে বরুণা।—তুমি রাগ করো না। অঞ্জনাকে বিশ্বনাথেরই কাছে রেখে গেলাম।

কাগজটাকে ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে দিয়েই ওষুধের শিশিটার দিকে অপলক হয়ে তৃষ্ণার্তের মতো তাকিয়ে থাকে বরুণা। কী সুন্দর দেখতে এক শিশি গাঢ় কালো ও টলটলে তরল মরণ।

শিশিটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় বরুণা।

চারদিকের কোলিয়ারিগুলির সুদিন পড়েছে। বাজার বস্তি বাড়ছে। নিত্য নতুন কুলী কারিগর কেরানী ও দোকানীর ভীড়ে নয়াবাদ যেন গেঁজে উঠেছে। নয়াবাদকে তাই আর শুধু বাজার বলা যায় না। শুধু একটা থানা দিয়ে আর সামলে রাখা সম্ভব নয়। একজন সাবডিভিসনাল অফিসারকে আদালত নিয়ে বসতে হলো নয়াবাদে। সেই থেকে নয়াবাদ মহকুমা।

কিছু ভদ্রলোকের আমদানী হলো। প্রথম যাঁরা এলেন তাঁরা শুধু কয়েকজন উকীল, দুজন ডাক্তার আর একজন ওভার্সিয়ার। প্রাইমারী বাংলা স্কুল হলো একটা। মিউনিসিপ্যালিটিও চালু হলো।

তার অনেক আগেই নয়াবাদের লালমাটীর ডাঙ্গা ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে ক্যাথলিক মিশনের সুন্দর একটা গির্জা। দেশী খৃষ্টান মেয়েদের কনভেণ্ট, একটা অনাথালয় আর একটা জেনানা হাসপাতাল। ঝাউবনের ফাঁকে সাদা নতুন ইমারতগুলি উঁকি দিয়ে ছবির মতো স্থির হয়ে থাকে।

তারপর সুরু হলো নয়াবাদের একটানা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন। রাতের রেলগাড়ীর মতো নয়াবাদকে টেনে নিয়ে গেলে বছরের পথ ধরে, হু হু করে, পরিণামান্তরে। কিন্তু সবচেয়ে বদলে গেল যে, নামধাম চেহারা পর্যন্ত—তার নাম ধনিয়া।

বাঙালীটোলা থেকে সামান্য একটু দূরে দুর্গাবাড়ির পেছনে এক আমড়াতলায় ধনিয়ার ছোট একটা মেটে ঘর। খাপরার ছাউনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘরের সুমুখে একটা ছাগল বাঁধা থাকে। বাংলা স্কুলের ছেলেরা তাই নাম দিয়েছে—ছাগল লজ।

তিলকের মা ধনিয়া। তিলককে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। তিলকের বাবা কে, তাও কেউ জানে না। কিন্তু দু'তিন বছর পর পর নিয়মিতক্রমে তিলকের অনুজ ও অনুজারা ভূমিষ্ঠ হয়। শোণিতস্নাত এক একটি আনন্দের কণিকা যেন চুপে চুপে সকলের অলক্ষ্যে মায়ের হাত ধরে জীবনের পথে দেখা দেয়। তারপরেই হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে মেলার ভীড়ে হারিয়ে যায়। আর তাদের কেউ দেখতে পায় না।

থাকে থাকে, ধনিয়া একদিন উধাও হয়ে যায়। মাস দুয়েক তার আর দেখা পাওয়া যায় না। তখন তাকে পাওয়া যাবে মিশন জেনানা হাসপাতালের একটা ফ্রী বেডে। ক্ষুদ্র বিবর্ণ একটি মানুষের শাবক কুঁকড়ে পড়ে আছে

ধনিয়ার বুকের কাছে। কটা দিন যেন উষ্ণ নরম ডানার তলায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। শ্লথ শরীরটা একটু ভরাট হয়ে আসে, চামড়ার ভাঁজ আর রেখাগুলি ধীরে মিলিয়ে যায়। মিটমিট করে তাকায়—হাত পা ছোঁড়ে। একটু স্পর্শ পেলেই চারাগাছের পাতার মতো লোলুপ ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।

তারপর আর নয়। পাখি উড়ে যায়। ধনিয়া একা ফিরে আসে তার ছাগল লজে। তিলকের ভাইটিও যথানিয়মে মিশন অনাথালয়ে চালান হয়।

ধনিয়া অদ্ভুত মানুষ। হাসপাতালের নার্সেরা আশ্চর্য না হয়ে পারে না। লেডি ডাক্তারও হতবুদ্ধি হয়ে বলেন "জীসস্! আমি সত্যি ঘাবড়ে গেছি। এই মেয়েটা আমার বাইবেল ও বিজ্ঞান উল্টে দিয়েছে। জানতাম পাখির বাচ্চাই বড় হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম পাখিই পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে দিয়ে।"

ভদ্রলোকের পাড়া ঘেঁসে থাকে ধনিয়া। আত্মীয় বলে ওর কেউ নেই। ওর সমাজ নেই। কিন্তু এ শুধু সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যের পর আর সে নিয়ম চলে না।

প্রতিরাত্রে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়, শুধু কানাকানির ওপর দিয়ে আমড়াতলায় এক অদ্ভুত পৃথিবীর লীলাখেলা চলেছে। আবছা আলো, চাপা হাসি। শব্দ এখানে শুধু ফিসফিস, গান এখানে শুধু গুঞ্জন। সবই অস্পষ্ট। এখানে কাউকে আসতে দেখা যায় না, কেউ কখনও চলেও যায় না। রাউণ্ডের পুলিশ ছাড়া সেসব অদৃশ্য ছায়া-জীবনের পরিচয় আর কেউ জানে না। কিন্তু তা নিয়ে সোরগোল হয় না কখনও। রাত্রে যতবার ধনিয়ার দরজা খোলে, রাউণ্ডের পুলিশেরও ততবার আয়ের পথ খুলে যায়।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ভদ্রসমাজে ধনিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা হয় কেন? ধনিয়ার কথা ভুলতে পারে না অনেকেই।

বাংলা স্কুলের ছুটি হলে বাড়ি ফেরার পথে ছেলেদের মনে পড়ে ধনিয়াকে। ছাগল লজের আমড়া গাছ। ধনিয়ার ধমক খেয়ে, ঢিল মেরে দু'একটা পাকা আমড়া না চিবিয়ে আসলে ওদের সমস্ত জাগ্রত দিনের পরিতৃপ্তি যেন অপূর্ণ থাকে।

সন্ধ্যেয় ক্লাবঘরে উকীল ও ডাক্তারবাবুদের মধ্যে ধনিয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁরা বলেন—মেয়েটার কেউ নেই, অথচ চলে যায় বেশ। Something wrong!

রাত্রি দশটার পর রাউণ্ডের কনষ্টেবলেরা পোষ্টে যাবার আগে এক টিপ খৈনি মুখে দিতেই ওদের চোখমুখ উজ্জল হয়ে ওঠে। সমস্তরাত্রি টহলের এক-

যেয়েনি। তারই মাঝে আমড়াতলার সামনে মিষ্টি অন্ধকারে কিছুক্ষণ থমকে থাকা। ধনিয়ার ঘরের দরজার ফাঁকে প্রদীপের একটু ক্ষীণাভা—প্রাপ্তি ও পুরস্কারের দিব্যজ্যোতি। চাঁদনী রাতের আকাশের দিকেও ওরা এত আগ্রহ করে মুখ তুলে কখনও তাকায় না।

এখানেই শেষ নয়। ধনিয়ার ব্যক্তিত্বের ছায়া আরও অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে—বাঙালী ভদ্রঘরের শুদ্ধান্তঃপুরে পর্যন্ত। এটা অবশ্য নিছক প্রয়োজনের তাড়নায়। ঘটনা এমনি দাঁড়ালো যে সন্তানবতী বধূসমাজও এহেন ধনিয়ার সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে আর পারলো না। তাদের মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাটুকু নইলে বুঝি মাঠে মারা যায়।

ভদ্রবাড়ির প্রসূতিদের একটা না একটা আধি ব্যাধি লেগেই আছে। কেউ সূতিকায় জর্জর, কেউ রক্তহীনতায় সিঁটিয়ে যায়, কারও' বা বুকের অপত্যনির্ঝর অকালে শুদ্ধ হয়ে গেছে।

মিশন হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মোটা ফী নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন।—প্রসূতিদের চিকিৎসা চলতে পারে কিন্তু শিশুদের জন্য কোন ট্রিটমেণ্টই সফল হবে না। ওদের দরকার ভাইটালিটি, ওষুধ নয়।

'—তবে উপায় ?'

'—উপায় একজন সুস্থ সবল আয়া, শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াবার জন্য।'

ঘরে ঘরে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এই বংশরক্ষার সঙ্কটে গরজের বালাই ডেকে আনলো ধনিয়াকে। আমড়াতলা থেকে একেবারে ভদ্রবাড়ির আঁতুর ও অন্তঃপুরে।

ধনিয়ার ডাক পড়ে বাড়ি বাড়ি। বুকের দুধ খাইয়ে যাবার ঠিকে ! দু'বেলার রেট মাসিক ছ'টাকা, দৈনিক একপো চালের সিধে আর ঠিকে শেষ হলে বিদায় নেবার দিন একটা নতুন শাড়ি। এই বরাদ্দে ধনিয়া বাড়ি বাড়ি খেটে যায়।

প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যের আগে ধনিয়া ঠিকে খাটতে বার হয়। হাতে একটা ভাঁজ করা পরিষ্কার তোয়ালে। সব সময় মুখ হাসি হাসি। সুগন্ধি নেবু তেলে চুবিয়ে চুল বাঁধা। লাল সায়ার ওপর একটা পাতলা ধোলাই শাড়ি। চলবার সময় পায়ের আঙুলে রূপোর চুট্‌কিগুলো খই ফোটার শব্দের মতো বাজতে থাকে। নাকে একটা সোনার চিড়িতনের নাকছাবি—ঠোঁটের মিটিমিটি হাসির সঙ্গে মানিয়ে যায় বেশ। প্রসাধন তেমন কিছু নয়, পরিচ্ছন্নতাই বেশি। কিন্তু সুশ্রী চেহারা, হঠাৎ দেখে মনে হয়—বড় বেশি ঠাট।

ঘোষাল বাবুদের বাড়ির অন্দরে ধনিয়া ঢুকলো। এখানে একবেলা ঠিকে খাটতে হয়। মাত্র তিন মাসের একটা ছেলে।

ধনিয়াকে দেখেই ঝি প্রথমে মুখ কুঁচকে ঘরের ভেতর চলে গেল। একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন জীর্ণ শীর্ণ ঘোষালবাবুর স্ত্রী। সামনে একটা দোলনায় ঘুমন্ত নতুন খোকাটা।

ঝি গিয়ে জানালো—ঐ এসেছেন! কী ঠাট রে বাবা! গা ঘিনঘিন করে।

ঘোষালবাবুর স্ত্রী বিদ্রোহিণী ঝিকে শান্ত করলেন।—থাক্‌, মুখের ওপর কিছু বলিস্ নি ঝি! দায়ে পড়েছি, কাজ নিতে হবে। ভেতরে যে যেমন লোক হোক্ না, আমাদের কি?

ধনিয়া এগিয়ে এসে দোলনা থেকে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বসে। দু'একটা অবান্তর প্রশ্ন করে—'আজ কেমন আছ দিদি?' উত্তরের কার্পণ্য দেখে আর বেশি কিছু বলে না। কাজ শেষ হবার পর একটুখানি দাঁড়ায়। গামছায় সিধে বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

বিকেলে নরেনবাবুর বাড়ি মেয়েদের একটা জটলা বসে। হাজির হয় ধনিয়া। একটা ধাড়ি ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হয়। তিন বছর বয়সের রোগাপটকা ছেলে, পেটে এখনও গরুর দুধ হজম হয় না। বুড়োটে চেহারা আর উগ্র স্বভাব নিয়ে বাড়িময় লোককে জ্বালাতন করে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কাঁদে আর মাটিতে গড়ায়। কোন প্রবোধ সান্ত্বনা মানে না।

বারান্দায় উঠে ধনিয়া হাততালি দিল।—আওয়া মেরা লাল।

চীৎকাররত ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো ভূতলশয্যা থেকে একবার ফণা তুলে তাকালো, তারপর এক দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ধনিয়ার কোলে। খানিকক্ষণ ধনিয়ার হাতের বাজু নিয়ে টানাটানি উপদ্রব করলো। তারপর চুপ করে ধীর স্থির হয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়লো ধনিয়ার কোলে।

কিছুক্ষণ পরে ধনিয়া ডাকলো—ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে কোথায় শোয়াই?

অকস্মাৎ ঘরের ভেতর মেয়েদের মধ্যে যেন একটা বড় রকমের রসিকতার ঝড়ের দোলায় সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলো। জব্দ করার জন্য সকলে মিলে চেপে ধরলো নরেনবাবুর স্ত্রীকে।—কই, উত্তর দাও শীগ্‌গির। ছেলের নতুন মা কি তো বলছেন।

লজ্জায় ও বিরক্তিতে অপ্রস্তুত নরেনবাবুর স্ত্রী ছটফটিয়ে উঠলেন।—আমি ওর সঙ্গে কথা-টথা বলতে পারবো না বাবা। পুঁটি তুই গিয়ে খোকাকে নিয়ে আয়।

অগত্যা ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে পুঁটি, আটবছর বয়সের একটা বোকা বোকা খুকী, সেই এগিয়ে গেল।

ধনিয়া সিধের জন্ম দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণ সকলেই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকে। এতখানি পথ হেঁটে এসেছে মেয়েটা, তবু পা দুটো পরিষ্কার। ধুলো ময়লা যেন পিছলে ঝরে গেছে।

কেউ বা বেফাঁস বলে ফেলেন।—মাগির হাত দুটো কী নিটোল। তাগাটা মাংসের মধ্যে দেগে বসে গেছে।

খিড়কির দোর দিয়ে ধনিয়া অদৃশ্য হতেই পেছনের কৌতূহলী দৃষ্টিগুলি যেন শান্ত হলো। মাষ্টারের বউ নাকিয়ে নাকিয়ে দু'তিন বার শিউরে উঠলেন।—আমি আর লাল সায়া পরছি না বাবা। এ জন্মে নয়। আজ থেকে ইতি।

দুপুরে দেখা যেত, ঘরের বাইরে একটা মোড়ার ওপর বসে ধনিয়া তামাক টানে। অদূরে ঘাসের ওপর চরন্ত ছাগলটার সঙ্গে স্নেহাপ্লুতস্বরে ডাকাডাকি, উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা চলতে থাকে।

কিন্তু কদিন থেকে ধনিয়াকে আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমড়াতলার মেটে ঘরের দরজায় কুলুপ লাগানো। ধনিয়ার ছাগলটা বাঁধা রয়েছে নালার ধারে আর একটা কুঁড়ের সামনে—বুড়ো প্রসাদী ডোমের ঘর।

আশি বছরের মতো বয়স হয়েছে প্রসাদীর। আঠার বছর বয়সে কালাপানি হয়েছিল একবার ডাকাতির দায়ে। তারপর ছাড়া পেয়ে আরও পাঁচবার জেল খেটেছে চুরির জন্ম। মোট বেয়াল্লিশ বছর জেলের ভাত খেয়েই জীবন কেটেছে তার। বাইরে এসে রোজগার করে ভাত খাবার রীতিনীতিই সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে একেবারে বসিয়ে দিল তাকে। ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে কোমরটা ভেঙ্গে গেল, আর সোজা হলো না।

তার ওপর এল শরীর ছাপিয়ে বয়সের জরা। প্রসাদী শুধু টিকে রইলো মরবার জন্ম। এখন ওকে দেখলে মনে হয় মূর্তিমান একটা ক্ষুধা যেন হাঁ করে রয়েছে। ছাগলটা ছাড়া প্রসাদীই হলো ধনিয়ার একমাত্র পোষ্য। দিনের রান্না শেষ করে ধনিয়া রোজ একথালা ভাত পৌঁছে দিয়ে আসে প্রসাদীকে। এই জন্মই বোধহয় ওর মরতে যা কিছু দেরী হচ্ছে।

প্রসাদীর ঘরের সামনে ধনিয়ার ছাগল।

এদিকে জেনানা হাসপাতালে সন্ধ্যার আলো জলেছে। ধনিয়ার বেড ঘিরে নার্সদের ভীড়। সকলের মুখে একই অনুনয়।—অন্ততঃ এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে রাখ ধনিয়া।

—না মিস্ বহিন, পারবো না।

লেডি ডাক্তার।—তোমার বদনামের কথা কে না জানে? চাপা দিতে তো পারবে না। তবে নিজের বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখ না কেন?

—না ডাক্তারনীজী, আমি খাওয়াতে-পরাতে পারবো না। ছেলে কষ্ট পাবে আর বড় হয়ে আমার দুসমন হবে। ছেলেকে মানুষ করার মতো পয়সা আমার নেই।

—কী বলছিস পাগলের মতো। ভিখিরি মেয়েগুলোও ছেলে ছেড়ে দেয় না। ওদের বুঝি পয়সা খুব বেশী।

—ওরা ছেলেকে মানুষ করে না বহিন, ওরা ছেলেকে ভিখিরি করে। আমি তা পারবো না।

—আচ্ছা, আমরা সকলে কিছু কিছু চাঁদা দেব। ছেলে নিয়ে যা সঙ্গে।

—তা হলে আপনারাই কেউ ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে যান না। আমি তো আপনাদের আয়া হয়েই থাকবো।

লেডি ডাক্তার আর নার্সেরা বেশী বিতর্কে মন দেয় না। ধনিয়ার চোখের দিকে তাকাতে ওদেরও কেমন গা ছম্ ছম্ করে। সেবা মমতাকে তারাও ভাড়া খাটায়, কিন্তু ধনিয়ার এই প্রশান্ত নিস্পৃহা—বড় নির্মম ও বিশদৃশ মনে হয়।

—আদাব্‌ আমি চলি এবার।

ধনিয়া উঠে দাঁড়ায়। একজন নার্স ধনিয়ার বেবিকে বেড থেকে ফ্লানেলের টুকরোয় জড়িয়ে কোলে তুলে নেয়—নার্সারীতে চালান করা হবে। ধনিয়ার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কাঁসার থালা আর ঘটিটা একটা তোয়ালেতে বেঁধে, হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

আর একজন নার্স রেজিস্টার নিয়ে আসে। লেডি ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন।

—বাচ্চাকা বাপকা নাম?

ধনিয়া।—তা জানি না।

লেডি ডাক্তার রেগে উঠলেন।—বরাবর তোমার ঐ এক কথা। যার সঙ্গে আজকাল থাক, তারই নাম বল না কেন?

—অনেকের সঙ্গেই থাকি, তার মধ্যে অনেকের নামও জানি না। কসুর মাপ করবেন ডাক্তারনীজি, যে কোন একটা নাম লিখে নিন।

—তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ। খুব খারাপ।

লেডি ডাক্তার রাগ করে উঠে চলে যান।

মেল ট্রেন মরাবাদ ষ্টেশন ছেড়ে তখন সিটি বাজিয়ে জোরে স্পীড নিচ্ছে।

হাসপাতালের ইমারতটা কাঁপছে হুরহুর করে। লাল কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ধনিয়া নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। কী রকম একটা দুর্বলতায় নার্সদের চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে।

ফটক পার হতেই দারোয়ান ঘণ্টা দিল। রাত নটা।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। ধনিয়ার আমড়াতলার জীবনে কোন ছেদ পড়েনি। বছর তিন আগে শুধু শেষবার জেনানা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি জাঁকিয়ে উঠেছে। নতুন টাউন বাড়ানো হয়েছে প্ল্যান করে। উকীলবাবু যে গাড়ি কিনলেন তারই নম্বর পড়লো সাতশো একচল্লিশ।

পাঁচ সাত দশ বার ষোল আঠারো—বছরের পর বছর ভেসে গেছে। ধনিয়া প্রায় চল্লিশের কোঠায় পা দিল। মাঝে মাঝে সড়কের ধারে খোলা উনুন জ্বেলে বসে—তেলেভাজা বেচে। সন্ধ্যের দিকে ঘরে ফেরার পথে কুলিরা কিছু কিছু কেনে। এক-আধ ঝুড়ি ঘুঁটেও তৈরী করে কখনো, সব বিক্রী হয়ে যায়। চেহারায় হয়তো জলুসের অভাব, তার চেয়ে পয়সার অভাব বেশী। আমড়াতলায় ক্বচিৎ কোন রাত্রে লোকের গলার স্বর শোনা যায়। কিন্তু শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। ধনিয়া তাই ভয় পায় না। সে জানে তাকে ভিক্ষে করতে হবে না।

ভদ্রসমাজে ধনিয়ার আনাগোনা ঘুচে গেছে অনেকদিন। সন্তানবতীদের স্বাস্থ্য হয়েছে ভাল। বুকের দুধ খাওয়াবার ঠিকে নেই। তা ছাড়া সাগর পার থেকে ধনিয়ার বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে—হরেক রকমের বিলিতি ফুড। এঁড়েলাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু ভিজিয়ে রাখতে ধনিয়ার আর ডাক পড়ে না। তাকে বোধহয় সকলে ভুলেই গেছে।

বড়দিনের ছুটী। পাটনার স্কুলকলেজগুলি বন্ধ। ছেলেরা ঘরে ফিরেছে। শিকার পিকনিক কার্ণিভাল আর প্রদর্শনীর মরসুম। নয়াবাদের ধমনী বিচিত্র উৎসাহে চঞ্চল। সেদিন ধনিয়ার ঘরে উনুনে আগুন পড়লো না। একটিও পয়সা নেই হাতে। অনেকদিন আগের ঘটনাগুলি, নানা রঙে রঙীন একটা মায়াময় আলেখ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

ধনিয়া উঠলো।—বাবুদের বাড়ি বাড়ি একবার দেখা করে আসি। একদিন তো চাকরী করেছি। পরবীর দাবী করা যেতে পারে। যদি খুসী মনে হয়—দশটা টাকাও যদি ওঠে।

নরেনবাবুর বাড়ির অন্দরে ঢুকতে পেল না ধনিয়া। ঘোষালবাবু চার আনা

দিলেন। ধনিয়া দেখলো—বাড়িময় ছেলেপিলে। ছেলেগুলো বেশ ঢ্যাঙা হয়ে গিয়েছে।

আর একটা বাড়ি। এতটা নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই। কিছু সিধে দিয়ে গিন্নিমা বললেন।—যা পাবার পেলে বাছা, এবার ওঠ শীগগির।

ধীরেনবাবুর বাড়ির দেউড়িতে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝি এসে একটা টাকা হাতে দিল।—মা দিয়েছেন, এই নিয়ে বিদেয় হও।

ধনিয়া—এ ঝি দিদি, তোমাদের বড় ছেলে কই ?

ঝি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো।—ঐ যে তাস খেলছে। তা, অত খোঁজে দরকার কি তোমার ?

—উঃ কত বড় হয়ে গেছে। দাঁত ওঠার পরও মাই ছাড়তে পারেনি। একবার কামড়ে দিয়ে আমাকে কী নাকাল করেছিল, মনে আছে তো ঝি ?

—আদিখ্যেতা ভাল লাগে না বাপু। তুমি যাও। এদিকে ঘেঁসতে আর এস না।

আরও অনেক বাড়ি বাকী আছে। কিন্তু একটা খটকা ধনিয়াকে ভাবিয়ে তুললো। এটা তো ঠিক পরবী পাওয়া হচ্ছে না। একেই বোধহয় ভিক্ষে বলে।

সন্ধ্যে হতে দেরী আছে। ধনিয়া তবু জোরে পা চালিয়ে ঘরের দিকে ফিরে গেল।

কিন্তু জের সহজে মিটলো না। ঘরে ঘরে ঝি আর গিন্নিদের আপত্তির কলরব শোনা গেল।—ও রাহু, আবার এতদিন পরে উদয় হলো কোথা থেকে। পাড়াভরা সব আইবুড়ো ছেলে। মাগী যে কখন কার সর্ব্বনাশ করে বসে কে জানে।

কর্তারা শুনলেন। একেবারে বাজে আশঙ্কা নয়। পাড়া ঘেঁসে এসব জীব থাকা উচিত নয়। ওরা থাকলেই যত গুণ্ডা বদমাসের উপদ্রব ডেকে আনে।

ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠকেও বিষয়টা আলোচিত হলো। প্রস্তাবটা সকলেই অনুমোদন করলেন। দুর্গাবাড়ীর কাছাকাছিই আমড়াতলার ও নোংরামি এবার সরিয়ে দেওয়াই উচিত।

ব্যাণ্ডের শব্দ। ধনিয়া হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে দাঁড়ালো। মিশন অনাথালয়ের ছেলেরা মার্চ্চ করে বনভোজনের উৎসবে যোগ দিতে চলেছে ? নীল ব্লেজারের হাফ-প্যাণ্ট আর সাদা ফ্লানেলের সার্ট। পায়ে লাল মোজা আর বুট। পাঁচ থেকে ষোল বছর বয়স, অন্তপুষ্ট কিশোর মানুষের একটা পল্টন।

শোভাযাত্রার আগে আগে ওদেরই ব্যাণ্ড পার্টি। এদের পোষাক একটু ভিন্ন ধরনের। মাথায় ভেলভেটের টুপি, তাতে সাদা পাখির পালক আর কচি ঝাউ-পাতা পিন দিয়ে আঁটা! নধর অধরে ছোট ব্যাগপাইপের রীড। ছোট ছোট ড্রাম ষ্ট্রাপ দিয়ে বুকের ওপর ঝোলানো।

বড়দিনের প্রভাত সূর্যের আভা সবেমাত্র কুয়াসা ঠেলে পথে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। শোভাযাত্রা এসে মোড়ের কাছে একবার থামলো। ব্যাগপাইপ আর ড্রামগুলি তিনবার শব্দের ঝনৎকার তুলে স্তব্ধ হলো। আশ পাশ থেকে পিল পিল করে ছেলে মেয়ে বুড়ো—কৌতুহলী একটা জনতা এসে ওদের চার-দিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ধবধবে সাদা আলখাল্লা আর প্যাণ্টালুন পরা এক পাদরী সাহেব ডেভিডের একটা গাথা হিন্দীতে সুর করে পড়লেন।

—আমেন!

ছেলেদের গলার স্বর! বনান্ত বাতাসের শব্দ, ঝর্ণার শব্দ—ভোরবেলার পাখির গলার কাকলির মতো শব্দ। ধনিয়ার যেন একটু চমক লাগলো। এগিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রার কাছাকাছি দাঁড়ালো, একটা গাছে ঠেস দিয়ে।

লম্বা দাড়িওয়ালা পাদরীগুলোকে কেমন জংলী জংলী মনে হয়। আর একজন পাদরী বক্তৃতা করলেন, বুকের ওপর ক্রশটা চিক্‌চিক্ করছে।—আজ থেকে উনিশশো চল্লিশ বছর আগে বেটেলহামের আকাশে এমনি এক সকাল বেলায় লাল সূর্য উঠেছিল। এক দরিদ্র ছুতোর নারীর কোলে মানবপুত্র আবির্ভূত হলেন।

পাদরীর বক্তৃতার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। ধনিয়া একটু সরে দাঁড়ালো, যাতে ছেলেদের মুখগুলি স্পষ্ট দেখা যায়।

—সেই মানবপুত্র একদিন কাঁটার মুকুট পরে চলেছেন জেরুজালেমের পথে, নিজেকে বলিদানের জন্য, তোমার আমার পরিত্রাণের জন্য ....।

ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বনের মতো প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে অন্ততঃ ছটী তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই। ঐ ড্রামবাজিয়ে দশ বছর বয়সের ছেলেটি, সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। হয়তো সেই একজন। কিম্বা পাশেরটিও হতে পারে। কিন্তু কে নয়? মনে হচ্ছে সবাই।

বিভোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে। দূরে বনের মাথার কুয়াসা গেছে গলে। মাঠের মাঝ দিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। ধুলো

উড়ছে। সকল পার্থিবং রজঃ মধুময় হয়ে উঠেছে।

গাছের ঠেস ছেড়ে দিয়ে অতি অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে ধনিয়া ঘরের দিকে ফিরলো। অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা যেন সমস্ত শরীর ছেয়ে বয়ে চলে গেছে—প্রিয়সঙ্গসুখের চরম ক্ষণে উৎসারিত সঞ্জলাসারের মতো। বুকের ওপর আঁচলটা ভাল করে টেনে নামিয়ে দিল ধনিয়া। কাঁচুলি ভিজে গেছে।

মিউনিসিপাল কমিশনারদের বৈঠক। কোতোয়ালী অফিসারের কাছে জরুরী নোট পাঠানো হলো।—সহরের নানা ভদ্রপল্লীতে যতগুলি নষ্টচরিত্র ছোট জাতের মেয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কুৎসিত ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছে তাদের যেন সেগ্রিগেট করে বাজারের লাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়।

কড়া সরকারী নির্দেশ। টাউন থানার পুলিসের ওপর ভার পড়লো। এই ধরনের দুষ্টা মেয়েদের নামের লিষ্টি দাখিল করতে—খাতায় নাম চড়িয়ে সকলকে বাজারের লাইনে বসিয়ে দিতে।

ধনিয়ার আমড়াতলায় সংসারেও এ-নির্দেশের আঘাত এসে পৌছতে দেরী হলো না।—আর এভাবে চলবে না। হয় সরে পড়, নয় পথে এস—কিম্বা সুপথে থাক।

ধনিয়া সাধ্যসাধনার ত্রুটী করলো না। ঘটিবাটি বেচে টাউন পুলিশকে নগদ ত্রিশটা টাকা পান খাবার খরচ দিতে রাজী হলো। তাকে রেহাই দেওয়া হোক্। কনেষ্টবলেরা মানলো না কেউ—এবার আর ফাঁকি নেই। আমাদেরও চাকরীর ভয় আছে। নাম তোমাকে লেখাতেই হবে।

হেড কনেষ্টবল ধমক দিলো,—ওসব ফন্দী ফিকির ছাড় এবার। নাও, টিপ সই দাও।

রাত্রি হয়েছে। প্রসাদী দোসাদ হাঁটুতে মুখ গুঁজে আগুনের ধুনীর সামনে বসেছিল। ধুনীর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কাণের কাছে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। প্রসাদী কানে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা একটা জলন্ত অঙ্গারে লেগে ঝলসে গেছে। তবু কোন জ্বালা নেই। সকাল থেকে শরীরটা শুধু সির্ সির্ করে কেঁপেছে। এখন সে স্পন্দনও নেই। আজ দু'দিন ধরে ধনিয়া আসছে না। পেটে এক দানাও ভাত পড়েনি।

—প্রসাদী চাচা। ধনিয়া এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে পড়লো। প্রসাদী তবু সাড়া দিল না। ধনিয়া বুড়োকে একবার জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে থুতনিটা টেনে

ওঠালো। বুড়ো চোখ মেলে তাকাতেই আবার ডাকলো।—প্রসাদী চাচা।

ধনিয়া কাঁদছে। এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মতো প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা।—এ কি? তুই ধনিয়া?

—হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী!

—ছি ছি, এ কি বলছিস।

—হাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাঙ্গারে থাকতে হবে।

—আরে না, তুই তো লছ্‌মী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

—কোন গাইয়ের স্বামী নেই, তারা কি লছ্‌মী নয়?

—তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই।

ধনিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো—এবার চলি চাচা, আর দেখা হবে কি না জানি না।

অপোগণ্ড ছেলের মতো প্রসাদী একবার তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো—ধনিয়ার হাতে সেই পরিচিত গামছাবাঁধা ভাতের থালাটা নেই, তার নিত্যদিনের প্রাণের পসরা। প্রসাদী হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাক্‌-স্ফূর্তি হলো না। মূক অভিমানে যেন হাঁটুর ভেতর আবার মাথাটা গুঁজে দিল। আর একবার নতুন করে কানের কাছে বেজে উঠলো কূলহারা কালাপানির উতরোল।

দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। আনমনে মাথার কাপড়টা ফেলে দিয়ে চুলগুলি গুছিয়ে শক্ত করে একটা খোঁপা এঁটে দিল। আঁচল দিয়ে তেলা মুখটা মুছে নিল একবার। তারপর চিরকেলে সেই মিটিমিটি হাসি আবার সারা মুখে চিক চিক করে উঠলো।

—তুমি রাগ করেছ চাচা! ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজর্জর শরীরটাকে বেড়ালের ছানার মতো কোলের ওপর তুলে নিল। কাঁচুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথার পাকা চুলের জটগুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

একটা ঘণ্টা পর। পরিতৃপ্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রসাদী। ক্লান্ত সিক্ত চোয়াল দুটো এলিয়ে পড়েছে। প্রসাদীকে ধুনীর কাছে মাটিতে শুইয়ে দিল ধনিয়া।

চকবাজারের দক্ষিণে একটা চওড়া গলি, দুদিকে দোতলা বাড়ির সারি। গলির ঠিক মাঝামাঝি পথের দুদিকে মুখোমুখি একটা দেশী আর একটা বিলাতী মদের দোকান। নীচের তলার সব ঘরগুলিই দোকান—পানবিড়ি, সরবত, আতর, চাট আর চামেলী তেল। একটা দোকানে ভাঙা তবলা পাখোয়াজ মেরামত হয়। পথের মাঝে একটা গাছতলায় শানবাঁধানো চাতালের ওপর হিজ্‌ড়েরা হাততালি দিয়ে নাচে। ওপরতলার জানালাগুলি সন্ধ্যের পর থেকেই এক এক টুকরো বায়স্কোপের পর্দার মতো আলোয় ঝলমল করে। রূপের বেসাতিনীদের লাইন।

নতুন বছরে দোতলার লাইনে একটা নতুন ঘরের জানালা খুলে গেল।

চল্লিশ বছরের আগুনে শুদ্ধ করা জীবন যৌবন, তার সব খাদ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধনিয়া মনের মতো করে সাজলো।

ঘরের ভেতর ঝাড়ের আলোটা জালিয়ে দিয়ে, চূড়ো করে খোঁপা বাঁধলো। একটা সোনালী চুম্‌কিদার রুমাল জড়িয়ে দিল তার ওপর। ঝুটা মোতির মালা দিল গলায়। একটা পাতলা নীল রেশমী সাড়ীকে সায়া ছাড়াই কোমরে এক পাক জড়িয়ে নিল। মুঠো মুঠো পাউডার ছিটিয়ে দিল গায়ে। কড়া জরদা দিয়ে একগাল পান চিবিয়ে ঠোঁট মুখ রক্তাক্ত করে নিল। এক পেয়ালা নির্জলা দেশী মদ ঢক ঢক করে খেয়ে গরম করে নিল গলাটা। সবুজ মখমলের কাঁচুলি বাঁধলো আঁটসাট করে। হাফগরাদ জানালাটার ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ধনিয়া।

ময়রার দোকান থেকে ধোঁয়া আর ভাজা পাঁপড়ের গন্ধে শীত-রাত্রির বাতাস ভারি হয়ে গেছে। নীচের সড়কে গ্যাস-পোষ্টের কাছে ক্ষুদ্র একটা জনতা, হাঁ করে জানালার দিকে তাকিয়ে।

হোক রাত্রি, হোক নেশা আর গ্যাস-লাইটের পোড়া জ্যোৎস্না। ওদের ঠিক চিনতে পারা যায়। লম্বা চেহারা ঘোষালবাবুর বড় ছেলেটা ঘনঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখে চোরা চাউনি খাজাঞ্চীবাবুর ছেলেটা, রুমাল নেড়ে কিছু একটা ইসারা করার চেষ্টা করছে। টলতে টলতে একটা মাতালও এসে দাঁড়ালো ওদের মধ্যে। হাতের মুঠো দুটো একটা চোখের ওপর দূরবীণের মতো লাগিয়ে কিছুক্ষণ তাক্ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মাতালটা।

এক ঢোক পানের পিক গিলে নিল ধনিয়া। কানদুটো তেতে ঘেমে উঠেছে। আঁচলটা গা থেকে পেছনে ঠেলে নামিয়ে দিল। দুহাত তুলে মাথার ওপর জানালার খিলানটা ধরে বুকটা সামনের গরাদের ফাঁকে জোরে চেপে ধরলো

ধনিয়া।

জনতার চোখে ধাঁধা। অসম্বৃতা এক রঙীন মরীচিকার মূর্তি জলছে জানালার ওপর। নীচে পাতলা রেশমী সাড়ীর আড়ালে আঁকা দুটি সুপুষ্ট জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। ওপরে একজোড়া দুরন্ত সবুজ গ্রহ, কাঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মতো গতিহারা।

সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে এক বিদ্‌ঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া। তবু প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত, শেষরাত্রি পর্যন্ত—যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।

মা ন বি কা

আর এখানে বেশিক্ষণ নয়। শুধু আর মাত্র তিনটি ঘণ্টার অপেক্ষা, তার পরেই আবার ট্রেন ধরবে তাপস।

ছুটি পাওয়া যায়নি। তবু রবিবারটাকে কাজে লাগাতে হয়েছে। শনিবার রাত্রিবেলা মঞ্জুলাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে তাপস। চক্রধরপুরে এসে পৌঁছেছে রবিবার বেলা এগারটারও কিছু পরে। সুতরাং, তিনটের ট্রেনই ধরতে হয়, তা হলে কাল সোমবারে কলকাতায় পৌঁছে ঠিক সময়মত অফিসের কাজে হাজির হতে পারা যাবে।

চক্রধরপুরের এই বাড়ি হলো বিপিন ডাক্তারের বাড়ি। তার মানে, মঞ্জুলার বাপের বাড়ি—অর্থাৎ তাপসের শ্বশুরবাড়ি। টাউনের একটু বাইরে, বেশ একটু নিরিবিলি খোলামেলা জায়গাতে এই বাড়িটা। দূরের পাহাড়ের গা জড়িয়ে আর এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে টেবোঘাটের সড়ক, সে সড়কের ছবিটা এ বাড়ির এই বারান্দাতে বসেই দেখা যায়।

বারান্দাতে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে ঐ পাহাড়ী ঘাটের আর শালবনের দিকে তাকিয়ে সময় পার করে দিচ্ছে তাপস। মঞ্জুলা সেই যে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে, তারপর আর এক মুহূর্তের জন্যও এদিকে আসেনি। এখানে, এই বারান্দার উপর যে তাপস নামে একটা অস্তিত্ব চুপ করে বসে আছে, এই সামান্য সত্যটাও বোধহয় একেবারে ভুলে গিয়েছে মঞ্জুলা।

বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার, বেশ একটু অস্বাভাবিক। প্রায় এক বছর পরে মেয়ে আর মেয়ের বর বাড়িতে এসেছে অথচ বাড়িতে একটা খুশীর সাড়া জেগে

উঠলো না। আর একটা কথা, মঞ্জুলার বিয়ে হবার পর এই প্রথম বাপের বাড়িতে এসেছে মঞ্জুলা। তাপসও বিয়ের পর এই প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। অথচ, সারা বাড়িটাই যেন একটা নির্বিকার আর নীরব শান্ত ও উদাস হয়ে ঘটনাটাকে কোনমতে সহ্য করছে। যেন কারও কোন কথা বলবার নেই, হাসবার দরকার নেই, একটু ছুটোছুটি করবারও দরকার নেই।

অথচ, বাড়িতে লোক আছে। বিপিন ডাক্তারও তো এতক্ষণ ছিলেন। তিনি এই কিছুক্ষণ আগে বাগানের ওদিক দিয়ে আর ওপাশের গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন। তাপসের কাছে আসেননি বিপিনবাবু, তাপসের সঙ্গে একটা কথা বলবার, কিংবা তাপসের রাত-জাগা ক্লিষ্ট মুখটাকে একবার দেখবারও দরকার আছে বলে বোধহয় মনে করেননি। হ্যাঁ, একটা চাকর অবশ্য এসেছে। তাপসকে চা আর খাবার দিয়ে গিয়েছে। চা আর খাবার খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে তাপস আর চুপ করে বসে বসে দূরের শাল-বনের চেহারা দেখেছে। এখনও দেখছে।

মঞ্জুলার মা অবশ্য নেই। তিনি মেয়ের বিয়ে দেখেননি। আজকের এই দুঃসহ ঘটনাকে দেখবার দুর্ভাগ্য থেকেও বেঁচে গিয়েছেন। তিনি মারা গিয়েছেন অনেকদিন আগেই, বোধহয় সাত বছরেরও আগে।

কিন্তু বড়-বউদি আছেন, মেজ-বউদি আছেন। এঁরা তো সম্পর্কে গুরুজন হন। এঁরাও তো একবার ঘরের বাইরে এসে তাপসের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারতেন।

তাই বা কেন? বাড়ির জামাই চুপ করে ঘরের বাইরের বারান্দায় বসে থাকবে, তাকে ঘরের ভিতরে এসে বসতে কেউ বলবে না—এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যবহার আর কি হতে পারে? আজই দুপুরে এসে, আবার আজই মাত্র আর তিন ঘণ্টা পরে বিকালের ট্রেনে চলে যাবে তাপস, বাড়ির কোন মানুষ তাকে একটা দিনের জন্যও থেকে যেতে অনুরোধ করবে না, এটাই বা কেমন কথা?

তাপস জানে না, কিন্তু এ রকমেরই কথা হয়ে আছে। এই এক বছর ধরে মঞ্জুলার চিঠিতে বড়-বউদি আর মেজ-বউদি যে সত্য জানতে পেরেছেন, আর, স্বয়ং বিপিনবাবুও যে-সত্য বুঝতে পেরে গিয়েছেন, তাতে আজ তাপসকে সমাদর করবার দরকার আছে বলে কেউ মনে করবে না। মঞ্জুলা তৈরী হয়েই এসেছে। এ-বাড়ির মনও আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে। তাপস না এলেই ভাল হতো। কিন্তু নিতান্তই যখন এসেছে, তখন বসে থাকুক, তারপর চলে যাক।

তাপস এসেছে, এটা তাপসেরই একটা মূর্খ উৎসাহের দোষ। মঞ্জুলাকে

চক্রধরপুরে পৌঁছে দেবার জন্য মঞ্জুলা তাপসকে অনুরোধ করেনি। ন'মামা কলকাতা থেকে টাটানগর যাচ্ছেন, সুতরাং ন'মামা অনায়াসে একটু ঘুরপথ হয়ে মঞ্জুলাকে চক্রধরপুরে পৌঁছে দিয়ে টাটানগর চলে যাবেন। এই ব্যবস্থাই করে রেখেছিল মঞ্জুলা। কিন্তু তাপস নিজেই হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললে—আমিই যাব। নাই বা পেলাম ছুটি। শনিবার রওনা হব, রবিবার দুপুরে পৌঁছব আবার রবিবারই বিকেলের ট্রেনে রওনা হয়ে সোমবার সকাল দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাব। বাস ঠিক সময়েই অফিস করতে পারা যাবে।

বিপিন ডাক্তার মনে মনে অনেক আক্ষেপ করেছেন। মাঝে মাঝে মুখ খুলে বলেও ফেলেছেন—না, খুবই ভুল হয়েছে।

অর্থাৎ তাপসের সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে দেওয়া খুবই ভুল হয়েছে। ভুলটা অনেকটা জেনে-শুনেই করা হয়েছে। বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দু'জনেই জানতেন, বিপিন ডাক্তারও সবই জানতে পেরেছিলেন, সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মঞ্জুলা।

সন্দীপ, দেখতে শুনতে খুবই ভাল ছেলে, ভাল কাজ করে, ভাল লেখাপড়া শিখেছে। আর, একটা বছরেরও বেশিদিন ধরে মঞ্জুলার সঙ্গে চেনা-শোনাও হয়েছিল। বড়-বউদি আর মেজ-বউদির কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতেও বাকি রাখেনি মঞ্জুলা, বিয়ে যদি করি তবে সন্দীপকেই বিয়ে করবো।

—তার মানে?

—তার মানে, সন্দীপ যদি বিয়ে করতে রাজি না হয়, তবে আমার বিয়েই হবে না।

—কিন্তু সন্দীপ কি বলে?

—সেটা তোমরা জিজ্ঞাসা করে দেখ।

সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সন্দীপ বলেছিল, আমার একটুও আপত্তি নেই।

বড়-বউদি—ওভাবে বলো না, একটু স্পষ্ট করে বল।

সন্দীপ লজ্জিতভাবে হেসেছিল—আমার ইচ্ছেও তাই।

সন্দীপের সঙ্গেই যে মঞ্জুলার বিয়ে হবে, এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সন্দীপ যখন নতুন চাকরি পেয়ে টাটানগর চলে গেল, তখন বড়-বউদি কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন—মঞ্জু তবে আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

লজ্জিতভাবে হেসেছিল সন্দীপ—যতদিন ইচ্ছে অপেক্ষা করুক। আমাকে

অবশ্য যেদিনই চিঠি দেবেন আপনারা……।

নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন বড়-বৌদি।

টাটানগর থেকে মঞ্জুলাও কয়েকটা চিঠি পেয়েছিল। সে-চিঠি বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দু'জনেই এক ফাঁকে পড়ে ফেলেছিলেন। আর, আরও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ভালবাসা যখন হয়েছে, তখন আরও কিছুদিন দেরি করতে পারা যায়। মঞ্জুলার জন্যে আর কোন পাত্র খোঁজ করবার কোন মানে হয় না। সন্দীপ আরও কিছুদিন দেরি করতে চায়। দেরি করুক। তাতে কিছু আসে যায় না। আর মঞ্জুলাও বিয়ের জন্য এমন কিছু উতলা হয়ে উঠছে না।

কিন্তু ভাগ্যেরই দোষ বলতে হবে। একটু ভাবতে, বুঝতে, সহ্য করতে আর ধৈর্য ধরতে এমন কয়েকটা ভুল হয়ে গেল, যে-জন্যে আজ মঞ্জুলাকে আর এ-বাড়ির সব মানুষকেই অনুতাপের জ্বালা ভুগতে হচ্ছে।

শোনা গেল, সন্দীপের নাকি টাটানগরেরই এক ভদ্রলোকের খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে। কে যে খবরটাকে প্রথম রটিয়েছিল, কে জানে? কিন্তু খবরটা এই চক্রধরপুরেও পৌঁছে গেল।

সন্দীপকে চিঠি দিয়েছিল মঞ্জুলা, চিঠি দিয়েছিলেন বড়-বউদি, শেষে বিপিন ডাক্তারও একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সবারই চিঠিতে ঐ একটি উদ্বিগ্ন আর করুণ প্রশ্ন—এ কি খবর শোনা যাচ্ছে? খবরটা নিশ্চয় ভয়ানক একটা মিথ্যে।

সন্দীপের কাছ থেকে কোন উত্তর আসেনি।

খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন বিপিন ডাক্তার, সন্দীপ বোম্বাই চলে গিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না, সন্দীপের বিয়ে হয়ে গিয়েছে কি হয়নি।

বড়-বউদি বললেন—বুঝতে আর কি অসুবিধে আছে?

মেজ-বউদিও বলেন—যে-ছেলে এতগুলি চিঠির একটাও উত্তর দিলে না, আর বোম্বাইও চলে গেল, সে-ছেলে কি-যে করে বসে আছে সেটাও খুব বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বড়-বউদি—আমার তো মনে হয়, বিয়ে করেছে সন্দীপ।

মেজ-বউদি—নিশ্চয়। তা না হলে আমাদের চিঠির উত্তর দেবে না কেন?

চক্রধরপুরে সন্দীপের বাড়িতে শুধু একটা মালী থাকে; সে মালীও কিছু বলতে পারে না। সে শুধু জানে, বাবু বোম্বাইয়ে আছেন আর মাঝে মাঝে মালীর মাইনেটা পাঠিয়ে দেন।

মঞ্জুলার প্রাণটাও এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে পুরো তিনটে

মাস যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি মঞ্জুলা কোন অভিমানের কথা নয়। কোন আক্ষেপের কথা নয়।

একটা বছর পার হবার পর বিপিন ডাক্তার বললেন—মঞ্জুলার তো বিয়ে দেওয়া উচিত।

বড়-বউদি—উচিত ঠিকই, কিন্তু মঞ্জুলা কি রাজি হবে?

—রাজি করাও।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দিনের পর দিন অনুরোধ করেছেন। কিন্তু মঞ্জুলা যেন অবিচল। বিয়ে করতে রাজি নয় মঞ্জুলা।

মঞ্জুলার ন'মামা কলকাতা থেকে লিখলেন—বেশ ভাল পাত্র আছে, আমারই জানা-শোনা ছেলে তাপস। ভাল চাকরি করে। বেশ শিক্ষিত ছেলে। মঞ্জুলা যদি রাজি হয় তবে অবিলম্বে জানাবেন। আমি বললে তাপসও রাজি হয়ে যাবে।

বিপিন ডাক্তার দুই পুত্রবধূর সঙ্গে পরামর্শ করেন।—ছেলেটিকে তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

বড়-বউদি—মঞ্জু যদি ভাল মনে করে, তবেই…।

বিপিন ডাক্তার—কথাটা হলো, আজ হয়তো তাপসকে ভাল বলে মনে করছে না, কিন্তু…তার মানে, বিয়েটা যদি হয়ে যায়, তবে…কালক্রমে ভাল সম্পর্ক হয়েই যাবে। সেটাই স্বাভাবিক।

বড়-বউদি—আমারও তো তাই মনে হয়। চেনাশোনা হবার পর আপনা থেকেই…।

বিপিন ডাক্তার—তাহলে তোমরা ওকে একটু বুঝিয়ে বল।

মঞ্জুলাকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন মেজ-বউদি—আপত্তি করবার কোন মানে হয় না মঞ্জু। বিয়ের পরেও ভালবাসা হয়, আর সেটাই হলো আসল ভালবাসা।

মঞ্জুলা রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল—ভালবাসা চাই না। তবে বিয়ে হোক্। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

মঞ্জুলার এই সম্মতি যে দুরন্ত এক অনিচ্ছার সম্মতি, এটা সেদিন বুঝতে পেরেও সাবধান হননি বিপিনডাক্তার মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর তাপসের সঙ্গে যেদিন কলকাতা রওনা হলো মঞ্জুলা, সেদিন বাড়ির আর সবারই চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করেছিল। কিন্তু মঞ্জুলার

চোখ শান্ত, শুকনো খটখটে। বিপিনডাক্তারকে আর দুই বউদিকে শান্তভাবে প্রণাম করে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল মঞ্জুলা; ঘটনাটা যেন কোন ঘটনাই নয়, মঞ্জুলার জীবনটাকে এই বিয়ের উৎসবের কোন ফুলের আর গন্ধধূপের সৌরভ যেন স্পর্শও করতে পারেনি। যেন এপাড়া থেকে ওপাড়াতে বেড়াতে যাচ্ছে মঞ্জুলা।

দুই

কলকাতার জীবন। কে জানে, সেদিন মনটা কেন যেন বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কলকাতার এই বাড়িটাকে যদি সত্যিই ভাল লাগতো, তবে ভালই হতো। আড়াল থেকে তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে যদি ভাল লাগতো, তবে ভালই হতো। তাপস যখন অফিস থেকে ফিরে এসে ঐ ঘরে চুপ করে আর একলা হয়ে বসে থাকে, তখন ঐ ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে যদি ইচ্ছে হতো, তবে ভালই হতো। এই ভদ্রলোক তো কোন অপরাধ করেনি।

কিন্তু মাত্র ঐ একদিন, সেদিনের মনের ভাবনাটা যেন বৈশাখের আকাশের এক টুকরো হঠাৎ-মেঘের মতো দেখা দিয়েছিল। তারপর আর নয়। এই এক বছরের মধ্যেও নয়। তাপসকে সহ্য করবার কথা মনে উঠলেই মনটা যেন বিষিয়ে যায়।

কি করে সম্ভব? তাপস দেখতে কুৎসিত নয় ঠিকই, কিন্তু কেমন-যেন একেবারে সাদা-সিধে একটা চেহারা। মুখের কথাগুলি যেন প্রাণহীন কতগুলি ভাষার শব্দ। শুধু চাকরি আর বাড়ি, এ-ছাড়া ভদ্রলোকের জীবনে যেন আর কোন সত্য নেই। ভদ্রলোক কোনদিন বাগানে দাঁড়িয়ে রাত্রির আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। অন্তত মঞ্জুলার তো চোখে পড়েনি।

মঞ্জুলাকে এ বাড়িতে আনবার কি দরকারই বা ছিল এই ভদ্রলোকের? কোনদিন তো কোন কাজের জন্য মঞ্জুলাকে ডাকবার দরকার বোধ করেন না ভদ্রলোক। চাকর আছে, রান্নার লোক আছে। যা দরকার তা সবই পেয়ে যান ভদ্রলোক। স্নান করেন, খাবার খান, অফিস চলে যান। মাঝে মাঝে ঘরে বসেই একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে অফিসেরই কাজের লেখা লেখেন। এ রকমের একটা রিক্ত মনের মানুষ বিয়ে করলোই বা কেন? এর জীবনে কোন স্ত্রীর দরকার হয় না। এই মানুষ কারও স্বামী হবার যোগ্যও নয়।

তাপসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। পৃথিবীটা বলবে, এই তাপসই হলো মঞ্জুলার

স্বামী। কিন্তু মঞ্জুলার মন জানে, ওটা একটা অসার ছায়া মাত্র। একটা দুর্ভাগ্যের অংক থেকে আর একটা দুর্ভাগ্যের অংকে এসে পৌঁছেছে মঞ্জুলার অদৃষ্টের নাটকটা। যাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারা যাবে না, তারই বাড়িতে একটি ঘরে বসে রঙীন শাড়ি পরে একটা মিথ্যে ঘরণীর রূপ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে।

একদিন সত্যিই, জোর করে মনটাকে যেন ভেঙে-চুরে একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল মঞ্জুলা। অফিস থেকে ফিরে এসে যখন বাইরের ঘরে একা বসেছিল তাপস, তখন এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল মঞ্জুলা। তাপস হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মঞ্জুলার দিকে তাকিয়েছিল আর হেসেছিল।

ছিঃ, যেন এক গাদা শুকনো ধুলোর হাসি। চমকে উঠে আর চোখ বন্ধ করে, তখনই চলে এসেছিল মঞ্জুলা। দেখতে একটুও ভাল লাগেনি।

দেখতে ভয় করে। আর, খুবই বুঝতে পারে মঞ্জুলা, দেখতে কেমন-যেন ঘেন্নাও করে। তাপসের জীবনের কোন কাজ, কোন কথা কোন হাসির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব। জোর করে একটা দুঃস্বপ্নের সঙ্গে ঘর করা যায় না। এখানে মরতে পারা যায়, কিন্তু বাঁচতে পারা যায় না।

হঠাৎ একদিন চক্রধরপুরের একটা চিঠি এসে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের বার্তাকে যেন গুঞ্জন করে মঞ্জুলার কানের কাছে শোনাতে থাকে। বড়-বউদি লিখেছেন, সন্দীপ এসেছে। সে-খবরটা নিতান্ত মিথ্যে একটা খবর, সন্দীপ বিয়ে করেনি। যাই হোক্‌, আশা করি তুমি আর তাপস ভালই আছ।

বড়-বউদিকে সেদিনই চিঠির উত্তর দিয়েছিল মঞ্জুলা— তাপস নামে একটি শান্তির সঙ্গে আমি বেশ সুখেই আছি। তোমাদের দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। আর ঐ নতুন খবরটা আজ আমাকে জানাবার কোন দরকার ছিল না।

এই চিঠির পর আরও কয়েকটা চিঠি লিখে বড়-বউদিকে সত্যিই একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে মঞ্জুলা। জেনেছেন বড়-বউদি, না, তাঁদের সব কল্পনা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। এই একবছরের মধ্যেও তাপসকে মেনে নিতে পারেনি মঞ্জুলা। তাপসকে সহ্য করবার আর সামর্থ্যও নেই বোধহয়। তা না হলে এত স্পষ্ট করে এসব কথা লিখবে কেন মঞ্জুলা?—আমি এখানে থাকবো না। আমি এই ঘেন্না থেকে সরে যেতে চাই। তাপসের সঙ্গে তোমরা যদি কোন সম্পর্ক রাখতে চাও, রেখো; কিন্তু আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি ন'মামার সঙ্গে শিগগির চক্রধরপুর যাচ্ছি।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদি আগেই আলোচনা করে রেখেছেন, দেখা যাক্‌

কি হয়? যদি সত্যিই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবে ···।

বড়-বউদি বলেন—তবে মনে হয়···সন্দীপকেই বিয়ে করতে রাজি হবে মঞ্জু।

মেজ-বউদি—কিন্তু সন্দীপ?

বড়-বউদি—এখন তো সন্দীপের কথা থেকেও বোঝা যায়, সন্দীপ মনে মনে খুব একটা আঘাতও পেয়েছে।

—কেন?

—মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে দেখতে পেয়ে।

—কিন্তু এটাও তো একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, তুমি ভাল ছেলেটি এতদিনে তবে চুপ করে বসেছিলে কেন? একটা চিঠিও দাওনি কেন?

—সন্দীপ বলছে, চিঠি দিয়েছিল।

—কে জানে? চিঠি দিলে চিঠি না পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।

—যাই হোক্। এখন তো সন্দীপ কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো তাপস। তাপসকে যখন সহ্যই করতে পারবে না মঞ্জু, তখন······।

—তখন ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদির পক্ষে আজ আর কিছু বলবার নেই। কারণ মঞ্জুলা এসেই গিয়েছে। মঞ্জুলার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যেন ওর প্রাণটা এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে একটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে মঞ্জুলা—আমার যা বলবার তা তো আগেই বলে দিয়েছি। আমাকে আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করো না।

বড়-বউদি—তাপস কি তবে · ···।

মঞ্জুলা—এখনই চলে যাবে।

বড়-বউদি—তুমি কি তবে······।

—না। ওর কাছেও আমার আর কিছু বলবার নেই।

তাপসকে এ-বাড়ির কোন মানুষ কোন কথা বলবে না। তাপসকে এই বাড়িটাও যেন কোনমতে শুধু তিনটে ঘণ্টার অস্বস্তির মত সহ্য করছে।

তিন

ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসে বই পড়ছিল মঞ্জুলা। এই বইটা এখানে এক বছর ধরে পড়ে আছে, তবু হারিয়ে যায়নি। এই বইয়ের ভিতরে একটি পাতায় যার নাম লেখা আছে, সে মানুষটাও হারিয়ে যায় নি। আবার ফিরে এসেছে। এখানেই আছে। কে জানে, এখন বোধহয় বাড়ির মালীর সঙ্গে বাগানে ঘুরে ফিরে গন্ধরাজের গোড়ায় সার-মাটি ছড়াচ্ছে।

ফুল ফলানো সন্দীপের জীবনেরই একটা শখ ছিল। সে শখটা এখনো আছে বোধহয়। আর একটা শখ ছিল, বিকেল হবার পরেই এই বাড়িতে একবার বেড়াতে আসবার। খবর পায়নি কি সন্দীপ, মঞ্জুলা যে এসেছে? খবর পেয়েছে বোধহয়; তবু এখনই নিশ্চয় আসবে না। এখনও তো বিকেল হয়নি, আর ...বারান্দার উপরে বসে আছে যে, মঞ্জুলার জীবনের একটা অকাম্য আবির্ভাব, সে এখনও আছে। ভালই হয়, তাপস চলে যাবার পরেই যেন সন্দীপ আসে। তাপসকে চোখে দেখলে সন্দীপও হয়তো মঞ্জুলার শাস্তির রকমটা দেখে হেসে ফেলবে।

এই বইটা হাতে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে মঞ্জুলা। কিন্তু একটা পাতাও পড়তে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বইটাই বার বার তিনবার আনমনা মঞ্জুলার হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছে। বইটারও গায়ে যেন একটা বিশ্রী রকমের ধুলো লেগে আছে। মনটা জোর করে ধরতে চায়, কিন্তু হাতটা যেন ময়লা হয়ে যাবার ভয়ে শিথিল হয়ে যায়। ধপ্‌ করে পড়ে যায় বইটা। সন্দীপ ফিরে এসেছে, সন্দীপ এখানে আছে, সন্দীপ আর-একটু পরেই আসবে—মনে হয়, চমৎকার একটি ঠাট্টার কথা ভাবছে মঞ্জুলার মনটা। এক বছরের মধ্যেও একটা চিঠির উত্তর দেয়নি যে, সে মানুষের মনের বাগানে গন্ধরাজ ফোটে কিনা সন্দেহ।

বইটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে দেয় মঞ্জুলা।

বড়-বউদি বলেন—বড় বিশ্রী ব্যাপার হলো।

—কি?

—তাপস চলে যাচ্ছে।

—যাবেই তো।

—হ্যাঁ, যাবে ঠিকই। কিন্তু যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে।

—না।

মঞ্জুলার নিশ্চিন্ত মনটা আবার অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। আবার নির্বোধের মতো এমন আহ্বান করে কেন ভদ্রলোক? কিছুই তো জানিয়ে দিতে বাকি রাখেনি মঞ্জুলা। কলকাতাতেই একদিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, আমার এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই।

আসবার সময় ট্রেনেও একবার আরও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল—আমি আর কলকাতায় ফিরে যাব না।

আর, এই তিন ঘণ্টা ধরে বাইরের বারান্দায় বসে সারা বাড়ির অশ্রদ্ধা আর তুচ্ছতা পেল যে লোকটা, সে কি এতই নির্বোধ যে এখনও কিছু বুঝতে পারছে না? মঞ্জুলার সঙ্গে যে এ-জীবনে কোন সম্পর্ক থাকবে না, এই সত্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু দেখতে পায়নি কি? তবে কোন্ লজ্জায় আর কোন্ সাহসে যাবার আগে মঞ্জুলার সঙ্গে কথা বলতে চায়?

অস্বীকার করে না মঞ্জুলা, কল্পনা করে বেশ বুঝতে পারে, মঞ্জুলার মনের এই সব কথা যদি কেউ শুনতে পায়, সে মঞ্জুলাকে একটা হিংস্রতার প্রাণী বলে মনে করবে। বিয়ে হয়েছে যার সঙ্গে, লোকে যাকে মঞ্জুলার স্বামী বলে জানে, তাকে এইভাবে একটা জঞ্জালের মতো সরিয়ে দেওয়া! শুনতে পেলে যে-কোন মানুষ বিপিনডাক্তারের মেয়েকে একটা নির্মমতার দানবী বলে মনে করবে। কিন্তু দোষ কার? তাপস যদি না আসতো, তবে তো এই বাড়িটাকে আর মঞ্জুলাকে এমন সাংঘাতিক অভদ্রতার কাণ্ড করতে হতো না। একটু দুঃখ হয় বইকি। এত নির্বোধ হলো কেন মানুষটা?

বড়-বউদি বলেন—যাও একবার, একটা কথার কথা বলে দিয়ে চলে এস।

মেজ-বউদি—সবই তো বুঝতে পেরেছেন তাপসবাবু, তবে আবার মিছিমিছি কথা বলতে চান কেন?

বড়-বউদি—আমারও একটা সন্দেহ হয়, বোধহয় একটা বাজে কথা অপমানের কথা-টথা বলে যেতে চায় তাপস।

মেজ-বউদি—হতে পারে, আশ্চর্য নয়।

মঞ্জুলা বলে—অপমানের কথা-টথা বললেও বুঝতাম, লোকটা নির্বোধ নয়।

বড়-বউদি—তবে আর কি? একবার গিয়ে কথাটা শুনে নিয়েই চলে এস। আর এ সব সহ্য করতে পারছি না।

বড়-বউদির মুখটা যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

কি-যেন ভাবে মঞ্জুলা। তারপর, যেন একটা শান্ত আক্রোশের মতো শক্ত একটা মূর্তি ধরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।—তিনটের ট্রেন ধরতে হবে যখন, তখন আর দেরি করছো কেন?

তাপস—তাই তো, আর দেরি করবার মানে হয় না।

মঞ্জুলা—তবে যাও।

আবার ঘরের ভিতরেই চলে আসছিল মঞ্জুলা। কিন্তু তাপস ডাকে—একটা কথা ছিল?

মঞ্জুলা—কি?

তাপস—তুমি তো তাহলে এখন এখানেই থাকবে ?

—সেকথা তো আগেই বলেছি।

—না, সেজন্যে বলছি না। বলছি, বর্ষার এই মাস দুটো এখানকার স্বাস্থ্য খুব সুবিধের নয়। শুনেছি এই দু'মাস এখানে নানারকম অসুখ-বিসুখ·।

মঞ্জুলার চোখে দুঃসহ অস্বস্তির ভ্রূকুটিটা আরও শক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রলাপ শোনাও যে একটা বিশ্রী শাস্তি।

তাপস হাসে—একটু সাবধানে থেকো। আর কলকাতায় পৌঁছেই আমি দু'শিশি কডলিভার অয়েল পাঠিয়ে দেব।

—কেন ? কার জন্যে ?

—তোমার জন্যে। তোমার তো একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে দেখেছি।

—ভাল কথা। কিন্তু পাঠাবার দরকার নেই, দরকার হলে ও-জিনিস এখানেই পাওয়া যাবে।

—আচ্ছা চলি। তাপস নামে সেই অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক নির্বোধের হাসি জলজল করতে থাকে।

মঞ্জুলার চোখ দুটো যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। এ কী রকমের সাংঘাতিক হাসি ! লোকটা যেন নিজের বুকের রক্তের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মঞ্জুলা বলে—তুমি সবই বুঝতে পেরেছো তো ?

তাপস—বুঝেছি।

—কি বুঝেছো ?

—তুমি আর কলকাতায় যাবে না।

—কেন যাব না, সেটাও নিশ্চয় বুঝেছো।

—বুঝেছি বই কি। আমার কাছে থাকতে তোমার ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না ?

—সেটা তুমি জান।

—তুমি জান না ?

—আমি তো শুধু জানি, তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছো। কাজেই, তোমাকে খুব ভুগতে হলো।

—তোমাকে তো কিছুই ভুগতে হয়নি, হবেও না।

—হবে বইকি।

—কেন ? তোমার কিসের অসুবিধে ?

—আমার বেশ খারাপ লাগবে।

—কেন ?

—সোজা কথা। তুমি আমাকে পছন্দ করনি, কিন্তু আমি তো তোমাকে খুবই পছন্দ করেছি।

—পছন্দ করে তোমার লাভটা কি ? আমি তো তোমাকে··।

—কি ?

—কোনদিন তোমাকে একটা কথাও বলে···।

—তবু···।

—তার মানে ?

—তবু ঘরে তো ছিলে। এখন অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরটাকে ফাঁকা ফাঁকা মনে হবে। এই যা।

চুপ করে কি-যেন ভাবতে থাকে তাপস। তারপরেই মঞ্জুলার মুখের দিকে তাকায়।

থরথর করে কাঁপতে থাকে মঞ্জুলার চোখ। তাপসের চোখে এ কী ভয়ানক দৃষ্টি। নির্বোধ হাসির মুখটা কী-ভয়ানক চতুর আর কত হিংস্র। তাপস নামে সেই মানুষটার যে এরকম একটা মুখ আর ও-রকম দুটো চোখ থাকতে পারে, কোনদিন যে কল্পনাও করতে পারেনি মঞ্জুলা।

তাপস বলে—চলি।

মঞ্জুলা—শোন।

তাপস—কি ?

মঞ্জুলা—তুমি কি ক্ষমা করে যেতে পারবে না ?

—ক্ষমা ? তোমার দোষ কোথায় যে ক্ষমা করবো ?

—দোষ আছে বইকি।

—কোন দোষ নেই।

—কিন্তু তুমি যে বলছো···।

—কি বলছি ?

—আমি না থাকলে ঘর ফাঁকা লাগবে।

—লাগবে।

ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাত তুলে চোখ ঢাকে মঞ্জুলা—তবে আমাকে নিয়ে চল।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দু'জনেই সামনে এসে দাঁড়ান।—চুপ কর মঞ্জু।

মঞ্জু বলে—না বউদি, এই ট্রেনেই চলে যাই।

শরতের এই নীল আকাশ, যে-আকাশের দিকে তাকালে সকলেরই চোখ মুগ্ধ হয়ে যাবে, সে-আকাশের দিকে তাকালে হিরণের চোখ দুটো মুগ্ধ হয় না কেন?

মুগ্ধ হয় কি না হয়, সেটা অবশ্য হিরণই বলতে পারে। কিন্তু বলে না। কেউ কখনও শোনেনি যে, পৃথিবীর কোন সুন্দরতার দিকে তাকিয়ে কোনদিন বলেছে হিরণ—কী চমৎকার!

কোনদিন কোন ফুলবাগানের দিকে তাকিয়েও কি বলতে পেরেছে হিরণ, কী চমৎকার! কোনদিনও না।

পরেশবাবুর বাগানটার দিকে তাকালে সবারই চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই রঙীন। বাগানের সবুজ ঘাসগুলি সমান করে ছাঁটা। কাঁটা গাছের বেড়াও যেন একটা পরিপাটি সরলতা। ফুলের চারদিকে যে-সব ফড়িং প্রজাপতি আর ভোমরা উড়ে বেড়ায় তারাও একটা ছন্দ মেনে চলে। এলো-মেলোভাবে উড়ে বেড়ায় না। এখানে টকটকে লাল ফুল, ওখানে সাদা, পিছনে হলদে করবী আর নীল অপরাজিতা। বাগানটা সত্যিই যেন ফুটন্ত বৈচিত্র্যের একটা বিস্ময়।

এই সেদিনও হিরণ এসেছিল। পরেশবাবুর বাগানটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাগানটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। তারপরেই বলে উঠলো—মাধবীলতাটা শুকনো।

সারা বাগানটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, অনেক চেষ্টা করে আর অনেক সময় নিয়ে আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে সত্যিই দেখা যায়, পাঁচিলটার ঐদিকে এক কোণে একটা মাধবীলতা শুকিয়ে রয়েছে।

বেশ তো, কোন সন্দেহ নেই, পরেশবাবুর এত বড় বাগানটার এক কোণে সত্যিই একটা বিশ্রী শুষ্কতা লুকিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই বাগানের এই যে শত শত সুশ্রী ফুল পাতা আর লতা বাতাসে দুলছে, যা দেখে ফড়িং আর প্রজাপতির চোখও মুগ্ধ হয়েছে, সেটা কি হিরণের চোখে পড়েনি?

সত্যিই পড়েনি। তা না হলে, অন্তত এত বড়-বড় বসরাই গোলাপগুলির সম্পর্কে একটা খুশির মন্তব্য করতো হিরণ।

কিন্তু চোখে না পড়বার তো কথা নেই। বসরাই গোলাপের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছে হিরণ। তবু মুখ থেকে

একটা সামান্ত খুশির উচ্ছ্বাসও শব্দ করে বেজে ওঠেনি। মনে হয়, পৃথিবীর কোন ভাল জিনিসকে ভাল বলতে গেলে হিরণের বুকটাই ফেটে যাবে। বোধহয় ওর নিঃশ্বাসেই একটা নিদারুণ সতর্কতা আছে, যেন ভুলেও ভালকে ভাল বলে না ফেলতে হয়।

এবিষয়ে হিরণের জীবনটা যেন সংযমের একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠেছে। কখনও, ভুলেও, মুখের কথার ফাঁকে কোন প্রশংসার, প্রশস্তির, অভ্যর্থনার বা কৃতার্থতার ভাষা যেন বেজে না ওঠে। বন্ধুরা ইচ্ছে করেই পরেশবাবুর বাগানের শোভা সম্পর্কে কতবার আলোচনা করেছে। পরীক্ষা করে বুঝতে চেষ্টা করেছে, হিরণের প্রাণটা খুশি হয়ে সেই চমৎকার বাগানের একটা ফুলেরও একটু সামান্ত প্রশংসা করে কিনা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এবিষয়ে হিরণের মুখ যেন প্রতিজ্ঞা করে বন্ধ করা একটা মুখ। কোন মন্তব্য করে না হিরণ। যদি নেহাৎই করে তবে সেটা হলো একটা খুঁত আবিষ্কারের কথা। অর্থাৎ, সেই শুকনো মাধবীলতাটা।—বড় বিশ্রী দেখতে ঐ মাধবীলতাটা, মন্তব্য করে হিরণ।

চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে পাড়ার প্রায় সবারই নেমন্তন্ন হয়েছিল। খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন চৌধুরী সাহেব। নেমন্তন্নের আসরের জন্য ফোর্ট থেকে ভাড়া করে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা আনিয়েছেন। ফোর্টের ব্যাণ্ড পার্টিও এসেছে। আর, ভোজের যে আয়োজন করেছেন, সে আয়োজন যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই সুন্দর আর তেমনই বিপুল। তিন রকমের পোলাও আর চার রকমের মাংস রান্না হয়েছে। রান্না করেছে নবাববাড়ির খানসামার দল।

অতিথিরা খুশী, অতিথিরা পরিতৃপ্ত, অতিথিরা মুগ্ধ। চৌধুরী সাহেবের হাসি মুখের অভ্যর্থনায় সকলে আরও খুশি। সত্যিই, চৌধুরী সাহেবের ভদ্রতার তুলনা হয় না।

হিরণ বলে—মিষ্টি পোলাওটার বাদামগুলো কেমন যেন কচ্‌কচ্‌ করলো। চৌধুরী সাহেবের একটা চোখ কেমন যেন কুঁচকে রয়েছে দেখা গেল। সামিয়ানাটার এক-জায়গায় একটা তালি আছে। ব্যাণ্ড-মাস্টারের মুখে বসন্তের দাগ।

সমীর বলে—ঠিকই বলেছো হিরণ, কিন্তু আর কি দেখলে বল?

নৃপেন বলে—মাংসের কালিয়াটা কেমন লাগলো?

হরিপদ বলে—ভোজের জায়গাটা কেমন সাজানো হয়েছিল, বল?

সমর বলে—ব্যাগ-পাইটার টিউন কেমন লাগলো?

একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না হিরণ। বোধহয় হিরণের অন্তরাত্মাই উত্তর

দিতে পারে না। কে জানে কি-রকমের নিদারুণ একটা বাধা যেন হিরণের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। কিছুতেই বলতে পারলো না হিরণ, চৌধুরী সাহেবের বাড়ির এই চমৎকার ভোজ-সভায় এসে চমৎকার কিছু দেখলো কিনা, চোখে পড়লো কিনা, কিংবা অনুভব করলো কিনা হিরণ।

কিন্তু সেজন্যে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, হিরণ কখনও হেসে ওঠে না, ওর চোখে কিংবা মুখের ভাষায় কখনো কোন উল্লাস জেগে ওঠে না। সুকুমারবাবুর মেয়ের বিয়ের সময়, যখন একদিকে নিমন্ত্রিতেরা ভিড় করে খেতে বসেছে আর ওদিকে বিয়ের মন্ত্রপাঠ শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের তারে কি একটা গোলমাল হয়ে সব আলো একসঙ্গে হঠাৎ নিভে গেল। সুকুমারবাবু যেন আতঙ্কিতের মতো একটা আর্তনাদ করে ওঠেন। সমর হরিপদ আর সমীরও আক্ষেপ করে ওঠে—আঃ, ভদ্রলোক সত্যিই বিপদে পড়লেন।

কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে হিরণ—বাঃ, বেড়ে অন্ধকার। নেমন্তন্ন খাও এবার! বিয়ের মন্তর এবার ঘ্যানর ঘ্যানর করুক।

নরেশবাবু একবার কলেজে গিয়েছিলেন, ছেলের পরীক্ষার ফী জমা দিতে। লোকের কাছ থেকে ধার করে আর নিজেরই একটা আংটি বেচে দিয়ে টাকা যোগাড় করেছিলেন নরেশবাবু। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, কলেজে উপস্থিত হয়েই দেখলেন, পকেটে টাকা নেই। ট্রামে কিংবা বাসে কোন চোর নিশ্চয়ই পকেট থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন নরেশবাবু। পথে দেখা হতে হিরণকেও এই দুর্ভাগ্যের খবরটা বলেছিলেন নরেশবাবু। কিন্তু শোনামাত্র হিরণের চোখ দুটো যেন ছটফট করে হেসে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো হিরণ—বাঃ, চোর ব্যাটার তো বেড়ে হাতসাফাই। একটুও টের পাননি বোধহয়?

নরেশবাবু বলেন—একটুও না।

হিরণ বলে— কি করে যে এমন অদ্ভুত হাতসাফাই হয়, আশ্চর্য!

হিরণের মুখের সেই ছটফটে ভাষার উল্লাসটা যেন জোরে হাতসাফাই-এর উদ্দেশে একটা বিস্ময়ের ঘোষণা।

এইভাবেই চলছে হিরণের জীবনটা। কেউ কোন নতুন বাড়ি তুলেছে, দেখতে গিয়ে বাড়িটার একটা খুঁতই শুধু চোখে পড়ে হিরণের। সিঁড়ির সিমেন্টের এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। আর একটা জানালার কাঠ চিড় খেয়ে এক জায়গায় ফেটে গিয়েছে।

কিন্তু আর কি কিছু নেই, যেটা দেখতে ভাল, খুবই শোভন আর সুন্দর?

না, হিরণ বলতে পারল না, বললও না যে, বাড়িটার মোজেয়িক বড় চমৎকার, ঘরগুলি বেশ বড়-বড়, আর খুব আলো-হাওয়া আছে।

বাড়ির মালিক যদুবাবু বলেন—সিমেণ্টে বড় ঠকে গেছি হে। প্রায় দশটন সিমেণ্টে ভেজাল ছিল। অর্ধেকই মাটি।

এইবার হেসে ওঠে হিরণের মুখটা—বাঃ, সিমেণ্টওয়ালা দেখছি খুব ওস্তাদ!

এটাও হিরণের চরিত্রের একটা অদ্ভুত আগ্রহ। কারও দুর্ভাগ্যেও একটা সহানুভূতির কথা বলতে যেন হিরণের বিবেকেই বাধা আছে, মানা আছে। আজ পর্যন্ত কেউ কখনও হিরণকে এমন কথা বলতে শোনেনি যে, আহা, অমুক বেচারা খুবই অসুবিধেয় পড়েছে। নিখিলের বড় ক্ষতি হয়ে গেল। চারুবাবুর উপর এটা বড় অন্যায় করা হচ্ছে।

চোখের উপরেই তো দেখা যায়, পাড়ার কত নিরীহ মানুষ বিপদে পড়েছে, কষ্ট পেয়েছে, সমস্যায় পড়েছে, দুশ্চিন্তা করছে। হিরণও দেখতে পায় বইকি। বন্ধুরা যখন আলোচনা করে, তখন সবই মন দিয়ে শোনেও হিরণ। কিন্তু, একটা আক্ষেপ? না, কখনও না। একটা সহানুভূতির কথা? না, কখনও না। বলতেই পারে না হিরণ।

দুই

মনে হচ্ছে, বেশ একটা অসুবিধেয় পড়েছে হিরণ।

সময় বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না, কিসের অসুবিধে?

সমীর বলে—এটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে, ঠিক বিয়ের পরেই হিরণ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

হরিপদ বলে—অথচ, বিয়ের পর দু' তিনটে মাস তো খুব বেশিরকম খোশ-মেজাজে ছিল হিরণ।

—তা ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, মেজাজে যেন ছিটে-ফোঁটা ফুর্তিও নেই।

সমর—সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, মনোজের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে হিরণ।

চমকে ওঠে সমীর—তাই নাকি?

সমর—হ্যাঁ, অথচ মনোজ হলো ওরই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হরিপদ—কবে থেকে এ ব্যাপার চলছে?

সমর—তা জানি না।

হরিপদ—আমি কিন্তু একটা আন্দাজ করতে পারছি।

সমীর—কি?

হরিপদ—আমার মনে হয়, সেই যে, সেই প্রথম দিনেই যে কাণ্ডটা হলো, তারপর থেকে……।

সমীর—প্রথম দিন মানে?

হরিপদ—সেই যে, বউভাতের দিন, যেদিন আমরা সবাই হিরণের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করলাম।

সমর—তা তো মনে পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন কাণ্ড হতে তো দেখিনি।

হরিপদ—আমি দেখেছিলাম।

সমীর—কি?

হরিপদ—ঐ যে মনোজ একটা কথা বললো, তারপর হিরণের স্ত্রী মনোজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

হ্যাঁ, এইবার সবারই মনে পড়ে। হিরণের কথায় স্মিতা যেন চমকে উঠেছিল আর মনোজের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল। স্মিতার প্রাণটা যেন হঠাৎ একটা শ্রদ্ধার গুঞ্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল আর সারা মুখ স্মিত হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, সামান্য একটা প্রশংসার ব্যাপার। স্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় একটা কথা হরিপদর কানের কাছে বলে ফেলেছিল মনোজ—সত্যিই চমৎকার দুটো চোখ, একেই বলে মৃগনয়না।

সমীর, হরিপদ আর সমর আর কিছু জানে না এবং তার আগে যে ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু খবর রাখে না। তাই ওদের পক্ষে ঘটনাটাকে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় বলে মনে হবে, এটা স্বাভাবিক।

স্মিতার মুখের দিকে তাকালে সবারই চোখে যে সত্য সবার আগে দেখা দেবে, সেটা হলো স্মিতার ঐ চোখ দুটো! একেবারে নিখুঁত দু'টি সুন্দর চোখ। স্মিতাও জানে, তার রূপের ভুল আর যা-কিছু কিংবা যতকিছুই থাকুক না কেন, অন্তত চোখ দুটোকে কেউ নিন্দে করবে না। যার চোখ আছে, সে সবার আগেই স্মিতার ঐ টানা-টানা কালো চোখ দুটোকেই দেখবে আর খুশি হবে।

কিন্তু শুনে চমকে উঠেছিল স্মিতা। জীবনে যার কাছ থেকে সবচেয়ে খুশির স্বরে কথাটা শুনতে পাবে বলে আশা করেছিল স্মিতার মন, তারই কাছ থেকে একটা অদ্ভুত কথা শুনতে পেল স্মিতা। বাসর ঘরে, সেই প্রথম আলাপের প্রথম ক্ষণে, যখন স্মিতার সেই টানা-টানা কালো চোখ দুটো হেসে-

হেসে আরও নিবিড় আর লাজুক হয়ে হিরণের মুখের দিকে তাকায়, তখন হঠাৎ বলে ওঠে হিরণ, তোমার ঘাড়ের ওপর ওটা কি? আঁচিল? না, জড়ুল?

সুমিতার চোখের হাসি স্তব্ধ হয়ে যায়। মনের আশাটা যেন হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়ে।

হিরণ হাসে—তোমার বাঁ কানের কাছে ওটা কিসের দাগ? মনে হচ্ছে, একটা ফোঁড়া হয়েছিল?

সুমিতা মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

বিয়েতে দানসামগ্রী যা পেয়েছে হিরণ, সেটা মতি মাসিমার মতো রাগী আর খুঁতখুঁতে মানুষের কাছেও প্রশংসা পেয়েছে।—না, বেয়াই কিপটেমি করেনি, বেশ ভাল জিনিসই দিয়েছে।

কিন্তু সুমিতা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। হিরণ বলে—মিররে কেমন যেন তিনটে স্ক্র্যাচ আছে; আর ফুলদানিটার পালিশ একটু ম্যাটমেটে।

কিন্তু মেহগনির অমন চমৎকার পালংকটা? তার মধ্যে তো খুঁত নেই। সেটা যে একটা চমৎকার জিনিস, এ কথাটা একটু খুশি হয়ে বলতে পারে না কেন হিরণ? একবার জিজ্ঞাসাও করেছিল সুমিতা—পালংকটা বাবা নিজে পছন্দ করে কিনেছেন।

কিন্তু সুমিতার মুখের এই খুশির কথাটা শুনেও, আর চোখের জিজ্ঞাসাটাকে দেখেও উত্তর দিতে পারেনি হিরণ।

সরবত তৈরী করতে সুমিতার দক্ষতার কথা কে না জানে? শ্বশুর বাড়িতেও সুমিতার সরবতের স্বাদুতা সকলের প্রশংসা পেয়েছে। সরবত খেয়ে একটাও প্রশংসার কথা শুধু একজন বলতে পারেনি সে হলো হিরণ। তবে একটা কথা বলেছে হিরণ—তোমার চা কিন্তু সুবিধের নয় সুমিতা।

—কেন? কি হলো?

—কখনো দেখছি খুব মিষ্টি, কখনো আবার একেবারেই মিষ্টি নয়।

মনোজ আসে মাঝে মাঝে। সুমিতা নিজেই চা তৈরী করে। সে চা খেয়ে মনোজ কোন প্রশংসা করে না, নিন্দেও করে না। কিন্তু একটি কথা বলে —আপনার হাতের সরবত কিন্তু অতুলনীয়। আমি জীবনে কখনও এত ভাল সরবত খাইনি।

সুমিতা হাসে—একটা মাসের মধ্যে সরবত খাওয়ার লোভেও তো একদিন এলেন না।

মনোজ হাসে—বেশ তো, বলেন তো রোজই আসবো। দেখি কত সরবত

খাওয়াতে পারেন।

সুমিতা—আসুন! একটুও ভয় পাই না।

অবশ্য রোজই আসে না মনোজ। কিন্তু, মনে হয়, সুমিতা যেন রোজই একটা আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। হিরণকেই তাগিদ দিয়ে কথা বলে—কই, তোমায় বন্ধু যে আজও এলেন না।

হিরণ গম্ভীর হয়ে বলে—তা আমি কি করে বলবো?

হিরণ গান গাইতে পারে ভাল। মাঝে মাঝে নিজেই যেন একটা আশায় উৎসাহে এসরাজ বাজায় আর গান গায়। সুমিতা কাছেই বসে গান শোনে। গান শেষ হবার পর হিরণের চোখ দুটো যেন উৎসুক হয়ে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে! বোধহয় হিরণের মনে একটা প্রশ্ন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। জানতে চায় হিরণ, গান শুনে কত খুশি হলো সুমিতা।

সুমিতা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—গান গাইবার সময় তোমার মাথাটা এত দোলে কেন?

চমকে ওঠে হিরণ। চোখের দৃষ্টিটা যেন তিক্ত হয়ে যায়। আর কিছুই দেখলো না, বুঝলো না সুমিতা, শুধু হিরণের মাথা দোলানোর অভ্যাসটাই সুমিতার চোখে পড়লো!

কিন্তু মনোজের গলার স্বর যে এত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, গান গাইবার সময় মনোজের গলা যে তিন পর্দাতেও চড়তে পারে না, সেটা তো কোন দিন বুঝলো না সুমিতা? কোন দিনও তো এমন কথা বলল না যে, মনোজের গলার স্বর সুবিধে নয়।

ফটো তুলিয়েছে হিরণ। শহরের সবচেয়ে ভাল স্টুডিওর হাতের কাজ। ফটোতে কোন খুঁত আছে বলে মনে হয় না। খুঁত থাকলেও চোখে পড়বে না। কিন্তু ফটো দেখা মাত্র হেসে ফেলে সুমিতা।

হিরণ বলে—হাসলে কেন?

সুমিতা বলে—কানটা আবছা হয়ে গিয়েছে।

ঠিকই, দেখতে পায় হিরণ, ফটোর চেহারাটাতে একটা কান সামান্য একটু আবছা হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফটোর নাক মুখ চোখ যে হেসে-হেসে জীবন্ত মূর্তির নাক মুখ আর চোখের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে; এটা কি চোখে দেখতে পেল না সুমিতা? অদ্ভুত!

কিন্তু একদিনও তো এ কথাটা বললো না সুমিতা, মনোজ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। চোখে না দেখবার তো কথা নয়। মনোজ যখন গল্প করে আর চা

খেয়ে চলে যায়, তখন সুমিতা হিরণেরই কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে।—মনোজবাবুর রুচি কিন্তু বেশ ভাল।

—কেন ?

—দেখছো না, কী চমৎকার সিল্কের একটা কামিজ পরেছেন।

সুমিতার মুখের দিকে যেন একটা রুক্ষ রিক্ত আর অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে হিরণ। সে দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ একটা জ্বালাও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁপতে থাকে।

তিন

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে হিরণ। আজ মনোজের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে সুমিতা। টিকিট কেনা হয়েই গিয়েছে।

হিরণের চোখের তারা দুটো যেন ক্ষমাহীন একটা আক্রোশে চাপতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।—এসব আবার কি আরম্ভ করলে ?

সুমিতা—কি বললে ?

হিরণ—তোমার যে চক্ষুলজ্জা বলেও কোন পদার্থ নেই।

সুমিতা হেসে ফেলে—আমার চোখই নেই, চক্ষুলজ্জা থাকবে কেমন করে ?

হিরণ—তুমি সত্যিই তাহলে সিনেমা দেখতে যাবে ?

সুমিতা—কি আশ্চর্য, তুমি এত রাগ করে কথা বলছো কেন ?

হিরণ—রাগ করে নয়, আশ্চর্য হয়ে কথা বলছি।

—কিসের আশ্চর্য ?

—শত হোক্‌, স্বামীর বন্ধু যতই বন্ধু মানুষ হোক, তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া কোন স্ত্রীর পক্ষে···বেশ একটু বাড়াবাড়ির ব্যাপার হয়ে যায় সুমিতা। তুমি যেও না।

সুমিতাও গম্ভীর হয়—আমি যাব।

হিরণ—না, যেও না।

সুমিতা—কেন ?

হিরণ—ভাল দেখায় না।

সুমিতা—কেন ভাল দেখায় না ?

হিরণ—একবার বলেছি। না শুনে থাকলে আর শুনতে চেয়ো না।

সুমিতা—শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।

হিরণ—বুঝতে পারবেও না কোন দিন।

সুমিতা—তুমি বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

হিরণ—ইচ্ছে করলেই পারি।

সুমিতা—তোমার ইচ্ছেই হবে না।

চুপ করে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিরণ। সুমিতার কথাগুলি যেন একরোখা কতগুলি অর্থহীন প্রতিবাদ। আবার হেঁয়ালির মতও মনে হয়। কি যেন বলতে চাইছে সুমিতা, কিন্তু বলতে পারছে না বলেই এলোমেলো করে অন্য কথা বলছে।

কিন্তু সুমিতা বোধহয় বুঝতে পারছে না, এই এলোমেলো প্রতিবাদ আর তর্কের ভাষা কী সাংঘাতিক বিষের জ্বালা ছড়িয়ে হিরণের মনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। স্বামীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এ কী দুঃসাহসের কথা অক্লেশে বলে দিতে পারছে সুমিতা।

না বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। যে নারীর চোখে এত ভুল, সে নারীর মনেও ভুল দেখা দিতে কতক্ষণ? ভুল এরই মধ্যে দেখা দিয়ে ফেলেছে কিনা কে জানে?

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অন্য ঘরের দিকে চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুমিতা। সুমিতা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে আনমনার মতো দরজার বাইরে গাছপালা-গুলির দিকে তাকিয়ে আছে। কে জানে কি দেখছে সুমিতা? কিন্তু সুমিতার টানা-টানা কালো চোখ দুটো ছলছল করছে। কী অদ্ভুত এই চোখ! জলে ভরে গিয়ে সে চোখের সুন্দরতা যেন আরও গভীর হয়ে টলমল করছে।

কিন্তু আজ সুমিতার এই সুন্দর চোখ দুটো বোধহয় হিরণের জন্য কোন আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারবে না। সুমিতার চোখ যেন অন্য কারও জন্যে কাঁদছে।

—ছিঃ! হিরণের গলার স্বর যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়ে তেমনই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যেন প্রাণপণে মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে সুমিতা। তাই কোন কথা বলতে পারছে না।

হিরণ বলে—এমন সুন্দর চোখেও এমন ভুল হয়?

চমকে ওঠে সুমিতা—কি বললে? কার চোখ?

—তোমার চোখ।

—কি করেছে আমার চোখ?

—তোমার চোখ দুটো শুধু দেখতেই চমৎকার, কিন্তু…।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় সুমিতা। তারপর হিরণের কাছে এসে আর হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে। আর সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ফেলে—কবে দেখলে, আমার চোখ দেখতে চমৎকার ?

—রোজই দেখছি।

—কোনদিন তো বলনি।

—সেটাই বোধহয় ভুল হয়েছে।

—কিন্তু···।

—কি ?

—তোমার চোখ যে আর-একটা ভুল করেছে !

—কি ?

—এতক্ষণ ধরে দেখেও বুঝতে পারনি, সুমিতা কার জন্যে কাঁদছে আর কেন কাঁদছে।

হিরণ—কার জন্যে ?

সুমিতা—তাহলে এখনও বুঝতে পারনি দেখছি।

হিরণ—তার মানে ?

সুমিতা—তার মানে, মনোজের সঙ্গে আমার সিনেমা দেখতে যাবার কোন কথাই হয়নি।

চমকে ওঠে হিরণ—কে বললে ? দুটো টিকিট যে দেখলাম।

সুমিতা—হ্যাঁ। আমার আর তোমার টিকিট।

অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে হিরণ—তবে ?

সুমিতা—তবে এক কাপ চা নিয়ে আসি। তারপর রওনা হব।

হিরণ—বেশ।

চা নিয়ে আসে সুমিতা। আর, চা খেয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে হিরণ—চল, আর দেরি করে লাভ নেই। আজকের চা-টা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই মাথার কাপড় টানে সুমিতা সমরবাবু আসছেন।

হিরণ বলে—সমরের মুখের হাসিটা দেখছো, সত্যিই দেখতে চমৎকার। নয় কি ?

সুমিতা হেসে ফেলে—হ্যাঁ।

হিরণ বলে—বাঃ।

সুমিতা—কি হলো ?

হিরণ— পরেশবাবুর বাগান থেকে হাসনাহানার গন্ধ ভেসে আসছে

সুস্মিতা—হ্যাঁ।

হিরণ—ভারী সুন্দর, চমৎকার মিষ্টি গন্ধ।

শুক্লা নবমী

কোন দিন কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে কখনো এই ভয় হয়নি যে, আমার স্বামীকে অশ্রদ্ধা করবার দুর্ভাগ্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেবে। কিন্তু যা দুঃস্বপ্নের মধ্যেও অসম্ভব ছিল, আজ তাই হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, স্বামীকে অশ্রদ্ধা করছি। না করে পারছি না। সে মন আজ আমার নেই।

সত্যি সত্যি দেবতা বলেই তো একদিন মনে হয়েছিল তাঁকে, আমার এই স্বামীকে, যাঁকে আপনারা আজও বলেন আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু, যিনি আজকাল সকাল বেলায় একটি এবং সন্ধ্যাবেলায় একটি টিউশনি করে নিজের জীবনধারণ করছেন এবং আমাকেও ভাত কাপড় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

সকালেই হোক আর সন্ধ্যাতেই হোক, টিউশনি সেরে যখন ক্লান্ত হয়ে বিষণ্ণ ও শুকনো মুখ নিয়ে স্বামী আমার ঘরে ফেরেন, তখন হেঁসেলের দুয়ারে বসে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। হাত-মুখ ধোওয়ার জলটুকু এগিয়ে দিতে অথবা একটা হাতপাখা তাঁর হাতের কাছে তুলে দিতে পারি না। ইচ্ছে করলেও পারি না।

এসব যে খুশিমনে করি, কিংবা করে খুশি হই, তা মোটেই সত্য নয়। স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারি না বলে নিজেকেও যে ক্ষমা করতে পেয়েছি, তা নয়। নিজের ওপর বেশ ঘেন্নাই হয়, রাগও করি। মনটা পুড়ে যায়। তবু সেই আগের মতো হাতপাখা নিজের হাতেই তুলে নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। হাসিমুখে কথা বলা দূরে থাক, স্বামী যদি হাসিমুখে আমার দিকে তাকান, তবুও প্রসন্ন হতে পারি না।

পারি না, কারণ আর সহ্য করতে পারি না। আপনারা তো তাঁকে বলেন আইডিয়ালিষ্ট, কিন্তু তিনিই তো আমার জীবনটাকে এমন শ্রদ্ধাহীন আর আশাহীন করে দিলেন। আমাকে ভাত-কাপড় দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু দিতে পারছেন কই? কেন এমন দশা হলো? কে এই দশার জন্য দায়ী?

তিনিই দায়ী। শুধু ভাত-কাপড় কেন, আমার জন্য কাসিলিং-এ একটা

সৌখীন বাড়ি করে দেবার সামর্থ্যও তাঁর ছিল! বিয়ের রাতে বাসর-ঘরে তিনি যখন প্রথম আমার হাত ধরেছিলেন তখন তাঁর হাতে দু'টো হীরের আংটি দেখেছিলাম। বিয়ের আগেই শুনেছিলাম, মস্ত বড়লোকের ছেলের সঙ্গেই আমার বিয়ে হচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে প্রথম এসেও দু'চোখ ভরে প্রমাণ দেখেছিলাম কথাটা মিথ্যে তো নয়, বরং যতখানি ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী সত্য। বাপের এক ছেলে আমার স্বামী, গঙ্গার ধারে মস্ত বড় তাঁর পৈতৃক বাড়ি। ঘরের আসবাব-পত্রের দামই হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর। লাইব্রেরীতে পাঁচ হাজারের চেয়েও বেশী বই, দাম বিশ হাজার টাকার চেয়ে বেশী। লোহার সিন্দুকে এক গাদা কোম্পানীর কাগজ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম আমার স্বর্গীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সোনা আর জড়োয়া গয়নার একটি স্তূপ। ব্যাঙ্কের পাশ-বইও দেখেছিলাম সাত-আটটি!

কোথায় গেল সে সব? সবই গেছে আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর আদর্শবাদের অনাচারে ছিন্নভিন্ন হয়ে, ধুলো হয়ে, লুপ্ত হয়ে। আজ আমাকে নিয়ে তিনি থাকেন সালকিয়া বাজারের কাছে একটা গলির ভেতরে বিশ টাকা ভাড়ার একটা বাড়িতে, যে বাড়িতে আমার বাপের বাড়ির টেরিয়ার কুকুরটা সাত দিন থাকলেও ঘেন্নায় মরে যাবে।

স্বামীর আমার কোন খারাপ খেয়াল নেই। আপনারা এবিষয়ে যতখানি নিঃসন্দেহ, আমি তার চেয়ে বেশী। বড়লোকের ছেলে হয়েও মদের বোতল তিনি বোধহয় জীবনে চোখেও দেখেননি, সিগারেটও খান না, এমনকি জর্দা দিয়ে একটা পান খেতেও তাঁর আপত্তি আছে। আর একটা যে সন্দেহ অনেক স্ত্রীই তাঁদের স্বামী সম্বন্ধে না করে পারেন না, সে সন্দেহের লেশমাত্রও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না আমার স্বামীর চরিত্রে। শুধু আমি কেন, আপনারাও সবাই জানেন, পরিচিতা বা অপরিচিতা মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনায় ও আচরণে তিনি কত সংযত আর কত শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু সবচেয়ে প্রগল্ভ তাঁর আদর্শবাদ! এক একটা দেশসেবা, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-উন্নয়ন, স্বদেশী, এবং হেনতেন নানা প্রকার আদর্শের উৎসাহে বিরাট পৈতৃক সম্পদের সব শেষ করে দিয়ে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন এবং কি করছেন দেখুন!

এতটা আমি আশঙ্কা করিনি। এখনও স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই, প্রথম প্রথম স্বামীর সব স্বদেশী ব্রত আর দেশসেবা এবং রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধই হয়েছিলাম। দেবতার মতই তো

তাঁকে মনে হতো। মনে হতো, তাঁর সুন্দর চেহারার চেয়ে তাঁর মনের ভেতরটা আরও কত বেশী সুন্দর।

দেখেছিলাম একদিন, বিয়ে হবার মাস কয়েক পরে, মাঘমাসের শীতের রাত্রে হঠাৎ গায়ের লেপ টেনে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ললিতা, দেখতো আমার টেবিলের দেরাজে কিছু টাকা-পয়সা আছে কি না?

দেখে এসে বললাম—আছে, তিনশো টাকা আছে।

—দাও।

দেরাজ থেকে টাকা এনে দিলাম। স্বামী তখুনি বের হয়ে গেলেন। ঘরের জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগ হচ্ছিল, চোখে জল আসছিল এবং একটা সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঘেন্নাও আসছিল মনের ভেতর। বড়লোকের ছেলে টাকা নিয়ে মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়, এ কি সত্যিই সে রকম বড়লোকের ছেলে? আমার কপালে কি সেই অভিশাপ এসে লাগলো?

শেষরাত্রে ফিরে এলেন স্বামী, আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু। নিজের থেকেই বললেন—নিজের ওপর কেমন একটা ঘেন্না এল হঠাৎ, তাই না গিয়ে পারলাম না।

ব্যাপারটা এই। শীতের রাতে লেপ গায়ে দিয়ে আরামে শুয়েছিলেন স্বামী, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়লো, বাগ্‌দি পাড়ায় বাচ্চা বাচ্চা দুধের ছেলেগুলো এই শীতে শুক্‌নো কলাপাতার গাদার ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরবার সময় নিজের চোখেই এই দৃশ্যটা তিনি দেখে এসেছিলেন। মনে পড়তেই আর থাকতে পারলেন না, টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে বিনয় সাহাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে, তার দোকান থেকে এক গাদা কম্বল কিনে নিয়ে বাগ্‌দিপাড়ায় ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিয়ে তার পরে ফিরে এলেন।

স্বামী হাসছিলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের ভেতরে কি যে হচ্ছিল তা আজও আমার মনে আছে। ইচ্ছে করছিল, তাঁর বুকের ভেতর মুখ আর চোখ গুঁজে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, যেখানে লুকিয়ে আছে এমন সুন্দর সোনার মতন একটা মন। ইচ্ছে করছিল, পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করি। কিন্তু আমাকে আমার মনের আনন্দ আর আবেগ প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তিনিই আগে আমার হাত ধরে প্রশ্ন করলেন—কিন্তু তুমি এরকম জেগে বসে আছ কেন?

কি মমতা ছিল তাঁর সেই অনুযোগের মধ্যেও; কিন্তু আজ কই? আজ আমি যখন জ্বরভরা গায়ে এক বাটি পান্তা ভাত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কাঙালের মতো

শুধু পোড়া লঙ্কা দিয়ে মেখে গিলে-গিলে খেতে থাকি, তিনি একবার তাকিয়ে দেখেন শুধু। এক জোড়া শুকনো ঠাণ্ডা আর বেদনাহীন চোখ। তাকিয়ে দেখেই তাঁর ছেঁড়া খদ্দরের কামিজটা গায়ে চড়িয়ে টিউশনি করতে অথবা কোথায় কোন্ এক আদর্শ করতে বের হয়ে যান। আর আমি একা ঘরে বসে আমার জীবনের অভিশাপের হিসেব করতে থাকি।

আমার স্বামীর ওপর আমার এই অশ্রদ্ধাকে আপনারাও হয়তো ক্ষমা করতে চাইবেন না। বলবেন, আমি বড় অসহিষ্ণু, স্বামীর ওপর আমার সমবেদনা নেই। আপনারা বলবেন, চারুবাবুও তো কিছু স্বর্গসুখ উপভোগ করে বেড়াচ্ছেন না। তিনিও তো আপনার মত মাঝে মাঝে পান্তা ভাতেই ক্ষুধা মিটিয়ে নিচ্ছেন, এবং তার জন্যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন না। আপনারা আদর্শের দোহাই দিয়ে বলবেন—চারুবাবুর স্ত্রী ললিতার মনটা ঠিক সহধর্মিণীর মন নয়। স্বামীর জীবনের দুঃখের ভাগ সমানভাবে গ্রহণ করতে যে স্বীকার না করে, তাকে কি…।

জানি, তাকে সহধর্মিণী বলা যায় না। কিন্তু আপনারা সে খবরটা জানেন কি, যে-খবরটা কোন খবরের কাগজে বের হয়নি, কিংবা আমি ও আমার স্বামী কোনদিনও বন্ধু বা প্রতিবেশীব কাছে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারিনি?

আমার পণ্টু মারা না গেলে আজ তার বয়স হতো তের বছর। কিন্তু আপনাদের এই কলকাতা সহরেই তিন বছর আগে, ঠিক যেদিন আপনারা নানা জায়গায় বুদ্ধ পূর্ণিমার অনুষ্ঠান ও উৎসব করছেন, ঠিক সেই দিন আমার কোলের ওপর শুয়ে থেকেই সে চোখ বন্ধ করলো। স্বামী আমার বুদ্ধ-পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা সেরে ঘরে ফিরে এসেই দেখলেন, পণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে চিরকালের মতো। আপনাদের চারুবাবুকে অনেক উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিয়ে বিদায় নিল পণ্টু। আর ডাক্তার ডাকতে হবে না, ডাক্তারের ফী যোগাড় করার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। শূন্য পকেট নিয়ে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে বৃথা আর ওষুধ অন্বেষণ করে ফিরতে হবে না।

পণ্টুর বয়স তখন দশ বছর। ছেলেটা ভুগছিল দু'বছর থেকে, যেদিন শালকিয়ার এই গলিতে এসেছি সেইদিন থেকে। আপনারা জানেন না, পণ্টুর জন্য ডাক্তার যে টনিক আর ফুডের ফর্দ করে দিয়েছিলেন, দু'বছরের মধ্যে মাত্র একটি মাস নিয়মমত তাকে সেই ফুড আর টনিক খাওয়াতে পেরেছিলাম এবং মাত্র এই একটি মাসের চিকিৎসার খরচ যোগাড় করতে গিয়ে আমার গায়ে সোনার চিহ্ন বলতে শেষ যে বস্তুটা ছিল, এক জোড়া রুলি, তা'ও বিক্রী করে

দিয়ে টাকা যোগাড় করেছিলাম।

এক কথায় বলতে পারি, আমার পন্টুর চিকিৎসা হয়নি। ডাক্তার বার বার বলেছিলেন—পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান ছেলেকে, নইলে বিপদ হবে। কিন্তু আমার আইডিয়ালিষ্ট স্বামী ছেলের জন্য দৈনিক এক ছটাক ছানাও যোগাড় করতে পারেননি। টাকার জন্য চুরি করতে পরেননি। কিন্তু ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং ধার পাননি। পন্টুও আমার দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো।

আপনারা দেখেননি আমার পন্টুকে। হাসপাতালের প্রসূতি-সদনের রিপোর্ট খুঁজলে এখনো দেখতে পাবেন যে, সদ্যোজাত শিশুটির দেহের ওজন রেকর্ড ওজন বলে লেখা রয়েছে রিপোর্টে, সেই শিশুটি হলো আমারই পন্টু। দু'-বছরের মধ্যে এমন সুন্দর হাসি-খুশি, দুরন্ত রাজহাঁসের মতো নরম নধর আমার পন্টু দেখতে দেখতে জিরজিরে একখানা হাড়মাত্র হয়ে গেল। ওষুধ পাইনি, ফুড পাইনি, এক ছটাক ছানাও পাইনি—পন্টুকে শুধু সাগুর জল খাইয়ে আর সরষের তেল মাখিয়ে আমি দু'টো বছর মরতে দিইনি। কিন্তু বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন নিজের থেকেই চলে গেল পন্টু।

আমি বলি, আমার স্বামীর ঐ আদর্শবাদই আমার পন্টুকে মেরেছে। ক্ষমা করতে পারি না তাঁকে। ভুলতে পারবো না, যে মানুষ মাঘ মাসের রাত্রে উঠে বাগ্‌দিপাড়ায় শীতার্ত ছেলেগুলির গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়ে এসেছে, সেই মানুষের ছেলে মরে গেল বিনা ওষুধে, বিনা খাদ্যে। পঙ্গুর মতো, বোবার মতো, আমার স্বামী মরা পন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দু'চোখ জলে টলমল করছিল, কিন্তু আমি দেখছিলাম, কী কুৎসিত ও নির্মম মূর্তি। ওর আদর্শবাদের চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই সংসারে। ওর ত্যাগের চেড়ে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই ত্রিভুবনে।

এখন হয়তো আপনারা কিছুটা বুঝতে পারছেন, কেন আমি আমার স্বামীর সম্বন্ধে এমন করে হৃদয়হীনের মতো কথা বলছি। আরও আশ্চর্যের কথা এবং আমার পক্ষে তো একেবারেই অসহ্য, তিনি এখনো দেশের শুভাশুভ নিয়ে, মহাপুরুষদের জীবনকথা নিয়ে, আরও অনেক-রকম তত্ত্ব নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের কাছে বিবেকানন্দ ও গান্ধীর প্রেম সেবা অহিংসা ও ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসে তিনি এখনো উপবাস করেন এবং আবির্ভাব দিবসে গঙ্গাস্নান করে এসে গীতা পড়েন এবং দু'একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে বক্তৃতাও করে আসেন। শুনেছি তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়, কারণ তাঁর বক্তৃতায়

নাকি একটা আন্তরিকতার আবেদন থাকে।

আপনারা যাই বলুন, আমার কাছে এসবই ভুয়ো, অর্থহীন, একটা অভিশাপ। অনেক সহ্য করতে পারি, এতটা সহ্য করতে পারি না।

অনেক দিন কেটে গেল। যতদিন না মরি ততদিন বেঁচে থাকতে হবে, এ ছাড়া জীবনের আর কোন অর্থ খুঁজে পাই না। ছেলেকে হারিয়েছি, আর স্বামী বলে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আদর্শবাদী দু'বেলা টিউশনি করে যে সম্পদ নিয়ে আসেন তাতে সাপ্তাহিক রেশনটা শুধু নিয়মিত ঘরে আসে। কিন্তু আজকাল দেখে একটু আশ্চর্য লাগছে, স্বামী আমার যেন একটু চালাক হতে উঠছেন। মাঝে মাঝে ভাবি, এই চালাকী কাণ্ডজ্ঞানটুকু যদি আগে থাকতো।

আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর অনেক ভক্ত আছে। আজকাল দশটা বাজলেই তিনি আর ঘরে থাকেন না, স্নান করেন না, ভাতও খান না। বলে যান—তুমি রান্নাবান্না করে খেয়ে নিও ললিতা। আমার জন্যে চাল নিও না।

প্রথমে বুঝতে পরিনি, ব্যাপারটা কি। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম।

ঠিক দশটা বাজলেই তিনি তাঁর কোন ভক্তছাত্রের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং কখনো সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব, কখনো রাজনীতি, কখনো বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-বিবেকানন্দ-গান্ধীর আদর্শ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনা করতে করতে ঘণ্টা দুই-তিন-চার পার হয়ে যায়। তাঁর ভক্ত ছাত্র অথবা ছাত্রের বাবা কিংবা মা অনুরোধ করেন—অনেক বেলা হয়ে গেছে চারুবাবু, এখানেই স্নান করে দুটো খেয়ে নিয়ে···।

আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু মৃদু হেসে মৃদু একটু আপত্তির ভঙ্গী করেন, কিন্তু পরমুহূর্তে রাজী হয়ে যান—হ্যাঁ, বেলা অনেক হয়েছে, এবং আপনারা যখন না খাইয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা বাধ্য হয়েই···।

স্নান করে ছাত্রভক্তের বাড়িতে উদরপূর্তি করে পাঁচ রকম অন্নব্যঞ্জনের আস্বাদ গ্রহণ করে ঘরে ফিরে আসেন আমার স্বামী। লক্ষ্য করেছি, তাঁর স্বাস্থ্যটা আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে উঠছে। যে ফতুয়াটা একেবারে ঢিলে হয়ে তাঁর কাঁধের হাড়ের সঙ্গে ঝুলতো, সে ফতুয়াটা এখন গায়ে সঙ্গে আঁটসাট হয়ে লেগে রয়েছে।

ভালই, তবে এই নতুন আদর্শবাদটা এতদিন চাপা ছিল কেন? যদি প্রথম থেকেই এইরকম বুদ্ধি রেখে তিনি আদর্শের সাধনা করতেন, তবে কি আর আজ আমাকে এমন শূন্য হয়ে, ছেলে হারিয়ে, স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে, এমন

একটা অভিশপ্ত জীবনের বোঝা নিয়ে পড়ে থাকতে হতো ? একটু বুদ্ধি রেখে, একটু সাবধান হয়ে আদর্শবাদী হলে কি আজ গঙ্গার ধারের বাড়ি, বাড়ির ফার্নিচার, এতগুলি ব্যাঙ্কের পাশ-বই, লাইব্রেরী আর সিন্দুকের ভেতরে গয়নার স্তূপ—সবই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেত ?

আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু এতদিনে পয়সার মর্য্যাদা বুঝেছেন, এবং পয়সা বাঁচাবার কায়দাটুকুও শিখেছেন। উন্নতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু…কিন্তু ভেবে পাই না, শ্রদ্ধা কেন আসে না ? এখনো তো পারলাম না, আগের মতন তাঁর গা ঘেঁষে বসে তাঁর গায়ে পাখার বাতাস দিতে। উদ্বেগ হয় না, যদি বাড়ি ফিরতে রাত করেন। আমার মমতাহীনতার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তাঁর শরীরটা এত ভাল হয়ে উঠেছে দেখেও আমি সুখী হতে পারছি না। কি যেন মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে।

কিছুদিন আগেও তো তাঁকে দেখেছি, কলতলায় হাত মুখ ধুচ্ছেন। দেখে রাগ হয়েছে। নিজের মূর্খতায় দোষে সব-হারানো ও প্রবঞ্চিত একটা মানুষের মূর্তি। কিন্তু আজকাল রাগ হয় না। বরং লজ্জা পাই। হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলে মনে হয়, যেন একজন অচেনা পুরুষ ঘরে এসে ঢুকলো।

বড়লোকের ছেলে, দু'আঙুলে হীরের আংটি, সেই অনেকদিনের আগের এক সুন্দর তরুণের মূর্তিটি আমার মনে আছে—আমার স্বামী, আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। আর সেদিনও দেখেছি, ছেঁড়া খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠান সেরে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন—সেও তো আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। কিন্তু আজ তো আমার দু'চোখের দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সেই পরিচিত মূর্তির কোনটিই দেখতে পাই না। ছাত্র-ভক্তের বাড়িতে পেটপুরে সুখাদ্য খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট চারুবাবু ঘরে ফেরেন। ভেঙেছে তাঁর সেই জোর, গেছে তাঁর সেই চোখের জল। হীরের আংটি গেছে, কিন্তু মৃত ছেলের দিকে তাকানো বুক-নিংড়ানো বেদনার অশ্রুজলও গেছে। অতীতকে ভুলে গেছেন, দু'বেলা পেটভরে খাওয়ার লোভ ও কৌশলবাদের কাছে হারিয়ে গেছে তাঁর বলিষ্ঠ দারিদ্র্যের আশীর্বাদ।

আজ বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যি মনের গোপনে স্বামীর জন্যে যে এককণা ভালবাসার সোনা ছিল, এতদিনে আমার গায়ের সোনার শেষচিহ্ন রুলি দুগাছির মতো তা'ও শেষ হয়ে গেল। আপনাদের কাছে এখনো হয়তো আইডিয়ালিস্ট সেজে ঘোরা-ফেরা করেন আমার স্বামী, কিন্তু আমি তো জানি, কি সর্বনাশ হয়ে গেছে এমন কঠিন একটা মানুষের আত্মার। একবার নয়,

দুবার নয়, কতবারই তো দেখেছি, মরতে ভয় করেন না আমার স্বামী। অনেক ঘটনার কথা জানি, অনেক ঘটনার কথা শুনেছি। জলে-ডোবা মানুষকে তুলতে গিয়ে, বসন্ত রোগীর সেবা করতে গিয়ে, সত্যাগ্রহের সময়ে ঘাতক সৈনিকের উদ্যত রাইফেলের সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে—অনেকবার জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। সেই মানুষ আজ বাঁচতে চাইছেন, প্রাণের জন্য কি অদ্ভুত দরদ! বিনা ওষুধে মরেছে যাঁর ছেলে, তবু চুরি করতে পারেন নি যিনি, তিনি আজ কায়দা করে, কি সূক্ষ্ম কৌশলে নিজের বিবেক আর আত্মসম্মানের ঘরে সিঁদ কেটে, প্রতিদিন যেচে আর সেধে পরের বাড়ি থেকে নেমন্তন খেয়ে ফিরছেন।

আমার ঘরে চাল বাঁচছে, পয়সাও বাঁচছে, রান্নাবান্নার হাঙ্গামাও কমেছে, কিন্তু তবু তো ভাল লাগছে না। আমি বেঁচে আছি মরবার জন্যে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু বেঁচে রয়েছেন কিসের জন্য। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারি, এবং আগের মতো ভালবাসতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই।

আগে রাগ করেছি তাঁর ওপর, কিন্তু তবু এই রাগের মধ্যেই ভালবেসেছি আর ভয় করেছি, ঐ আদর্শবাদীর কঠিন মেরুদণ্ডটিকে। কষ্ট সহ্য করতে পারিনি যখন, তখনই শুধু অশ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু এখন······।

এখন আমার দিন যাচ্ছে এই ভাবেই। যখন স্বামী শুয়ে থাকেন ঘরের ভেতর, আর আমি বসে থাকি রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে, তখনো মনে হয় এ পৃথিবীতে আমি একা হয়ে গেছি, সব শূন্য হয়ে গেছে। আমার কপালে সিঁদুরের দাগ রয়েছে, কিন্তু মনেই পড়ে না যে আমার স্বামী, অর্থাৎ আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু আমার এত কাছে রয়েছেন। যে সান্নিধ্য পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করতাম একদিন, তার আর কোন মূল্য নেই। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে না তাঁর কাছে। শুনতে আপনাদের খুব খারাপ লাগবে তবু না বলে থাকতে পারছি না। সময় সময় মনে হয়, সত্যি আমার স্বামী নেই। এই তো আজ আবার বেশ বেলা করে ঘরে ফিরেছেন, এবং চৌকীর ওপর শুয়ে পান চিবোচ্ছেন আমার স্বামী। কিন্তু পরের বাড়ি গিয়ে যেচে ভাত খেয়ে, তার ওপর আবার পান খেয়ে ঘরে ফিরতে পারে, এমন একটা চরিত্রকে তো কখনো আমি আমার স্বামীর মধ্যে দেখিনি।

এই তো আমার জীবনের চেহারা—শূন্য হয়ে গিয়েও জলছি। আজ বুঝতে পারি, এতদিন অশ্রদ্ধা করেছিলাম আমার স্বামী নামে মানুষটিকে নয়, তাঁর আদর্শবাদকে। আজ তাঁর সেই নিষ্ঠুর আদর্শবাদ নেই, এবং স্বামীর ওপর খুশি

হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু কই, খুশি হওয়া দূরে থাক্‌, আমার স্বামী আছে বলেই মনে হয় না। এ কী ভয়ানক জ্বালা, নিজেকে ধিক্কার দিই, সইতে পারি না।

এতদিনে আমার স্বামীর অর্থাৎ আপনাদের আইডিয়্যালিস্ট চারুবাবুর মেরুদণ্ড ভেঙেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার এই দুঃখদীর্ণ ও অভিশপ্ত জীবনে যে একটা মাত্র অহংকার শেষ পর্যন্ত ছিল, তা'ও আজ চূর্ণ হয়ে গেছে। সালকিয়ার গলির এই জীর্ণশীর্ণ ও আলো-বাতাসহীন গৃহজীবনকেও সহ্য করেছি। আমার কোলের ওপর শুয়ে থেকেই ছেলে আমার চিরকালের মতো চোখ বন্ধ করলো—তা'ও সহ্য করেছি। আপনাদের আইডিয়্যালিস্ট চারুবাবু ছেঁড়া কামিজ গায়ে দিয়ে টিউশনি করতে বের হয়ে গেছেন, তা'ও সহ্য করেছি। সহ্য করতে কষ্ট হয়েছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারি না। এক এক সময় ভাবি—কেন ঘরে ফিরে আসেন আপনাদের চারুবাবু? পরের বাড়ির খাট-পালঙ্কে একটা ভাল বিছানার ওপর বেহায়া আরামে শুয়ে থাক্‌লেই তো পারেন। কেন আবার এই ছেঁড়া তোষকের ওপর ঐ বেহায়া শরীরকে শোয়াতে আসা?

দুই

চলছে দিন, যদিও এ'কে চলা বলে না। আজ বোধহয় শুক্লা নবমী। যদিও শ্রাবণ মাস, তবুও আকাশে ঘনঘটা নেই এবং সন্ধ্যেটাও এখনো শেষ হয়নি। রান্না-বান্না করিনি। উনি বাড়ি না আসা পর্যন্ত রান্না চড়াই না, কারণ, আজ-কাল আবার রাত্রি বেলাটাও কোথায় কোন ভক্তছাত্র, বড়লোক আত্মীয়, খুব চেনা বা অল্পচেনা বন্ধুর বাড়িতে এবং বলতে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে, শিয়ালদা ষ্টেশনে উদ্বাস্তদের রিলিফ শিবিরেও ঢুকে পড়ে এবং ভাত খেয়ে পরিতৃপ্ত মনে ঘরে ফেরেন। তাই সন্ধ্যা বেলাটা আমি আর রান্না চড়াই না। দু'মুঠো চাল-ডাল জলে ভিজিয়ে রাখি, আর হেঁসেলের চৌকাঠের কাছে বসে প্রেতিনীর মতো সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সেই ভেজানো চাল-ডাল চিবোই। কারণ আমাকে বাঁচতে হবে যতদিন না মরে যাই।

কলতলায় নবমীর চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। মনেও পড়েছে, আজকের দিনটা হলো আমাদের বিয়ের দিন। চৌকাঠের কাছে বসেছিলাম, কিন্তু মুহূর্তের মনের ভুলে যেন অন্য একটা পৃথিবীতে আর অন্য একটা যুগে চলে গেলাম। শ্রাবণের নবমী, চারদিকে ধূপ এবং চন্দনের গন্ধ, শাঁখও বাজছে। লোকের ভিড়। কত হাসি আর কলরব। উঠোনের ওপর আল্‌পনা। সমস্ত জগৎ সংসার আমাকে হুলুধ্বনি দিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটি সুন্দর মুখের

সামনে তুলে ধরলো। ধন্য হলাম, জীবন আমার অমৃতের স্পর্শ পেল সেই দু'টি স্মিত চক্ষুর দৃষ্টিতে।

শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন আপনাদের চারুবাবু। আমার দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কী অদ্ভুত শুকনো হাসিহীন ও প্রাণহীন একজোড়া চোখের দৃষ্টি—এ কি সেই চোখ? মুহূর্তের মধ্যে আমার শুক্লা নবমীর চাঁদ ঐ নোংরা কলতলায় আছাড় খেয়ে মরে গেল।

শুনতে পেলাম, এবং বুঝতে পারলাম, বমি করছেন স্বামী। শুনেছিলাম, বড়লোকের ছেলেরা রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে বমি করে। কেন করে তা'ও শুনেছিলাম। তবে কি স্বামী আমার আবার নতুন করে বড়লোক হলেন? আগেও তো বড়লোক ছিলেন, কিন্তু তখন তো এভাবে রাতের বেলা ঘরে ফিরে বমি করেননি।

যাই হোক্, কিছুই আশ্চর্য নয়। বড় লোকের এঁটো খেয়ে বাড়ি ফিরলেও বোধহয় বমি করতে হয়। কোথায় গিয়ে কি খেয়ে এসেছেন জানি না। হয় গুরুভোজন হয়েছে, নয় বড়লোকের এঁটো গেলাসের কোন ঘৃণ্য বস্তু পান করে এসেছেন।

—ললিতা! আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু ডাকলেন আমাকে।—বড় কষ্ট হচ্ছে ললিতা, একবার কাছে এস।

স্বামীর কথা শুনতে পেলাম, বমি করছেন আবার, তা'ও শুনতে পেলাম। কিন্তু মাপ করবেন আপনারা, আমার নির্মমতার কথা শুনে রাগ করবেন না, স্বামীর ডাক শুনেও আমি তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। প্রচণ্ড একটা ঘৃণা এসে আমার সব শক্তি বিবেচনা, কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান লুপ্ত করে দিল।

স্বামী নিজেই উঠলেন। কলতলায় গিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। জল তুলে নিয়ে এসে নিজেই ঝাঁটা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করলেন। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে রইলেন।

আমি শুয়ে রইলাম হেঁসেলের দাওয়ায়। আমি বুঝতে পারলাম, সত্যিই স্বামী নেই। একটা অপরিচিত পুরুষ এসে ঘরের ভেতর শুয়ে রয়েছে!

নিজের ওপরেও কম ঘেন্না হয়নি। ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের এই চোখ-মুখের ওপর এক শিশি অ্যাসিড ঢেলে দিই, কদর্য ও কুৎসিত হয়ে যাক্ ইহজীবনের মতো, কেউ যেন আর চিনতে না পারে ললিতাকে—বাপ-মা'র আদুরে মেয়ে আর আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর সেই প্রাণের জিনিস ললিতাকে।

তিন

আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর আদর্শ চুলোয় গেছে, আর ললিতার ভালবাসাও শ্মশানে গেছে। সালকিয়ার গলিতে একটা ঘরে থাকে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। এ ছাড়া আর আমাদের জীবনের অন্য কোন পরিচয় নেই।

এক এক সময় ভাবি, মরবো তো শীগ্‌গির, খুব বেশি দেরি নেই। শরীরের সমস্ত হাড়ে কিরকম একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে আজ মাস তিনেক হলো। অসহ্য ব্যথা, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা। যখন মূর্চ্ছা ভাঙে, তখন দেখি যে কলতলায় কিংবা উনোনের কাছে পড়ে আছি।

মরবো, একথাটা ভাবতে আনন্দ পাই না। কারণ যেভাবে মরলে হাসিমুখে মরতে পার্‌তাম, সে সুযোগ নেই। জীবনের সেই শুক্লা নবমীর প্রথম উৎসবের দিনটিতে, যেদিন আপনাদের চারুবাবুকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনও যদি একটি কথাও না বলে তাঁর চোখের সামনে মরে যেতাম, ভালই লাগতো বোধহয়। কিন্তু আজ আর তেমন সুখের মরণ কল্পনা করতেও পারি না। স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরবার সাধ আর নেই।

বোধহয়, খুব বেশি নিষ্ঠুরের কথার মতো শোনাচ্ছে আমার কথাগুলি। কিন্তু না বলে থাক্‌তে পারছি না। মরবো তো ঠিকই, কিন্তু মরবার সময় আপনাদের চারুবাবুকে কাছে পাব কি? কাছে থাকলেও তিনি আমার মাথাটা কোলে তুলে নেবেন কি? সবচেয়ে বড় ভয়, স্বামীর কোলে মাথা রাখতে আমার ভাল লাগবে কি?

আজ হাড়ের ব্যথাটা বড় বেশি বেড়েছে। স্বামী চলে গেছেন সকাল বেলায় টিউশনি করতে। আজ আর আমি রাঁধবো না, রান্না করার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই। আসল কথা হলো, রাঁধবার মতো আজ ঘরে কিছুই নেই, রেশন আনা হয়নি। স্বামীকে রেশন আনতে বলেছিলাম, তিনি বললেন—টাকা নেই। বলেই বের হয়ে গেলেন।

শুয়েছিলাম হেঁসেলের চৌকাঠের কাছে। বেলা হয়েছে। বাসনওয়ালা হাঁক দিয়ে নতুন বাসন ফিরি করতে বের হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি। কলতলায় কাকের দল মিছামিছি এসেছে, এককণা ভাতের দানাও কলতলায় নেই।

কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না। মুখের ওপর রোদ পড়তেই উঠে বসলাম। বুঝলাম, দুপুরও পার হয়ে গেছে। ভাবছি, স্নান কর্‌বো, খোঁপা ভেঙে চুল এলিয়ে

দিয়ে, গায়ের আঁচলটা নামিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে রোদের মধ্যে বসলাম তেলের বাটি নিয়ে।

হঠাৎ স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। চমকে উঠলাম। আঁচলটা গায়ে জড়াবারও সময় পেলাম না। রাগে গা জলে উঠলো। বলতে যাচ্ছিলাম—বের হও, এদিকে এস না এবং সত্যি সত্যি দু'চোখের দৃষ্টি বিষিয়ে নিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

স্বামী তাঁর কাঁধের ওপর থেকে ছেঁড়া চাদরটা তুলে নিয়ে দাওয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—কুসংস্কার, যত সব কুসংস্কার!

আমার মুখে যে ধিক্কারের ভাষাটা এসেছিল, সেটা আর বেজে উঠলো না। স্বামীর চিৎকারে বাধা পেলাম। কিন্তু কিসের কুসংস্কার?

স্বামীর চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকমের, মুখটা শুকনো, যেন একটা জ্বরের জ্বালায় ছটফট করছেন। চেঁচিয়ে বললেন—টাকা আছে?

শুনে ঘেন্না হলো। উত্তর দিলাম না। কিন্তু তিনি তেমনি চেঁচিয়ে বললেন—সোনা-টোনা কিছু আছে? মনে মনে হাসলাম। কথা বললাম না।

কতক্ষণ চুপ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম, তা জানি না। স্বামীও নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকটা সামনে থেকে এখনো সরে যাচ্ছে না, বিরক্ত হয়েই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

শিউরে উঠলাম। তাঁর দু'চোখে বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা চিক্‌চিক্ করছে। ঠিক এমনি ভাবেই তাকিয়েছিলেন তিনি সেদিন পল্টুর মুখের দিকে—যেদিন পল্টু নিষ্প্রাণ হয়ে আমার কোলের ওপর শুয়েছিল।

কথা বললাম। জিজ্ঞেসা করলাম—কি হয়েছে? স্বামীও কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কলতলায় গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিলেন।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, আপনাদের চারুবাবু এতদিন পরে আবার কাঁদেন কেন? কি এমন করুণ দৃশ্য দেখলেন যে ঐ চোখে আবার জল দেখা দিল? তবে কি তিনি এতদিন পরে দেখতে পেয়েছেন তাঁর ললিতাকে, তাঁর শুক্লা নবমীর চাঁদ আজ রোগজীর্ণ ক'খানা হাড় নিয়ে সালকিয়ার গলিতে স্যাঁৎ-সেঁতে ঘরের দাওয়ায় কিভাবে পড়ে আছে। কিন্তু আমি তো এখনো মরিনি, অমন করে জলভরা চোখে তাকাবার দরকার কি?

বোধহয় নিজের মনের দুর্বলতা আর মোহ নিয়ে বৃথা একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। স্বামী আমার একমুহূর্তেই সে স্বপ্ন ভেঙে দিলেন।

বললেন—কিছু টাকা যে আমার এখনই চাই।

—কত টাকা?

—অন্তত দশটাকা।

—নেই।

—কত আছে?

—এক টাকা।

—তাতে হবে না। আরও চাই।

—নিয়ে এস।

—কোথা থেকে আনবো?

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—নিয়ে এস ভিক্ষে করে কিংবা চুরি করে। কী এমন কঠিন কাজ!

আমার চিৎকারের প্রত্যুত্তরে চিৎকার করলেন না স্বামী। শান্তভাবেই বললেন—অন্তত আট-দশটা টাকা না হলে হয় না। কি উপায় হতে পারে বলো?

বললাম—ঐ যে পড়ে রয়েছে তোমার সম্পত্তি, বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এস। হেঁসেলের ভেতরে পেতল-কাঁসার থালা-ঘটি-বাটিগুলি দেখিয়ে দিলাম।

বাইরের রাস্তায় ঠিক সন্ধিক্ষণ বুঝে বাসনওয়ালাও হাঁক দিচ্ছিল। আপনাদের চারুবাবু আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে কতগুলি বাসন তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন এবং বাসনওয়ালার কাছে বেচে নিয়ে আটটা টাকা নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন।

সমস্ত ঘটনাটা একটা হেঁয়ালির মতো লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। আপনাদের চারুবাবুকে এতটা বিচলিত হতে, কিংবা চিৎকার করে কথা বলতে এর আগে আমি কখনো শুনিনি।

তিনিই এ হেঁয়ালি পরিষ্কার করে দিলেন। বললেন—যত সব কুসংস্কার। গিয়েছিলাম নীতুদের বাড়ি। কিন্তু দেখলাম নীতুদের বাড়িসুদ্ধ লোক উপোস করছে, কারণ আজ গান্ধীজীর মৃত্যুদিন। আজ ওদের বাড়িতে রান্নাবান্না কিছুই হয়নি। যত সব কুসংস্কার।

রহস্যটা এতক্ষণে স্বচ্ছ হলো। নীতু হলো আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর একজন ভক্তছাত্র। আজ টিউশনি সেরে নীতুদের বাড়িতে দুপুর বেলায় হাজির হয়েছিলেন। প্রতিদিন যে কৌশলে পরের বাড়ি খেয়ে ফেরেন, সেই কৌশলের সাধনা করতেই সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেখলেন, তাঁর আদর্শে

ও উপদেশে অনুপ্রাণিত নীতু আর নীতুর বাড়ির সবাই উপোস করে গান্ধী তিরোভাব দিবস পালন করছে। ব্যর্থ হয়ে, লোভী ও ক্ষুধার্ত আইডিয়ালিস্ট আজ ফিরে এসেছেন ঘরে। কিন্তু যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁকে খেতেই হবে, আজ আরও বেশী করে খাবেন। মানুষের কুসংস্কার আজ আর সহ্য করতে পারছেন না আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু। মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসে উপোর করা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি? নীতুদের সঙ্গে অনেক তর্ক করে ঘরে ফিরেছেন চারুবাবু। নীতুরাও একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে।

টাকার দরকার এই জন্যেই। চারুবাবু আজ আরও বেশি করে খাবেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজ মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর চোখে পাগলের দৃষ্টি, গায়ে যেন দুঃসহ জ্বরের জ্বালা এবং কথায় এক লোভী ও ক্ষুধার্ত জীবের ভয়ংকর কাতরানি।

স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে ঘেন্নায় চোখ জ্বলে উঠলো।

তিনি কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং ফিরে এলেন বাজার থেকে একগাদা খাদ্যবস্তু কিনে নিয়ে—মাছ, কপি, সন্দেশ, ছানা, রাবড়ি, দই, সরু চাল, সোনা মুগের ডাল।

ব্যস্তভাবে বললেন—তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও। আমি খেয়েই একবার বের হব। অনেক কাজ আছে।

বিধাতা যদি আজ এসে আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে এই হুকুম দিতেন—থালায় আর বাটিতে বিষ সাজিয়ে নিজের হাতে স্বামীকে খেতে দাও, তাহলেও বোধহয় সেকাজ এত কঠিন মনে হতো না, যত কঠিন মনে হচ্ছে এই মাছ আর কপি রেঁধে স্বামীকে খাওয়াতে। ধিক্ এ জীবন, ধিক্ আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর অদৃষ্ট!

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। উনুন ধরালাম, এবং আমিও মরিয়া হয়ে আজ রান্না করলাম। তিন রকম মাছের তরকারী, ছানার ডালনা, কপির বড়া এবং তরকারী, ভাজা পাঁচ রকম, ডাল রাঁধলাম তিন রকম।

রাঁধতে রাঁধতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। আলো জ্বাললাম। দেখলাম আপনাদের চারুবাবু কলতলায় স্নান করছেন।

রান্না শেষ হলো। ঘর ধুয়ে মুছে, শুকনো কাপড় দিয়ে আর একবার ভাল করে মেজেটা ঘষে দিয়ে, তারপর আসন পাতলাম। সব খাবার বাটিতে ও রেকাবিতে, এবং ভাতের একটা স্তূপ থালার ওপর সাজিয়ে রাখলাম।

প্রদীপটাকে এই ভুরিভোজের যজ্ঞক্ষেত্রের পাশে রেখে দিলাম।

তারপর ইচ্ছে করছিল, ঘর থেকে ছুটে বাইরে চলে যাই। আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু একটা ক্ষুধার জীবমাত্র হয়ে এই খাদ্য গিলে গিলে মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসটাকে হিংস্র বিদ্রূপে ব্যর্থ করছেন—এ দৃশ্য যেন আর দেখতে না হয়। কিন্তু কোথায় যাব? হাড়ের ব্যথা আমাকে পঙ্গু করে রেখেছে। মরতে হলে যেন এই দৃশ্য দেখার আগে এই দাওয়ার ওপরে নিঃশব্দে মরে যাই।,

বোধহয় আবার স্বপ্ন দেখছিলাম। যখন তন্দ্রা ভাঙলো, তখন বুঝলাম দাওয়ার ওপর শুয়ে আছি। রান্নাঘরের ভেতর প্রদীপটা তখনো মিটমিট করে জ্বলছে এবং সাজানো খাবার সবই পড়ে আছে। আপনাদের চারুবাবু এখনো খেতে আসেননি।

ওঘরের ভেতরেও আলো জ্বলছে বোঝা যায়, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ শোনা যায় না। কি জানি এতক্ষণ ধরে নীরবে ঘরের ভেতর বসে কি করছেন আপনাদের চারুবাবু?

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, রাত গভীর হয়েছে। সমস্ত গলিটাই নিঝুম হয়ে আছে। একটু পরেই পাশের তেতালা বাড়িতে দেয়াল-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো—রাত দু'টো।

সে কি? আপনাদের চারুবাবু কি তবে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন?

উঠলাম। ছোট উঠোনটা পার হয়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকালাম।

না, ঘুমিয়ে পড়েননি আপনাদের চারুবাবু। তিনি বসেছিলেন ঘরের মেজেতে একটা আসনের ওপর। তাঁর সম্মুখে একখানা গীতা খোলা পড়ে রয়েছে। ধীর স্থির একটা প্রশান্ত মূর্তি, এক মনে গভীর আগ্রহে এবং নিষ্পলক চক্ষে গীতা পড়ছেন।

চোখ দু'টি নিষ্পলক কিন্তু দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা চিক্ চিক্ করছে সেই দু'টি চোখের কোণে।

ভয়ে ভয়ে শুধু একবার বললাম—অনেক রাত হয়েছে, খেয়ে নাও।

আপনাদের চারুবাবু উঠলেন না, কোন উত্তর দিলেন না। গীতা বন্ধ করে আর চোখ মুছে বসে রইলেন।

তবে কি তিনি সত্যিই আজ উপোস করবেন, মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসের সম্মান রাখবেন? তবে এই ভয়ানক খাই-খাই কাণ্ড করলেন কেন?

একি নিজের হাতে নিজেরই আত্মার ওপর কশাঘাত? কিংবা জীবনের সবচেয়ে বেশি দুঃসহ দুঃখের সঙ্গে একটা পাগলামি? অথবা অভিমান, মা-মরা ছেলে-মানুষ যেমন মায়ের ওপর অভিমান করে?

শেষ পর্যন্ত উঠলেন না, খেলেনও না আপনাদের চারুবাবু। আজ ঘরে খাবার আছে, অনেক আছে এবং নানারকম আছে; অন্তত আজকের দিনটার মতো আছে, তবু খেলেন না। যা ছিল না, তাই এইভাবে আছে করে নিয়েছেন, নইলে বোধহয় উপোস করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

কাছে এগিয়ে গিয়ে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। আমাকে ওভাবে দেখে একটু যেন বিব্রতভাবে ভয়ে ভয়ে বললেন—কিছু মনে করো না। ঘরে খাবার না থাকলে সত্যি সত্যিই তো আর ব্রতের উপোস হয় না। তাই…।

হ্যাঁ তাই। আর তাঁকে কথা বলতে হয়নি, কারণ আমিই আর বলতে দিইনি। কারণ, দেখতে পেয়েছি এক অসহায় নিঃস্বের ভগ্নব্রত জীবনের জ্বালা কোথায় জ্বলছে।

তারপর কি হয়েছিল সব মনে নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, সে রাত্রি ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙেছিল। বুঝলাম, স্বামীর বুকের কাছে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ঘরের ভেতরে প্রদীপটা তখনো জ্বলছিল। মনে হলো, শুক্লা নবমীর চাঁদ থেকে একমুঠো আলো এসে পড়েছে আমার জীবনের বাসর-ঘরে। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম, ইনিই তো সেই।

সকাল হলে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। হেঁসেলে ঢুকতেই দেখলাম, বিড়ালে সব খাবার খেয়ে চলে গেছে।

তার পরের ঘটনাগুলি আপনাদের শোনাবার আর প্রয়োজন হবে না। আমি বেঁচে আছি মরবার জন্য, এবং বিশ্বাস করি স্বামীর কোলে মাথা রেখে যদি মরি, তবে সে মরণ বড় সুখেরই হবে।

অনধিকার প্রবেশ

বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু করে। সন্ধ্যা হতে না হতেই জমাট অন্ধকারের ছায়া নেমে এল সহরের বুকে। বাদলা হওয়ার দমক আসছে

হুহু করে দিগ্‌বিদিকের খেয়াল না রেখে, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছে পথচারীদের গায়ে। এমনি দিনে প্রিয়তোষ চলেছে হন হন করে একটা গলি দিয়ে। বর্ষারাতেও গলির মধ্যে চলেছে অবিরাম জনপ্রবাহ। ধাবমান জনতাকে পেয়ে বসেছে কি যেন একটা নেশার আমেজ। কত রকমের লোক, কে তার খবর রাখে অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়েছে গলির মর্যাদা। দিনের আলোয় সেখানে ডাক দিয়ে যায় বুড়ো ফিরিওয়ালা, ছন্দের টুং-টাং তোলে কালীঘাট-ফেরৎ রিকশাওয়ালা।

বাড়ীগুলির বড় বড় নম্বর অন্ধকারে বেশ দেখা যাচ্ছে। সারা দিনের উদাস গৃহবীথিকা জেগে উঠেছে আনন্দের প্রমত্ততায়। এগারো নম্বরে প্রিয়তোষ ঢুকে পড়ল। সঙ্কীর্ণ ঘরে নোংরা মাদুরবিছান মেজেতে বসে আছে একসার লোক। সামনের নড়বড়ে তক্তপোষে এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পেঁয়াজ কুচিয়ে চলেছে। একটা লোক সকলের ফরমাসমত গেলাস, পেঁয়াজ, মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা এগিয়ে দিচ্ছে। দলের সবাইকে চেনে প্রিয়তোষ। পুলিনবাবু পান-পাত্র হাতে স্থূলাঙ্গীর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। অতুলবাবু পা ছড়িয়ে বসে আছেন, মুখে বিদ্রূপের হাসি। মুখে চোখে বড়মানুষী ভাব—স্বতঃসিদ্ধ রায়। গা-ঘেঁসে বসে আছে গ্যাসমিস্ত্রী শিউশরণ আর জুটমিলের কুলী রমজান। যাঁরা লোকনিন্দার ভয় করেন, তাঁদের মুখ একবার জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভিড় কমলেই তাঁরা ঢুকবেন।

প্রিয়তোষ সফেন তাড়ির পাত্রে চুমুক দিচ্ছে একটু একটু করে। ঘর প্রায় খালি, মাঝে মাঝে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আধখোলা দরজা দিয়ে এসে সকলের ঝিমিয়েপড়া উৎসাহকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। রমজান মিয়া মিষ্টিগলায় গান ধরেছে,—'মেহেরবাণী হুস্‌ন্‌কী নয়াজোয়ানী দেখ্‌ কর।' গেলাস হাতে প্রিয়তোষ চোখ বুঁজে স্বপ্ন দেখছে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে সারি সারি রুক্ষমূর্তি খেজুর গাছ, তাদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রস।
—বাবুজী!

ঘরের বাইরে চাপাগলার আওয়াজে প্রিয়তোষের চমক ভাঙল। ভিতরে তখন দু'একজন মাত্র রয়েছে। স্থূলাঙ্গী নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

মিনতিভরা কণ্ঠে আবার শোনা গেল,—বাবুজী, বাবুজী! বিষণের ডাক প্রিয়তোষকে ফিরিয়ে আনল স্বপ্নের আবর্ত থেকে; সন্তর্পণে দরজা খুলে সে বাইরে এল। গলির দুপাশের বাড়িগুলি অন্ধকারে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সন্ধ্যা-বেলার হঠাৎ-জেগে-ওঠা প্রাণ রাত্রির গভীরতার সঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

অন্ধকারে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে বিষণের দীর্ঘ মূর্তি। কালি চাঁদের মতো গলির মোড়ে রাস্তার বাতিটা ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। বিষণ আর প্রিয়তোষ চলেছে সেই দিকে—অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠেছে তারা।

সে'রাতে অন্ধকারের ঢেউ যেন সহরের বুকে কালির বন্যা বইয়ে দিল। ঘন মেঘের পর্দা ধীরে ধীরে যেন নেমে আসছে পৃথিবীকে ঢেকে দিতে। জনহীন রাজপথগুলি অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে অসাড়ে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে পথের ঠিকানা যেন থেকে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ চলেছে অন্ধের মতো বিশ্বজগৎকে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে। তালুকদার বাবুদের দেউড়ীতে একটার ঘণ্টা বেজে গেল। তাদের পথচলা যেখানে শেষ হল, সেখানে তখন শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ। দু'তিনখানা অ্যাম্বুলেন্স-কার দাঁড়িয়ে আছে, কুলিরা একটার পর একটা মুমূর্ষু লোক এনে গাদাগাদি করে রাখছে তার মধ্যে। একটা উগ্র ভাপসা গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নাকে এসে লাগছে।

নোংরা বস্তি। তরকারীর খোসা আর ভাতের ফ্যান চারদিকে ছড়ান তার সঙ্গে কিছু কিছু ইঁদুরের নাড়ীভুড়ি। বাড়িওয়ালা ট্যাক্‌স্ দেয় বটে, কিন্তু ধাঙড়, মেথররা নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে সপ্তাহে এক-একদিন পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। বস্তির বাসিন্দা সকলেই সামান্য চাকুরে। সুশীলবাবু ছাপাখানায় কাজ করেন। গৌরবাবু কাজ করেন মাড়োয়ারীর গদিতে। ফটিকবাবু স্কুলে মাষ্টারি করেন। এছাড়া পরাণবাবু, হৃদয়বাবু, শীতলবাবু,—তিনজনেই ষ্টেশনে হকারি করেন। মা ষষ্ঠীর কৃপা সকলের ঘরেই আছে। সাত-সিকে ভাড়ার আলোকবাতাসহীন ঘরে স্বামীস্ত্রী পাঁচ-সাতটি ছেলে মেয়েতে কোন রকমে রাতকাটান মাত্র হয়। মেয়েদের বিয়ে হয় না। আট হাত সরু-পাড় কাপড় পরে, মা-বাপের কড়া শাসনে তারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই বাইরে আসে, ছেলেদের দিকে তাকায় আর হাসে। ছেলেরা কোরা-ধুতির ওপর নতুনকেনা পাঞ্জাবী চড়িয়ে ঘাড় ছেঁটে বাপের ভয়ে কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে যায়; বিকেল না হতেই ফিরে এসে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে।

বস্তির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরে থাকে প্রিয়তোষ। আড়াইটাকা ভাড়ার ঘরটিতে দরজা ছাড়াও দুটি জানালা আছে। প্রিয়তোষের পেশা গল্পলেখা। জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তার লেখাকে দিয়েছে এক অসহ্য সম্পদ। সে লেখার মধ্যে প্রেমের চিহ্ন নেই।

বিষণ কোথা থেকে এসে জুটেছে প্রিয়তোষের সঙ্গে। একচোখ কাণা,

সারামুখে বসন্তের দাগ, বুড়োকে দেখে তার মায়া হয়েছিল। তখন থেকে তার হাতেই সে তুলে দিয়েছে সংসারের ভার। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল নেই। মাঝে মাঝে ফটিকবাবু আসেন খোঁজখবর নিতে। যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ শুরু হলে জিনিসপত্রের চড়া দামে এসে থেমে যায়। ফটিকবাবু বলেন, বস্তির পাট এবার উঠল ভায়া। বোমার ভয় আমার নেই। না খেয়ে শুকিয়ে মরাকেই আমার যত ভয়। আটটা বাজলেই তিনি বিদায় নেন। অন্ধকারে তাঁর শীর্ণ অভাবমলিন মূর্তি মিলিয়ে যায়, প্রিয়তোষ একদৃষ্টে সে দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুপুরবেলা বস্তির গোলমাল অনেকটা থেমে যায়। ছেলেমেয়েদের বাপেরা ধুঁকতে ধুঁকতে কাজে বেরিয়ে যায়, অকালবার্দ্ধক্যে শীর্ণ মায়েরা ব্যবহারজীর্ণ যন্ত্রের মতো একটার পর একটা সংসারের কাজ করে যায়। বড় মেয়েরা অন্ধকার ঘরের কোণে বসে ভয়ে ভয়ে অঙ্গের স্বাস্থ্য খুঁজে খুঁজে দেখে, ছোট ছেলেরা কলতলায় কাক তাড়ায়—খেলা করে।

আড়াইটাকার ঘরে বসে প্রিয়তোষ গল্প লেখে—তাদের বিষয়ে, যারা আড়াইকোটি টাকার মালিক, যারা প্রভুত্ব করে আড়াই লক্ষ লোকের ওপর। লিখতে লিখতে বিকেল হয়ে যায়, সে মুখ তুলে দেখে গৌরবাবুর মেয়েটা মিছামিছি হেসে চলে যাচ্ছে।

আজ রাতের ব্যাপার প্রকাশ পেল বিষণের মুখ থেকে। পরানবাবু সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরছেন কাজ সেরে। বস্তির কাছাকাছি একটা অন্ধকার গলিতে বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই তিনি দেখলেন—অদূরে গ্যাসপোষ্টের আড়ালে কারা লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বীরত্ব দেখাবার এমন সুযোগ পরাণবাবু ছাড়লেন না। হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হতেই কে একজন সবেগে উধাও হয়ে গেল। আর একটা কাঠি জ্বালাতেই থামের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া বেপথুমতী বেলাকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। ডুরে শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ পরা, চোখে কাজল, পরিপাটী করে খোঁপা বাঁধা—আমতলা বস্তির গৌর সিংহীর মেয়ে বেলাকে আর চেনা যায় না।

পরাণবাবুর সঙ্গে বেলা তো বাড়ি ফিরল। তার অভিসাররাত্রির সঙ্গী শীতলবাবুর ছেলে গণেশ অন্ধকারে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। রাত দশটায় মাড়োয়ারীর কবলমুক্ত গৌরবাবু বাড়ি এসে হাঁপানিজীর্ণ দেহে যেন নতুন শক্তি ফিরে পেলেন। মেয়েকে ঘা'কতক দিয়ে তিনি দমকলের মতো সবেগে গালাগালির তোড় ছাড়লেন শীতলবাবুর উদ্দেশে। শীতলবাবুও নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র নন।

তাঁর সোণার চাঁদ ছেলে নিরপরাধ। গৌরের মেয়ে শীঘ্রই বাজার তুলবে, এই সদম্ভ উক্তি তিনি করাতে একটা হাতাহাতির সূত্রপাত হয়। বস্তির বাসিন্দারাও কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করলেন। হাতাহাতি, ক্রমে লাঠি দা নিয়ে মারামারিতে পরিণত হল। খবর পেয়ে অবিলম্বে ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স-কার সুশীলবাবুরা সদলে যাত্রা করলেন হাসপাতালের দিকে।

সকলের অলক্ষ্যে প্রিয়তোষ তার নিজের ঘরে ফিরে এল। একটু পরে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই ভাঙা কাঁসার মতো ঝগড়াটে গলার শব্দে সে চমকে উঠল। সে শব্দে মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকারটাও যেন খান্ খান্ হয়ে গেল। সুশীলবাবুর স্ত্রী সূতিকা জরে ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়েছেন, পরাণবাবুর স্ত্রী দুবছর থেকে ভুগছেন হার্টের অসুখে, শীতলবাবুর স্ত্রীর ফুসফুসে ক্ষয় ধরেছে। আজ রাতে কর্তাদের রণতাণ্ডব তাঁদের চিত্তেও এনে দিয়েছে কুৎসিত এক কলহের প্রেরণা।

লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোর সামনে বসে লিখছে প্রিয়তোষ। বস্তির গৃহিণীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রস্থান করেছেন। গৌরবাবুর মেয়ের কান্না থেমে গেছে। লেখা থামিয়ে প্রিয়তোষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, কখন ভোরের আলো ফুটবে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ, এঞ্জিনের বাঁশী আর রিকশার টুং-টাং। ভোরের আলোয় দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রিয়তোষ স্বপ্ন দেখছে, বেলা শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, পরনে ডুরে শাড়ী, পরিপাটী করে খোঁপা বাঁধা।

এক একটা দিন করে বর্ষা কেটে গেল। আকাশের মেঘল ভাব কেটে গিয়ে নতুন রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমতলা বস্তির নোংরা আবহাওয়ার ওপরেও শরতের সোণালী হাসির ছায়া পড়ল। বিবর্ণ খোলার চালে মেঘমুক্ত আকাশের নির্মল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, পাশের ডোবাটাতে ব্যাঙের একটানা ডাক গেছে থেমে। বস্তির প্রাণীদের বেসুরো জীবনেও যেন কার সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে। প্রায়ই দেখা যায় ফটিকবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে গুণ্ গুণ্ করছেন, সুশীলবাবু কাজে যাচ্ছেন একটা টপ্পা গাইতে গাইতে। গৃহিণীদের রুক্ষ মুখেও প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠেছে।

এই কুড়িয়ে-পাওয়া আনন্দের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না কেবল গৌর বাবু। একদিন কাজ থেকে ফিরে প্রবল কাশির দমকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বিত্তহীনের ঘরে মরবার দিনেও ডাক্তার ডাকার কথা সহজে কারও মনে হয় না, ফিট্ হওয়া তো একটা সামান্য ব্যাপার। সাবিত্রী মেয়ে বেলাকে

ডেকে দিলেন বাপের মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করতে, জ্ঞান হলে রান্না তৈরী না দেখলে ক্ষুধার্ত স্বামী অনর্থ ঘটাবেন।

বেলা হাওয়া করছে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ; মুদিতনেত্র গৌরবাবু নিঃশ্বাস ফেলছেন ধীরে ধীরে। ঘরের মধ্যে কুপী জ্বলছে, তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই হয়েছে বেশী। সুশীলবাবুরা ঘরের মধ্যে ভিড় করে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করছেন। হৃদয়বাবু ছেলেবেলা স্বাস্থ্যরক্ষা পড়েছিলেন, বললেন,—ব্লটিং কাগজের ধোঁয়া গৌরের নাকে দাও! পরাণবাবু নাড়ী দেখে বললেন, অবস্থা ভাল নয়, গলির মোড়ে জ্ঞান কবরেজকে ডাকতে পাঠাও। ঘরের এককোণে সাবিত্রীর চাপাকান্না শোনা যাচ্ছে। অভুক্তভোগীরা নিম্নগলায় আশ্বাস দিচ্ছে। সুশীলবাবুর স্ত্রী বেলাকে দেখিয়ে বললেন,—ওই ডাইনীর জন্যই বাপের প্রাণটা গেল। রোগী দেখে প্রিয়তোষ কিন্তু চমকে উঠল। তার সাড়া পেয়ে বেলা মাথা নীচু করে আরও জোরে হাওয়া করতে লাগল। বিষণকে নিয়ে প্রিয়তোষ ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

মাঝরাতে ডাক্তার পাওয়া শক্ত ব্যাপার। অনেক সাধ্যসাধনার পর এক নামকরা ডাক্তার আসতে রাজী হল। দক্ষিণা পঁচাশী টাকা। চৌষট্টি টাকা ফি-এর ওপর রাতের মজুরী ষোল টাকা বেশী, আর পেট্রোল খরচ পাঁচ টাকা। ডাক্তার বললেন - একশ টাকার কমে রাতে আমি নড়ি না মশায়, গরীব বলেই দিলাম কিছু ছেড়ে। টাকাটা যেন মারা না যায় দেখবেন। বস্তির লোকদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না।

ভিজিটের বহর শুনে প্রিয়তোষের মনটা একবার শঙ্কিত হয়ে উঠলেও সে তখনি সামলে নিল! তার মায়ের দু'একখানা হালকা গহনা তার কাছে তখনও আছে, ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাঁর আশীর্বাদ।

প্রিয়তোষ যা সন্দেহ করেছিল তাই হল। ডাক্তার বললে,—সন্ন্যাস, এ রোগ সারবার নয়। প্রিয়তোষবাবু, আপনি আমাকে অনর্থক ট্রাব্‌ল দিলেন। রোগ সারাতে না পারলেও টাকাটা গুনে নিতে ডাক্তার একটুও ইতস্ততঃ করল না। তার বিদায় নেওয়ার ঘণ্টাচারেকের মধ্যেই গৌরবাবুর মৃতদেহ নিয়ে সুশীলবাবুরা বেরিয়ে গেলেন।

গৌরবাবুর মৃত্যুতে বস্তির ওপর দিয়ে যেন একটা আচমকা আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল। কেবল শীতলবাবু শত্রুনিপাতে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে থেমে গেলেন, কারণ এক মাস পরেই তাঁর স্ত্রী শ্মশান যাত্রা করলেন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। দুঃখময় সংসার চালনার ভারী যবনিকা ধীরে ধীরে

নেমে এল তাঁর বিস্ময়াহত দৃষ্টির সম্মুখে।

অলস মধ্যাহ্নের মতো ম্লান জড়তা এসে আচ্ছন্ন করেছে প্রিয়তোষকে। এখন বেশীর ভাগ সময়ই সে ঘরে বসে আনমনে কাটায়। এগারো নম্বরে যেতে ভাল লাগে না। স্থূলাঙ্গীর স্থূল রসিকতা, নাকীসুরে আপ্যায়ন তাকে আর প্রলুব্ধ করে না। সন্ধ্যার একটু আগেই বস্তি ছাড়িয়ে দূরে পার্কে গিয়ে সে শুয়ে থাকে পামগাছের নীচে। চানাচুরওয়ালা হাঁক দিয়ে যায়, ভিখারী ছেলেমেয়ের গলাভাঙা গান কানে আসে। পার্কের ভিতর লাল সুরকীঢালা চওড়া রাস্তা, হাস্যকোলাহলে মুখর করে চলেছে সন্ধ্যা-বিহারিণী ভদ্রবাড়ীর মেয়েরা। পশ্চিম আকাশের লাল রং এসে লুটিয়ে পড়েছে তাদের বিচিত্র শাড়ীর গায়ে। প্রিয়তোষ ভাবে রামবাবুর মেয়ে সরু-পাড় মোটা শাড়ী পরে এখন হয়ত রান্না চড়িয়েছে, আট হাত শাড়ী পরে বেলা হয়ত কলে জল ধরছে, ভিখিরি মেয়েগুলি এতক্ষণে উনুনে চাল ফুটিয়ে নিচ্ছে।

ঘরে এসে সারারাত প্রিয়তোষের কলম আর থামে না। বিষণ অনুযোগ করে, বলে,—এইবার বহুমাকে নিয়ে এস বাবুজী, আমি একলা আর পারি না। প্রিয়তোষ হাসে, কলম কিন্তু থামে না। খোলা জানালা দিয়ে শিশিরভেজা হাওয়া আসে। লেখা থামিয়ে এক একবার সে প্রাণভরে নিশ্বাস নেয়, আর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার বস্তির প্রাঙ্গণে রুক্ষচুলেভরা করুণ মুখ হাওয়ায় ভেসে উঠছে না? প্রিয়তোষ অনুভব করে বেলা তার দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে।

যে উদ্যম একদিন তাকে জীবনের পথে উৎসাহী পথচারী করে তুলেছিল, তার যেন সমাধি হয়ে আসছে। জগতের সবত্র চলেছে সেই একই আহ্বান আর প্রত্যাখ্যান, দুরাশা আর আশাভঙ্গের অর্থহীন খেলা।

বস্তির ঘরখানি হয়ে উঠল তার শেষ আশ্রয়। সেখানে সে একটানা লিখে চলে তার নতুন লেখা, যা তার জীবনে কোনদিনই প্রকাশিত হবে না। শরতের মধ্যাহ্ন উত্তাপে প্রখর হয়ে ওঠে, একটা বাজতেই জুটমিলের বাঁশীর আর্তনাদ শোনা যায়। প্রিয়তোষ গৌরবাবুদের দরজায় চুপি চুপি ধাক্কা দেয়।

দরজা খুলে দেয় বেলা। সাবিত্রী বলেন,—এস বাবা। আসবাবহীন ঘর, প্রিয়তোষ বসে একটা পিঁড়ি টেনে। বেলার কাজ শেষ হয়নি তখনও। ঝেড়ে মুছে ঘরটিকে সে তকতকে করে তোলে। লজ্জা, হাসি, অভিমান খেলা করে তার মুখে। প্রিয়তোষ কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল সাবিত্রীর হাতে

দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যায়।

বস্তির বাসিন্দাদের জীবন চলেছে একটানা গ্লানির টানে। মাঝে মাঝে সে তাল ভঙ্গ হয় গৌরবাবুর স্ত্রীর আর্তবিলাপে, শীতলবাবুর সকরুণ আত্ম-অনুযোগে। নিরুদ্দিষ্ট গণেশের সন্ধান মেলেনি আজও। শোকাতুর পিতার কটূক্তি বর্ষিত হয় পরাণবাবুর উদ্দেশে।

প্রিয়তোষের সবচেয়ে ভাল লাগে ফটিকবাবুকে। পঁচিশ টাকা স্কুলের মাইনে ও টিউশনির দশ টাকায় নির্ভর করে তিনি তাঁর নিজের ও গৌরবাবুর সংসারের ভার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আড়াই টাকা মাইনেতে একটি একটি করে চারটি ছেলে পড়াতে হয় তাঁকে। চার বাড়িতে বিদ্যার সঙ্গে তাঁর শরীরের রক্তটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। সকল কষ্ট সহ্য করেন তিনি হাসিমুখে, দুঃখের চাকায় নিষ্পেষিত হয়েও তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে এক কপট সুখের প্রসন্নতা।

অসামাজিক প্রিয়তোষ গৌরবাবুদের ঘরে যাতায়াত করে—সুশীলবাবুরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। শীতলবাবু সব ভুলে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন, গৌরের মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। প্রাঙ্গণে বিচার সভা বসলো সুশীলবাবুর নেতৃত্বে। প্রিয়তোষের বিরুদ্ধে দু'দফা অভিযোগ আনলেন শীতলবাবু ;—সে মদ খায় ও গৌরের মেয়ের সঙ্গে তার রহস্যময় সম্বন্ধ। পরাণবাবু বললেন,—গৌরের মেয়ে আজকাল চওড়াপাড় শাড়ী পরছে, গায়ে জামা থাকে সব সময়। হৃদয়বাবু সাবিত্রীর ঘরের দিকে তাকিয়ে চড়ানগলায় মন্তব্য করলেন,—আমরা বেঁচে থাকতে চোখের সামনে কোন কুকাণ্ড বরদাস্ত করবো না। ভাবের আতিশয্যে তাঁর ফিরিকরা সাধা গলাও হঠাৎ বাধা পেয়ে গেল। প্রতিবাদ করলেন শুধু ফটিকবাবু, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ স্বর সমবেত কণ্ঠের ধমকে মিশে গেল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রিয়তোষ অস্বীকার করল না। বেলার সঙ্গে তার জীবনের অনুভূতির ফুল একে একে ফুটে উঠছে। সে কেমন করে অস্বীকার করবে? সে সত্যকে আমতলা বস্তির সামাজিক হুঙ্কারে কিছুতেই নামিয়ে অপমানিত হতে দেবে না। আবেগে প্রিয়তোষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

বস্তির বৈঠক রায় দিল,—প্রিয়তোষকে অবিলম্বে বস্তি ত্যাগ করতে হবে। নিজের ঘরে বসে তখন সে লিখে চলেছে তার নতুন লেখা একমনে।

ক্রুদ্ধ বিষণ্ণ তার পাশে বসে বলে,—রাতের অন্ধকার গাঢ় হলে ঝকঝকে দামী মোটর এসে লাগে বস্তির গায়ে। সুশীলবাবু আর শীতলবাবুর মেয়েরা দামী পোষাক পরে মোটরে বসে। অনেক রাতে তারা ফিরে আসে নোটের তাড়া

হাতে নিয়ে।

প্রিয়তোষের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল না। সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাঙনের যে ইতিহাস গড়ে উঠছে, তার প্রতিরোধ কেউ করতে পারবে না। সে তো উপলক্ষ্যমাত্র। সকল বিধিনিষেধের অর্গল ভেঙে বেরিয়ে পড়বে নতুন দিনের নতুন লোক। বাংলাদেশের লেখক প্রিয়তোষ, শুধু লেখে—লিখে লিখেই ফুরিয়ে যায়।

বিদায়ের দিন মধ্যাহ্নে বেলার চোখের দৃষ্টি জানালার ফাঁক দিয়ে অভিনন্দিত করল প্রিয়তোষকে। সুশীলবাবুরা তার গৃহত্যাগ উপলক্ষ্যে একযোগে কাজ কামাই করে গৌরবাবুর ঘর পাহারা দিচ্ছেন। হেমন্তের পড়ন্ত রোদ লুটিয়ে পড়ল দূর মিলের চিমনীর গায়ে, ন্যাড়া বেলগাছটার আগায়। বিষণের সঙ্গে চললো প্রিয়তোষ আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে।

বেলার দৃষ্টি একান্তভাবে তার মনের মানুষের মূর্তিটিকে শেষবারের মতো খুঁজছিল। ভাগ্যিস বেলা জানে না যে প্রিয়তোষ লেখক মাত্র ; মানুষ নয়। জীবনের আহ্বানের সম্মুখে যারা তাদের পৌরুষের ওপর ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ে। ওরা শুধু লেখে—জীবন ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় বলেই ওরা লেখক।

গ্রা ম - য মু না

কত রকমের পরব ও উৎসব আছে কিন্তু হোলির মতো কোনটি নয়। চম্পুগাঁয়ের চামারেরা একথা ভাল করে জানে।

ক'মাস আগেই গেছে নাগপঞ্চমী ; সকাল থেকে মেয়েরা ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করেছে। দেয়ালগুলি নতুন করে গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে, চূণ গুলে বড় বড় সাপের মূর্তি এঁকেছে তার ওপর। প্রায় সারা গাঁয়ের নরনারী শিশু পাতকুয়োগুলির কাছে ভীড় করে স্নান করেছে, মাটির তেলাইয়ে সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে ও দুধে পূর্ণ করে ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছে। সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে শ্রীনাগের সেই নৈবেদ্যের সামনে। বাস্তু সাপের গর্তে ভাত ঢেলে দিয়েছে তারা। সারাদিন মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গান গেয়ে শ্রীনাগের কৃপা প্রার্থনা করেছে। খয়ের গাছের ডাল দিয়ে ঘরের চারদিকে গণ্ডী দেগে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কোন সাপ সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করে তাদের সুখের নীড়ে বিষ ছড়াতে আসবে না।

তারপর সন্ধ্যেও হলো, চম্পুগাঁয়ে ভরাবর্ষার মেঘের ঘটা অন্ধকার ঘনিয়ে আনলো। বর্ষণে প্লাবনে ছোট্ট চম্পুগাঁ যেন গলে যাচ্ছে। অদূরে ফল্গুর বুকে

ঢল নেমেছে—জলের তোড়ের গোঙানি শোনা যায়। তবু সেবক মাহাতোর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জলে ওঠে—ঢোলের শব্দ গুমরে ওঠে। পানভোজন আর হাসিখুসীর কলরব, নাগপঞ্চমীর উৎসবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ কাজরি গায়। মেয়েরা দলবেঁধে গান করে।

উৎসবে গাঁয়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত। শুধু আসেনি সাধু চামার। তাকে কেউ আসতেও আহ্বান অনুরোধ করেনি।

সাধুকে এইভাবে গাঁয়ের সবাই মিলে শাস্তি দিয়ে আসছে, আজ এক বছর ধরে। দোষ সাধুরই বলতে হবে।

সেবক মাহাতোর মেয়ে রূপা। সকালবেলা বিলে হাঁস ছাড়তে যায়, আর স্নান করে ফিরে আসে। সাধু চামার বিলের ধারে ঘুরঘুর করে; হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর একদিন কথাটা বলেই ফেললো সাধু।—রূপা আমার কথাটা কিছু ভাবছিস্ না?

এর পর আর তাকে মাপ করা যায় না। বয়সে রূপার চেয়ে ছোট হয়েও এত সাহস পায় কোথা থেকে? সাধুকে একরকম একঘরে করেই রাখা হয়েছে।

সেবক মাহাতো সাধুকে অনেকবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—আমার মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। তুমি এসব নিয়ে আর আলোচনা করো না। বার বার জিদ করতে এস না।

রূপা দেখতে না হয় খুবই ভাল, কিন্তু সাধুর সঙ্গে বিয়ে দিতে দোষটা কি?

দোষ—রূপার ইচ্ছেটা। আগে রূপা একরকম রাজীই ছিল। জিজ্ঞাসা করলে লজ্জা পেয়ে হাসতো, হাঁ-না কিছুই বলতে পারতো না। কিন্তু রূপা স্টেশনের হাসপাতালে কাজ পেয়েছে—মেয়েদের ওয়ার্ডের জমাদারণী। এই চাকরী জোটার সঙ্গে সঙ্গে রূপার সাজসজ্জা আর মনটা বোধহয় চম্পুগাঁয়ের মেটে বাড়িগুলির সঙ্গে আর খাপ খাচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে হয়েও, গ্রাম-যমুনার ডাক যেন ভুলতে বসেছে রূপা।

গাঁয়ের অনেকে রূপার ওপর ও সেই সঙ্গে সেবক মাহাতোর ওপর খুব বেশী প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু মাহাতোর টাকার জোর আছে—পূজো পার্বণে সেবকের উদারতাই গাঁয়ের আনন্দোৎসবের একমাত্র আশ্রয়। আর সাধু যদিও কারিগর মাত্র, কিন্তু খেটে খায়—বয়স আছে শরীরও আছে। ও যদি রাজী হয়, তবে চম্পুগাঁয়ের যে কোন মেয়ের বাপ খুশী হয়ে ওকে জামাই করতে রাজী আছে। কিন্তু সাধুর রোখ ওই একদিকে—রূপা।

মেয়েরা মনে মনে জলে। গাঁয়ের বাতাসে রূপার নামে দু'একটা বদনামের

কথাও মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেবক মাহাতোর প্রতিপত্তি কেউ ভুলতে পারে না।

গাঁয়ের অনেকে তাই সাধুর ওপরে চটা। ঠিক হয়েছে, এইভাবে শুধু হা-হুতাশ করে আর সেবক মহাতোর কাছে অপমান খেয়ে ওর দিন কেটে যাক্।

রূপা নিজেকে গাঁয়ের অন্য মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন রকম ভাবে এবং ভিন্ন করে রাখে। সকলের সঙ্গে এক হয়ে সরলভাবে মিশতে পারে না। মেয়েরা আজও একবার রূপাকে গাইতে ডাকলো; রূপা বললো—না, ওসব ভাল লাগে না আমার।

সভা ভাঙলে সবাই চলে যায়। তখন অন্ধকারে কাদাজলের ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে একটি মানুষ সেবক মাহাতোর ঘরে এসে ওঠে। সাধুকে দেখে মাহাতোর নেশাড়ে মেজাজ জ্বলে ওঠে।—এবার তুমি মার খাবে আমার হাতে।

সাধু তবু মিনতি করে বলে যায়; মাহাতো নিজের গর্জনে কিছু শুনতে পায় না। রূপা ঘরের ভেতর থেকে সব শোনে।

দশহরা উৎসব। শরতের নতুন আলোর সঙ্গে ক্ষেতের মাটিতে আর তৃণে শস্যে নতুন প্রাণের রঙ লাগে। গাঁয়ের সকলে শোভাযাত্রা করে বার হয়। মেয়েরা যে-যার ভাল সাজটি পরে নেয়। আগে আগে পুরুষেরা ঢোল বাজিয়ে চলে, পেছনে মেয়েরা একটানা অবিরাম গেয়ে চলে। সবচেয়ে আগে থাকে প্রকাণ্ড রঙীন-পাগড়ী মাথায় ও লাঠি হাতে সেবক মাহাতো, রূপাও থাকে শোভাযাত্রার সঙ্গে! ঠিক সঙ্গে নয়, সকলের পেছনে একটু সরে, একা একা। এক বাঙালী জমিদারবাবুর বাড়ি প্রতিমা দেখে, মেলা ঘুরে ওরা আবার ফিরে আসে গাঁয়ে। সেবক মাহাতোর ঘরে পান-ভোজন চলে।

সাধুকে কেউ ডাকে না। এক-একটি পরব আসে, গাঁয়ের হৃদয়টার যেন কপাট খুলে যায়। সবাই সবাইকে ডাকে। সমস্ত দিনটা যেন লোকের মন থেকে রাগ হিংসার ধুলো ঝরে পড়ে যায়। সবাই সৌহার্দ্যের আনন্দে চঞ্চল। লোকের অহঙ্কারের বেড়াগুলি এই সময় একটু আল্গা থাকে। সাধু ঠিক এই পরবের দিনগুলিতেই সাহস করে তার আবেদন নিয়ে আসে সেবক মাহাতোর কাছে। শুধু সেবক নয়, গাঁয়ের আরও দু-চারজন বয়স্কদের কাছে সে তার বেদনা ও বক্তব্য বুঝিয়ে বলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। সবাই বলে—এরকম দেওয়ানা হয়ে গেলে কেন ছোকরা? যেখানে আমল পাবে না, সেইখানে ভিড়বার এত জিদ কেন?

দশহরার রাতে সেবক মাহাতোর ঘরে সাধু আবার এল। সেবক অন্যদিনের মতো আর তেমন বকাবকি করলো না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা তেমনি সরল ও স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিল।—দেখ সাধু, তুমি লোক ভাল জানি; কিন্তু পয়সাও তো একটা ইজ্জৎ। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে সেইজন্য হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি তোমার কিছু ক্ষেতজোত থাকতো, তবে না হয়……।

সাধু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চলে গেল। রূপা ঘরের কপাট একটু ফাঁক করে দেখছিল ও দুজনের কথাগুলি সবই শুনছিল।

দেয়ালির উৎসবও এসে গেল। আবার ঘরদোর নিকিয়ে তকতকে করা হয়েছে। এ মাসেই রূপার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে। আজ সে নিজে হাতে প্রদীপ সাজালো ঘরের চারদিকে। সন্ধ্যে হতেই উঠোনে একটা আগুনের কুণ্ড করে রাখলো—ভাঁড়ে করে জল রেখে দিল পাশে। মাঝরাত্রে প্রেতাত্মারা আসবে নিজের নিজের পুরানো ঘরে। জল খেয়ে তৃপ্ত হবে।

রাত্রি হতেই সেবক মাহাতোর ঘরের দাওয়ায় জুয়া আর মদের হুল্লোড় মেতে উঠলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চললো উৎসব। সকলে চলে যাবার পর সেবক নিজেও ঘরের ভেতর চললো। উঠোনের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চমকে উঠলো—কে ?

যে-মূর্তিটা এগিয়ে এল সে আর কেউ নয়, স্বয়ং সাধু। সেবক যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে উঠলো—টাঙিটা দেতো রূপা, আজ ওর সব সখ ঘুচিয়ে দেব।

রূপা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু টাঙি হাতে নিয়ে নয়। একটা মোড়া নিয়ে এসে মাহাতোর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো—নাও, বসে কথা বলো।

মাহাতো বসে নিয়ে শান্ত হলো। সাধুর সেই পুরানো কথা—একটানা বলে চলেছে। মাহাতো শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়ছে। রূপা আজ আর ঘরের ভেতরে যায়নি—একটু দূরে দাঁড়িয়েই সব শুনে গেল।

মাহাতো হঠাৎ সচকিত হয়ে বললো।—আরে যা বাবা, বিরক্ত করিস্ না। তোর বয়স তো রূপার চেয়ে অনেক কম। আর একটু বড় হলে না হয়……। যা বিরক্ত করিস না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপা বাইরে বার হতেই মাটির দিকে তাকিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে কুটীল একটা হাসি তার দু-ঠোঁটের

ওপর দিয়ে যেন পাক দিয়ে গড়িয়ে গেল। রূপা দেখলো, ঘরের দোর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত কে যেন কতগুলি কালো সরষে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। রূপা আবার হাসলো। শেষে তুক করা সরষে সহায় হলো হতভাগার। কেঁদে হলো না, কাকুতি-মিনতিতে হলো না, জিদ-আব্দার-অনুরোধ সব ভেসে গেল, তখন আর উপায় কি? মন্ত্র ফুঁকে সরষে ছিটিয়েছে। আচ্ছা?

রূপা ডাক দিল—ও মাসী, এসে দেখে যাও।

থুড়থুড়ে এক বুড়ী একটা ঘরের ঝাঁপ খুলে বাইরে এল। রূপা দেখিয়ে দিল ব্যাপারটা—তুক্-করা সরষে কে ছিটিয়ে গেছে।

বুড়ী চীৎকার করে সেই সকালেই গাঁ মাৎ করে তুললো—সর্বনাশ করলে। কোন্ দুষ্মন পেছনে লেগেছে। এত ভাল বেটী আমার, এমন জোয়ান আর সুন্দর, তাই পেছনে লেগেছে গো। কি উপায় হবে গো।

পাড়ার অনেকে জুটে গেল। সেবক মাহাতো গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই আলোচনা করলো—এমন দুষ্কর্ম কে করতে পারে? ব্যাপার খুবই গুরুতর মনে হচ্ছে। এর ভেতর অনেক রহস্য আছে।

সকলে দুশ্চিন্তায় মাথা দুলিয়ে এই সব কথা বলছিল। রূপা হঠাৎ বলে উঠলো—এত ভাবনায় কোন কাজ নাই। আমি সরষে মাড়িয়ে যাব, দেখি, কোন্ পিশাচ আমার কি করতে পারে।

রূপা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। সকলে সেবক মাহাতোর দিকে তাকিয়ে বললো—কাজটা ভাল হলো না মাহাতো।

সাধু দিন গুণছিল। রূপা সরষে মাড়িয়ে গেছে বেপরোয়া হয়ে—এ খবর শুনেছে সাধু। তার বিষণ্ণ মনের আকাশে এক আহ্লাদের ঝড় নেচে চলে যায়। রাগ করে হোক্ আর লোভ করে হোক্, হরিণ একবার ফাঁদে পা দিলেই হলো। রূপা যেন এই প্রথম তার ভালবাসার রাঙামাটির পথ ধরে একবার হেঁটে গেছে উপেক্ষা-ভরে। কিন্তু তার পর?

সাধু শুধু দিন গুণে যায়। অনেকদিন ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রূপার পায়ে সেই রাঙামাটির কোন দাগ লাগে না। এদিকে সেবক মাহাতো এক নামকরা ওঝা আনিয়ে ফেলেছে। নানারকম ভয়ঙ্কর তুকতাক চলেছে সেবকের বাড়িতে। শোনা গেল সেবক মাহাতোর শত্রুকে বাণ মারার আয়োজন হচ্ছে। সাধু ভয়ে মুসড়ে পড়লো।

কিন্তু গাঁয়ের নানা জনে, নানা গোপন খবর এনে সেবক মাহাতো আর

ওঝাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। তারা প্রায়ই দেখছে—সাধু রাত্রে ঘরে থাকে না। একদিন রাত্রে দেখা গেছে—জঙ্গলে বসে মড়ার খুলিতে পেঁচার চোখ পুড়িয়ে কাজল তৈরী করছে। অমাবস্যার রাত্রে একটা হাঁড়ি নিয়ে সাধু ফক্তর মশান ঘাটে উলঙ্গ হয়ে জল তুলে নিয়ে এসেছে।

ওঝা একদিন সরে পড়লো—লড়াইটা একটু কঠিন হয়ে উঠেছে মাহাতো। অনেকগুলি দেও-দানার সঙ্গে লড়তে হবে। আমি একা পারছি না, আমার বড় সাকরেদকে নিয়ে আসি।

সেবক মাহাতোর সব আশঙ্কা দূর করে দিল আর একটা খবর—সাধু গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পল্টনের চাকরী পেয়েছে।

হ্যাঁ, এখন না গিয়ে তার উপায় কি? কত রকম উপদ্রবই না করলো। কিছুতেই কোন কারসাজি আর সফল হলো না। ভালই হলো, এবার সের-ঘাটের বনেদী কোন রবিদাসের বাড়ির ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে, নিশ্চিন্ত হয়ে।

*　　　*　　　*

হোলি এসে গেল। এ এক অদ্ভুত পরব। শুক্লা বাসন্তীর এক সন্ধ্যায় বনান্তের কোলে পূর্ণচাঁদের রূপে দেখা দেবে শিশু নব বৎসর। পঞ্জিকা হাতড়ে একে খুঁজতে হয় না। আকাশের নক্ষত্র রাশিচক্র ক্রান্তি ও অয়নাংশ অঙ্ক কষে গুণে এই উৎসবের দিনক্ষণ মাপতে হয় না। অন্তরে ও বাহিরে এক অদৃশ্য পুষ্পধন্বার খেলা চলতে থাকে। আকাশের রঙে, বাতাসের স্পর্শে, আলোকের আভায়, গাছের কিসলয়ে মুকুলে হঠাৎ এক বিহ্বল যৌবন জেগে ওঠে। হোলি যেন মানুষের মন থেকে আগল খুলে বেরিয়ে আসে। এই একটি দিন মানুষ একটি সহজ সত্যকে উপলব্ধি করে, সে সত্য হলো এই যে, মানুষের অন্য পরিচয় যাই থাক্ আসলে সে প্রাণ মাত্র। এই প্রাণ যখন সারা বছর ধরে সংগ্রাম করে যায়, তখন সে জীবন-সৈনিক বা সামাজিক মানুষ মাত্র। তারপর একটি দিনের জন্য বসন্তের একটি পূর্ণিমায় সে ছুটি পায়। সৈনিকের পোষাক ছেড়ে ফেলে আবার রঙীন উত্তরীয় তুলে নেয়। এই কুঙ্কুমের বর্ষা, আবীরের ঝড়, রংঝারি আর পিচকারি ফোয়ারা—নিখিল চিত্তের স্নায়ুজাল থেকে শেষ ভীরুতার চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে রঙীন করে তোলে। হৃদয় আসি যেথা করিছে কোলাকুলি—দোল-পূর্ণিমায় মানুষের মেলায় তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

চম্পুগাঁয়ের সেবক মাহাতোর আঙিনায় ঢোলক ও বাঁশীর শব্দে হোলির রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠলো। সারা বছরের তৃষ্ণা মিটিয়ে পুরুষেরা সকলেই যেন

তাড়িতে মদেতে দেহমন চুবিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও অনেকেরই এই দশা।

মেয়েরা আসর থেকে একটু দূরে বসেছিল! পুরুষেরা ছেলে বুড়ো সবাই নেচে গেয়ে ছড়া কাটছে। খিস্তির উদ্দাম হুল্লোড় থেকে থেকে ঢেউ-ভাঙা জলরোলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। নরনারী সবারই গায়ের বসন রঙের ছোপে বিচিত্র। রূপা শুধু এড়িয়ে গেছে—মেয়েরা অনেক অনুযোগ সাধ্যসাধনা করেছে। কিন্তু অবীরের একটি ছোট টিপ ছাড়া আর কোন রঙ সে নেয়নি। এই উৎসবে সে যেন একজন দর্শকের মতো শুধু বসে আছে।

টলতে টলতে একজন এসে আসরে ঢুকলো—সাধু চামার—হাতে একটা বাঁশী। সঙ্গে সঙ্গে সেবক মাহাতো সাধুর তিন পুরুষ তুলে একটা খেউড় গেয়ে উঠলো। সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে সমর্থন জানালো—সা-রা রা-রা সা-রা রারা। ঢোলক বাজিয়ে সেবক মাহাতো গাইলো—

রাত অনেক বাত অনেক, নাই পাহারা।
ভুখ লাগা? এস এস কুত্তা হামারা॥

সকলে খুসীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢোলকে চাঁটি দিয়ে নেচে লাফিয়ে সমস্বরে সায় দিল।—সা-রা রা-রা। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি করতে লাগলো।

সাধু চামার বাঁশীতে একবার ফুঁ দিয়ে একটা হাত তুলে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। এবার তার পালা। সাধু জবাব দিল—

চুপ রহ, চুপ রহ, বোকা চম্পুগাঁও।
বেতাল দেবের বড় চেলা পূজো মেরা পাও।

সকলে এক সঙ্গে গর্জন করে জবাব দিল—আবে, যাও যাও!

আজ কি আর কেউ একথায় ভয় পায়। ভূত প্রেত বেতাল বরমদেব—আজ সব তুচ্ছ। সাধু চামার ভয় দেখাতে এসেছে—সে বেতালসিদ্ধ হয়েছে। এসব ফাঁকি ফন্দী ভূতচতুর্দশীর রাত্রেই মানায়।

সাধু চামার বাঁশী বাজিয়ে এক পাক নেচে নিয়ে আবার গাইলো—

খুস্ থাক দুস্‌মন, অনেক দিলে সাজা।
সেপাই হয়ে ফিরে এসে দেখ লেগা মজা॥

সকলে—আবে যাঃ যাঃ।

সকলে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠলো, পল্টনে নাকি চাকরী পেয়েছে সাধু। যাক্ না চলে! আজকের দিনে আবার শাসাতে এসেছে সকলকে—মজা দেখে

নেবে! আজ কে কার পরোয়া করে?

সাধু আর একবার নেচে নিয়ে ধরলো,—

তোপ ফাটা, বোম মারা, দম নাহি পায়।

লড়ে ফিরে সাধুরামের প্রাণ চলে যায়॥

সকলে—আরে, হায় হায়!

ঢোলকের বাজনা একটু মৃদুতর হয়। মেয়েদের মধ্যেও চাঞ্চল্য কলরব একটু স্থির হয়ে আসে। সাধু গেয়ে যায়—

শুক বলে সুখ নাই, নাই ঠিকানা।

তবু সারীর কালো চোখে জল ভরে না॥

সকলে উত্তর দিল—আরে, না না!

আরে না, না। এক ললিত আশ্বাসের সুর। আরে না না অভিমান করো না, চলে যেও না। জ্যোৎস্নালোকে তোমার সারীর কালোচোখ চক্‌চক্ করছে, দেখতে পাচ্ছ না? সেবক মাহাতো আস্তে আস্তে একটা খঞ্জনী বাজাচ্ছে। সকলে ঢোলক বাজিয়ে দুলে দুলে নাচছে—আরে, না না। ক্লান্ত সাধু বিভোর হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চললো। হঠাৎ বুড়ো সেবক মাহাতো যেন একটা খুশীর দমকা লেগে চেঁচিয়ে উঠলো—সা-রা, রা-রা, হোলি হায়।

মেয়েদের মধ্যে এই আনন্দ চাঞ্চল্যের ঝাপটা গিয়ে লাগলো। সব মেয়েরা মিলে হাসতে হাসতে মুঠো মুঠো আবীর নিয়ে রূপাকে চেপে ধরলো—এইবার তোকে রঙ মাখতেই হবে।

প্রি য় ং ব দা

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। ঠিক কথা।

এবং কথা যদি শুকনো কথা হয়, তবে তো কথাই নেই। চিঁড়ে ভেজা দূরের কথা, চিঁড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কিন্তু কবিতা সরকারের কথাগুলি কি সত্যই কতগুলি শুকনো কথা।

অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই বলাবলি করে, এবং তাদের ধারণা এই যে, যতই মিষ্টি কথা বলুক না কেন কবিতা সরকার, তাতে পরিমল চৌধুরীর মন ভিজবে না। কবিতা সরকারের কথাগুলি নেহাতই কতগুলি তোষামোদের ঝংকার। কবিতা সরকারের হাসির শব্দটাও তাই।

প্রায় তিন মাস হয়েছে, পরিমল চৌধুরী অডিটর হয়ে এই অফিসে এসেছে।

বড়জোর আর তিন মাস এখানে থাকবে ; তার পরেই আবার দিল্লীতে হেড-অফিসে চলে যাবে। অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেরই মনে একটা সন্দেহ এই বার প্রায় একটা বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, দিল্লী ফিরে যাবার সময় পরিমল চৌধুরী একা ফিরবে না। এই অফিসেরই একটি মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সে মানুষটির নাম প্রীতিলতা রায়। কবিতা সরকারের মতো প্রীতিলতা রায়ও এই অফিসের হিসেবের কাজের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

পরিমল চৌধুরীর দিল্লী ফিরে যেতে আর যে তিনটি মাস বাকি আছে, বোধহয় সেই তিনটি মাস শেষ হবার আগেই প্রীতিলতা রায়কে এই অফিসের ঐ কাউণ্টারের ছোট টেবিলটার কাছে বসে থাকতে আর দেখা যাবে না।

দিল্লীতে হেডঅফিসে বদলি হবে প্রীতিলতা? না। অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই জানে, তা নয়, পরিমল চৌধুরীর অফিসের সঙ্গে প্রীতিলতা রায়ের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। পরিমলের জীবনেরই সঙ্গে প্রীতিলতার একটা সম্পর্ক হয়ে যাবে। পরিমলের সঙ্গে প্রীতিলতার বিয়ে হবে এবং দু'জনেই এক সঙ্গে দিল্লী চলে যাবে।

কি আশ্চর্য, অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই যেটা অবধারিত সত্য বলে এরই মধ্যে বুঝতে পেরে গিয়েছে, আর বিশ্বাস করে ফেলেছে, সেটা কবিতা সরকার বুঝতে পারে না, আর বিশ্বাস করতেও পারছে না। বোধহয় ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না কবিতা সরকার। কারণ, বিশ্বাস করতে ভাল লাগে না। এখনও একটা আশার মায়ায় মূঢ় হয়ে নিজেকে যেন এক অদ্ভুত বিশ্বাসের খুশিতে মাতিয়ে রেখেছে কবিতা।

পরিমল চৌধুরীর চোখের দৃষ্টিকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও জয় করতে পারেনি যে কবিতা সরকার, সে কেন এত বড় আশা পোষণ করে তা সে-ই জানে। অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই জানে, কবিতা সরকার একদিন এই বৃথা দুঃসাহসের প্রতিফল বেশ ভাল করেই পেয়ে যাবে। সাধ করে একটা অসম্ভবের সঙ্গে ভালবাসার খেলা খেলতে যাওয়া যে যেচে অপমান ডেকে আনা; একটা শাস্তির কাছে অদৃষ্টকে ছেড়ে দেওয়া।

কবিতা সরকারের কথা আর হাসির শব্দগুলি যেন চটুল বেহায়াপনার ঝংকার। পরিমল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার সময় কবিতা সরকারের চোখের চাহনিও নীরবে ঝংকার দিয়ে আর কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। কবিতা সরকারের জীবনের ইচ্ছা যেন ব্যাকুল হয়ে পরিমল চৌধুরীর বুকের উপর তখনি আছড়ে পড়বার জন্য ছটফট করছে, কবিতা সরকারের ভাব-ভঙ্গী দেখলে এরকম

সন্দেহ না করে পারা যায় না।

অথচ কবিতা সরকার নিজেই প্রতিদিন নিজের চোখে দেখতে পায়—পরিমল চৌধুরী অফিসের ছ'ঘণ্টার মধ্যে অন্তত তিনবার নিজের ছোট কেবিনটার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে, কারণে ও অকারণে প্রীতিলতার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে কথা বলে পরিমল, সে-কথার শব্দ এদিক-ওদিক থেকে কিছুটা শোনা গেলেও সে-কথার ভাব ও ভাষার কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। এবং খুবই বুঝতে পারা যায়, শুধু অফিসের কাজের কথা নয়, অন্য কোন কথা বলছে পরিমল।

কিন্তু প্রীতিলতা শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিলের উপরে রাখা লেজার বই-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা চেয়ারটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে একমনে টাইপ করতে থাকে। পরিমল চৌধুরীর কথাগুলি যেন শুনতেই পাচ্ছে না প্রীতিলতা। প্রীতিলতার চোখ-মুখের নির্বিকার প্রশান্তি এবং অটুট গম্ভীরতা লক্ষ্য করে তাই ধারণা করতে হয়।

অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই নিজের নিজের চেয়ারে বসে এবং আড়চোখের চাহনি একটু বিচলিত করে নিয়ে দেখতে থাকে, পরিমল চৌধুরীর চোখ-মুখের ভাব আর ভঙ্গী কখনো আবেদনের মতো, এবং কখনো বা নিবেদনের মতো করুণ হয়ে উঠছে। যেন একটা নিরেট বধিরতার কাছে গুনগুন করছে পরিমল চৌধুরীর জীবনের একটা আগ্রহ।

কিন্তু এক-একদিন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো জলজল করছে, সারা মুখটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। পরিমল চৌধুরীর জীবনের স্বপ্ন যেন একটা আশ্বাসের ছবি দেখতে পেয়েছে।

কবিতা সরকার নিজেও তো এই দৃশ্য রোজই দেখতে পায়। তবু কবিতা সরকারের চোখে-মুখে কোন আক্ষেপের বেদনা অথবা বিষাদের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা যায় না। কবিতা সরকার পরিমল চৌধুরীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে, অথচ পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো অপলক হয়ে একটু দূরের সেই কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে কোন দৃশ্যের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে একমনে কাজ করছে প্রীতিলতা। এমন ঘটনা চোখের উপরে দেখতে পেয়েও কবিতা সরকারের আশার আবেগ মুষড়ে পড়ে না। বরং হাসির ঝংকার আরও একটু মিষ্টি করে দিয়ে এবং বেশ জোরে জোরে কথা বলে—আচ্ছা আমি এখনই ফাইলটা আপনার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলেই দেখবেন যে···।

অফিসের দীনুবাবু মাঝে মাঝে এমন একটা কথা বলেন, যা শুনে অফিসের

স্টাফের প্রায় সকলেরই ধারণা বিশ্বাস এবং ইচ্ছার রকমটা এলোমেলো হয়ে যায়। দীনুবাবুর কথার মধ্যে একটা বেসুরো যুক্তি যেন সুর করে বেজে ওঠে।

দীনুবাবু বলেন, গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়। দুধ বেচতে হলে গলি গলি ঘুরতে হয়তো হয়, কিন্তু সুরা এক ঠাঁই বসে থেকেই বিক্রী হয়ে যায়। অ্যাঁ? তবে কি কবিতা সরকারকেই দুধের সঙ্গে তুলনা করছেন দীনু-বাবু? এবং প্রীতিলতা হলো সুরা?

তা কেন হবে? কেমন করে হবে?

প্রীতিলতা দেখতে সুন্দর ও শান্ত। একটু বেশী সুন্দর আর বেশী শান্ত। নিজের টেবিলের কাছে চুপ করে বসে থাকে আর নীরবে কাজ করে। প্রীতিলতা কোনদিনও নিজের হাতে ফাইল নিয়ে অডিটর পরিমল চৌধুরীর কেবিনের ভিতরে যায়নি। মস্ত বড় বড় কাগজের শীট ভরে যখন গাদা-গাদা হিসাবের অঙ্ক টাইপ করার কাজ আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে ফেলে প্রীতিলতা, তখনও কাজের বাহাদুরী নেবার জন্য হিসাবের স্টেটমেণ্ট নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের দিকে ব্যস্তভাবে ছুটে যায় না। এহেন প্রীতিলতা সুরা হবে কেন?

আর, যে কবিতা সরকার যখন-তখন বিনা কাজে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে, এবং যত আজে বাজে কথা মিষ্টি করে বলছে, সে কবিতা সরকারকে দুধের মতো একটা সাদা ও শুদ্ধ উপকারের বস্তু বলে মনে করা হবে কেন?

একমাত্র দীনুবাবু কবিতা সরকারের পক্ষে কথা টানেন, তা ছাড়া স্টাফের প্রায় সকলেই প্রীতিলতার পক্ষে।

কবিতা সরকারের চেহারাটা দেখতে কুৎসিত না হলেও সুন্দর নয়। এবং প্রীতিলতার তুলনায় কিছুই নয়। আর গুণের কথা? সেদিক দিয়েও কবিতা সরকারের এমন কোন সম্বল নেই, যার জোরে প্রীতিলতাকে ছাড়িয়ে যাবার সাধ্যি হবে কবিতার। গত বছর এই অফিসের স্টাফ বেশ ঘটা করে রবীন্দ্র জয়ন্তী করেছিল এবং সেই উৎসবে দুজনেই গান গেয়েছিল। কিন্তু কে না জানে, কী চমৎকার গান গেয়েছিল প্রীতিলতা। প্রীতিলতার গান শেষ হবার পর কবিতা সরকারের গান শুনে উৎসবের আনন্দটা যেন মুখ টিপে কৌতুকের হাসি হেসে ফেলেছিল। কি আশ্চর্য, ওরকম একটা বাজে গলা নিয়ে গান গাইলো কেন কবিতা সরকার? একটুও ভয় পেল না কবিতা? ভয় না থাকুক, লজ্জা বলেও তো একটা বস্তু আছে। প্রীতিলতার গানের পর কবিতা

সরকারের পক্ষে কোন গান আর না গাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু একটা গান নয়, পর পর তিনটে গান গেয়েছিল কবিতা। এবং সেই সময় উৎসবের আসর প্রায় অর্ধেক শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আর কিছুদিন পরে আর একটা উৎসবের সময় একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিল কবিতা। বোধহয় নিজের যোগ্যতার সীমা সম্বন্ধে একটু সচেতন হবার মতো কাণ্ডজ্ঞান পেয়েছিল। প্রবীণ অডিটর মিস্টার রাও রিটায়ার করে চলে গেলেন, তাঁকে স্টাফের পক্ষ থেকে বিদায়-সংবর্ধনা করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে প্রীতিলতা একাই গান করেছিল। স্টাফের কেউ কেউ মুখ টিপে হাসি লুকিয়ে কবিতা সরকারকে অনুরোধ করেছিল—আপনার অন্তত গোটা পাঁচেক গান হলে···

কোন উত্তর না দিয়ে কবিতা সরকার হাসিমুখে শুধু মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল। এবং দীনুবাবু একটু খুশি হয়ে আড়ালে আড়ালে স্টাফের সেই সব কৌতুকীদের উল্টো ঠাট্টা করেছিলেন—কেমন জব্দ? কবিতা সরকারকে যত বোকা বলে মনে কর, তত বোকা সে নয়।

কিন্তু স্টাফের প্রায় সকলেই তবু মনে করে, বোকা বৈকি কবিতা সরকার। নইলে প্রীতিলতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার সাহস করে কেন? গান গাইতে গিয়ে আক্কেল হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরিমল চৌধুরীর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যে-সব কাণ্ড করছে কবিতা, তাতে মনে হয় পরিণাম এখনও কল্পনা করতে পারছে না। আক্কেল হবে একদিন, শিগগির হবে, খুব সম্ভব আর তিনমাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। মনে-মনে প্রীতিলতাকে ভালবাসে পরিমল, এই সত্যের প্রমাণ প্রতিদিন পাঁচবার দেখতে পেয়েও কেন নিজেকে এখনও সামলে ফেলছে না কবিতা?

রূপের অভাব এবং গুণের অভাব যেন শুধু কতকগুলি মিষ্টি কথা আর হাসির ঝংকার দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায় কবিতা। শুধু পরিমল চৌধুরীর গায়ে পড়ে বাচালতা করে করে প্রীতিলতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে কবিতা সরকার। বুঝতেও পারে না যে, ওর এইসব মিষ্টি-মিষ্টি মুখরতাকে নিতান্ত শুকনো কথার অসার মুখরতা বলে মনে করে পরিমল চৌধুরী। এই তিন মাসের মধ্যে ভুলেও কোন দিন কবিতা সরকারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়নি পরিমল। কোন দিন বেয়ারাকে পাঠিয়ে কবিতা সরকারকে কোন কাজের বা প্রশ্নের জন্য নিজের কেবিনে ডেকে পাঠায়নি!

মাঝে কিছুদিন খুব ভাল করে আর স্টাইল করে সাজ-সজ্জা চালিয়েছিল

কবিতা। প্রীতিলতার সাজসজ্জায় বেশ সুন্দর সৌখীনতা সব সময় রঙীন হয়ে ঝলমল করে। সুতরাং, স্টাফের প্রায় সকলেরই ধারণা হয়েছিল, প্রীতিলতার সাজসজ্জার স্টাইল আর ঝলমলে রঙীনতার সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করবার জন্য মেতে উঠেছে কবিতা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছে কবিতা। আক্কেল হয়েছে। কবিতা সরকারের সেই সব রঙীন ঝলমলে সাজ পরিমল চৌধুরীর চোখের উপর যেন একটা ছায়াও ফেলতে পারেনি। কোন মুহূর্তেও একটু উৎসুক হয়ে বা বিস্মিত হয়ে কবিতা সরকারের স্টাইলের সাজ লক্ষ্য করেনি পরিমল চৌধুরী, মুগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা। অথচ, নিজের কানে শুনতে পেয়েছে কবিতা, প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে পরিমল—আপনার এই শাড়িকেই বোধহয় বালুচর শাড়ি বলে? কী চমৎকার!

সেই রকমই নির্বিকার প্রসন্নতায় গম্ভীর হয়ে থেকে শুধু আস্তে একটু মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় প্রীতিলতা—না।

—কি বললেন?

এইবার কথা বলে প্রীতিলতা—বালুচর নয়।

প্রীতিলতার চোখে যেন সুন্দর একটা গর্বের তৃপ্তি ঝিকমিক করে হাসছে। অডিটার পরিমল চৌধুরীর সেই আবেদনময় মুখের দিকে যেন একটা সূক্ষ্ম করুণার দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে প্রীতিলতা।

আর, কবিতা সরকার তার সাজের শাড়িটার দিকে ব্যথিত অথচ তীব্র একটা ভ্রূকুটি হেনে তাকিয়ে থাকে। এটাই তো বালুচর শাড়ি, প্রীতিলতা যে শাড়িটা পরেছে, সেটা একটা সাধারণ মাদ্রাজী তাঁতের শাড়ি। কিন্তু পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো বালুচর দেখবার আশায় মুগ্ধ হয়েও দেখতে পাচ্ছে না যে, কত কাছে ঝলমল করছে একটা বালুচর।

তার পর আর নয়। পরাজয় স্বীকার করেছে কবিতা সরকার। তারপর থেকে যত সাদামাটা কালোপেড়ে মিলের শাড়িতে সেজে অফিসে আসে কবিতা সরকার।

এখন সম্বল শুধু কথা। তোষামোদের মতো যত ভাষা, আর যখন-তখন মিষ্টি হাসির ঝংকার। শুধু মিষ্টি কথার জোরে রূপের অভাব আর গুণের অভাব ঢাকা দিয়ে পরিমল চৌধুরীর মনের কাছে মিষ্টি হয়ে ওঠবার এক ভয়ানক তপস্যা শুরু করেছে কবিতা সরকার।

স্টাফের প্রায় সকলেই রাগ করে। এটা কবিতা সরকারের পক্ষে নিতান্ত

একটা হীনতা নয় কি? অডিটর বেচারাকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার জন্ত এ কেমন বিশ্রী চক্রান্তের মতো একটা কাণ্ড করে চলেছে কবিতা সরকার? প্রীতিলতার দিকে মন পড়েছে পরিমলের এবং প্রীতিলতাও এতে অখুশি হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে আর কেন? পরিমল আর প্রীতিলতার সম্পর্কের উপর এরকম উপদ্রব করা কবিতা সরকারের পক্ষে মোটেই উচিত হচ্ছে না।

দীনুবাবু বলেন—উচিত কি অনুচিত, সেটা তোমরা বুঝবে কি করে?

—তার মানে?

দীনুবাবু—পরিমল চৌধুরীকে যদি মনে মনে ভালবেসে থাকে, যদি ভালবাসতে ইচ্ছে করে থাকে কবিতা সরকার, তবে বেচারা একটু চেষ্টা-চরিত্র না করে থাকবেই বা কেমন করে?

—কিন্তু পরিমলকে ভালবাসে কেন কবিতা সরকার? কোন অধিকারে?

দীনুবাবু—হাসেন—ভালবেসে ফেলেছে, এই অধিকারে।

স্টাফের প্রায় সকলেই একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অফিসটা যে প্রজাপতির অফিস হয়ে উঠলো? দিনের পর দিন এ সব কাণ্ড চোখে দেখতে আর ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু হেস্তনেস্ত হতে এত দেরিই বা হচ্ছে কেন? এটাও যে একটা রহস্যের ব্যাপার! প্রীতিলতা কি এখনও মন স্থির করেনি? কিংবা প্রীতিলতার কি এখনও বুঝতে বাকি আছে যে, প্রীতিলতার কাছে পরিমল চৌধুরীর জীবন একটা আশ্বাস আশা করতে শুরু করে দিয়েছে?

সন্দেহ হয়, এখনও হয়তো হ্যাঁ বলেনি প্রীতিলতা।

মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয়, প্রীতিলতার সুন্দর মুখটা যেন বিজয় গরবে জলজলে হয়ে রয়েছে। অডিটর পরিমল চৌধুরীর মতো মানুষ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, ব্যস্, তারপর প্রীতিলতার এই শান্ত চোখমুখের আর মনের যেন কর্তব্য নেই।

দীনুবাবুও মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলেন—আমি একটা খবর পেয়েছি।

—কি?

দীনুবাবু—প্রীতিলতার মামার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।

—তাতে হয়েছে কি?

দীনুবাবু—প্রীতিলতার মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রীতিলতার বিয়ে হবে বলে কোন খবর তিনি পেয়েছেন কিনা?

—কি বললেন তিনি?

দীনুবাবু—তিনি বললেন, না, এ রকম কোন খবর তিনি পাননি। প্রীতি-

লতার মার কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, এখন বিয়ে করবার কোন ইচ্ছে নেই প্রীতিলতার।

—কিন্তু এদিকে যে এসব কাণ্ড চলেছে, তার কি হবে?

দীনুবাবু হাসেন—আর তিন মাসের মধ্যে একটা কিছু না কিছু হয়েই যাবে।

আর তিন মাসের মধ্যেই হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অডিটারের কাজ শেষ করে পরিমল চৌধুরী আবার দিল্লী ফিরে যাবে। স্টাফের প্রায় সকলেরই মনের ধারণা ও বিশ্বাস এই দু'টি পরিণামের একটি অবধারিত বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু কবিতা সরকার যেন এক পরম নিশ্চিন্ততায় মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। যেন অনন্তকাল পর্যন্ত এই অফিসের ঐ কেবিনের ভিতরে ঢুকে পরিমল চৌধুরী নামে এক হাজার টাকা মাইনের একটা মানুষের কাছে কারণে-অকারণে শুধু ঝংকার দিয়ে হাসবে আর কথা বলবে কবিতা সরকারের জীবন।

কবিতা সরকারের বাচালতায় একটুও বিরক্ত হয় না পরিমল চৌধুরী! চা-এর সময় যখন এসে পড়ে কিংবা পার হয়ে যায়, তখন কবিতা সরকার নিজেই একবার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পরিমলের কেবিনে ঢোকে,—কিছু মনে করবেন না, আপনার চা-এর সময় হয়ে গিয়েছে, শুধু এটুকু বলবার জন্যেই এসেছি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিমল চৌধুরী বলে—ও, ধন্যবাদ।

মস্ত বড় একটা হিসাবের টাইপ-করা স্টেটমেণ্ট হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে পরিমল চৌধুরীর টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর ছটফট করে কথা বলতে থাকে কবিতা সরকার। দেখুন তো, কোন ভুল আছে কিনা!

পরিমল—না, কোন ভুল নেই বলেই তো মনে হচ্ছে।

কবিতা—এ সব কাজে প্রীতিলতার একটুও ভুল হয় না।

পরিমলের চোখের চাহনি দীপ্ত হয়ে ওঠে।—হ্যাঁ, আশ্চর্য, কোন দিন সামান্য ভুল হতেও দেখলাম না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে কবিতা সরকার।—কিন্তু এ সব আমারই কাজ।

পরিমল—তার মানে? আমি তো এ সব কাজের ফাইল প্রীতিলতা রায়ের কাছে পাঠিয়ে থাকি।

কবিতা—হ্যাঁ, ঠিকই। কিন্তু প্রীতিলতা আবার আমার কাছেই সেগুলি পাঠিয়ে দেয়। এসব ঝঞ্ঝাট আমিই ভুগি।

হো হো করে হেসে ওঠে পরিমল—মজার ব্যাপার।···প্রীতিলতা রায় কি এখন···।

কবিতা—কি ?

পরিমল—অফিসে এখনও আছেন বোধহয়, চলে যাননি বোধহয়।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় পরিমল, এবং কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে দূরের কাউণ্টারে প্রীতিলতার সেই সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে! তারপরে এগিয়ে যেয়ে প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়।

আঃ, যেন হঠাৎ অলস ও ক্লান্ত হয়ে, এবং একটা জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাসের বাতাস বুকের ভিতরে টানতে টানতে নিজের টেবিলের দিকে চলে যায় কবিতা।

কিন্তু ক্ষণিকের বিষাদ মাত্র। কবিতা সরকারের আশার আবেগ হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়েছে, একটু ব্যথা লেগেছে, এই মাত্র। কিন্তু ব্যথা ভুলে যাবার মতো ভয়ানক একটা জোর যেন কবিতা সরকারের বুকের ভিতরে আছে। পরের দিন আবার ঠিক এই রকমের কোন একটা অজুহাত নিয়ে পরিমল চৌধুরীর ঘরের ভিতরে ঢুকে খিলখিল করে হেসে ওঠে কবিতা সরকার।

—কি ব্যাপার ? হাসি মুখ তুলে আর কলম থামিয়ে প্রশ্ন করে পরিমল।

কবিতা বলে—আপনার বয় বললে, আপনি আজ চা-খাবার কিছুই খাননি।

পরিমল—আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন নাকি ?

কবিতা—রোজই জিজ্ঞাসা করি।

পরিমল—মজার ব্যাপার !

কবিতা হাসে—মজার ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু চা-খাবার খেলেন না কেন ?

পরিমল—ঐ একঘেয়ে রুটি পুডিং আর চা রোচে না।

কবিতা—বলেন তো আমি একটা কাজ করতে পারি।

—কি ?

—আমি একটা লিস্ট তৈরী করে দিচ্ছি, কোন্ দিন কোন্ খাবার আসবে। ধরুন, সোমবারে শুধু ফল আর চা। মঙ্গলবারে আলুর ঘুঘনি, ডিম আর টমেটোর স্যালাড। বুধবারে···

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পরিমল—তবে দিন একটা লিস্ট করে।···হ্যাঁ, একবার প্রীতিলতা রায়কে জিজ্ঞেসা করলে হয়।

—কি জিজ্ঞাসা করবেন ?

—উনি কি রোজই একঘেয়ে চা আর বিস্কুট খাওয়া পছন্দ করেন ?

সত্যিই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় পরিমল, এবং হাসতে হাসতে এগিয়ে যেয়ে প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কবিতা। এবং দেখতে থাকে, কী চমৎকার

ঢলঢলে একটা গর্বের চাহনি তুলে বিজয়িনীর মতো ভঙ্গী করে পরিমল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে প্রীতিলতা। কি বলতে চায় প্রীতিলতা?

প্রীতিলতারই টেবিলের নিকট দিয়ে যেতে যেতে যে-কথা শুনতে পায় কবিতা সরকার, তা থেকে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, পরিমল চৌধুরীকে এখনও কি-যেন স্পষ্ট করে বলে দিতে পারছে না প্রীতিলতা। এখনও যেন সময় চাইছে প্রীতিলতা।

—কেন? আমার প্রস্তাবটা কি খারাপ? পরিমল চৌধুরীর মুখের হাসি আর ভাষা যেন একটু কাতর হয়ে প্রীতিলতার সুন্দর মুখের অবিকার প্রশান্তি একটু বিচলিত করে দিতে চেষ্টা করছে।

কিসের প্রস্তাব? হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দূরের একটা আলমারির দিকে তাকিয়ে শাড়ির আঁচল ধরে মিছামিছি টানাটানি করে কবিতা। পরিমল চৌধুরীর এই কাতর নিবেদনের শব্দ সহ্য করতে গিয়ে কবিতা সরকারের কান দুটো যেন গুপ্ত রক্তচ্ছটার জ্বালা লেগে লাল হয়ে ওঠে। কবিতা সরকারের অদৃষ্ট যেন একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাতে কানমলা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

প্রীতিলতা বলে—আপনার প্রস্তাব ভাল, কিন্তু···।

আর কিছু বলে না প্রীতিলতা, কিন্তু কি আশ্চর্য প্রীতিলতার এই কিন্তুময় অনাগ্রহের ঘোষণা শুনেও পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতে থাকে পরিমল চৌধুরী, লেজার বইয়ের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে কি চমৎকার একটা ঢলঢলে গৌরবের শোভার মতো সুন্দর মুখটাকে একটুখানি হেলিয়ে দিয়ে বসে আছে প্রীতিলতা।

পরিমল বলে—আমি তাহলে বয়কে বলে দিই, যখন আমার খাবার আসবে তখন সেই সঙ্গে আপনারও খাবার··।

প্রীতিলতা মুখ না তুলেই উত্তর দেয়—না।

পরিমল—কেন মিস রায়?

প্রীতিলতা—এখন না, এখন কিছু বলতে পারছি না। মাপ করবেন।

মাপ চাইছে প্রীতিলতা, কিন্তু মাপ চাইবার কী দৃপ্ত ভঙ্গী। যেন ভক্তের স্তাবকতাকে করুণা করছে প্রীতিলতা।

কিন্তু হেসে ওঠে কবিতা সরকারের মুখটা। পরিমল চৌধুরীর নিবেদন এখনও একেবারে পাগল হয়ে যায়নি। এখনও প্রীতিলতার ইচ্ছার দুয়ারে এসে শুধু ধর্ণা দিচ্ছে পরিমল। এবং এখনও প্রীতিলতাকে সে-কথা বলে ফেলতে পারেনি পরিমল, যে-কথা বলে ফেলবার পর প্রীতিলতার সুন্দর মুখটা চরম

জয়ের সুখে আরও রঙীন হয়ে এই অফিস-ঘর ছেড়ে বাড়ি চলে যাবে, তারপর ছুটি নেবে, প্রীতিলতা। এবং তার কয়েকদিন পরেই একগাদা রঙীন খামের চিঠি এই অফিসঘরের টেবিলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ে সারা অফিসের মানুষগুলিকে এই সত্য জানিয়ে দেবে যে, প্রীতিলতার জয় হয়েছে। অডিটর পরিমল চৌধুরীর সঙ্গে প্রীতিলতা রায়ের বিয়ে এবং তার কিছুদিন পরেই পরিমলের সঙ্গে দিল্লী চলে যাবে প্রীতিলতা।

কিন্তু সে প্রস্তাব নয়। যাক্ হাঁপ ছাড়ে কবিতা সরকারের আতঙ্কিত বুকটা। কিন্তু নিজের টেবিলের কাছে এসে আবার কাজে মন দিতে গিয়ে যেন মনটাকেই খুঁজে পায় না কবিতা সরকার। বুকের ভিতরে হাঁপাচ্ছে আর হাঁস-ফাঁস করছে এক গাদা ক্লান্ত নিঃশ্বাসের ভার।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, কবিতা সরকারের অন্তরাত্মা যেন আহত হলেই আরও বেশি উদ্দাম হয়ে ওঠে। কবিতা সরকারের সম্বলবিহীন স্বপ্ন, বার বার হতাশ হওয়া আর আঘাত-পাওয়া আশা যেন প্রচণ্ড এক অহংকারের জেদে আবার মরিয়া হয়ে ওঠে। হার মানতে চায় না কবিতা সরকারের প্রাণ। যখন তখন এবং কারণে অকারণে, পরিমল চৌধুরীর কেবিনে ঢুকে বাচালতা করে আসবার প্রতিদিনের অভ্যাস তবুও ছাড়তে পারে না। ঐ কেবিনটার বিরুদ্ধে একটা অভিমান করবারও যেন শক্তি নেই কবিতা সরকারের। উটের কাছে কাঁটা গাছের স্বাদ যেমন, কবিতা সরকারের কাছে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের নিভৃতটা বোধহয় তেমনই একটা স্বাদের স্বর্গ। না যেয়ে থাকতে পারে না কবিতা সরকার।

যেদিন, ব্যাঙ্কের লোকগুলি একটানা পাঁচ ঘণ্টা হিসাবের লড়াই সেরে পরিমল চৌধুরীর কেবিন থেকে বের হয়ে চলে গেল, সেদিন হঠাৎ একটা ব্যাপার···।

একি ব্যাপার? পরিমল চৌধুরীর বেয়ারা কেবিনের ভিতর থেকে আতঙ্কিতের মতো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে কেন? এত বড় অফিসঘর, এত লোক কাজ করে, কিন্তু কারও দিকে না তাকিয়ে শুধু কবিতা সরকারের মুখ লক্ষ্য করে কবিতা সরকারের টেবিলের দিকে ছুটে আসছে বেয়ারা। কি হলো? কবিতা সরকারও হঠাৎ লেখা বন্ধ করে আর উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকে। সারা অফিসঘরে একটা উদ্বেগময় ব্যস্ততার সাড়া পড়ে যায়।

বেয়ারা এসে কবিতা সরকারের কাছে বিড়বিড় করে কি একটা কথা বলতেই পরিমল চৌধুরীর কেবিনের দিকে ছুটে চলে গেল কবিতা সরকার,

এবং তার পরে সকলেই। বেয়ারা বলে, সাহেব দু'হাতে মাথা টিপে ধরে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন আর ছটফট করছেন।

কেবিনের ভিতরে ভিড়ের প্রবেশ দেখেই আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে পরিমল চৌধুরী—কি ব্যাপার? আপনারা সবাই এত ব্যস্ত হয়ে ·।

কিন্তু কবিতা সরকার তৎক্ষণে, এবং এতগুলি মানুষের চোখের সামনেই একেবারে সীমাহীন তোষামোদ আর বেহায়াপনার আবেগে যেন মাতাল হয়ে উঠে একটা কাণ্ড করে ফেলে। রুমাল জলে ভিজিয়ে পরিমল চৌধুরীর কপালটাকে বার বার মুছে দিতে থাকে কবিতা সরকার।

পরিমল বলে—থাক থাক, এমন কিছু কষ্টের ব্যাপার নয় যে···।

কবিতা সরকার ভ্রুকুটি করে এবং শাসানির স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ করুন আপনি।

পরিমল হাসে—হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন কটমট করে জলে উঠলো; কাল ভাল ঘুম হয়নি, তাই বোধহয়···। থাক···এইবার ছেড়ে দিন।

কবিতা সরকারের চোখ দুটো যেন কেঁপে ওঠে—ছেড়ে দিতে পারি ঠিকই কিন্তু আপনার কি কোন ক্ষতি হচ্ছে?

পরিমল—না, ক্ষতি হবে কেন? বরং···সত্যি কথা বলতে হয়, মাথার জ্বালাটা এরই মধ্যে অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

সত্যিই কবিতা সরকারের ভেজা রুমালের ছোঁয়া পেয়ে পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো যেন ঘুমের স্বাদ পেয়ে আস্তে আস্তে বুঁজে আসছে। কেবিনের ভিতরের ভিড়টা আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে থাকে। এবং যখন ফাঁকা হয়ে গেল, তখন কবিতা সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে ওঠে পরিমল—প্রীতিলতা রায়ও এসেছিল বলে মনে হচ্ছে?

কবিতা বলে—না, আসেনি।

ঠিক কথা। একমাত্র প্রীতিলতা ছাড়া আর সকলেই বেয়ারার উদ্বেগ বার্তা ন উদ্বিগ্ন হয়েছে আর ছুটে এসেছে। ছুটে আসেনি শুধু একজন। সে ঐ প্রীতিলতা রায়। এখনও নিজের টেবিলের কাছে সে একমনে টাইপ করছে, সেই শান্ত ও সুন্দর মুখটা ঢলঢল করছে।

কবিতা সরকারের হাতের ভেজা রুমাল কবিতা সরকারের হাতেই ছিল। কবিতার হাতের সেই রুমালের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠে পরিমল—ধন্যবাদ—

তারপরেই কেবিন ছেড়ে বের হয়ে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে, প্রীতিলতার

টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পরিমল।—হঠাৎ সামান্য একটা মাথায় যন্ত্রণা করে, অফিসের এতগুলি মানুষকে ট্রাব্‌ল্‌ দিয়ে···আপনি শুনেছেন তো মিস রায়?

প্রীতিলতা হাসে—হ্যাঁ, শুনেছি।

কবিতা সরকারও শুনতে পায়, কত স্পষ্ট করে এবং কি অদ্ভুত ভঙ্গী করে কথা বলছে প্রীতিলতা। শুনেছে, তবু ছুটে যায়নি প্রীতিলতা। এবং প্রীতিলতা জীবনের এই ভয়ংকর অহংকারের গুঞ্জন আর হাসির শব্দ কত মুগ্ধ হয়ে শুনছে পরিমল চৌধুরী!

কবিতা সরকারের আশার সব জেদ যেন একটা পাঁজর-ভাঙা বেদনার চাপে মড়মড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। না, এমন মিথ্যা সংগ্রাম সহ্য করবার কোন অর্থ হয় না। মাথা হেঁট করে, এবং চরম পরাজয়ের শ্রান্তিটাকে যেন ঢোঁক গিলে লুকিয়ে ফেলতে ফেলতে নিজের টেবিলের কাছে এসে চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে কবিতা সরকার।

এবং আর তিনটা দিন পার হতে না হতেই স্টাফের প্রায় সকলেই একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে বুঝতে পেরে হেসে ফেলে। এইবার হার স্বীকার করেছে কবিতা সরকার। পরিমল চৌধুরীকে দেখলেই আর কলকল করে হেসে ওঠে না কবিতা সরকার। যখন-তখন এবং কারণে-অকারণে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের ভিতরে ঢুকে বাচালতাও করে না। কি অদ্ভুত ব্যাপার! তিন দিনের মধ্যে একবারও পরিমল চৌধুরীর কেবিনে যায়নি কবিতা সরকার।

পরিমল চৌধুরীর আশার জীবনে কোন পরিবর্তন এই তিন দিনের মধ্যে হয়েছে বলে মনে হয় না। দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার নিজেই এসে প্রীতিলতার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আর হেসে-হেসে কি কথা বলে চলে যায় পরিমল চৌধুরী। এই পরিমল চৌধুরীর এই আকুলতার নিবেদন শুনে শুনে প্রীতিলতার মুখটা ঠিক তেমনই শান্ত ও সুন্দর হয়ে ঢলঢল করতে থাকে।

কিন্তু তার পরের দিন প্রীতিলতার টেবিলের কাছ থেকে যেতে যেতে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় পরিমল চৌধুরী। অফিসঘরের চারদিকে তাকিয়ে পরিমলের চোখ দুটো কি-যেন খুঁজতে থাকে। তারপরেই ব্যস্তভাবে হেঁটে নিজের কেবিনের দিকে চলে যায় পরিমল।

তার পরের দিন প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ফেলে পরিমল—ঐ সেই কাউন্টারের দিকে, যেখানে নিজের কাজের টেবিলে বসে একমনে লেখালেখি করছে কবিতা সরকার।

পরিমল চৌধুরীর অডিটের কাজ শেষ হতে আর মাত্র একটি মাস বাকি আছে। যেদিন থেকে ঠিক একটি মাস পরে পরিমল চৌধুরীকে দিল্লী চলে যেতে হবে, সেইদিন হঠাৎ কেবিনের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে থাকে পরিমল চৌধুরী। যেন হঠাৎ চমকে উঠেছে পরিমলের কেবিনের বাচালতাহীন নীরব ও গম্ভীর বাতাস।

কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একেবারে বেহায়ার মতো অপলক চোখ তুলে কবিতা সরকারের কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে থাকে পরিমল চৌধুরী।

আর সাতটা দিন পর অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই চমকে ওঠে—একি ব্যাপার ?

দীনুবাবু বলেন—কি হলো ?

—কই, প্রীতিলতার টেবিলের কাছে গিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকে না কেন পরিমল চৌধুরী ? প্রীতিলতার সুন্দর মুখের দিকে ভক্তের মতো একবার না তাকাতে পারলে যে পরিমল চৌধুরীর প্রাণ···।

হ্যাঁ, যে পরিমল চৌধুরীর প্রাণটা প্রীতিলতার সুন্দর মুখের শোভা একবার কাছে এসে দেখে না যেতে পারলে হেসে উঠতে পারতো না, সেই পরিমল চৌধুরী যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে, একটু করুণ হয়ে, এবং বোধহয় বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে কবিতা সরকারের গম্ভীর মুখের দিকে লক্ষ্য রেখে কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কবিতা সরকারের বাচালতা আর হাসির ঝংকার শুনতে না পেয়ে যেন কাতর হয়ে ছটফট করছে পরিমল চৌধুরীর বুকটা। তা না হলে, বার বার এ রকম ছটফট করে কোটের বুকের বোতামগুলিকে বার বার টানাটানি করে কেন পরিমল চৌধুরী ?

তার পরের দিন। অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে, একটা ফাইল হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সোজা একেবারে কবিতা সরকারের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পরিমল চৌধুরী। পরিমল চৌধুরীর চোখের চাহনিতে যেন একটা আবেদন করুণ হয়ে ফুটে উঠেছে। একটু আশ্চর্য হয়ে এবং গম্ভীর মুখ নিয়ে পরিমলের মুখের দিকে কবিতা সরকার চোখ তুলে তাকাতেই পরিমল বলে।—এই ফাইল দেখে শেষে তিন মাসের পারচেজের হিসাবটা তিন কপি টাইপ করে দেবেন এখনি ?

চমকে ওঠে কবিতা সরকার। বোধহয় চোখের একটা ছলছল সজলতার বেহায়াপনা লুকিয়ে ফেলবার জন্য মাথা হেঁট করে। আর, পরিমল চৌধুরী কোন কথা না বলে শুধু দুই চোখ অপলক করে পিপাসিতের মতো কবিতা

সরকারের সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—বলুন না, আপনি কথা বলছেন না কেন? আপনার আপত্তি আছে কি? পরিমলের গলার স্বরও ছটফট করে ওঠে।

কবিতা সরকার বলে—একটুও আপত্তি নেই।

স্টাফের প্রায় সকলেই একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে মুখ ঘুরিয়ে দীনুবাবুর দিকে তাকায়। সকলের চোখে যেন একটা নীরব প্রশ্ন ছটফট করছে—এ কি ব্যাপার দীনুবাবু? এ কি হলো?

দীনুবাবু একটুও আশ্চর্য না হয়ে, এবং প্রসন্নভাবে একটা হাই তুলে হেসে ফেলেন।—যা হবার ছিল, তাই হলো।

ন তু ন শা লি ক

এই জায়গাটার নাম কাঁকুলিয়া। গেঁয়ো চব্বিশ পরগণা আর সহুরে কলকাতা এখানে এসে এখনো একদেহে লীন হতে পারেনি, বরং তার উল্টোটাই সত্য। দু'জনে যেন আক্রোশে পরস্পরের গলা টিপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সহরের ইচ্ছে গেঁয়োকে উদ্বাস্তু করতে, গেঁয়ো চাইছে সহরের অনধিকার প্রবেশের উৎপাতকে ট্রামলাইনের ওপারে ঠেলে রাখতে। তবু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়—লোহা লক্কড়, কাঁচ কংক্রীট, গ্যাস পীচ আর বিদ্যুৎ নিয়ে সহরের এই রাবুণে আক্রমণে গাঁয়ের সাঁতেপণা আর বেশী দিন চলবে না।

মাঠের ওপর দিয়ে যে সরু এবড়ো-খেবড়ো সুরকি-ছড়ানো রাস্তাটা রেল লাইন পর্যন্ত পৌছেছে, তারই ওপর একজায়গায় মাধবী-নিবাস। ছোট বাড়িটা একেবারে আগাগোড়া লতাপাতায় ঢাকা! নোনাধরা বিবর্ণ একটি থামের গায়ে সিমেন্টে গাঁথা নামটা এখনো লতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে আছে। বাড়ির পেছনে একটা ডোবা, ঝুমকো জবার ডালগুলি প্রায় জলের ওপর নুয়ে থাকে। বাড়ির কর্তা রঘুনাথবাবু গ'ড়েহাটা রোডের ওপরেই এক কাঠের আড়তে হিসেব লেখার কাজ করেন।

কাছাকাছি আর বাড়ি ছিল না। সম্প্রতি কয়েকটা হয়েছে। কাঁকুলিয়ার নারকেলের ঝালরের ঝিরঝিরে ছায়ার নীচে সে-বাড়িগুলি বেশী বেমানান হয়নি। সবই দালান বাড়ি বটে, তবে তাদের গায়ে গাঁয়ের আদরটুকু মাখা থাকে—দোপাটির বেড়া, উঠোনের কোণে একটা গন্ধরাজ, পেছনে দু-চারটে কুমড়োর মাচা। এক বাড়িতে গায়ে-হলুদের উলু দিলে—দূরে ও নিকটে বিশটা বাড়িতে

শোনা যায়। সবাই বুঝতে পারে, নিতাবাবুর ভাইঝি পারুলের বিয়ে।

রঘুনাথবাবু ছাড়া মাধবী-নিবাসে আর যারা থাকে, তারা সংখ্যায় বেশী নয়। রঘুনাথবাবুর স্ত্রী, মেয়ে সুধা আর ছেলে ভম্বল—যার বয়স মাত্র সাত বছর। মাধবী-নিবাসের এই ক্ষুদ্র পরিবারের গৃহবলিভুক্ কুকুরটার নাম নেলো। একটু রোগাটে চেহারা, হয়তো ভাল করে খেতে পায় না বলেই। নেলোর কান্তিহীন পাহারাই মেধাবী-নিবাসের আসল প্রাচীর। নেলো সিঁড়ির ওপর শুয়ে শুয়ে ধোঁকে, কিছুক্ষণ ঘুমোয়, পর মুহূর্তেই একটা মেঠো ইঁদুরকে তাড়া করে সীমানার ওপার করে দিয়ে আসে।

আর আছে দুটো গরু, তার মধ্যে একটার নাম নতুন শালিক। এ নাম ভম্বলের দেওয়া। নতুন শালিককে কখনো খুঁটোয় বাঁধতে হয় না। নিজের মনেই বাড়ির আশে পাশে চরে বেড়ায়। কাছাকাছি যদি কখনো দেখতে না পাওয়া যায়, ভম্বল পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ে—নতুন শালিক…। নতুন শালিক তখন হয়তো স্লিট ট্রেঞ্চের ধারে কচি ঘাস চিবিয়ে ফিরছে। ডাক শুনেই সাড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে।

সুধা কলেজে পড়ে। অনেক কষ্ট করে পড়তে হয়। ঘরেকাচা কালো-পাড় মিলের শাড়ি দিয়েই সুধাকে সাজ-সজ্জা সারতে হয়। এর ওপরে যাবার মতো আর্থিক সামর্থ্য ওদের নেই। স্যাণ্ডেল পায়ে দু'মাইল পথ হেঁটে কলেজ যাওয়া-আসা সুধার অভ্যাস হয়ে গেছে। বিকেলে যখন ক্লান্ত হয়ে, ঘামে ভিজে, রোদে ঝলসানো মুখ নিয়ে সুধা ঘরে ফেরে, তখনো ওকে সুন্দর দেখায়।

আজ না হয় রঘুনাথবাবু মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল আর অশক্ত দেহ নিয়ে কাঠের আড়তে হিসেব লিখছেন! কিন্তু তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনের দুঃখে-সংগ্রামে ও আদর্শে পোক্ত একটি মেরুদণ্ড আছে, যা কোন আন্দামানের লগুড়ের আঘাত ভাঙতে পারেনি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সুধা হয়েছে বাপেরই উপযুক্ত মেয়ে। কাব্যি করে বললে অত্যুক্তির মতো শোনায়, তবু কথাটা সত্যি—সুধা যেন রঘুনাথবাবুর ছেলেবেলায় দেখা মুক্তির স্বপ্ন, আবার নতুন করে দুরন্ত হয়ে উঠেছে। সুধা পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছে, তবু রঘুনাথবাবু কোন নিষেধ করতে পারেন না। সেটা যেন নিজেকেই নিষেধ করা হবে। তাছাড়া সুধা তো পাশ করে যাচ্ছে ঠিক—পয়সার অপব্যয় হচ্ছে না।

রঘুনাথবাবু বলতেন—সুধা, তোদের আন্তর্জাতিকতার কথাগুলি আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সুধা—আমরা সবদেশের দুঃখীদের মুক্তি চাই, সর্বজাতির পীড়িতদের সেবা-

করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর পীড়িতেরা সবাই মিলে যেন একটি জাত!

রঘুনাথবাবু—আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু সর্বজাতির পীড়িতদের একত্রে পাবি কোথায়, যে সেবা করবি?

সুধা—আমাদের আশেপাশেই তারা রয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষেতে মাঠে অফিসে কারখানায়।

রঘুনাথবাবু—আমিও তো তাই বলি। তবে মিছে আমাদের ঘরকুনো বলে নিন্দে করিস কেন?

সুধা হাসতে থাকে।

একটা পার্টি আর সমিতি আছে, সুধা তারই সদস্যা, অথবা ভলান্টিয়ার, কর্মিনী বা ব্রতিনী যে-কোন আখ্যা দেওয়া যায়। বর্মা থেকে হৃতাশ্রয় শত শত অভাগা প্রতিদিন শেয়ালদায় ট্রেণ থেকে নামে। রোগে অনাহারে ও পথক্লেশে জীবগুলি যেন সারা হয়ে গেছে। মাড়োয়ারী সেবা সমিতির রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে পার্টির নির্দেশ মতো সেবা-কমিটির সহকর্মিনীদের সঙ্গে সুধাকে খাটতে হয়। প্রায়ই কলেজ কামাই হয়। বাড়ি ফেরে হয়তো রাত্রি এগারটা বারটায়। আশ্রয়-প্রার্থিনী মেয়েদের কোলের ছেলেদের দুধ জ্বাল দেওয়া থেকে শুরু করে খিচুড়ি-তরকারী রান্না পর্যন্ত, সব কাজ শেষ করে হলুদ-মসলার দাগে শাড়ীটার দফা সেরে সুধা বাড়ি ফেরে।

মাধবী-নিবাসের সামনে একটা পতিত জমি শুধু কচুবনে ছেয়ে ছিল। আজ কমাস ধরে সেখানে একটা বাড়ি উঠছে। বড় বড় মার্বেলের স্ল্যাব আসছে, নানারকম ইস্পাতের ফ্রেম, সেগুনের চৌকাঠ, ঘসাকাঁচের সার্সী। রোজ সকাল বিকেল ইঞ্জিনিয়ারেরা এসে তদ্বির করে যান। বাড়িটা একমহল দুমহল করে চড়ে উঠছে। একটা অতিকায় কংক্রীটের সরীসৃপ যেন ফণা তুলে উঠতে উঠতে চারতলায় এসে শান্ত হলো।

বাড়িটার নামকরণ হয়ে গেল—দি সান্নি নুক—The Sunny Nook, কিন্তু গৃহপ্রবেশের দিন সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে এক কেলটে চেহারার বাঙালী-সাহেব পরিবার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিল। মিঃ এন কে (নিশিকান্ত) রায়, তাঁর স্ত্রী ও একটি তরুণী—অর্থাৎ বুড়োবুড়ী ও তাঁদের মেয়ে। এক বছর পার হয়ে গেলেও পাড়ার কোন ভদ্রলোক এঁদের কুলশীলের কোন খবর পেল না। এঁরা কারও সঙ্গে মেশেন না, সমোটর বাড়িতে ঢোকেন এবং সমোটর বেরিয়ে

যান। চাকর মালী খানসামা ও ড্রাইভার নিয়ে একটা ভৃত্যগোষ্ঠী আছে। কিন্তু তারাও কেমন একটু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। প্রতিবেশী কোন ভদ্রলোক প্রশ্ন করলে মালীটা তবু কথা বলে উত্তর দেয়, খানসামা ইঙ্গিতে হাঁ-না জানিয়ে দেয়, গোয়ানীজ ড্রাইভারটা তাকাতেই চায় না। কিন্তু সাতহাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখলেই কি অন্দরের পরিচয় আটকে রাখা যায়? তাহলে আর মহেঞ্জোদাড়োর রহস্য আবিষ্কৃত হতো না।

এন-কে রায় একজন ব্যাঙ্কার এণ্ড জেমিন্দার। সরল করে বললে বলা যায়—গোটা দশেক লোন অফিস হয়তো আছে, যার কারবারী কীর্তি আসলে কাবুলী নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়, তার ওপর কর্ণওয়ালিশী কৌলীন্যের কৃপা। পার্থক্যের মধ্যে—হিসেবটা ইংরাজীমতে রাখা হয়, চোরা অডিটার দিয়ে খাতা গুছিয়ে রাখে ইন্‌কমট্যাক্সকে ফাঁকি দেবার জন্য। একটা অসদোপার্জ্জনকে গালভরা নাম দিয়ে রেজিষ্টারী করে যেসব ক্ষুদে ক্ষুদে জগৎশেঠ দেশকে বিকিয়ে দিতে বসেছে, এন-কে তাদেরই একজন। শোনা যায় বিলিতি বুলেটের চেয়ে আমাদের দমদম বুলেট আরো ভয়ঙ্কর।

সান্‌নি মুকের ফটকের লোহার জাফ্‌রির ওপারে একটা ভীষণদর্শন টেরিয়ার সারাদিন মেজাজের গরমে চীৎকার করে ফেটে পড়তে থাকে। ফেরীওয়ালা, ভিক্ষুক বা ঠুলি-লাগামের সাজ-পরা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া—পথ দিয়ে যেতে দেখলেই টেরিয়ারের বৈরনির্য্যাতনের উৎসাহ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দরজার গরাদ নখ দিয়ে সরোষে আঁচড়াতে থাকে।

মেয়েটির নাম মীর্ণা। নামটা আগে হয়তো মীনা ছিল, এখন ফিরিঙ্গিয়ানায় অলঙ্কারের ভারে মীর্ণা হয়ে গেছে। যেসব লোক সন্ধ্যায় চায়ের আসরে এসে হাসাহাসি করে, এ'নাম হয়তো তাদেরই দেওয়া। অথবা মিস্‌ রায় নিজেই সাধ করে নিয়েছে। মীর্ণাও কলেজে পড়ে, কিন্তু এমন একটা কলেজে যেখানে বার আনা ছাত্রী সাদা-কালো দো-আঁসলা জাতের মেয়ে আর বাকী চার আনা বিশুদ্ধ সাদা। এ কলেজের মেয়েরা অনেকে মদ খায়, সিগারেট খায়, সাইকেল চড়ে, বাস্কেট বল খেলে। মীর্ণা রায় সিগারেট খায়, গোপনে মদ খেতে আপত্তি নেই—যদিও বুড়ো এন-কে এখনও এ খবর জানে না। তবে সাইকেল চড়তে পারে না মীর্ণা—বয়সের অনুপাতে চেহারাটা বড় বেশী মুটিয়ে গেছে। বাস্কেট বল খেলতে গিয়ে কোমরে চোট লেগেছিল প্রথমদিন, তারপর ওপথ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

মীর্ণা রায়ও ঐ পার্টি আর সমিতিটার সদস্যা। সন্দেহ হতে পারে সমিতিটা

কি বারোয়ারী গাজনতলা যে, যার ইচ্ছা সেই এসে একবার ঢাক পিটিয়ে নেচে যাবে? কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই? নেই নিশ্চয়, নইলে মীর্ণা রায় এখানে কি করে ঢুকতে পারে?

আরও আশ্চর্যের বিষয় মীর্ণা রায় ঐ সমিতির খাসদরবারের একজন। সুধার মতো আর সব মেয়ে-কর্মীদের কাছে এটা ধাঁধাঁর মতো লাগে। সমিতির পরিচালকদের সদ্বুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কিন্তু সুধার মতো মেয়েদের অহমিকা এখনো এত প্রখর হয়ে ওঠেনি, তাই বিসম্বাদ সৃষ্টি করতে ওরা চায় না। সাধনার ক্ষেত্রে এখনো ওরা ছাত্রী হয়েই থাকতে চায়—শিক্ষা নিতে চায়—পরীক্ষা দিতে চায়। তাই ওরা চুপ করে থাকে।

কিন্তু মিষ্টার এন-কে কোন্ পরাণে এই ক্ষুরস্য ধারা ইব সমাজসেবার পথে মেয়েকে ছেড়ে দিলেন?

এন-কে শুনেছিলেন যে সমিতিটার আদর্শ হলো আন্তর্জাতিক সেবা। কথাগুলি বড় গোলমেলে লেগেছিল। পরে অনেক ভেবেচিন্তে বুঝলেন, বোধ হয় সি-এস-পি-সি-এ'র মতো কোন নিরীহ প্রতিষ্ঠান হবে। কুমার শিবেন্দ্র ভৌমিকের মতো বিলেতফেরত জমিদার বাচ্চাও যখন এই সমিতির আদর্শকে বেছে নিয়েছে. তখন মীর্ণাও সেই দিকে যাবে; ভবিষ্যতে যে-দুজনের জীবন দাম্পত্যের বন্ধনে ধরা দেবে, আজ আদর্শের আসরে তারা ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। এন-কে খুসীই ছিলেন—সমিতিটা বেশ সুন্দর ঘটকালি করছে।

সমিতির বৈঠকে সুধা আর মীর্ণার মধ্যে কয়েকবার মুখোমুখি দেখা হয়েছে, কিন্তু বার্তা বিনিময় হয়নি কখনো। কাঁকুলিয়ার পথেও দেখা হয়েছে—কতবার চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু দুজনের মাঝে যেন এক বৈতরণীর ব্যবধান, এমনি-ভাবেই তারা দু'জনে দু'জনকে তাকিয়ে দেখে। তবু এদের ব্রত এক, আদর্শ এক, বৈঠকের প্রস্তাবে দুজনে সমান আগ্রহে হাত তুলে সম্মতি জানায়।

মীর্ণা রায় সত্যিই যেন আন্তর্জাতিকতার একটি চলচ্চিত্র। অঘ্রানের সন্ধ্যায় কাঁকুলিয়ার বাতাসে এমন কিছু হাড়কাঁপানো হিম থম্‌থম্ করে না; মীর্ণা রায়ের ফারের পোষাক দেখে মনে হয়—আল্‌সের কোন উপত্যকার এক কুকুর-সঙ্গিনী মেয়ে বরফঢাকা পাহাড় ডিঙোতে চলেছে। চায়ের আসরে কত জাতের লোক যে আসে তার বর্ণনা চলে না। আসরেতে সমিতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে অভ্যাগতদের বোঝানো হয়। বেঁটে বেঁটে চীনে কাপ্তেন, ঢ্যাঙা মার্কিন মিলিটারী অফিসার, ইংরেজ সাংবাদিক—তাছাড়া দিশী রমের বোতলের মত দীনহীন চেহারা প্যান্টালুন-পরা বাঙালী প্রফেসর আসে। এইসব বিচিত্র

মসলা দিয়ে তৈরী এক অদ্ভুত আন্তর্জাতিকতার সালাড চেটে সন্ধ্যায় সান্নি মুক তৃপ্তির উদ্গার তোলে। ভবিষ্যতের এক গিল্টিকরা সোনালী ফেরদৌসের স্বপ্নে এদের ভাবনায় রিমঝিম সুখের আবেশ লাগে। মীর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকের তামাকের পাইপ হাত থেকে ফস্কে পড়ার উপক্রম হয়। সব শেষে মীর্ণা রায় এক প্যাকেট চকোলেট উপহার দেয়—কেনাডিয়ান সৈন্যদের জন্য। ধন্যবাদ, সাধুবাদ, স্তুতি ও অভিনন্দের ঝড় জেগে ওঠে।

ভম্বল স্কুলে ভর্তি হয়েছে। রঘুনাথবাবু একটু চিন্তায় পড়লেন—মাসিক খরচের অঙ্ক বাড়লো। উপরি কয়েকটা টাকার সংস্থান না হলে আর চলে না। কাজেই মাধবী-নিবাসের সঙ্গে সান্নি মুকের একটা যোগসূত্র দেখা দিল। একদিন দেখা গেল, ধরণী গয়লা নতুন শালিককে হেঁচড়ে নিয়ে এসে সান্নি মুকের ফটকের কাছে দাঁড় করালো দুধ দুইবার জন্য।

খাঁটি দুধের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। রঘুনাথবাবু রায়-সাহেবকে দুধ বেচছেন আজকাল। ধরণী দুধ দোয়, ভম্বল কাছে দাঁড়িয়ে দেখে। মীর্ণা আর বুড়ো এন-কে পায়চারী করে বেড়ান। সতর্ক দৃষ্টি রাখেন—দুধে জল মেশানো হচ্ছে কিনা।

দুধের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে তবু সংশয় ও অভিযোগের অন্ত ছিল না। মীর্ণা প্রায়ই ভম্বলকে বলে—তোমার বাবাকে বলে দিও খোকা, গরুটার দুধ ভয়ানক খারাপ। এরকম হলে দাম কাটা যাবে।

মীর্ণা আসলে এই গরুটাকে পছন্দই করতো না—বোধহয় ঐ নামটার জন্য। এক একদিন বিদ্বেষ চেপে রাখতে পারতো না মীর্ণা। ভম্বলকে আবার কথা শুনতে হতো—খোকা, গরুর নাম শালিক রেখেছ কেন? তোমার নাম যদি বুল ডগ রাখা হয়, তবে সেটা কি ভাল শোনাবে?

শেষকালে নতুন শালিককে নিয়েই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল।

রবিবারের বিকেলবেলা সুধা জানালার ধারে বসে বই পড়ছিল—নব্য-রুশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। জাতির মুক্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী চাষী-মজুরের প্রচণ্ড সংগ্রামের কাহিনী। তারা শত্রুকে যখন স্পষ্ট করে চিনে ফেললো, তারপর আর দ্বিধা করেনি। আভিজাত্যের জারজ হিংসার সিংহাসনকে হিড় হিড় করে টেনে নামিয়ে চূরমার করে দিয়েছিল তারা। তাদের সেই আদর্শে জোড়াতালি ছিল না, মিথ্যার সঙ্গে আপোষ ছিল না……।

সুধা দেখলো—মীর্ণা কুকুর নিয়ে পথের ওপর পায়চারী করছে। নিজের ভাবনার মাঝখানেই সুধা হঠাৎ হেসে ফেললো। ঐ মীর্ণা নাকি তারই সহব্রতিনী—এক আদর্শের সূত্রে দুজনে বাঁধা! ঘৃণায় গা শিরশির করে উঠলো সুধার। মীর্ণার আদর্শ? পথের কাঁটারাই যদি নিজেদের পথ বলে জাহির করে! আদর্শের মিল? কোথায়? এ-যে জীবন দিয়ে গড়া ব্যবধান! মিটিংয়ের কোন কোরাস সঙ্গীতের নাকিসুর এই ব্যবধান ভেঙে মিলিয়ে দিতে পারবে না। সমিতিটারও যেন কেমন মতিচ্ছন্ন হয়েছে! কয়েকটা বড়লোক কিছু মোটা চাঁদা দেয় বলেই কি এমনভাবে মুখ বুজে অনধিকারীর নষ্টামি সইতে হবে?

কুকুরের ঝগড়ার বিদ্ঘুটে চীৎকারের শব্দ। সুধা তাকিয়ে দেখলো—টেরিয়ারে আর নেলোতে মারামারি লেগে গেছে। নেলোটা যদি এখনো ভালয় ভালয় পালিয়ে যায়, তবে বাঁচতে পারে। কিন্তু নেলো যেন ক্ষেপে গেছে, মরিয়া হয়ে টেরিয়ারের ওপর দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বার বার। টেরিয়ার নেলোর টুঁটি কামড়ে মাটির ওপর এক ঝাপটে চিৎ করে চেপে ধরলো।

অসহায়ের মতো ছটফট করছে নেলো—চীৎকার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তার ওপর ড্রাইভারটা একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসছে—একটি বাড়ি দিয়ে নেলোকে সাবড়ে দেবে; পরিত্রাহি চীৎকার করছে মীর্ণা।

চারপায়ের ক্ষুরের দাপটে কাদা ছিটকে কোথা থেকে গোঁ গোঁ করে শিং উঁচিয়ে দৌড়ে এল নতুন শালিক—নেলোকে উদ্ধার করতে। তার মনের প্রতিজ্ঞা শিং দুটোর তীক্ষ্ণতা দেখেই বুঝতে পারা যায়—টেরিয়ারকে না ফুঁড়ে দিয়ে সে আর ফিরছে না।

নেলোকে ছেড়ে দিয়ে টেরিয়ার সভয়ে দূরে সরে গেল। ড্রাইভার লাঠি নিয়ে নতুন শালিকের পিঠে বসিয়ে দিল ঘা'কতক। নতুন শালিক মার খেয়ে পালিয়ে গেল অন্য দিকে। মীর্ণা রায় এই সংগ্রামের আবর্তের মধ্যে পড়ে আতঙ্কের শক লেগে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

নেলো পালিয়ে এসে মাধবী-নিবাসের সিঁড়ির ওপর বসে ধুঁকতে লাগলো। সুধা দেখলো—ওর গলার মাংস গভীর হয়ে ছিঁড়ে গেছে, হয়তো বাঁচবে না।

মীর্ণা রায়ের সত্যি শক লেগেছিল। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে তখন, সান্নি স্কুলের তেতালার একটা ঘরে পাখার নীচে বসেছিল মীর্ণা। বুকের দুরুদুরু ভাবটা তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। গেঁয়ো কাবুলিয়া যেন চক্রান্ত করে আজ

তাকে আক্রমণ করেছে। জোনাকীগুলি দলে দলে ঘরে এসে ঢুকছে। একটা মশার ঝাঁক আলোর বাল্‌বটাকে মারমুখো হয়ে ঘিরে ধরেছে। ডানা-ওয়ালা বেঁটে কচ্ছপের মতো চেহারা, একটা গুব্‌রে পোকা রুষ্ট গুঞ্জন তুলে, ঝুপ করে মীর্ণার কোলের ওপর পড়ে আক্রোশে ছটফট করতে লাগলো। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো মীর্ণা।

সকালবেলা রঘুনাথবাবুকে সান্নি স্কুকের চাকর খবর দিয়ে গেল—ব্যারামী গরুর দুধ আর চাই না। অবিলম্বে যেন বকেয়া দাম মিটিয়ে নিয়ে চলে যান।

বিকেলবেলা সমিতির জরুরী বৈঠকে সুধা দেখলো—সমিতির নেতা উপ-নেতা মোড়ল দালাল সবাই উপস্থিত, শুধু নেই মীর্ণা রায়। অসুস্থ বলেই আসতে পারেনি।

কলকাতার জোয়ান অব আর্ক, সেই মীর্ণা রায়ই কিন্তু প্রস্তাবটা পাঠিয়েছেন, পেশ করলেন কুমার শিবেন্দ্র। প্রস্তাবের বক্তব্য—

সমিতির আন্তর্জাতিক সেবার আদর্শে অনেক বদ্‌জাতির ভেজাল ঢুকতে আরম্ভ করেছে। সভ্যতালিকা পার্জ করা হোক্। সন্দেহভাজনদের নাম রিপোর্ট করতে একটি কমিটি গঠনের আজ্ঞা হয়।

নেতাগোছের লোকগুলিই আগে হাত তুলে সায় দিল। মুহূর্তের মধ্যে সুধার চোখের সামনে থেকে যেন একটা ঝাপ্‌সা পর্দা সরে গেল। সুধার মনে হল, কতকগুলি হালফ্যাসানের অঘোরপন্থী যেন কারও মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য হাত তুলে রয়েছে।

সুধাও তাড়াতাড়ি হাত তুলে প্রস্তাবে সায় দিল। সে জানে এখানে এই তার শেষ হাত তোলা।

পি ছু ডা কে

জেঠিমা, মেজমামী আর হেনা-বউদি, তিনজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে আর একসঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। সবারই মুখে এক জিজ্ঞাসা—কই, শুভা তোর বাক্সটা কোথায়?

শুভা বলে—ওই তো।

তিন জনেই আবার একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বাক্সটার কাছে এগিয়ে এলেন।

শুভা জিজ্ঞাসা করে—কী ব্যাপার?

জেঠিমা বললেন—বাক্সটা বেশি ভারি হয়ে গিয়েছে। একটু হালকা করে দিতে হবে।

জেঠিমার কথার সরল অর্থ এই যে বাক্সের ভিতরে এত বেশি জামা-কাপড় ঠাসা হয়েছে যে বাক্সটা খুব ভারি হয়েছে। যাতে বাক্সটা বেশ-একটু হালকা হয়ে যায়, সেজন্যে যা করা দরকার, তিনি তাই করতে চান। তার মানে, কিছু কাপড়-জামা বের করে নিতে হবে।

মেজমামী বলেন—তা ছাড়া, বাক্সের কাপড়-জামা একটু ভাল করে সাজিয়ে ও গুছিয়ে দিতে হবে।

হেনা-বউদি বলেন—বাড়িতে এত লোক থাকতে মণ্টুকে কে সরদারী করে এই বাক্স সাজাতে বলেছিল!

শুভা বলে—আমি বলিনি। মণ্টু নিজেই বললে, দিদি, আমি তোমার সব কাপড় জামা নতুন বাক্সে ভরে দিয়েছি।

ঠিক কথা, দশ বছর বয়সের মণ্টুর পক্ষে শুভার বাক্স ঠিকমত সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই জেঠিমা মেজমামী আর হেনা-বৌদি আবার নতুন করে শুভার বাক্স সাজিয়ে দিতে আর একটু হালকা করে দিতে চান। শুভার পুরানো বাক্স থেকে কাপড়-জামা আর টুকিটাকি আরও সব জিনিস তুলে নিয়ে নতুন বাক্সের ভিতরে এলোমেলো ঠেসে দিয়েছে মণ্টু, সবাই তাই সন্দেহ করেছেন।

শুভার বিয়ে হয়েছে কাল। আজ এই বিকেলে শুভাকে নিয়ে বর আর বরযাত্রীরা সব একটি মোটরবাসে রওনা হয়ে যাবে ধানবাদ থেকে গিরিডি। রাত আটটার মধ্যেই ওরা গিরিডি পৌঁছে যাবে, সেখানে নববধূকে ঘরে তুলে নেবার জন্যে বরণডালা আর শাঁখ বোধহয় এরই মধ্যে তৈরী হতে শুরু করে দিয়েছে।

রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। বরকর্তা বলেছেন, ঠিক তিনটে একুশ মিনিটে যাত্রালগ্ন। তার মানে আর কুড়ি মিনিট বাকি আছে।

শুভার সাজ আগেই সারা হয়ে গিয়েছে। হেনা-বউদি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে নিজের হাতে শুভাকে সাজিয়েছেন। তখন কিন্তু কারো মনে হয়নি যে শুভার বাক্সটাকে একটু ভাল করে সাজিয়ে দেওয়া দরকার। যেন বাক্সটা একটু হালকা হয়। যেন বাক্সের ভিতরে কোন ভুল না থেকে যায়।

তিনজনের এই ব্যস্ততা যেন একটা সন্দেহের আর উদ্বেগের ব্যস্ততা। সবারই হঠাৎ মনে হয়েছে যে শুভার বাক্সের ভিতরে একটা ভুল নিশ্চয়ই থেকে গিয়েছে। মণ্টুর বুদ্ধি আর কতটুকু।

জেঠিমা এক এক করে এক-একটা শাড়ী টেনে বের করছেন আর কী যেন দেখছেন। কিন্তু দেখতে না পেয়ে আবার একটা শাড়ীকে নামিয়ে ফেলেন।

মেজমামী চোখ দুটোকে বাক্সের কাছে নিয়ে এসে কী যেন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন।

শুভা যার নাম, যে-মেয়ের কাল বিয়ে হয়েছে, সে-মেয়ের বয়স আজ বাইশ বছর তিন মাস। আজ থেকে চার বছর আগে, সেদিন এই মেয়ের বয়স ছিল মাত্র আঠার বছর তিন মাস, সেদিনও এই মেয়ে নববধূ হয়ে নতুন জীবনের পথে যাত্রা করেছিল। কিন্তু মাত্র আট মাস পরেই সিন্দুর মুছে দিয়ে সেই মেয়েকে আবার ধানবাদের এই বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

প্রত্যেকে দুঃখিত হয়েছিলেন, আত্মীয়েরা ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন—শুভার আবার বিয়ে দেওয়া হোক। বিধবার বিয়ে তো দোষের কিছু নয়। তা ছাড়া এই বয়সের মেয়েকে সারা জীবন বিধবা থাকতে দেওয়া চলে না। ওরকম নিষ্ঠুরতার কোন অর্থ হয় না।

সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছিলেন শুভারই শাশুড়ী। তিনি বার বার শুভার বাবাকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন—বিয়ে দিন অনাদিবাবু। আমরা সবাই চাই, শুভার আবার বিয়ে হোক।

আবার বিয়ের কথা শুনে শুভাও কোন বিদ্রোহ দেখায়নি। শুধু কয়েকটা দিন খুব কেঁদেছিল। তার পর শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

কোন সন্দেহ নেই, শুভা খুশি হয়েছে। আজই সকালে বরযাত্রীদের সামনে বসে শুভা তিনটে গান গেয়েছে। শুভার মাথায় সিঁদুর দেখে শুভার চোখ একবার শুধু একটু ছলছল করেছিল, তারপর সেই ছলছলে চোখই হেসে উঠেছিল।

কিন্তু যাত্রা-লগ্নের কুড়ি মিনিট আগে হঠাৎ এই তিন অভিভাবিকা এত উদ্বিগ্ন আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? মণ্টুর বুদ্ধির ওপর এত সন্দেহ বা কেন দেখা দিল?

শুভাও স্পষ্ট করে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কেন সবাই বাক্সটাকে হালকা করে দেবার জন্যে আর ভাল করে সাজিয়ে দেবার জন্যে এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সত্যি কথা, মণ্টুর বয়স দশ বছর হলেও মণ্টুর বাক্স-সাজাবার দক্ষতা কারও চেয়ে কম নয়। এই তো মাত্র দশ মাস আগে হেনা-বউদির বোন সুলেখার বিয়ে তো ধানবাদের এই বাড়িতেই হয়েছিল। সুলেখার বাক্সে কাপড় জামা ভরেছিল আর সাজিয়ে রেখেছিল এই মণ্টু। কই, সেদিন তো

এরা কেউ আপত্তি করেনি। কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে সুলেখার বাক্স হালকা করবার জন্যে ছুটে আসেনি।

বাক্সটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। প্রায় সব কাপড়-জামা বাক্সের ভিতর থেকে বের করে ফেললেন জেঠিমা। মেজমামী হঠাৎ বলে ওঠেন—এই তো! পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে হেনা-বউদি বাক্সটার ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে একটা বস্তু তুলে নিলেন। হাঁফ ছাড়েন জেঠিমা—যাক, এবার সব কাপড়-জামা বাক্সের ভিতরে ভরে দাও হেনা।

মেজমামী হাসেন—সত্যি কথা, হেনা কিন্তু মণ্টুর মতো অত সুন্দর করে বাক্সের ভিতরে কাপড়-জামা সাজিয়ে দিতে পারবে না।

হেনা-বউদিও হাসেন—পারতাম, কিন্তু আর তো সময় নেই।

শুভার দুই চোখ এই বার অপলক হয়ে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হেনা-বউদি যে বস্তুটাকে বাক্সের ভিতরের কাপড়-জামার শেষ স্তরের তলা থেকে তুলে নিয়ে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন, সে বস্তুটির পরিচয় জানে শুভা। আজ প্রায় তিন বছর ধরে এই বস্তুটি এই বাক্সের কাপড়-জামার শেষ স্তরের আড়ালেই পড়ে ছিল।

একটি ফটো। চার বছর আগের ফটো। শুভার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে নবেন্দু; শুভার স্বামী নবেন্দু। সে নবেন্দু আজ আর নেই। নবেন্দু আজ নেহাতই একটি ফটোর নবেন্দু। এই ফটো আজকের নবেন্দু-শুভার বাক্সের ভিতরে একটুও মানায় না। খুব ভুল হবে, যদি ওই ফটো শুভার বাক্সের ভিতর থেকে যায়।

শুভা চুপ করে বসে দেখতে থাকে, হেনা-বৌদি আবার সায়া, কাপড়-জামা নতুন বাক্সের ভিতরে ভরে দিলেন।

বাইরের বারান্দা থেকে অনাদিবাবু ডাক দেন—কই তোমরা সব কোথায়?

জেঠিমা বলেন—আয় শুভা।

শুভা হাসে—বাক্সটা এইবার বোধহয় খুব হাল্কা হয়ে গিয়েছে, জেঠিমা?

জেঠিমা—অ্যাঁ? কি বললি?

শুভা আবার হাসে, আর হাসতে গিয়ে, দুই চোখ জলে ভরে যায়।—ঠিকই সত্যি, বাক্সটা এইবার খুব হাল্কা হয়ে গেল।

সিদ্ধপুরুষ

রামগড় থেকে রাজপুর কলিয়ারীতে যাবার সড়কে একুশ মাইল-স্টোনের কাছে এসেই হঠাৎ ব্রেক কষে ছুটন্ত জীপ গাড়ির দুরন্ত আবেগ থামিয়ে দিল লোকনাথ, কলিয়ারীর এনজিনিয়র চরণবাবুর ছেলে।

লোকনাথ বললে—দেখবেন তো চলুন, অডিটারবাবু। এখানে একজন সিদ্ধপুরুষ থাকেন।

—সিদ্ধপুরুষ?

লোকনাথ—হ্যাঁ, একজন খাঁটি সিদ্ধপুরুষ। উনি গাছের ভাষা বোঝেন, গাছের সঙ্গে কথা বলেন। গাছেরা, যত শাল, কেঁদ, মহুয়া আর পিয়ালেরা ওঁকে খুব ভালবাসে। সবচেয়ে বেশি ভালবাসে একটি আমগাছ।

সড়ক থেকে সামান্য একটু দূরে, যেখানে ফাঁকা শালবনের পাশে মুণ্ডাদের গাঁয়ে মাদল বাজছে আর অনেক-পুরনো কয়েকটা ইটখোলার ধ্বংসের গায়ে শেয়ালকাঁটার জঙ্গলের উপর হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে একটা একলা আমগাছের ছায়ার কাছে ছোট্ট একটা ঘর; ইটের দেয়াল আর খাপ্‌রার চালা।

লোকনাথ বললে—ওই, ওই ঘরটাই হলো সিদ্ধপুরুষের আস্তানা।

—চল, দেখে আসি।

সড়ক থেকে নেমে, ফাঁকা শালডাঙ্গার চোরকাঁটা মাড়িয়ে সেই ঘরের দিকে যেতে যেতে লোকনাথ বললে—এই সিদ্ধপুরুষের বয়স তিনশো বছরের বেশী ছাড়া কম নয়। কলিয়ারীর কম্পাসবাবু বলেন, অন্তত পাঁচশো বছর হবে। ঠিক কবে আর কোথা থেকে তিনি এখানে এসে আস্তানা করলেন, তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। বোশেখ মাসে যখন পাহাড়-পোড়ানো গরম বাতাসের হল্কা লেগে মাঠের গরু মরে যায় আর ঘরের মানুষেরা ছটফট করে, তখন গাছেরা ঠাণ্ডা বাতাস বইয়ে দিয়ে সিদ্ধপুরুষের আস্তানাটিকে ঠাণ্ডা করে রাখে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যে-রাতের আকাশে পূর্ণমাসীর চাঁদ ঝলমল করে জ্যোৎস্না ছড়ায়, সে-রাতে সিদ্ধপুরুষের ঘরের আঙিনার এই আমগাছ চমৎকার একটি সুন্দরী মেয়ে হয়ে আর হেসে-হেসে সিদ্ধপুরুষের কাছে এসে দাঁড়ায়। কম্পাসবাবু দেখেছেন, রাজপুর থানার সেকেণ্ড অফিসার নিমাইবাবুও দেখেছেন, সেই চমৎকার সুন্দরীর সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন সিদ্ধপুরুষ।

ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন সিদ্ধপুরুষ। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি। কিন্তু এ কী? এরকম অদ্ভুতভাবে দুই চোখ অপলক করে তিনি আমাকে দেখছেন কেন?

সিদ্ধপুরুষ বললেন—তুমি তো বিমলের বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিদ্ধপুরুষ—আমাকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। চিনতে পেরেছি। আপনি হলেন বিমলের মামাবাড়ির ভোলাদা। সেই যে, আজ বোধহয় ত্রিশ বছর হলো, আপনি বর্ধমানে চলে গেলেন, তারপর আর আপনাকে দেখিনি। শুনেছিলাম, আপনি বিয়ে করেছেন।

ভোলাদা—হ্যাঁ, বিয়ে হবার পর রেলওয়ের ইট সাপ্লাইয়ের কণ্ট্রাক্ট পেয়ে এখানে এসে আর এই ঘরটি তৈরী করিয়ে সস্ত্রীক ঠাঁই নিয়েছিলাম। তারপর আর বেশী দিন নয়, একটা বছরও পার হয়নি, তিন দিনের জ্বর সহ্য করতে না পেরে সে চলে গেল। একলা হয়ে এই ঘরে শুধু রয়ে গেছি আমি।

—কিন্তু এরা যে বলছে, আপনি একজন সিদ্ধপুরুষ। পূর্ণিমার রাতে আপনার ঘরের আঙিনার ওই আমগাছের ছায়া নাকি চমৎকার এক সুন্দরী মেয়ে হয়ে আপনার কাছে দেখা দেয়।

হেসে ফেললেন ভোলাদা—না, ঠিক তা নয়। চমৎকার একটি সুন্দরী মেয়ে আমগাছের ছায়া হয়ে আমার কাছে দেখা দেয়।

—আজ্ঞে? কী বললেন?

ভোলাদা—তোমার বউদি নিজের হাতে এই আম গাছের চারা পুঁতেছিল। আর, জান না বোধহয়, তোমার সেই বউদি দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

কোন মিল নেই, তবু মিল

সেদিন সেখানে যে-কাজ করতে হয়েছিল, সেটা ছিল রিলিফের কাজ। আজ এখানে যে-কাজের জন্ম এসেছি, আর ক্যাম্পও করে ফেলেছি, সেটাও রিলিফের কাজ। কিন্তু পাঁচ বছর আগের সেই আগস্ট, আর আজকের আগস্টের আলোছায়ার মধ্যে কোন মিল নেই। সেই আগস্টের সকালবেলার বাতাসে যদিও হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার কামড় ছিল না, কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন মৃদু হিমের একটা মোলায়েম আমেজ ছিল। সেই আমেজের ছোঁয়াচ লেগে গরম কফির

আদও নিবিড় হয়ে যেত। তারপরেই দেখতে পাওয়া যেত, কুয়াশা গলিয়ে দিয়ে রৌদ্রের আভা কাথিড্রালের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার উপর লুটিয়ে পড়েছে। সোনার মিনারের মতো ঝলমল করছে সেই চূড়া।

আর আজ এখানে দেখতে পাচ্ছি, একটা গেঁয়ো মন্দিরের মাথার ত্রিশূল জলের উপর ভেসে রয়েছে। তার মানে বন্যার জল মন্দিরটাকে ডুবিয়ে দিয়ে ত্রিশূলের গোড়া অবধি উঠেছে। সেই আগস্টের আকাশে সূর্য ছিল, আজকের এই আগস্টের আকাশে শুধু মেঘ আর মেঘ। সন্দেহ হয়, আবার বৃষ্টি হবে। এই মেঘ সহজে সরে যাবার মেঘ নয়।

দানাপুরের আর্মি মেডিক্যালের অফিস থেকে হঠাৎ জরুরী অর্ডার এসেছে—অতঃপর কর্নেল সলিল মজুমদার কোশীর পূর্বদিকের এলাকাতে রিলিফের কাজ চালাবেন, আর কর্নেল মালহোত্র নদীর পশ্চিম দিকের এলাকার রেস্ক্যু কাজের ভার নেবেন।

শান্তিপুর থেকে বড় মাসিমারও একটি চিঠি এসেছে—বাবা সলিল, অন্তত সাতদিনের ছুটি নিয়ে একবার চলে এস।

ছুটি নিয়ে শান্তিপুর যাবার জন্য বড় মাসিমার এই তাগিদের কারণও চিঠিতে লেখা আছে। বড় মাসিমা জানিয়েছেন, তার বাগানের তিনটি ভাদুই আমের গাছ, মধুনাথ ভোজেশ্বর আর গোলবদন খুব ভাল ফলেছে। ফল পাকতে শুরু করে দিয়েছে। আর বোধহয় দশদিনের মধ্যেই সব ফল পেকে সারা হয়ে যাবে। কাজেই……।

বড় মাসিমার কাছে আজকের আমি অর্থাৎ আর্মি মেডিক্যালের কর্নেল সলিল মজুমদার বোধহয় কুড়ি বছর আগের সেই বারো বছর বয়সের সলিল, আমের লোভ দেখিয়ে চিঠি দিলেই যে-ছেলে শান্তিপুরে ছুটে যেত।

আজ এখানে আমার ক্যাম্পের একটি চেয়ারে বসে আর রিলিফ অপারেশনের চার্ট ও মাপের দিকে তাকিয়ে যে-সব গ্রামের নাম দেখছি, তাদের সঙ্গে সেইসব গ্রামের নামের কোন মিল নেই। এখানে এরা হলো, বাহাদুরগঞ্জ মকবুলপুর হারু-মারু ভিখপুরা আর চাঁদিবাজার। পাঁচ বছর আগে সেখানে যাদের বুকের উপর দিয়ে আর্মি মেডিক্যালের কনভয় ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল, তারা হলো—লাস্ত্রা কলম্বানো, সিগনা আর মন্টিলুপো। সেদিন সেখানে নদী আর্নোর জল পার হতে হয়েছিল। আজ এখানে নদী কোশীর জল পার হয়ে দুর্ভাগা গ্রামের আটক-পড়া মানুষগুলিকে উদ্ধার করতে হবে। ঘরে ঘরে ক্ষুধার খোরাক পৌঁছে দিতে হবে।

যেতে হবে মকবুলপুর, যেতে হবে চাঁদিবাজার। কিন্তু বার বার পাঁচ বছর আগের সেই ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ছে কেন? হ্যাঁ, একটা কারণ আছে। সেদিনও ফ্লোরেন্সের ভিতরে কনভয় নিয়ে ঢুকে পড়তেই হঠাৎ অর্ডার পেয়েছিলাম, মারাঠা ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে এইবার আমার মেডিক্যাল ইউনিটকেও থাকতে হবে, আর রেল-ব্রিজ দখল হয়ে যাবার পর রিলিফের কাজ করতে হবে।

ফ্লোরেন্স দখল করবার সেই দিনগুলিকেও মনে পড়ছে। বারুদের গন্ধধূমে অন্ধ হওয়া আর গোলাগুলীর শব্দে বধির হওয়া তিনটি ভয়ানক যুদ্ধের দিন। মাইনের জালে জড়িয়ে পড়ে, আর মৃত্যুময় এক-একটি বিকট বিস্ফোরণের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ওয়েস্ট কেণ্টের আগুয়ান জীপগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বালা আর শব্দের বিভীষিকার মধ্যে রুষ্ট ড্রাগনের মতো এক-একটি জার্মান ট্যাঙ্ক একটু একটু করে পিছনে হটে যাচ্ছে। এক নম্বর গোর্খাদের একটা কোম্পানী শুধু কুকরি আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে আর 'কালী মায়ী কি জয়' হাঁক দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুনোনি ক্যানেল পার হবার সময় নিহত গোর্খাদের লাসের মধ্যে একটি পরিচিত মুখের ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। গায়ের উর্দিতে শুকনো রক্ত তখনও লাল হয়েই আছে, আর কুকরিটাকে হাতে ধরে রেখেছে, মাটির জংলা ড্যাফোডিলের উপর পড়ে আছে নিষ্প্রাণ নন্দু থাপা, যে একদিন আমাকে কাসিনোতে গরম হালুয়া খাইয়েছিল।

একুশ ইণ্ডিয়ান ইনফ্যানট্রি ব্রিগেডের উপর নির্দেশ আছে, জার্মান ট্যাঙ্ক হটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে হবে, ফ্লোরেন্সের বুভুক্ষুদের মধ্যে রুটি ময়দা মাখন আর ওষুধের বিলি-বিতরণের কাজও করতে হবে। আমার মেডিক্যাল ইউনিটকেও তাই বিশুদ্ধ রিলিফেরও ইউনিট হয়ে আর ফ্লোরেন্সের ভিতরে গিয়ে ঠাঁই নিতে হয়েছে।

পিয়াৎসা ভাসারি, সড়কের পাশে একটি ধ্বসেপড়া সিনেমা ভবনের মধ্যে রুটি-ময়দার বিরাট সম্ভার নিয়ে বসে আছি। মারাঠাদের একটি প্লেটুন আমার রিলিফ ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধার্ত নরনারী, বৃদ্ধ ও শিশু, যুবা ও তরুণী। জমাদার বলবন্ত স্টিক উঁচিয়ে সেই ক্ষুধার্ত ভিড়কে শান্ত হতে আর সুশৃঙ্খল হতে নির্দেশের সঙ্কেত দোলাচ্ছে। আর, মাঝে মাঝে, কে জানে কিসের উল্লাসে সুর করে শিস দিচ্ছে।

রুট-মার্চ করে ওয়েস্ট-কেণ্টের ব্যাটেলিয়ন শহরের আরও ভিতরে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছি, সড়কের দুপাশের বাড়ির উপরতলা থেকে অনেক ফুল, স্বাগত

অভ্যর্থনার অনেক ফুলের উপহার ঝরে পড়ছে ঘর্মাক্ত ব্যাটেলিয়নের মাথার উপর। খবর পাচ্ছি, একে একে সহরের সব এলাকাই দখল হয়ে চলেছে। তিন নম্বর পাঞ্জাবের একটি ব্যাটেলিয়ন হিপোড্রোম আর জ্যাকোপিনো এলাকাতে ডেরা করে ফেলেছে। কিন্তু পিয়াৎসা কাভুর, বেচারিয়া আর ডোনাটেনো এখনও উচ্ছৃঙ্খল। সেখানে গলায় লাল রুমাল বেঁধে ফাসিস্তির ছোকরাদের দল পিস্তল আর হাতবোমা নিয়ে পার্টিজান ছোকরাদের মারছে আর মরছে। কিংস ড্রাগুন গার্ডের একটি দল এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দু'পক্ষেরই দুরন্তদের হত্যা করছে। পিয়াৎসা মার্কোর খবর বড়ই করুণ। সেখানে ফ্যাসিস্তির ছোকরাদের লাসের সঙ্গে কিছু নিরীহ ঘরোয়া মানুষেরও লাস ছড়িয়ে পড়ে আছে; তার মধ্যে বুড়োবুড়ি আর ছোট ছেলেমেয়েও আছে। এদের হত্যা করলো কে? জমাদার বলবন্ত বলে—টমিলোগ। খুব বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল ওই ড্রাগুন গার্ডের দল।

সেদিনে আর এদিনে কোন মিল নেই, সে জায়গা আর এই জায়গার রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যেও কোন মিল নেই। সেখানে বিলি করতে হয়েছিল রুটি ময়দা মাখন। এখানে বিলি করতে হচ্ছে চিঁড়ে গুড় আর ছোলা। সেখানে রাতের বুলেভারে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি, বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে একটা পাগল। এখানে এই কিছুক্ষণ আগে নিকটের একটা গ্রামে রিলিফ পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখে এলাম, খড়ের মাচানের উপরে বসে অনেক লোক শোকের কান্নার মতো ভীরু করুণ স্বরে আর একসঙ্গে চিৎকার করে গান গাইছে, হে সীতানাথ রাম! হে রঘুনাথ রাম!

ওয়েস্ট কেন্টের মাথার উপর তো অনেক ফুল ঝরে পড়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কারা ঝরিয়েছে ফুল। সড়কের দু পাশের বাড়ির উপরতলায় খোলা জানালাতে অনেক সুস্মিতা ও বিহ্বলা সুন্দরীর হাত-দোলানো ফুর্তির খেলাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, ওরা কারা? এ তবে কি একটা ছল-অভ্যর্থনার ফাঁদ?

পালাৎসো রিকার্ডি, যেখানে অ্যালায়েড মিলিটারী সরকারের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ওয়েস্টকেন্টের ছোকরাদের মুখে আর সে হাসি নেই, বাড়ির উপরতলার জানালাতে খোঁপা বেণী আর স্ফীতবক্ষ জামা দেখতে পেয়েও ওরা আর হল্লা করে গান গেয়ে ওঠে না। কারণ, ওই পালেৎসা রিকার্ডির গেটের সামনে ওয়েস্ট-কেন্টের মেসিন-গানের সবচেয়ে জবরদস্ত যে দল পাহারা দিচ্ছে, তাদের মাথার উপর

অনেক ফুলের সঙ্গে অনেক বোমাও ঝরে পড়েছে। তাই এবার অর্ডার হয়েছে পাড়ায় সন্ধান করে আর ঘর তল্লাসী করে যাকে সন্দেহ হবে তাকেই ধর।

রিলিফের কাজ মাত্র সকালে ও বিকেলে দু'ঘণ্টা। তারপর সন্ধান আর ধরপাকড়ের কাজ। শুধু আমার মেডিক্যাল ইউনিটকে নয়, সড়ক মেরামতের একটা ফিল্ড কোম্পানীকেও পেট্রল দিতে বের হতে হয়। ফিল্ড কোম্পানীর হাবিলদার চন্দন সিং বলে—আজব তামাসা। আমরা মিস্তিরীর দল ব্রেনগান হাতে নিয়ে পাহারাদারী আর খবরদারী করবো, আর কেণ্টু-জেণ্টু যত কমবাটান ঘরের ভিতরে নেচে-গেয়ে হুল্লোড় করবে, বাঃ।

বুঝতে পারছি না, আজ এখানে বানভাসি কোশীর কাছে, সেকেলে একটা পুরনো গড়-কেল্লার উঁচু চাতালের উপরে বস্তা-বস্তা চিঁড়ে গুড় আর ছোলার ভিড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে, আর নিকটে ও দূরের এক-একটা প্রায় ডুবন্ত গাঁয়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বার বার শুধু ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে কেন? বেশ অদ্ভুত রকমের একটা মনের খেলাই বলতে হবে। এই জল দেখে সেই কুয়াশার কথা মনে পড়ে। এই পিছল কাদার সড়কটাকে দেখে সেই পিয়াৎসা মার্কো আর পিয়াৎসা ভাসারির কথা মনে পড়ে। আর, এই ডুবুডুবু মন্দিরের বিষণ্ণ ত্রিশুলটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, রোদের আভা লেগে সোনার মিনারের মতো ঝলমল করছে ফ্লোরেন্সের কাথিড্রালের চূড়া।

বানের জলের উপর দিয়ে রিলিফের লটবহর নিয়ে আর পাঁচটি মোটর বোট ভাসিয়ে যখন মকবুলপুরে পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা। কিন্তু রোদ নেই। আকাশের মেঘের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায়, রোদের ছিটে-ফোঁটা আসার কোন চিহ্নও সেখানে নেই। এই কাদাঘোলা বানের জলের চেহারাও কত কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই আর্নো নদীর জল গোলা-বারুদের কালো ধোঁয়ার ছায়া মেখেও এত কালো হয়ে যায়নি। সে জলে এমন প্রবল ঢলও ছিল না। কলকল টলমল ছলছল, আর্নো নদীর নীলজল। তবু কী আশ্চর্য, এই কোশীর জল পার হতে গিয়ে বার বার সেই আর্নোকে মনে পড়ে যাচ্ছে। আর আর্নোকে মনে পড়তেই ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

হ্যাঁ, এটা মকবুলপুর, এদিকে ওদিকে শুধু যত গলা-পচা মাটির ঘর। মরা মহিষ ফুলে ঢোল হয়ে পড়ে আছে। পেয়ারা গাছের মাথার সঙ্গে ভাঙা খাটিয়া জড়িয়ে রয়েছে। পচা খড়ের মাচানের উপর শকুন। এ গাঁয়ে একটিও মানুষ নেই। সিভিল হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার মোহনরাম, যাকে বন্যা এলাকাতে আমার গাইড হয়ে কাজ করবার জন্য এস-ডি-ও পাঠিয়েছেন, তিনি আক্ষেপ

করে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওঃ, সব বহ্ গিয়া।

—তার মানে, সবাই মরে গিয়েছে ?

—নেহি সাহেব, কিছু ভেগেছে, আবার কিছু নিশ্চয় মরেছে।

মানুষ নেই তো চিঁড়ে-গুড় দেব কাকে ? খড়ের মাচানের উপর বসে শকুনটা একগাদা নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছে। ওর কাছে উপোষ কিংবা বুভুক্ষা কোন সমস্যাই নয়।

রিলিফের চার্ট আর ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আর এস-ডি-ও'র রিপোর্টটা একবার পড়ে নিয়ে বুঝলাম, চাঁদিবাজারের কিছু মানুষ আটক পড়ে আছে বলে মনে হয়।

চাঁদিবাজার পৌছতে সময় লাগলো পুরো একটি ঘণ্টা। কিন্তু কোথায় বা চাঁদি আর কোথায় বা বাজার ? শুধু ছোট্ট একটি একতলা দালানের ছাদ ছাড়া আর সবই ডুবে গিয়েছে। মোহনরাম বললেন, ওটা হলো একটা পুরনো থানা-বাড়ি। ছাদের উপর জন পঞ্চাশ মানুষের একটা ঠাসাঠাসি সমাবেশ। শুধু কান্না আর চিৎকার—বাঁচাইয়ে সাহেব, জলদি বাচাইয়ে ! হ্যাঁ, একটু দূরে আর একটা ছোট্ট সুশ্রী একতলা পাকা-বাড়ি, যার ছাদ ডোবেনি, কিন্তু মেঝে ডুবে গিয়েছে। কম্পাউণ্ডার মোহনরাম বলেন—ওটা মেয়ে ইস্কুলের বাড়ি। ওখানে একজন বাঙালিনী মাস্টারণী আছেন।

—আছেন নাকি ?

—এখন আছেন কিনা জানি না, কিন্তু ছিলেন। দ্বারভাঙ্গার পুলিনবাবুর মেয়ে।

—আপনার চেনা মানুষ ?

—পুলিনবাবুকে চিনি, পুপরিহা রেল-স্টেশনের চায়ের-স্টলের ঠিকে নিয়েছেন !

দালানের ছাদের সঙ্গে মই লাগিয়ে আটক মানুষগুলিকে এক-এক করে নামিয়ে মোটরবোটে তুলতে থাকে সেপাই রাজারাম আর অবতার সিং। ওরা দু'জনেই খুব পোক্ত কর্মী। ক্যাসিনোতে দেখেছিলাম ওদের প্রথম। ওরা তখন জাঠ দলের একটা অ্যাম্বুলেন্স কোম্পানীতে ছিল।

মেয়ে-স্কুলের আধ-ডুবন্ত বাড়িটার খোলা দরজা আর খোলা জানালার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকেও কারও চেহারার দেখা পাওয়া গেল না। কে জানে, বাঙালিনী মাস্টারণী এখনও আছে, না চলে গিয়েছে, না মরেই গিয়েছে। ভাবতে গিয়ে খুবই দুঃসহ একটা অস্বস্তি সহ্য করতে হচ্ছে।

কিন্তু বুঝতে পারছি না, এখানে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেই সুদূর ফোরেন্সের পিয়াৎসা ভিসারার একটা ছোট বাড়ির জানালাকে মনে পড়ে কেন? এখানে ওই জানালাটা খোলা—সেখানে সেই জানালা ছিল বন্ধ। কিন্তু কে-জানে কেমন করে জমাদার বলবন্ত দেখে ফেলেছিল, সেই বন্ধ জানালার ওদিকে ঘরের ভিতর চুপ করে একটা চেয়ারের উপরে বসে আছেন এক তরুণী ইতালিয়ানী।

সকালবেলাতে এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় এক হাজার অভাবী আর উপোষী নরনারীর হাতে দশটি রুটির এক-একটি প্যাকেট তুলে দেবার পর আমার ইউনিটের লোকগুলি যখন ক্লান্ত হয় আর সিগারেট খায়, তখন আমিও হাঁপ ছাড়ি আর সিগারেট ধরাই। কিন্তু জমাদার বলবন্ত তেমনই অদ্ভুত এক উল্লাসের শিস বাজায় আর আমাকেই বার বার অনুরোধ করে—জেরা উধর তো দেখিয়ে সাহেব।

উধর মানে ওই ছোট বাড়িটা যার জানালা সব সময় বন্ধ। জমাদার বলবন্ত হঠাৎ একটা হাত তুলে গোপের দু'দিক মুচড়ে দিয়ে যেন একটা অদ্ভুত খুশির হাসিকেও মোচড় দিয়ে লুকিয়ে ফেলে আর বলে—ওদিকে একটা দরজা আছে, দেখুন।

ঠিকই, ওদিকে একটা দরজা আছে। আস্তে একটা ঠেলা দিতেই সে দরজা খুলে গেল, আর দেখতেও পাওয়া গেল, একটা চেয়ারের কাঁধ আঁকড়ে ধরে আর একেবারে নিথর হয়ে বসে আছে এক তরুণী। বাড়িতে দ্বিতীয় কোন মানুষের সাড়া-শোনা যায় না, দ্বিতীয় কোন ছায়াও দেখা যায় না। মনে হয়, বাড়ির পুরুষেরা সবাই পালিয়েছে।

আমার পায়ের শব্দ শুনেও তরুণী ইতালিয়ানী কোন সাড়া দিল না। মুখ তুলে একবার তাকালও না। তবে কি খেতে না পেয়ে আর খুব ভয় পেয়ে ওর প্রাণ মন আর শরীরটাও একেবারে নিথর হয়ে গিয়েছে?

মিথ্যে নয় আমার ধারণা। কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, আস্তে আস্তে ধুঁকছে একটা শুষ্ক ও শীর্ণ নারীর বুক। দুই চোখ কোটরের ভিতরে বসে গিয়েছে। চমৎকার সোনালী চুল, কিন্তু উসকো-খুসকো। টেবিলের উপর একটা কাঁচের বোতল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বোধহয় জ্যাম কিংবা জেলি ছিল এই বোতলে। তাই বোতল ভেঙে জ্যাম-জেলির শেষ প্রলেপটুকুও চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে এই মেয়ে, যার সোনালী চুলের ক্রীমের ফিকে গন্ধ এখনও বাতাসে লেগে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—সিনোরিনা?

—সি।

—ইওর নেম?

—আনা।

—হাংরি?

—মি দিয়া ভিনো।

বুঝলাম ক্যাসিনোতে থাকতে চেষ্টা করে যে-টুকু ইতালীয় ভাষা বুঝতে শিখেছিলাম তাতেই বোঝা গেল, তরুণী মদ চাইছে।

কী আশ্চর্য, আনার শুকনো এই চোখ দুটো থেকে এত জল ঝরে পড়ছে কেমন করে?

আমি বলি—ইল পানে? খাদ্য?

আনা বলে—সি সি।

ঘড়ঘড় করছে আনার অদ্ভুত গলার স্বর। কাঁপছে আনার মাথাটা, চোখ দুটোও যেন লোভী হয়ে চকচক করছে।

আনার হাতের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে একটুও দেরি করি না। দশটি রুটির একটি প্যাকেট, এক ডিবে মাখন, আর হ্যাঁ, ব্রাণ্ডির একটি বোতলও আনার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

—গ্রাৎসিয়ে! গ্রাৎসিয়ে! চেঁচিয়ে উঠলো সেই শীর্ণা ও শুষ্কা আনা। কিন্তু কী আশ্চর্য, আনা যে চেয়ার ছেড়ে আমারই কাছে এগিয়ে আসছে। এ কী কাণ্ড, আনা যে আমার গা ঘেঁষে আর একেবারে বুক সেঁটে দাঁড়িয়েছে। কী চায় আনা? মুখটাকে আর শুকনো ঠোঁট দুটোকে আমার মুখের কাছে এমন করে তুলে ধরে কেন?

ভাগলপুরের সেজমামার কথা মনে পড়ছে। খেতে বসে পাতের উপর একগাদা মাছ ভাজার দিকে তাঁর চোখ দুটো লোলুপ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। তবু তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন, মনে মনে বিড়বিড় করে কী-যেন বলতেন। সেজমামী বলেছিলেন—ওটা ওঁর অভ্যাস, দেবতাকে আগে নিবেদন না করে কিছু খান না। সেজমামীর কথা শুনে আমরা মুখ টিপে হাসতাম।

আনার কাণ্ড দেখে এখন আমার মনটাও যেন মুখ টিপে হাসছে। বুঝতে পারছি, এটা হলো আনার প্রাণের একটা লোভের নিবেদন। কিন্তু কী অদ্ভুত লোভ।

কিন্তু চমকে উঠলাম। বাইরে থেকে বন্ধ জানালাটার গায়ের উপর হঠাৎ একটা শিসের শব্দ যেন আছড়ে পড়েছে, জমাদার বলবন্তের অদ্ভুত উল্লাসের শিস। এক হাত দিয়ে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে আনাকে সরিয়ে দিলাম।

সরে গেল আনা, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ অপলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে চোখে যেন হঠাৎ-আহত একটা বিস্ময় করুণ হয়ে ছমছম করছে।

আনা বলে—আরিভেদের্চি।

আবার এস! বিদায় দেবার একটা বুলি! একটা কথার কথা, এই মাত্র।

শুনতে পাচ্ছি, লাস্ট পোস্ট বাজিয়ে আমাদেরই একুশ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের ব্যাণ্ড সড়ক ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলে এলাম।

কম্পাউণ্ডার মোহনরাম বলছেন, চলুন একবার ওই ইস্কুল বাড়িটার ভিতরে গিয়ে খোঁজ করি সত্যি কেউ আছে কি নেই।

—হ্যাঁ চলুন।

বুঝতে পারছি না, চোখ দুটো, সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের বাতাসটাও হঠাৎ এক-একবার ছটফট করে উঠছে কেন? এই নিঃশ্বাস কি কাউকে আবার দেখতে আর কাছে পেতে চাইছে? যদি তাই হয়, তবে তো বুঝতে হবে যে, এটা হলো পাঁচ বছরের পুরনো একটা পিপাসার ছটফটে নিঃশ্বাস।

আমার মোটর বোট ইস্কুল-বাড়িটার প্রায় দেয়ালের কাছে এসে ঠেকলো। এক হাঁটু জলের ভিতরে নামলাম, বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। আর চমকেও উঠলাম। একটা তক্তপোষের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে আছে এক তরুণী। কোন সন্দেহ নেই, এই সেই বাঙালিনী মাস্টারণী, পুলিনবাবুর মেয়ে।

বললাম—ভয় নেই, উঠে বসুন।

ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালো পুলিনবাবুর মেয়ে। কী ভয়ানক উদাস দুটো চোখ! যেন তাকিয়েও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। গাল চুপসে গিয়েছে, গলার একটা শিরা ফুলে ফুলে কাঁপছে, আর হাতের চুড়িগুলি কব্জি পার হয়ে ঝুলে পড়েছে।

—আপনার নামটা বলবেন?

—রমা!

—কতদিন না খেয়ে রয়েছেন?

—সাত দিন।

—খাবেন কিছু ?

—হ্যাঁ।

এই শুকনো ও শীর্ণা রমাও একটি অতি করুণ দুর্ভাগ্যের ছবি। উস্কো-খুস্কো সোনালী চুলের স্তবক নেই, কালো চুলের ঢিলে বেণী। নীলচে চোখ নয়, বেশ কালচে চোখ। রমাকে দু'হাত দিয়ে ধরে খাটের উপর বসিয়ে দিতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, কাঁধের হাড় খটখট করছে। সন্দেহ হচ্ছে, ভয়ও পাচ্ছি, এই রমার বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের জোরটুকু এখুনি ফুরিয়ে যাবে না তো ?—জলদি কীজিয়ে কম্পাউণ্ডার বাবু, আমার বোট থেকে এক গেলাস দুধ তাড়াতাড়ি গরম করে নিয়ে আসুন। আর ব্র্যাণ্ডির শিশিটাও আনবেন। হ্যাঁ, আর কিছু বিস্কুটও।

রমার বুক আর শ্বাস পরীক্ষা করতে দশ মিনিটও সময় লাগলো না। কম্পাউণ্ডারবাবু ততক্ষণে গরম দুধ ব্র্যাণ্ডি আর বিস্কুট এনে দিয়ে আবার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গরম দুধ, ব্র্যাণ্ডির শিশি আর বিস্কুটের প্যাকেটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রমা। দেখতে পাচ্ছি, রমার দুই চোখে ক্ষুধা আর পিপাসার জ্বালা যেন হঠাৎ স্নিগ্ধ হয়ে গিয়ে চিকচিক করছে।

ডাক দিলাম—শোন। শোনা মাত্র খাট থেকে নেমে এক হাঁটু জলেরই মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো রমা। ওই নিদারুণ শুকনো আর হাঁপ-ধরা ধুকপুকে শরীরে এভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার শক্তি কোথা থেকে আর কেমন করে এসে গেল।

আমার মুখের দিকে তাকায়, আর আমারই একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় রমা। কী যেন বলতে চায়, তবু বলতে পারে না।

এটা ফ্লোরেন্স নয়, ফ্লোরেন্সের পিয়াৎসা ভিসারাও নয় আর রমার মুখের ভাষাটা আনার মুখের ভাষা ইতালীয়ও নয় যে, রমার কথা আমি বুঝতে পারবো না, কিংবা আমার কথা রমা বুঝতে পারবে না। তবু রমা কথা বলতে পারছে না, আমিও কথা বলতে পারছি না। ভুল হয়ে যাচ্ছে। রমা আর আনা। আনা আর রমা। রমার ঢিলে বেণীতে নারকেল তেলের ফিকে গন্ধ, কোন ক্রীমের ফিকে গন্ধ নয়। কোন মিল নেই, তবু মিল। বলতে ইচ্ছে করছে, আবার এসেছি।

জমাদার বলবন্ত তো এখানে নেই যে, অদ্ভুত উল্লাসের শিস বাজিয়ে সমস্যাটার একটা হঠাৎ সমাধান করে দেবে। বুঝতে পারছি না, রমাকে আস্তে

একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারা যাবে কি যাবে না। আমিই তো রমাকে কাছে ডেকে ফেলেছি, সরিয়ে দেব কী করে?

কিন্তু দরজার বাইরে একটা ছায়া যেন হঠাৎ নড়ে উঠলো। জোরে গলা ঝেড়ে কেশে উঠলেন কম্পাউণ্ডার মোহনরাম। চমকে উঠলো রমা, সরে গেল রমা।

সেখানে সেদিনের জমাদার বলবন্তের শিসের শব্দ, আর আজ এখানে কম্পাউণ্ডার মোহনরামের কাশির শব্দ—কোন মিল নেই, তবু মিল আছে বলে মনে হয়।

ডাক দিলাম—শোন আনা।

রমা—কী বললেন?

হেসে ফেললাম—পাঁচ বছর আগে ইতালীতে একদিন একটি উপোষী মেয়েকে ঠিক এইরকমই খাবার দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছিল, তার নাম রমা।

রমা অদ্ভুতভাবে তাকায়—কী বললেন?

আমি বলি—যাকগে, গরম দুধটা এখুনি খেয়ে নিন, তারপর চলুন।

মা টি র দী ক্ষা

দেশ তখনো ভাঙেনি, ভাঙ্‌বার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেই সময়।

ভয়ানক এক হিংসার ঝড়ে নোয়াখালির পল্লীর শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে কুটীরের ভস্মস্তূপ, হিন্দু নরনারীর জীবন অপমানিত। যারা ঘরে আছে, নির্যাতিত বন্দীর মতো তাঁদের মূর্তি। যারা ঘর ছেড়েছে, শোকার্তের মতো তাদের চোখের দৃষ্টি। সেই সময়।

সেই সময় প্রথম দেখা হয়েছিল নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। চৌমুহনী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর তারা বসেছিল। অমিতার কোলে আঁচলে জড়ানো একটি ছ'মাসের শিশুও ছিল।

লাকসাম যাবে যে ট্রেণ, তারই অপেক্ষায় বসেছিলাম। অনেক রাত হয়েছিল, ট্রেনের আসবার সময়ও পার হয়ে গিয়েছিল। তাই একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে বসে বসে প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি নিঃশব্দে জপের মালার মতো যেন চিন্তার ভেতর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল।

সবই অনিশ্চয়ের মধ্যে। দূরান্তরে ঐ অন্ধকারাবৃত ক্ষেত মাঠ ও জনবীথিকার জগতে আজ মানুষের মানমর্যাদা ও জীবন অনিশ্চয়ের মধ্যে। ঐ

অন্ধকারের বুকে হিংসার গরল পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। নীলকণ্ঠ কোথায়? কিন্তু সংসারের তিনি কি মানুষের ইতিহাস থেকে বিদায় নিয়ে সরে গেছেন? এই রকম সংশয়েই তখন মনের ভেতর যেন তোলপাড় করছিল এবং ভারত জীবনের শঙ্কাহরণ নায়ক মহাত্মা গান্ধী তখনো নোয়াখালি এসে পৌছননি। তবু সংবাদ শুনেছি, কলকাতা থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি আসছেন, সেই সময়।

চারদিকের এই অনিশ্চয় ও অন্ধকার সত্ত্বেও অনেক রাতে চাঁদ উঠলো চৌমুহনীর আকাশে। সকল পার্থিব মূঢ়তার বহু উর্ধ্বে থেকে যেন কোটী কোটী স্নিগ্ধ আলোকের কণিকা এসে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে দেখলাম, প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে আছে এক যুবক ও তার পাশে এক তরুণী, কোলের ওপর একটি শিশু। চারদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা, ঘুমন্ত স্টেশন, তারই মধ্যে নিঃশব্দে বসে আছে স্বামী স্ত্রী ও সন্তান। মনে হচ্ছিল, এ পৃথিবী যেন আজও অসমাপ্ত রচনার মতো এখনো অর্থহীন ও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তারই মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছে পৃথিবীর প্রথম পিতা মাতা ও সন্তান। এখনো তারা যেন গৃহ-জীবন লাভ করেনি।

সেই সময় পরিচয় হলো তাদের সঙ্গে। নরেশ ও অমিতা। দেশ ছেড়ে তারা চলে এসেছে, দেশের দিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছা তাদের আর নেই। শুধু প্রাণ ছাড়া আর সব গেছে। লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত সেই দেশের ভিটার কালিমাখা মূর্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে তারা চলে এসেছে।

কিছুই সঙ্গে নেই। একটা ছোটখাট পোঁটলাও না। নিরাভরণ সর্বস্ব-বর্জিত রূপ নিয়েই তারা বসেছিল। তাই মনে হচ্ছিল, ওরা দুটি অনিশ্চয়ের পথিক মাত্র, শুধু প্রাণ ছাড়া আর কোন পাথেয় নেই।

নরেশ ও অমিতার সঙ্গে আলাপ করলাম, কিন্তু আলাপ করবার মতো কোন উৎসাহ তাদের ছিল না। কেমন একটা উদাসীন ভাব, এই পৃথিবীতে তারা যেন বাইরের লোক, নব আগন্তুক মাত্র। কাউকে বিশ্বাস নেই, কোথাও সমবেদনা আশা করে না। বিরাট একটা সর্বনাশের অভিসন্ধির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন তারা অদৃষ্টকে এক পাশে আলগোছে সরিয়ে এনে রেখেছে। দেশ থেকে এখানে, এখান থেকে দূরে, দূর থেকে দূরান্তরে, শুধু সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

নরেশের পায়ে জুতো ছিল না। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। তার সমস্ত সত্তা যেন অতল এক অসহায়তার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে। অমিতা

একটু অন্য রকমের। পরিশ্রান্ত ও মলিন মুখ, কিন্তু দৃষ্টি প্রখর। চারদিকে সাবধানে তাকিয়ে দেখার শক্তিটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। অমিতার শাড়িতে তখনো কচুরীপানার শেকড়ের কুচি লেগে রয়েছে। সেই শাড়ির আঁচলে ঢাকা ঘুমন্ত শিশুটি মাঝে মাঝে ছটফট করে। অমিতা একটু ব্যস্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবেন?

নরেশ অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিল—কোন ঠিক নেই।

অমিতা বললো—কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কলকাতা যাবার মতো পথের খরচ সঙ্গে আছে তো?

নরেশ কোন উত্তর দিল না। অমিতাও উত্তর দিল না। অমিতার কোলের শিশুটি একটু ছটফট করে কেঁদে উঠলো।

একটু স্পষ্ট করেই বললাম—যদি কোন সাহায্যের দরকার থাকে বলুন, আমার পক্ষে যা সাধ্য···।

নরেশ তিক্ত স্বরে বলে—না।

অমিতা বলে উঠলো—একটা কাজ যদি করতে পারতেন···।

নরেশ অপ্রসন্নভাবে অমিতার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু অমিতা শান্ত-ভাবেই বলে—একটা ফুড যদি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে···।

তবে কি? বুঝলাম অমিতার আঁচলে জড়ানো একটা শিশুর প্রাণ ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। তাই অমিতা স্থির থাকতে পারছে না। তাই কলকাতা যাবার পথের খরচ নয়, সসাগরা পৃথিবীর সব মণিমাণিক্যও নয়, এই মুহূর্তে শুধু এক শিশি গুঁড়ো দুধের ফুড পেলেই সে সুখী হবে।

এতক্ষণ দেখতে পাইনি, এখন দেখতে পেলাম, অমিতার কানে এক জোড়া সোনার দুল আছে। একটা দুল খুলে নিয়ে অমিতা বলে—এ ছাড়া দাম দেবার মতো আর কিছু নেই। এটা নিয়ে আপনি···।

নরেশ অমিতাকে ধমক দিয়ে উঠলো—না, রেখে দাও।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—এসবে আমার কোন দরকার নেই। এত রাত্রে, এই রকম জায়গায় ফুড কোথায় পাব জানি না। কিন্তু দেখি···।

নরেশ এবার আমাকেই ধমক দিল—না, কোন দরকার নেই।

একটু চুপ করে থেকে নরেশ বললো—আমিই চেষ্টা করছি।

নরেশ উঠলো। কোথায় যাবে জানি না। এই নিস্তব্ধ রাত্রির নির্মম ঘুমের দ্বারে দ্বারে সন্ধান করে কোথায় যে এক শিশুমানুষের ক্ষুধার বেদনা দূর করার মতো ফুড পাবে নরেশ, তা সেই জানে। তবু দেখলাম, নরেশ যেন এক

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার প্রাপ্যের সন্ধানে যাত্রা করছে।

ট্রেনের শব্দও শোনা যাচ্ছে, নরেশ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—আপনি যান, আপনার ট্রেন আসছে।

* * * *

বহুদিন পরে আবার দেখা নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। তখন খবরের কাগজে কতগুলি কথা নিত্য প্রচারিত হয়ে চলেছে—বাস্তুহারার সমস্যা, উদ্বাস্তুর দাবী, শরণার্থীর কর্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীর প্রশ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশ খণ্ডিত হয়েছে, আর কলকাতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগন্তুক মানুষ হাজারে হাজারে আশ্রয় নিয়েছে প্রতি অঞ্চলে ও বস্তিতে। বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে এক বাড়ির সিঁড়িকোঠায় ক্ষুদ্র-পরিসর এক অন্ধকারময় স্যাঁতসেঁতে আশ্রয়ে বাসা নিয়ে রয়েছে নরেশ, অমিতা ও সেই শিশুটি। শিশুটি বেশ বড়সড় হয়েছে।

চৌমুহনীর সেই গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে নরেশ ও অমিতাকে যেরকম দেখেছিলাম, বেনিয়াপুকুরের ধূলো ধোঁয়া আর দ্বিপ্রহরের রোদে তাদের আর সেরকম মনে হলো না। সেদিন তাদের দেখেছিলাম দুটি পথিক প্রাণের মতো ক্লান্ত ও পীড়িত, কিন্তু তবু সান্ত্বনা চায় না। সেদিন পৃথিবীর প্রথম দম্পতির মতো যেন একটা কঠোর অহংকার নিয়েই তারা সকল অনিশ্চয়ের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে ঊর্ধ্বগগনের চন্দ্রালোক গায়ে জড়িয়ে বসেছিল।

আজ দেখলাম, নরেশের চেহারা ও আচরণ অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি খুব অল্পই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু নরেশ গায়ে পড়ে অনেক কথা বললো, অনেক অভিযোগ, অনেক দুঃখের কথা, অনেক ক্ষোভের কথা।

একটা চাকরি পেয়েছে নরেশ, কিন্তু সেদিন তারা ধর্মঘট করেছে। মালিক মাইনে বাড়ায় না, তারই প্রতিবাদ। ধর্মঘট কমিটির সহকারী সেক্রেটারী হয়েছে নরেশ।

হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে নরেশ বলে—আমাদের দুঃখের আর অন্ত নেই, সাধনবাবু। কেউ মুখ তুলে তাকায় না।

দেখলাম, নরেশের সত্যিই ক্ষোভের অন্ত নেই। এ পৃথিবীতে কারও মনে কোন সমবেদনা নেই। সামান্য একটা সাহায্য পেতে হলে দশ জায়গায় দরখাস্ত নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। এই হলো নরেশের অভিযোগ।

অমিতা ভদ্রতা করলো, সিঁড়িকোঠার সামনে বসে চা খেলাম। অমিতাও বললো—কিছুই ভাল লাগছে না, এও এক রকমের নির্বাসন। প্রতি মুহূর্তে

এত অসুবিধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে মানুষ কি করে বাঁচে বলুন? কন্ট্রোল হলো ফ্রী রেশন বন্ধ করে দিয়েছে।

ঠিক এরকম কথা অবশ্যই আশা করিনি। এই তো সেই নরেশ, আর সেই অমিতা, নিদারুণ এক অনিশ্চয়ের মধ্যেও যারা আমার সাহায্যের প্রস্তাব তুচ্ছ করতে পেরেছিল। মনে হলো, প্রথম দিনের দেখা সেই প্রাণের সব গর্ব যেন পরাভূত হয়ে গেছে।

সিঁড়িকোঠায় আশ্রিত নরেশ ও অমিতার সংসারের চেহারাও লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, দুঃখ ও অভাব আছে বৈকি। এ ঘরে মানুষের বাস করা উচিত নয়। অমিতার চেহারা আগের তুলনায় অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে। ফ্রী রেশনে যে খাদ্য পাওয়া যায়, তার চেয়ে ভাল খাবার অধিকার নিশ্চয় ওদের থাকা উচিত। ছেলেটার গায়ের জামাটা দু'জায়গায় ছেঁড়া, কিন্তু নরেশের গায়ে একটা দামী কাপড়ের কামিজ। ঘরে কোন দেব-দেবী বা মহা-পুরুষের ছবি নেই, কোন বই নেই। অথচ দেখলাম এক গাদা কাঁচের ও এলুমিনিয়ামের বাসন। মস্ত বড় একটা পাকা কাঁঠাল মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে, এবং মোটা মোটা মাছি উড়ছে তার চারদিকে। রঙীন কাঁচের একটা ফুলদানির ভেতরে এক প্যাকেট সিগারেট আর দুটো সিনেমার টিকেট। অভাব আর অপচয়, কোথাও শূন্যতা কোথাও অতিরিক্ততা, সব মিলিয়ে কোথায় যেন ছন্দ নষ্ট করে দিয়েছে, যার জন্যে বড়ই শ্রীহীন মনে হচ্ছিল এই দম্পতির সিঁড়িকোঠার সংসার। হয় পৃথিবী এদের সঙ্গে ছন্দ রাখতে পারছে না, নয় এরাই পৃথিবীর সঙ্গে ছন্দ রেখে চলতে পারছে না। কোথায় যেন ভুল রয়ে গেছে। অথচ এই নরেশ ও অমিতাকে একদিন দেখেছি, একটা পোঁটলাও সঙ্গে নেই, নিরাভরণ দুটি মূর্তি নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সুস্থির হয়ে বসে আছে। কিম্বা হয়তো আমারই ভাবতে ভুল হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি মনে হয়, সেদিন দুঃখ ছিল ভয়ানক কিন্তু এরা ছিল সুন্দর। আর আজ ওদের দুঃখটা বিশ্রী, এবং ওরাও শ্রীহীন।

ওঠবার সময় নরেশ বললো, আপনার সঙ্গে কোন কাপড়ওয়ালার জানা-শোনা আছে কি?

—কেন?

—কয়েক গজ টুইলের দরকার ছিল। যদি ধারে পাইয়ে দেন, তবে বড় ভাল হয়।

কোন কাপড়-ওয়ালার সঙ্গে জানাশোনা ছিল না, তাই নরেশের অনুরোধ

রক্ষার কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়েই উঠলাম।

* * * *

অনেক দিন পরে দেখা, এই নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। ছেলেটিও বেশ বড় হয়ে উঠেছে দেখলাম।

বেনিয়াপুকুর নয়, ধুলো ধোঁয়া এবং কলকাতার দিনের আলোকে নয়। রাজীবপুরের এক পৌষের প্রভাতে।

ধানচাষীদের এক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সভা সাঙ্গ হবার পর ভিড় থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই সেই চাষী-জনতার ভেতর থেকে খাট ধুতি এবং ফতুয়া পরা মূর্তিতে বেরিয়ে এসে হাসিভরা মুখ নিয়ে যে লোকটি নমস্কার জানালো, তাকে চিনলাম। নরেশ।

বিস্ময়ের দৃশ্য নিশ্চয়। সকল অনিশ্চয়ের অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা উত্তীর্ণ হয়ে একটা মানুষের প্রাণ যেন এইবার তার জীবনের ভিটা খুঁজে পেয়েছে। নরেশকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

নরেশের অনুরোধে আজ আমিই এক কৌতূহলী পথিকের মতো, কি জানি কি দেখবার জন্যে, তার নতুন ঘরে এসে পৌছলাম।

মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি, বড় আঙিনা, লতার বেড়া। কুমড়োর মাচানও আছে। কয়েকটা নতুন পেঁপে গাছ। খুঁটোর সঙ্গে দড়ি বাঁধা একটা কালো গরুও আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অমিতা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। সে হাসির সঙ্গে আগুনের আঁচের মতো একটা লালচে আভাও মিশে ছিল। একটা একচালার নীচে উনুনের সামনে বসে এতক্ষণ ধান সেদ্ধ করছিল অমিতা।

আর একবার দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নরেশ ও অমিতার সংসার দেখলাম। আঙিনায় তুলসী আছে। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে একটি লক্ষ্মীর সরা ও ছবি রয়েছে। দেয়ালে মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আছে। দাওয়ায় মাদুরের ওপরে কয়েকটা বইও পড়ে আছে দেখলাম—গীতা, রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য আর চণ্ডীদাসের গান।

নরেশ হাসতে হাসতে বলে—কলকাতার জীবন আর সহ্য হলো না।

—কেন?

—সেখানে দুঃখের শেষ নেই, অভাবেরও শেষ নেই মশাই। তার চেয়ে এই ভাল।

—কি?

—এই চাষার জীবন।

—এখানে এসে কি দুঃখ অভাব সব মিটে গেছে?

—তা মিটবে কেন? সবই আছে।

—তবে?

নরেশ সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলো না। একটু চেষ্টা করে তার যুক্তিগুলিকে যেন গুছিয়ে নিয়ে বললো—তবে শান্তি আছে। নিজের হাতে খেটে দুঃখ-অভাব দূর করবার একটা চেষ্টা তো করতে পারছি। তা ছাড়া…।

নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তা ছাড়া এখানে এসে দু'দণ্ড ধর্মটর্ম পূজোটুজো করতে পারি, কলকাতায় থেকে ওসব রুচিও যেন চুলোয় যেতে বসেছিল।

অমিতা বললো—তা ছাড়া…।

—বলুন।

অমিতা হেসে হেসে বলে—এখানে এসে হাঁপ ছাড়তে পারছি। কত বড় মাটির আঙিনা দেখছেন?

মাটির আঙিনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বিশ্বাস করলাম, নরেশ ও অমিতার জীবন একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস পার হয়ে, এইখানে এসে মাটির উদার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে। তাই হাঁপ ছাড়ছে। এই মাটির করুণা দিয়ে ওরা নিজের হাতেই ভাগ্য গড়বে। ওদের চোখে মুখে আর সেই বেনিয়াপুকুরের সিঁড়িকোঠার বিশ্রী দুঃখের ছাপ নেই। ওদের জীবন মাটির দীক্ষা লাভ করেছে। তাই আজ বোধহয় এত সুন্দর ও সুশ্রী দেখাচ্ছে নরেশ আর অমিতাকে।

মনে হলো, এই রকমই এক মানবদম্পতি বোধহয় মানুষের প্রথম সংসার রচনা করেছিল, এবং এই এইরকমই একটি মাটির আঙিনা ছিল সেই সংসারে।

সমীক্ষা দক্ষিণ পলাশপুর

দক্ষিণ পলাশপুর নামে একটি গ্রামের সমীক্ষার এই রিপোর্ট প্রকাশ করে দেওয়া হলো। কারণ, লোকগণনার সাধারণ রিপোর্ট কিংবা ব্লক উন্নয়নের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হতে এখনও দেরী আছে। আর, সেই দুই রিপোর্টে দক্ষিণ পলাশপুরের নাম করে বিশেষ কোন কথা থাকবে কি থাকবে না, তারও কোন ঠিক নেই।

বলতে হয়, এটি একটি যথার্থ অনুন্নত গ্রামজীবনের রিপোর্ট। সবচেয়ে নিকট রেলস্টেশন হলো ষোল মাইল দূরের মতিনগর হল্ট। আর সবচেয়ে নিকট যে-পথে ছোট মোটরগাড়ি অনেক কষ্টে চলতে পারে, সেটা হলো দেড় ক্রোশ পশ্চিমে ধানক্ষেতের সঙ্গে প্রায় একাকার সেই পুরনো অহল্যাবাঈ সড়ক।

এহেন দক্ষিণ পলাশপুরের গ্রাম্যতার মধ্যে একেলে উন্নতির ছোঁয়া কিংবা ছোঁয়াচ কতটুকুই বা লাগতে পারে? জেলার ম্যাপের মধ্যে দক্ষিণ পলাশ-পুরের নামের পাশের চিহ্নটা হলো ছোট্ট একটা কালো বিন্দু। ছোট্ট একটা নীল তারার চিহ্ন নেই, লাল তারার চিহ্নও নেই, তার মানে দক্ষিণ পলাশপুরের কোন কৃষিপণ্য নেই, শিল্পপণ্যও নেই। সন্দেহ হয়েছিল—দক্ষিণ পলাশপুর বোধহয় দশ-বিশ ঘর মানুষের বসতি নিয়ে অতি সামান্য কোন গ্রাম্য অস্তিত্ব কিংবা নিছক একটা নাস্তিত্ব।

পুরনো অহল্যাবাঈ সড়কের পাশে তালডাঙ্গা নামে যে একটু জায়গা আছে, সেখানে এসে পৌঁছতেই বুঝতে পারা গেল, সত্যিই দক্ষিণ পলাশপুর নামে একটা যথার্থ গ্রাম আছে। এখানে একটা বুড়ো বটের ছায়াতে দু-চারটে গো-গাড়ি সব সময়েই পড়ে থাকে আর ঝিমোয়, যতক্ষণ না দেড় ক্রোশ দূরের দক্ষিণ পলাশপুরে যাবার জন্তে কোন বমাল ব্যাপারী কিংবা অব্যাপারী মানুষ এসে হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকি করে।

গ্রামের ভিতর ঢুকতে সবার আগে যাকে চোখে পড়বে, সেটা চমকে ওঠার মতো কোন বিস্ময়ের মনুমেণ্ট নয়। একটা মন্দির। বটের শিকড়ে আর জটাতে জড়ানো এই মন্দিরের সর্বাঙ্গে বড় বড় ফাটল হাঁ করে রয়েছে। বিগ্রহ নেই, সেবাইত নেই। মন্দিরের ভিত্তির গায়ে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে একটা শ্লোক খোদিত আছে। শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কে নাক্ষিতে শঙ্করং সংস্থাপ্যাশু...বাস্, এই পর্যন্ত। শ্লোকের বাকি লেখা সবই মুছে গিয়েছে। বোঝা যায়, এটা শিব-মন্দির। ১৮৫৭ শকে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কে নির্মাণ করেছিলেন, কে জানে? শ্লোকের লিপির সবটুকু যদি থাকতো, তবে নিশ্চয় তার পরিচয় পাওয়া যেত। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজে সতের শতকের দক্ষিণ বঙ্গের শিল্পরুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খুব সূক্ষ্ম সুন্দরতার কারুকলা না হলেও দেখতে চমৎকার। কিন্তু মন্দিরের ভিত্তির গোড়ার দিকের পাথরে মূর্তিকলার যে কাজ দেখা যায়, তার সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির মহাস্থানগড় বৌদ্ধবিহারের পাথুরে রেলিং-এর মূর্তিকলার সাদৃশ্য আছে। প্রশ্ন করতে হয়, পাল যুগের মূর্তিকলার স্টাইল দক্ষিণ পলাশপুরের এই শিবমন্দিরের ভিত্তির

পাথরে কেমন করে এল? দক্ষিণ পলাশপুর তবে কি পালযুগের আলোছায়ার সৃষ্টি?

যাই হোক, প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আজকের এই দক্ষিণ পলাশপুর যতই অনুন্নত হোক না কেন, অর্বাচীন নয়। কয়েক শতাব্দী আগে এই দক্ষিণ পলাশপুর অনেক স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর অনেক স্মৃতি দিয়ে ঘেরা একটি উন্নতির উপনিবেশ ছিল। আজ দেখা যাচ্ছে যে, সেকালের উজ্জ্বল আলোর একটি দীপ আজ শুধু পোড়া সলতের কালি হয়ে পড়ে আছে। যে ছিল খুব উন্নত, সে-ই আজ খুব অবনত।

এই মন্দির, সতের শতকে ভগবান শঙ্করের কাছে নিবেদিত এই প্রত্নকীর্তিটি আজ বিংশ শতাব্দীর যে মানুষটির সম্পত্তি তিনি হলেন দক্ষিণ পলাশপুরের জয়ন্ত ঘোষ। লোকে বলে, চার-আনি। অর্থাৎ ইনি দক্ষিণ পলাশপুর জমিদারির চার-আনি মালিক। আজ অবশ্য আর বলা চলে না। বলতে হয় ছিলেন। জমিদারি চলে গেলেও চার-আনি নামটা চলে যায়নি। আর যে বা যাঁরা বার-আনি ছিলেন, তিনি বা তাঁরা কবে কোথায় যে চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। যাই হোক, মন্দিরটা যখন চার-আনির সম্পত্তি, তখন চার-আনি কেন মন্দিরটার নিদারুণ জীর্ণতার সামান্য একটু সংস্কারও করেন না? মন্দিরটা যে আর সাত-আট বছরের মধ্যে একেবারে ধ্বসে পড়ে জঞ্জালের একটা ভয়ানক স্তূপ হয়ে যাবে।

দুই

চার-আনির বাড়িটা অদ্ভুত। রাতের মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলে দেখতে পাওয়া যায়, বিরাট ও গম্ভীর একটা প্রাসাদের চেহারা চমকে উঠেছে। কিন্তু ভোরের আলোতে দেখা যায়, বড়ই পুরনো আর মলিন চেহারার একটা চকমিলান দালান। দেউড়ির মাথা ভেঙে পড়ে গিয়েছে, থামগুলির গায়ে পলেস্তারার চিহ্ন নেই। ইট খসে পড়ে চারিদিকের উঁচু পাঁচিল এমনই খর্ব হয়ে গিয়েছে যে, বাগানে ঘুরে-ফিরে ফুল তুলতো যে মেয়েটি তাকে খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যেত। বাসন্তী রঙের একটি শাড়ি পরে ভোরের আলোতে বাগানের ফুল তোলা এই মেয়ের নিত্যদিনের একটা অভ্যাস ছিল। চার-আনির সেই মেয়ে প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

চার-আনির জয়ন্ত ঘোষ বললেন, না মশাই, ওই সাংঘাতিক ভাঙা মন্দিরের মেরামত করবার রুচি আমার নেই, যদিও ওটা আমারই সম্পত্তি।

আদুড় গায়ের উপর জড়ানো একটা ময়লা চেহারার শাল, বেশ ছোট

বহরের ধুতি আর পায়ে বাঘছালের চটি, যার রোঁয়াগুলি প্রায় সবই ঝরে পড়ে গিয়েছে। চার-আনির জয়ন্ত ঘোষের ধবধবে ফর্সা চেহারার মধ্যে কেমন-যেন একটা করুণতা আছে।

জয়ন্ত ঘোষ বললেন—আমার পিতামহ, পিতা আর আমি, আমরা তিন পুরুষ ধরে চার-আনি। বার-আনির সবাই দু'পুরুষ আগেই জমিদারি বেচে দিয়ে সরে পড়েছে।

দেয়ালের তাক থেকে পুরনো নথিপত্রের একটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে এসে, তার ভিতর থেকে বেছে বেছে একটা দলিল বের করলেন জয়ন্ত ঘোষ—এই দেখুন, আমাদের তিনপুরুষ আগের সেই বিবাদের আপসনামা। বত্রিশ বছর ধরে মামলা চলবার পর শেষে আপস হলো: কামাখ্যাচরণ ঘোষ বাদী, বিশ্বনাথ ঘোষ গয়রহ বিবাদী। দরখাস্ত পক্ষে বাদী ও উত্তরকারী বিবাদীগণের নিবেদন এই—আমরা বাদী ও বিবাদী পরস্পরের আত্মীয় বটি। মামলা চলিলে উভয়পক্ষের অমঙ্গল হইবে বিধায় আমরা পক্ষগণের দরখাস্ত ও সালিসের রোএদাদ ইত্যাদির উপর লক্ষ্য না রাখিয়া নিম্নলিখিত রূপে আপোসে নিষ্পত্তি করিলাম। অত্র সোলেনামা ডিক্রির একাংশ গণ্য হইবে এবং আমরা উভয়পক্ষ ইহাতে বাধ্য থাকিব।

দলিলের বয়ান আর বেশি না পড়ে জয়ন্ত ঘোষ অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন। এই ভদ্রাসনের দখল পেলেন কামাখ্যাচরণ ঘোষ, আমার পিতামহ। আর, পেলেন জমিদারির চার-আনি। ওদিকে বিশ্বনাথ ঘোষ গয়রহ পেলেন জমিদারির বার-আনি। কিন্তু তাঁদের ছেলেরা একদিন সেই বার-আনি জমিদারিকে আট লক্ষ টাকায় বেচে দিয়ে সরে পড়লেন!

কোথায় সরে পড়লেন?

বিলেতে। বার-আনির বংশের সবাই আজ বিলেতে। তারা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর, কেউ বা মস্ত বড় হোটেলের মালিক।

জয়ন্ত ঘোষের দুই চোখের তারা চিকচিক করে যেন হাসতে থাকে।—কী সৌভাগ্য, কী চমৎকার জীবন, কী সুখের সংসার। ওরা সবাই বিবাদীর গুষ্টি হলেও আমি বলবো, ওরাই ভাগ্যিমান। বাবার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েও ওদের কেউই আমাকে চিঠি দিয়ে সামান্য দু-চারটে শোক-দুঃখের কথাও জানায়নি। ওরা আমাকে বোধহয় একটা মানুষই বলে মনে করে না। তবু আমি বলবো ওরাই মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ…।

পুরনো নথিপত্রের বাণ্ডিলটাকে হাত দিয়ে শক্ত রকমের একটা ঠেলা দিয়ে

হেসে উঠলেন চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ।—কিন্তু হ্যাঁ, আমিও প্রতিশোধ তুলে নিয়েছি। আমার মেয়ে প্রীতিলতার বিয়েতে কাউকেও নিমন্ত্রণের চিঠি দিইনি। বিয়ে হয়ে যাবার এক মাস পরে সবাইকে একটি করে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে, প্রীতির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জামাই হলো বিলেত-ফেরত ডাক্তার মনোময় দত্ত। এ হলো লণ্ডনের হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসার চীফ সার্জন সেই মনোময় দত্ত, বার-আনি গুষ্টির সন্তু ঘোষ যার অ্যাসিস্টেণ্ট ছিল।

চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের আদুড় গায়ে জড়ানো শালটা হঠাৎ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো। ঢিপ ঢিপ করছে বুকটা। সন্দেহ হয়, জয়ন্ত ঘোষের বুকের ভিতর থেকে প্রতিশোধের গর্ব ও আনন্দ যেন একসঙ্গে উথলে পড়তে চাইছে। বুকের উপর হাত বুলিয়ে জয়ন্ত ঘোষ বলেন—ওরা কেউ আমার চিঠিরও জবাব দেয়নি; দেবে কি করে? লজ্জার মার তো কম সাংঘাতিক মার নয়। আজ মনে মনে ওরা নিশ্চয় স্বীকার করছে যে, চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ যে-সে মানুষ নয়।

বেশ জোরে একটা হাঁফ ছাড়লেন জয়ন্ত ঘোষ।—যাক্ গে ওসব কথা। আমার জামাই মনোময় এখন কলকাতাতে প্র্যাকটিস করছে। বিলিতী স্টাইলের ফার্নিচারে সাজানো দুটি বাড়ি, আর দুটি গাড়ি তার আছে। আমার জামাই মনোময় শুধু সাজ-পোশাকে নয়, মনে-প্রাণেও সাহেব-মানুষ। আপনিও হয়তো মনোময়কে দেখেছেন।

—না, দেখিনি।

—যা-ই হোক, আমিও আমার স্বপ্ন সফল করে ছেড়েছি। চার-আনি হয়ে দক্ষিণ পলাশপুরের অজ গেঁয়েমির মধ্যে পড়ে থাকলেও আমার ভাগ্যটা শেষ পর্যন্ত অজ হয়ে যায়নি।

অজ গেঁয়েমি বলতে চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ কী বোঝেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু দক্ষিণ পলাশপুরের জমির রূপ-গুণের যে-সব অদ্ভুত তথ্য পাওয়া গেল, তাতে বিশ্বাস করতেই হয় যে, এই জমিতে সত্যিই অদ্ভুত এক অজন্মার ভূত ভর করেছে। উত্তরে তাল-ডাঙা আর পশ্চিমে রাজহাট, এই দুই সীমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে যে জমি, তার প্রায় সবটাই কোনকালে দক্ষিণ পলাশপুরের চার-আনি কর্তার ভূসম্পত্তি ছিল। সে জমিতে ধান ফলে না, কোন কৃষিই সম্ভব হয় না, কেশে ঘাসে ভরাট হয়ে আর পতিত হয়ে পড়ে আছে ওই জমি। ল্যাণ্ড রেকর্ড অফিসের নথীতে স্বত্বাস্বত্বের খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, কেশে ঘাসে ভরাট ওই পতিতের মধ্যে আজকের দক্ষিণ পলাশপুরের দু'পুরুষ আগের

যত লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর আর চাকরান মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে।

নদীটার নাম ভাসানি। একটা মজা নদী। চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কোন কালে এই ভাসানির জলে কোন নৌকা ভেসে বেড়িয়েছে। এই নদীটাই হলো দক্ষিণ পলাশপুরের জমির অভিশাপ, দুর্ভাগ্যের আসল কারণ। এই মজা নদী ভাসানি বর্ষার জলের ঢল বইতে পারে না। সে জল প্রতি বছর পাঁচ হাজার বিঘে ধেনো জমির উপর গড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত এক রকমের লালবালুর কাদা ছড়িয়ে দেয়। এরকম বালুর কাদা কোথা থেকে যে বয়ে নিয়ে আসে ভাসানির বর্ষার জলের ঢল, তা কেউ বলতে পারে না। এরকম লালবালুর কাদাতে শুধু কেশে ঘাসই ভাল ফলে, আউশ আমন ও রবির কোন শস্য ফলাতেই পারে না।

গ্রামের গা ঘেঁসে অবশ্য রবির বেশ ভাল এঁটেল জমি আজও আছে। পুব দিকের তিন শো বিঘে হলো কালচে দোঁয়াশ। ধান মন্দ ফলে না। সে ধানের নাম হীরেশালি। পশ্চিমে রোগা-রোগা সরু জাতের বাঁশের একটা জঙ্গল আর পানের বরজ গোটা কুড়ি।

দক্ষিণ পলাশপুরের ভিতরে ও বাইরের চারদিকে বড় বড় গাছের চেহারা দেখলে একটু আশ্চর্য হতেই হবে। অনুন্নত এই গ্রামের কয়েকটা গাছ বড় বেশী উন্নত। দেবদারু অর্জুন আর পিয়াশাল, অশোক পলাশ জারুল আর সিমুল, কদম ডুমুর আর পাকুড়। কোন সন্দেহ নেই যে, এদের মধ্যে কয়েকটা বুড়ো-বুড়ো গাছের বয়স অন্তত দু' তিন শো বছর হবে। হতে পারে, এদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো সতের শতকের স্মৃতি নিয়ে একালের দক্ষিণ পলাশপুরের মাটিতে পুরনো আদরের ছায়া ছড়ায়।

চার-আনির দালান বাড়ির সামনের বাগানে যে কেতকীর একটা কুঞ্জ ধরনের ভিড় আছে, সে কেতকীকে একটা বিস্ময় বলে মনে করা চলে। কেতকীর কুঞ্জটাকে নয়, বিস্ময়ের সত্যটাকে আবিষ্কার করেছেন যিনি, তিনি হলেন স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার কৌশিক বসু।

একদিন ভোরবেলাতে, সেটা ছিল আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগের এক ফাল্গুনের প্রথম দিন, একজন অপরিচিত যুবককে বাগানের কেতকীর কুঞ্জটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অপ্রসন্ন হয়েছিলেন চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ। বেশ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন—কে মশাই আপনি? না বলে কয়ে এখানে এই সময়ে···।

কৌশিক কিন্তু বেশ শান্ত স্বরে জবাব দেয়—আমি আপনাদের এই দক্ষিণ

পলাশপুরের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার।

—আপনি আবার কবে সেকেণ্ড মাস্টার হলেন ?

—সেকেণ্ড মাস্টার হৃদয়বাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। আমি এই এক মাস হলো তাঁরই জায়গাতে এসেছি।

—কিন্তু এখানে কি মনে করে ?

—আমি আপনাদের এই কেতকী দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছি।

—কেন ?

—আমি জানতাম, সকলেই জানে যে কেতকী ফোটে বর্ষাকালে, আর কেতকীর রং হলো সাদা। কিন্তু কালিদাস লিখেছেন কেতকী বসন্তকালে ফোটে তার রং হলো হেমাভ, সোনার আভার মতো হলদে। ধারণা ছিল, কালিদাস ভুল কথা লিখেছেন। কিন্তু এই তো এখানে, আপনাদের কেতকীর যে ফুল এই ফাল্গুনে ফুটেছে, তার রং যে সত্যিই হেমাভ।

শুনে শান্ত হলেন জয়ন্ত ঘোষ। তারপর বেশ শান্তস্বরে বললেন—আচ্ছা, এখন তবে আসুন।

ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসেই চমকে উঠলো প্রীতিলতা।—কী ব্যাপার ! কী হয়েছে বাবা ?

জয়ন্ত ঘোষ বললেন—কিছুই না। গাছ আর ফুলের সম্পর্কে উনি ওঁর বিদ্যের কথা বলছেন।

তিন

দক্ষিণ পলাশপুরের বিদ্যা আর শিক্ষার অবস্থা যে কী রকমের করুণ, সেটা স্কুলবাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। পুরনো ইট দিয়ে আর লাল বালুর কাদা দিয়ে তৈরী এই স্কুলবাড়ির দেয়ালের গাঁথুনি অবশ্য নড়বড় করে না, কিন্তু উপরের খড়ের চালা আর বাঁশের বাতা নড়বড় করে। স্কুলবাড়ির কাছের একটা মাঠে ধ্বসে-পড়া একটা দালানের অনেক ইটের স্তূপ দেখা যায়। বুনো জলজের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে একটা পুরনো পুষ্করিণীর জল ; তার ঘাটটাও আজ পুরনো ইটের একটা স্তূপ। এই সব ইট দিয়ে স্কুলবাড়ির দেয়াল গাঁথা হয়েছে। জানা গেল, সেই ভয়ানক বর্ধমান জ্বরের আমলে ভয় পেয়ে বারো-আনির যে শরিকের সুখী মানুষগুলি গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতো পালিয়ে গিয়েছিল, এই সব পুরনো ইট তাদেরই দালানের অবশেষ। স্কুলের মর্যাদা এখনও হাই পর্যায়ে উঠতে পারেনি। নবম শ্রেণী পর্যন্ত এসে ঠেকে রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বেশির ভাগই হলো কাছাকাছি পাঁচ-সাতটি গ্রামের ছেলে। এই স্কুল পত্তন

করেছিল জেলা বোর্ড। এখন সরকারী গ্র্যান্টের সাহায্যে এই স্কুলের স্কুলতা কোন মতে চলছে।

এহেন একটি নিদারুণ গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারী করতে কৌশিকের মতো স্কলার ছেলে কেনই বা এল, আর কেনই বা স্থায়ী হয়ে থেকে গেল সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বললেন, আমিও ঠিক বুঝতে পারি না।

শুধু একজন স্কলার ছেলে বললে কৌশিকের পরিচয়ের সবটুকু বলা হয় না। কৌশিক বসু এই গ্রামের ছেলে নয়, বাইরে থেকে আগত একজন আগন্তুক। কৌশিকের চেহারা দেখে মনে হবে, বোধহয় দ্বিতীয় এক বল্লালসেন বাইরে থেকে একজন খাঁটি ক্ষত্রিয়কে আমদানি করেছেন। দীঘল বলিষ্ঠ শরীর, কিন্তু নাক চোখ ও মুখের শ্রী বড়ই কোমল। কৌশিক বসু দেখতে খুবই সুন্দর।

হেড মাস্টার গৌরহরিবাবু বললেন—বংশের দিক দিয়ে কৌশিক হলো আদি দশরথ বসুর পরে ষোল পুরুষ। আর, ওদিকে চার-আনির জয়ন্ত ঘোষ হলেন আদি মকরন্দ ঘোষের পরে পনের পুরুষ। তাঁর মেয়ে প্রীতিলতাকে বলা চলে, ষোল পুরুষ। কাজেই দু'দিকের কৌলীন্যের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল মিল ছিল। কিন্তু···হ্যাঁ, আপনার কি সরকারী মৎস্য চাষ বিভাগের কোন কর্তার সঙ্গে চেনা-শোনা আছে?

—কেন, বলুন তো?

—এ তল্লাটে মাছের উন্নতি করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

শুনতে পাচ্ছি, ভয়ানক হল্লা চলছে। বুঝতে পারছি, স্কুলের ক্লাসে ক্লাসে পড়া চলছে। ছিপ হাতে তুলে নিয়ে গৌরহরিবাবু বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমাকে এখন মাছ ধরবার জন্য বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন?

—ওই যে, বেশী দূরে নয়, ওই রঘুরামের বিলে। অবিশ্যি সেই অঢেল মৎস্য সম্পদ আজ আর নেই। শুধু শোল, চিতল আর বোয়াল। তার চেয়ে বেশী হলো বড়বড় জলঢোঁড়া আর কচ্ছপ। তবু, আজও কিছু-কিছু বাটা ফলুই আর ট্যাংরার বংশ বেঁচে আছে বলেই ওখানে যাই। বাবার মুখে গল্প শুনেছি, প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রঘুরামের বিলে খ্যাপলা জাল ফেলে ইজারাদারের জেলেরা হাজার-হাজার রুই-কাত্‌লা তুলতো আর নৌকা বোঝাই করে বাইরে চালান দিত। সে সময় নদী ভাসানির এরকম মজা অবস্থা ছিল না। মাছের নৌকা তরতর করে ভেসে তিন ঘণ্টার মধ্যে নীলগঞ্জের ঘাটে পৌঁছে যেত।

আর এক ঘণ্টার মধ্যে পাইকারেরা লুঠেরার মতো ব্যাকুল হয়ে সব মাছ কিনে ফেলতো। কিন্তু আজ দেখুন···আচ্ছা নমস্কার। আপনার যা জানবার তা ওই কৌশিকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

জানবার আর কী-ই বা বাকি আছে।

কৌশিক বসু কিন্তু বেশ মুখচোরা স্বভাবের ছেলে। সহজে কিছু বলতে চায় না। তবু, কথায় কথায় একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছে কৌশিক। মাত্র পঁচাশি টাকা মাইনে পায় বলে কৌশিকের মনে কোন ক্ষোভ অভিযোগ নেই।

ঠিকই, বেশ সুখী ও শান্ত মন নিয়ে দক্ষিণ পলাশপুরের সেকেণ্ড মাস্টারীর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে কৌশিক। বি-এ পাশ করে আর রেলওয়ের সার্ভিসে বেশ ভাল মাইনের কাজের জন্ত প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়েও শুধু অপেক্ষায় আর আশায় চুপ করে বসে থাকতে পারেনি কৌশিক গ্রামের স্কুলের তিন-চার মাসের জন্ত টেম্পোরারী সেকেণ্ড মাস্টারীর চাকরি, মাইনে পঁচাশি টাকা, মন্দ কি? একটা নতুন পরিবেশের বাতাস গায়ে লাগানো যাবে।

তিন-চার মাস পরে চলে যাবার জন্যই এখানে এসে সেকেণ্ড মাস্টার হয়েছিল কৌশিক। অঙ্কেতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরহরিবাবু আশ্চর্য হয়েছিলেন।—আপনাকে পার্মানেণ্ট করা হলেও বোধহয় আপনি এখানে থাকবেন না।

—আজ্ঞে না।

—রেলওয়ের চারশো টাকা মাইনে চাকরিটা আপনি পেয়ে যাবেনই বলে মনে হয়। আপনি ভয়ানক কোয়ালিফাইড।

—খবর পেয়েছি প্রতিযোগিতার পরীক্ষাতেও আমি ফার্স্ট হয়েছি। কাজেই···।

—চাকরির চিঠি বোধহয় তিন-চার মাসের মধ্যেই এসে যাবে?

—তার আগেও আসতে পারে।

ভুল কথা বলেনি, এমন কিছু বাড়িয়েও বলেনি কৌশিক। দুটো মাস শেষ হতে না হতেই চাকরির চিঠি এসে গেল, ঠিক আর ছ'মাস পরে নতুন মাসের পয়লা তারিখে চাকুরির কাজে যোগ দিতে হবে।

—কিন্তু কী ব্যাপার? রেলওয়েতে এইরকম ভাল মাইনের একটা চাকরী না নিয়ে আপনি এখানেই রয়ে গেলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে কৌশিক হাসতে থাকে—রয়ে গেলাম।

—কিন্তু তার একটা কারণ থাকবে তো?

—কারণ কিছুই নেই। ইচ্ছে হলো, তাই রয়ে গেলাম। দেশের বাড়িতে কাকারা আছেন, মা আছেন কাশীতে। প্রতি মাসে মা'কে ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দিই।

—এতেই আপনার জীবনের সব সাধ মিটে গেল ?

—না, ছুটির দিনে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করি, আর তার পাঠ উদ্ধার করি। সময়টা ভালই কেটে যায়।

হাসছে কৌশিক। সত্যি বেশ আছে কৌশিক।

চার

জাতের হিসাব নিলে জানা যায় এই গ্রামে অনেক জাতের মানুষ আছে, তাদের ভিন্ন-ভিন্ন পাড়াও আছে। বারুজীবী, বণিক, যুগী, মোদক, কলু, কাঁসারি, কুমার, কামার, নাপিত, রজক আর ভুঁইমালী। কোন পাড়াতে মাত্র দশ ঘর মানুষ, কোন পাড়াতে আবার পঞ্চাশ ঘর। দশ-বিশ ঘর নিয়ে বামুন কায়েতের পাড়াও আছে। একজন কবরেজ মশাইও আছেন।

জাত আছে, কিন্তু জাতের পেশা একেবারে নেই বললেই চলে। সেই বর্ধমানের জ্বরের প্রকোপে নয়, একটা অদ্ভুত দুর্ভাগ্যের জ্বরে এই গ্রামের সব জাতের সব পেশা যেন শুকিয়ে-পাকিয়ে মরে গিয়েছে। মঙ্গলবারে শিবমন্দিরের কাছে ডাঙ্গাতে যে হাট বসে, তার মধ্যে দক্ষিণ পলাশপুরের সব জাতেরই মানুষ তিন সারিতে বসে আর সব্জী বিক্রি করে। উচ্ছে, ধুঁদুল, কুমড়ো, লাউ আর কাঁকুড়। মাস বুঝে ওল, সীম, বরবটি আর কাঁচা পেঁপেও থাকে। মুদিদের ডাল নুন আর মশলার পসরাও দেখা যায়। বিশ বছর আগেও এই হাটে দা, কাটারি, লাঙ্গলফলা আর বঁটির অনেক দোকান বসতো। তা ছাড়া কাঁসার বাসনের পসরাও ঝকঝক করে খদ্দেরের চোখের লোভ জাগিয়ে তুলতো। এখন আর সে সব পণ্যের কিছুই আসে না। গোবর্ধন অবশ্য দশ-বিশ সের মুগকলাই বিক্রি করে, আর যুগী-পাড়ার শ্রীধর ও চন্দ্রনাথ বিক্রি করে খেরো গামছা। পানের বেচাকেনার হল্লাটাও যেন অনেকগুলি রোগীর কাতরানির শব্দ। গো-গাড়িতে বোঝাই হয়ে বাইরে থেকে অবশ্য চকমকে অনেক রকমের পণ্যের আগমন হয়। প্লাস্টিকের খেলনা আর বাসন, রঙিন শাড়ি আর কোরা ধুতি, সুতির গেঞ্জি আর উলের সোয়েটার, রূপসী ফিল্মী তারকাদের ছবি, টর্চ আর সাইকেলের সরঞ্জাম।

ডালডাঙার কাছে মোটর ট্রাক থামিয়ে রেখে পাইকারেরা আসে, সব সব্জীর সম্ভার কিনে আর গো-গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে চলে যায়। দক্ষিণ

পলাশপুরের অর্থনৈতিক প্রাণটা। মঙ্গলবারের হাটে বিকেল পর্যন্ত এই ভাবে ও এইরকম একটা সাড়া নিয়ে একটু চঞ্চল হয়, আর সন্ধ্যা হতেই ফুরিয়ে যায়। মোদক মহেন্দ্রের মেঠাইয়ের দোকানে সারাদিনের বিক্রীতে দশ টাকার বেশী আসে না।

সবচেয়ে বেশী করে আসে আর সবচেয়ে বেশী বিকিয়ে যায়, সেটা হলো বাইরে থেকে আসা একটা পণ্য, মিলের মোটা সুতোর ধুতি আর শাড়ি। নীলগঞ্জের তাঁতের কুসুম ফুলের রসে রঙীন-করা বাসন্তী রং-এর শাড়ি হলো সবচেয়ে সৌখীন আর দামী পণ্য, খুব কমই বিক্রী হয়। এই গ্রামে ওই শাড়ির ক্রেতা হলো শুধু ওই এক চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ।

সন্দেহ হয়, এই হাট বোধহয় সতের শতকের একটি সমৃদ্ধ হাটের ধ্বংসাবশেষ। বাইরে থেকে আজও যে এত ক্রেতা-বিক্রেতার আগমন এখানে হয়, তার কারণও বোধহয় স্মৃতিচারণার মতো একটা ব্যাপার। পুরনো অভ্যেসের জের। নইলে দক্ষিণ পলাশপুরের মতো এরকম একটা দুর্গম্য অনুন্নত গ্রামে এরকম কোন হাট বসতো না।

জাতপেশার কী অদ্ভুত অসহায় অবস্থা! প্রায় সব পেশারই হাত অসাড় হয়ে গিয়েছে, হাতিয়ারে মরচে ধরেছে। জাতপেশা ছেড়ে দিয়ে কিংবা ভুলে গিয়ে অনেকেই ভিন গাঁয়ের ক্ষেতে মনিষ হয়ে কাজ করে আর দিনমজুরীর আড়াই টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

কাঁসারীপাড়ার মথুরানাথের বিবৃতি: কলকাতা থেকে মহাজনেরা এসে দাদন সাধে বটে, কিন্তু দাদন নিতে পারি না। কাঁসার বাসনের যে দর তারা বেঁধে দিতে চায়, সে দর আমাদের পোষায় না। কাজেই পেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এ তল্লাটে আমার কাঁসার বাসন কেনবার মতো লোকও নেই। অনেক মেহনত করে পদ্মকলির মতো ধাঁচের একটা পেতলের পিলসুজ গড়েছিলাম। চার-আনির বাবুকে কত করে বললাম, আপনার মেয়ের বিয়ের দানসামগ্রীর জন্ত জিনিসটা কিনুন। তিনি বললেন—না, দরকার নেই। বর হলো বিলেত-ফেরত মানুষ, তার বাড়িতে পিলসুজ-টিলসুজ মানায় না।

নীলু ঘোষের বিবৃতি: আমার গোয়ালে এখনও ছ'টা গাই আছে বটে। কিন্তু থেকেও নেই। দুধ যা হয় তাতে দই-ক্ষীরের কিছু কারবার চলছে বটে কিন্তু আর কতদিন চলবে, তা বলতে পারি না। মশার কামড়ে গাইগুলো দিন দিন রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। চার-আনির বাবুকে সেধেছিলাম, আপনার মেয়ের বিয়েতে অন্তত সের দশেক ক্ষীরের অর্ডার আমাকে দিন। তিনি বললেন,

না, ক্ষীর-টীরের দরকার নেই। বর হলো বিলেত-ফেরত মানুষ। বরযাত্রীদের সাহেবী কেতায় খাওয়ানো হবে।

কবিরাজ অনাদি সেনের বিবৃতি : আমার সালসা-পাচনের কোন কদর নেই। রোগীর নাড়ী টেপাটিপি করবার জন্যেও আমাকে কেউ আর ডাকে না। কাজেই আমাকে স্কুলের বাংলা পণ্ডিতের কাজ নিতে হয়েছে। চার-আনির বাবু মাথা ধরার কষ্টে ভুগছিলেন, তাকে দেড় টাকা দামের একটা তৈল দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন : আপনার তৈল মাথাতে দিলে আমার মাথার কষ্ট বাড়বে।

অদ্ভুত ব্যাপার, পেশা হারিয়ে দুঃখী হয়ে যাবার এই গ্রাম্যজীবনের অবসাদ ও বিষাদের মধ্যে একটা নতুন পেশা বড়ই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে। এরকম বিচিত্র পেশা এবং তার এরকম মূর্তিমন্ত রূপ পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।

দন্তে তৃণ কাটি, অর্থাৎ একটা খড়কুটোকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে, আর জলন্ত ধুনোর একটা তপ্ত ধুনুচি হাতে নিয়ে গ্রামের এপথে-সেপথে ছুটোছুটি করে একটা লোক। এক-একবার থামে, গরুর মতো একটা বোকাটে শব্দের ডাক ছাড়ে। তারপর সারা গায়ে তপ্ত ধুনুচির ছেঁকা লাগায়। লোকটার নাম হলো ভক্ত হারু।

ভক্ত হারুর বিবৃতি : নিজের পাপের জন্যে নয় মশাই, আমি পরের হয়ে তার পাপের জন্য দন্তে তৃণ কাটি প্রাশ্চিত্তির করি। দক্ষিণা নিই মাত্র পাঁচটি টাকা। অন্য গাঁ থেকেও প্রাশ্চিত্তির করবার কাজ পাই। এ জগতে কে যে কত সাধু পুরুষ, তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। কে না প্রাশ্চিত্তির করালো? কে আর বাকি আছে? শুধু ওই চার-আনির বাবু ভয়ানক ভচ্ছোনা করে আমাকে খেদিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাকি প্রাশ্চিত্তির করবার কোন দরকারই কোনদিন হবে না। আমি সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম আর বলেছিলাম, দেখাই যাক্ দরকার হয় কি না।

[পাঁচ]

ধর্ম আছে উৎসবও আছে। পাঁচু ঠাকুরের পুজো হলো এই দক্ষিণ পলাশ-পুরের নিত্যদিনের ধর্মীয় ব্যস্ততা। পাঁচু ঠাকুরের কাছে পুজো আর মানতেও হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। শ্মশানে যাবার পথে আছে চণ্ডীতলা, অশ্বত্থের তলায় একটি সিঁদুর মাখানো শিলা। পালপাড়ার জগদ্ধাত্রীর পুজোটাই হলো এই গ্রামের একমাত্র ও সবচেয়ে হর্ষমুখর একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই উৎসবে সব

চেয়ে বেশি আমোদ জমিয়ে তোলে নীলগঞ্জের সখীদের গান। ছেলেরা মেয়ে সেজে গান গায়। গানেতে গ্রামের যার-তার নামে যথেচ্ছ রগড়ের কথা থাকে। এ বছরের সখীদের গানে চার-আনির বাবুর মেয়ের নামেও ইঙ্গিত করে কিছু কথা গাওয়া হয়েছে: 'ভাগ্যি নয়কো মাগ্‌গি ভাই ভাদুদিদি বলেন। ফুলতুলুনী মেয়ে আমার মেম-সাহেবটি হলেন।'

ঠিক কথা। জানাজানি হতে আর রটে যেতে বেশী দেরি হয়নি। চার-আনির বাবুর মেয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে খুবই সুখে আর আদরে আছে। শ্বশুর আর শাশুড়ি দুজনেই প্রীতিলতাকে খুব ভালবাসে। বিলেত-ফেরত স্বামীর বাড়িতে সাহেবী চালচলনের সঙ্গে নিজেকে খুবই সহজে মানিয়ে নিয়েছে প্রীতি। মঙ্গলবারের হাটে তোলা আদায় করেন যিনি, চক্রবর্তী মশাই, যিনি চার-আনির বাড়ির সব কাজের একজন সরকার মশাই, তিনি এই এক বছরের মধ্যে তিনবার কলকাতায় গিয়ে প্রীতিকে দেখে এসেছেন। তিনিই বলেছেন, প্রীতি এখন আর সেই বাসন্তী শাড়ির আর ফুলের সাজির প্রীতি নয়। জামাই মনোময়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যখন ময়দানে বেড়াতে যাবার জন্য গাড়িতে ওঠে প্রীতি তখন তাকে সত্যিই পাড়াপড়শিরা একটি মেমসাহেব বলে মনে হবে। প্রীতিলতার সাজ-পোশাক আর খোঁপাতে নতুন রকমের রঙ আর ভঙ্গী। প্রীতিকে ভাল করে লেখা-পড়া শেখাবার জন্য দেড়শো টাকা মাইনের একজন মাস্টার আছেন। প্রীতির বাপের বাড়িতে যাবার কোন কথা উঠলেই শাশুড়ী গম্ভীর হয় আর জামাই মনোময়ের চোখ মুখের ভাবটা করুণ হয়ে যায়। শাশুড়ী বলেছেন, বিয়ের পর একটা বছর পার না হওয়া পর্যন্ত নতুন বউয়ের পক্ষে বাপের বাড়ি যাওয়া আমাদের নিয়ম নয়। প্রীতিও চক্রবর্তী মশাইকে বলেছে—তাই ভাল। আপনি বাবাকে আর মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কাকা। এদের দুঃখিত করে এখন দক্ষিণ পলাশপুরে যেতে আমার একটুও ভাল লাগবে না।

মদ খেয়ে সব সময় টং হয়ে থাকেন যিনি, যাঁর নাম রায়বাবু, গো-গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে যিনি বেশ ভালই আয় করেন, তিনি বলেন—কিন্তু একবার এই দক্ষিণ পলাশপুর ছেড়ে চলে গেলে আর ফিরে না আসাও তো একটা নিয়ম।

—তার মানে?

—তার মানে ছাড়ার মতো করে একবার ছেড়ে চলে গেলে আর কখনও ফিরে না আসাই ভাল। ফিরে এলে নির্ঘাৎ কোন আঘাত অপঘাত পেতে হয়। কবরেজ-মশাইয়ের বড়ছেলে সুধাকর, যে সুধাকর আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো

কলকাতাতে আছে, কলকাতাতে চাকরী করে, কলকাতাতেই বিয়ে করেছে, আর মাগ-ছেলে নিয়ে কলকাতাতে ভাড়ার বাসাবাড়িতে থাকে, সে বড়দিনের ছুটিতে একবার এসেছিল। দিনদুপুরে পথের উপর একটা কেউটে সুধাকরকে তাড়া করেছিল। সেদিনই বিকেলে কলকাতাতে ফিরে চলে গিয়েছিল সুধাকর।

জানা গেল, দক্ষিণ পলাশপুরের জীবনে এরকম আরও অনেক নিয়ম আছে। শনিবারের সন্ধ্যেতে পথ হেঁটে তালডাঙ্গাতে না যাওয়াই ভাল, কারণ পথ ভুল করিয়ে দেবার জন্য পথেরই উপর আলেয়া ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীতলার কাছে যে ডুমুর গাছটা আছে, তার ফল রান্না করে খেতে নেই। খেলে অমঙ্গল হয়। গাছপাকা ডুমুর খাওয়াই ভাল, এবং খাওয়ার পর মুখ ধুতে নেই। রাত্রি বেলাতে কুকুরের কান্নার শব্দ কানে এলে ঘরের দরজার কপাটে তিনবার টোকা দিতে হয়। পুবমুখো হয়ে হাই তুলতে নেই। যদি মাঝ রাতে পায়ের শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোন ছায়া দেখতে না পাও, তবে দরজার হুড়কোতে পুরনো ঝাঁটা একবার ছুঁইয়ে দেবে। ভোরবেলাতে চার-আনির দেউড়ির মাটি মাড়াতে নেই; মাড়িয়ে ফেললে একটু গোবর মাড়িয়ে নিতে হবে।

দক্ষিণ পলাশপুরের এই সব করতে নেই আর করতে হয় যেন গ্রামবাসী মানুষগুলির মনের পাতালের যত দেবতা; কেউ ভয় দেখায় কেউ বা লোভ দেখায়। এবং এদের বিক্রমও কিছু কম নয়। গ্রামের কোন মানুষ এদের শাসন মেনে চলতে কখনও ভুল করে না, ভুলেও যায় না।

মোড়লের শাসন এখন আর নেই বললেই চলে। জাতের শাসন অবশ্য কিছুটা আছে। গত এক বছরের মধ্যে একঘরে করে শাস্তি দেবার তিনটে ঘটনা হয়েছে।

এক বছরের চুরির সংখ্যা হলো একুশ, খুনের সংখ্যা দুই, আর মেয়েমানুষ নিয়ে গণ্ডগোল ও মারামারির সংখ্যা হলো সাত।

রোগের মধ্যে মা শীতলার কৃপার ঘটনা সবচেয়ে বেশী। গত বছর মা শীতলার মাথাতে তুলসীপাতা রাখতে পারা যায়নি। যতবার রাখা হয়েছে ততবারই নাকি গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে। গত বছরে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় একশত জন, মরেছিল আশিজন। ওলাউঠায় মৃত্যুর সংখ্যা ছয়, সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা তিন।

মনে হতে পারে, দক্ষিণ পলাশপুরের এই সব রোগ মরণ আর দরিদ্রতার হাহাকারের দাপটে আনন্দের সব বাদ্য-টাদ্য নীরব হয়ে গিয়েছে। গান-টানও প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছে। চড়কের সময় ঢাক অবশ্য বাজে, কিন্তু সেই বাজনার তেমন কোন জোর নেই। কচিৎ কোন সন্ধ্যাবেলাতে চাষী গেরস্থের মেটে ঘরের

দাওয়াতে কেরোসিনের কুপি জ্বলে, খোলের শব্দও বাজে। ঘণ্টা দু'তিন নামকীর্তন চলে—হা রে কিষ্ণ, হা রে কিষ্ণ, হা রে কিষ্ণ হারে হারে। কে জানে, নামকীর্তনের ভাষার এই বিকার নিতান্ত উচ্চারণের বিকার কিনা। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। এই গ্রামের মাঠে কোন রাখালিয়া বাঁশি-টাশি বাজে না। দক্ষিণ পলাশপুরের অবস্থা দেখলে মনে হবে, ওটা নিতান্তই মিথ্যে কবি-কল্পনা।

কিন্তু কী আশ্চর্য রায়বাবুর গরু চরায় যে ছেলেটি, তার হাতে সব-সময় একটা ট্রানজিস্টার দুলে-দুলে আর ঘুরে ঘুরে ফিল্মী গান শোনায়।

না, ধারণা করলে ভুল হবে যে, দক্ষিণ পলাশপুরে এই গ্রাম্যতার সবটাই হলো সেকেলে জীবনের যত জীর্ণ-শীর্ণ অবশেষ। একেলে জীবনের বিচিত্র রকমের অনেক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই অনুন্নত গ্রামটির জীবনে প্রবেশ করেছে। পালপাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের রঙীন ডিসেতে মুড়ি খায়। গো-গাড়ী হাঁকিয়ে রোজ তালডাঙ্গাতে যায় যে বৈদ্যনাথ আর লক্ষ্মীচরণ, তাদের চোখে কালো কাঁচের চশমা, কড়া রোদের চেহারা ওদের চোখে আর সহ্য হয় না। স্কুলে যাবার সরু রাস্তাতে অনেক ধুলো অনেক কাদা আর অনেক গর্ত। তবু রায়বাবুর দুই ছেলে সাইকেলে চেপে স্কুলে যায়। রায়বাবু বলেন—বিলিতী ওষুধের একটা শিশিও এ গাঁয়ে দেখতে পাবেন না, কিন্তু চেষ্টা করে খোঁজ নিলে দু'চারটে বিলিতী মদের বোতল নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

দুঃখ হয়, দক্ষিণ পলাশপুরের এই অবস্থা যেন একটা আধপোড়া ফিনিক্স পাখীর যন্ত্রণাময় চেহারাটার দৃশ্য। ভাল হতো, যদি ভাল করে পুড়ে গিয়ে একেবারে ভস্ম হয়ে যেত এই দক্ষিণ পলাশপুর। তাহলে নতুন করে প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠতো হয় সতের শতকের অখণ্ড-অটুট একটি গ্রাম্যতার চেহারা নিয়ে, নয়তো সিন্ধ্রি চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুরের মতো বিশ শতকের জানপদী মূর্তি নিয়ে।

তাই ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য বোধ করতে হয়, কৌশিক বসুর মতো আধুনিক স্কলার ছেলে রেলওয়ে সার্ভিসের চারশো টাকা মাইনের একটা অফিসারী পদের মায়া তুচ্ছ করে কেন আর কিসের জন্য এই আধপোড়া দশার দক্ষিণ পলাশপুরে পড়ে আছে।

ছয়

এক বছর আগের ফাল্গুনেরই একটা মঙ্গলবারের হাটে তোলা আদায় করতে যখন ব্যস্ত ছিলেন চক্রবর্তী মশাই তখন সেই ব্যস্ততারই মধ্যে হেডমাস্টার গৌরহরিবাবুর মুখে একটু খবরের কথা তিনি শুনেছিলেন। আর চমকে উঠেছিলেন। খবরের মতো খবর আর চমকে ওঠবারই মতো কথা। সেকেও

মাস্টার কৌশিক বসুর মস্ত মাইনের একটা চাকরির চিঠি এসেছে। চাকরীর শুরুতেই চারশো টাকা মাইনে। চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে কৌশিক। তাই এখন ভাবতে হচ্ছে কী করে আর কোথা থেকে আবার একজন সেকেণ্ড মাস্টার পাওয়া যায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার দরকার হবে বোধহয়।

সেই মুহূর্তে আরও ব্যস্ত হয়ে, আর, বলতে গেলে একরকম দৌড় দিয়ে চার-আনির জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে এসে খবরটাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন চক্রবর্তী মশাই। তারপর স্কুলবাড়িতে গিয়ে আর কৌশিক বসুকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে এলেন আর হাঁফ ছাড়লেন।

জয়ন্ত ঘোষ খুশি হয়ে হাসলেন আর বললেন—এস বাবা, বসো বসো। শুনছি তুমি নাকি স্কুলের মাস্টারীর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

কৌশিক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুনছি, তুমি নাকি রেলওয়েতে চারশো টাকা মাইনেতে একটা চাকরি পেয়েছ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর কতদিন এখানে আছ?'

'বড় জোর আর একটা মাস।'

'তোমরা তো কুলীন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাদের দেশ?'

'ত্রিবেণী, হুগলী।'

'দেশে বাড়ি আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাড়িতে আর কে আছেন?'

'কাকারা আছেন।'

'তোমার বাবা?'

'তিনি নেই।'

'তোমার মা?'

'কাশীতে আছেন।'

'তোমার বড় কাকার নামটা আর ঠিকানাটা বলবে?'

'হ্যাঁ, জ্ঞানময় বসু, নতুনবাজার, ত্রিবেণী, হুগলী।'

'একটু চা খাও।'

'দিন।'

চেঁচিয়ে ডাক দিলেন জয়ন্ত ঘোষ—প্রীতি, চা দিয়ে যা।

প্রীতি আসে, চা দিয়েই চলে যায়। জয়ন্ত ঘোষ বললেন—আমার এই মেয়েই আমার একমাত্র সন্তান।

জয়ন্ত ঘোষের সঙ্গে এই আলাপ-সংলাপের ঘটনার পর মাত্র সাতটা দিন পার হয়ে আর একটা মঙ্গলবারের সকালবেলার রোদ যখন ঝলমল করে জেগে উঠেছে, ঠিক তখন একটা হঠাৎ বিস্ময়ের আবির্ভাবের মতো চার-আনির বাড়ির দেউড়ির কাছে গো-গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক, কলকাতার ডাক্তার শ্রীসুবিনয় দত্ত।

প্রজাপতির কি চমৎকার নির্বন্ধ। মামা সুবিনয় দত্ত তার ভাগ্নী প্রীতিলতার জন্ম একটি পাত্রের খবর নিয়ে এসেছেন। পাত্র হলো সুবিনয় মামারই জ্ঞাতি সোমেন দত্তের ছেলে মনোময়। বিলেত ফেরত ডাক্তার মনোময়। পাত্রের ইচ্ছা আর পাত্রের বাপ-মার ইচ্ছার একমাত্র দাবী হলো, খুব সুন্দর মেয়ে চাই। আর কোন দাবী নেই। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, প্রীতির মতো সুন্দর মেয়ে হাজারে কেন, লাখেও একটা পাওয়া যায় না। সুতরাং…

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্। আর দশটা দিন পরেই প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে গেল। বর মনোময়কে দেখবার জন্য পুরনো মন্দিরের কাছে রাস্তার উপর দক্ষিণ পলাশপুরের ছেলে-মেয়ে-বুড়োর বিরাট একটা ভিড় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকেই পুরুত এসে মন্ত্র পড়েছিল, হোম করেছিল। আর, সুবিনয় মামা তাঁর নিজের চেষ্টায় সব বন্দোবস্ত করে আর বেশ খরচ করে চার-আনির এই পুরনো দালানের বারান্দাতে বরযাত্রীদের সাহেবী কেতায় ডিনার খাইয়েছিলেন। কেটারিং-এর লোক এসেছিল দশজন, বরযাত্রী পাঁচজন।

গ্রামের কেউই নিমন্ত্রিত হয়নি। মামা সুবিনয় দত্ত বলেছিলেন, গ্রামের কাউকে লুচিমণ্ডা খাওয়ানো চলবে না। হাটের তোলা আদায় করে যার জীবনযাত্রা কোন মতে কায়ক্লেশে চলছে, তার মেয়ের বিয়েতে গেঁয়োদের নিয়ে দীয়তাং ভুজ্যতাং করবার কোন মানে হয় না।

তারপর? তারপর আর কি-ই বা হতে পারে। দক্ষিণ পলাশপুরের কোন আলোছায়ার চেহারা বদলে যায়নি। শুধু একটি দৃশ্য মুছে গিয়েছিল, চার-আনির বাগানে সকালবেলাতে ঘুরে ফিরে ফুল তুলতে সেই সুন্দরী মেয়েটিকে আর দেখা যায়নি।

সকালবেলার রোদে অনেককালের পরিত্যক্ত বৈরাগী পাড়ার যত বাস্তভিটার

ঘাসের উপর কেউটে ঘুরে বেড়িয়েছে। শুধু কি এক কেউটে? দাঁড়াশ কালচিতি শাঁকিনী, বেত-আছড়া ও আরও কত জাতের কতজন যে আছেন, তার হিসেব করা সম্ভব নয়। ঠাট্টা করে বলতে ইচ্ছে করে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ খুব-একটা গ্র্যাণ্ড সাকসেস হয়নি। সাপেরা হাজারে হাজারে পালিয়ে এসে এই দক্ষিণ পলাশপুরে ঠাঁই নিয়েছিল। দক্ষিণ পলাশপুরের সর্প সম্পদ বড়ই বিপুল।

এর মধ্যে যে সাপের নাম সন্ন্যেসী গোখ্‌রো, সে সাপ এই বিশ্বে অন্য কোথাও নেই বলে মনে হয়। গেরুয়া রং-এর গোখ্‌রো। এরা চার-আনির বাড়ির দেউড়ির আর পাঁচিলের ফাটলের মধ্যে বাস করে। ডানপিটে ছেলেরা কোন সন্ন্যাসী গোখ্‌রোর মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করলেই রেগে যান আর চেঁচিয়ে ধমক দেন মাতাল রায়বাবু।—থাম্ ছোঁড়ারা। ওরা কার কি ক্ষেতি করেছে রে? ওদের মারিসনে, কখ্‌খনো মারবিনে। ওরা গুপ্তধন পাহারা দেয়।

কিন্তু ডানপিটে ছেলেরা, কিংবা আগন্তুক বেদেরা ও ব্যাধেরা যখন গুলতি চালিয়ে আর আঠা মাখানো জাল পেতে গ্রামের গাছের পাখিগুলোকে মারে আর ধরে, তখন হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন রায়বাবু—ধর ধর ধর। সব ধরে ফেল। ঘুঘুর মাংস তো মাংস নয়, আয়ু বাড়াবার ওষুধ।

তবু দক্ষিণ পলাশপুরের পক্ষিসম্পদ একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। জলপাইগুড়িতে পাখীর সরকারী স্যাংচুয়ারিতে যাদের খুব কম দেখা যায় কিংবা দেখতেই পাওয়া যায় না, সেরকম বিরল জাতের অনেক পাখী এখানে আছে। সাদা-পেঁচা, মদনা টিয়া, ধনেশ, দোয়েল, আর নীলকণ্ঠ অনেক দেখা যায়।

একটা বৎসর চুপ করে থাকবার পর দক্ষিণ পলাশপুরের দোয়েল যেদিন ডুমুর গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে শিস বাজাতে শুরু করেছিল, সেটা ছিল ফাল্গুনেরই একটা দিন। গ্রামের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই আবার দলে দলে এসে আর ভিড় করে গ্রামের মাঝপথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। কলকাতার শ্বশুর-বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে চার-আনির মেয়ে। গো-গাড়ির ভিতরে বসে আছেন সেই মেয়ে; কী চমৎকার তার সাজের শাড়িটি। চূড়োর মতো খোঁপা। মেয়ের দু'ঠোঁটের মিষ্টি হাসির রকমটাও বদলে গিয়েছে। চার-আনির সেই মেয়েকে আর চেনাই যায় না।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বেহায়ার মতো সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেন যে নিজেই যেচে কিংবা কে-জানে কিসের গরজে চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। বাইরের ঘরে বসে তখন গল্প করছিলেন চার-আনির বাপ মা ও মেয়ে।

গৌরহরিবাবুকে এভাবে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখে খুবই রাগ করেছিলেন জয়ন্ত ঘোষ।—কী ব্যাপার? আপনি আবার আমার এখানে কেন, কিসের জন্য? একটা সেকেণ্ড মাস্টার পেতে হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন।

'আজ্ঞে না, বিজ্ঞাপন দেবার দরকার নেই।'

'কেন?'

'সেই সেকেণ্ড মাস্টার কৌশিক তো আর চলে যায়নি।'

'কেন?'

'কে জানে কেন! অদ্ভুত এক খেয়ালী ছেলে। যত সব অদ্ভুত খেয়ালের কাণ্ড! চাকরির চিঠিটাকে একদিন ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো আমি আর যাব না স্যার, এখানেই থাকবো।'

'কণ্ডটা কবে হলো?'

'সেই যেদিন আমাদের মা-মণির বিয়ে হয়ে গেল।'

চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের রাগের চোখ দুটো একবার কেঁপে উঠেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর গৌরহরিবাবুর সেই মা-মণি প্রীতিলতার চোখদুটো হঠাৎ নিষ্পলক হয়ে গৌরহরিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

তারপর, রাত্রি ফুরিয়ে ভোর হতেই যখন ডুমুরগাছের দোয়েল শিস বাজাতে শুরু করেছে, তখন দেখা গেল কী অদ্ভুত ব্যাপার, চার-আনির মেয়ে প্রীতিলতা, আর মাত্র তিন দিন পরে কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে যে মেয়ে সেই মেম-সাহেব মেয়ে নীলগঞ্জের তাঁতের বাসন্তী শাড়ি পরে আর ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাগানের ফুল তুলছে। বোধহয় চোখ দুটো ছলছল করে উঠছে, তাই বার বার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে আর বার বার থমকে দাঁড়াচ্ছে প্রীতিলতা।

সেদিন দুপুরবেলার ঘটনার দৃশ্যটা আরও অদ্ভুত, একেবারে ভয়ানক রকমের অদ্ভুত। চার-আনির বাড়ির বারান্দার কাছ থেকে একটা দৌড় দিয়ে দেউড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর দন্তে তৃণ কাটি গরুর ডাক ছাড়ছে ভক্ত হারু নামে সেই চিমড়ে চেহারার লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ছটফট করলো ভক্ত হারু। প্রাশ্চিত্তিরের যন্ত্রণা দেখাচ্ছে হারু। তার পর জলন্ত তপ্ত ধুনুচি হাতে নিয়ে দৌড় দিল। হঠাৎ এক-একবার থামে হারু রাস্তার ধুলোর উপর শুয়ে পড়ে, আর তপ্ত ধুনুচি দিয়ে বার বার বুকের উপর ছেঁকা দিতে থাকে।

এই অনুন্নত অদ্ভুত দক্ষিণ পলাশপুরের উন্নতির জন্য সমীক্ষার রিপোর্টে আপাতত এই সুপারিশ করতে হয় যে, ভাসানি নদীটার একটা বাঁধ দরকার।

জলের ঢল সামলাবার জন্যে সেই বাঁধে বেশ বড়-কয়েকটা স্লুইস গেটও দরকার। স্কুলটার জন্য সাহায্যের গ্রাণ্ট বাড়াবারও দরকার আছে যাতে দশম শ্রেণী সহজে চালু করা সম্ভব হয়। অন্তত তালডাঙ্গা থেকে দক্ষিণ পলাশপুর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটাকে পাকা করে দেওয়া উচিত। আর, জানা দরকার কিসের জন্য গ্রামের মানুষগুলির পুরনো পেশা ও কুটিরশিল্প একেবারে মরেই গেল। জানা দরকার, সরকারী পুরাকীর্তি সংরক্ষণের কর্তারা আজও সতের শতকের জীর্ণ মন্দিরটাকে সংস্কার করে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন না কেন। তা ছাড়া আরও একটু জানা দরকার, এত ভয়েল শিফন অর জর্জেট থাকতে সেদিন নীলগঞ্জের তাঁতের বাসন্তী শাড়ি কেন পরেছিল চার-আনির মেয়ে প্রীতিলতা? আর বাগানের ফুল তুলতে গিয়ে তার চোখ দুটোই বা ছলছল করছিল কেন?

ধূলি স্নান

এরা দুজন যেন সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতি। প্রকৃতি চালাচ্ছেন আর পুরুষ চলছেন।

অনবিশবাবু, যিনি এককালে কোন-এক কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি এখনও মাঝে-মাঝে হেসে হেসে আর শান্তস্বরে যাদের সম্পর্কে কথাটকে বলে থকেন, তারা হলো অবিনাশবাবুর বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির স্বামী আর স্ত্রী।

ফটিকদা, যিনি শখের থিয়েটারে অনেক অভিনয় করে নিজের মুখের ভাষাটাকেও বেশ একটু নাটুকে করে তুলেছিলেন, তিনি বলতেন, এ যেন মেঘের ঘরে বিদ্যুতের বাসা। যাদের দু'জনের সম্পর্কে ফটিকদার ধারণাটা খুব আশ্চর্য হয়ে কথা বলতো, তারা হলো ওই স্বামী আর স্ত্রী, অবিনাশবাবুর বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির নরেশ আর নীরজা। নরেশ দেখতে খারাপ নয়, আর নীরজাও রূপসী নয়। তবু ফটিকদার কথাটাকে খুব ভুল তুলনার বাচালতা বলে কেউ মনে করেনি। নরেশ যখন কারও মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন মনে হবে, নিতান্ত এক নিরীহতার দুটি চোখ যেন তাকিয়ে আছে। কিন্তু নীরজার চোখের তারা ঝিকমিক করে; মনটা যেন ওই চোখের চাহনিতে অদ্ভুত একটা আলো হয়ে ঠিকরে পড়তে চায়।

কে যেন নিন্দে করেই কথাটা বলে ফেলেছিল—একটুও মানায় না। তার মানে, নরেশের মতো নিরীহতার কাছে নীরজার মতো একটা ঝকমকে ব্যস্ততাকে

একটুও মানায় না। সত্যি, নরেশ যেন একটা অলস শান্তির ছবি। বাইরের ঘরে একটা চেয়ারের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে সুস্থির হয়ে বসে থাকে। আর, নীরজা যেন সব-সময় কাজে ব্যস্ত একটা চঞ্চলতার হাওয়া। ডাক-পিয়ন এসে দরজার কাছে দাঁড়ালে নীরজাই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। সব চিঠি নীরজাই পড়ে। তারপর নীরজা নিজেই সেই সব চিঠিকে আবার হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে নরেশের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে একটা-দুটো চিঠি নীরজার হাতেই থেকে যায়; কিন্তু সেজন্য নরেশের চোখে কোন প্রশ্নের ছায়াও দেখা দেয় না। নীরজার ইচ্ছা, নীরজা নিজেই জানে ও বোঝে, কোন্ চিঠি নরেশের পড়বার দরকার আছে, আর, কোন্ চিঠি নরেশের পড়বার কোন দরকার নেই।

বাগানের মালী যখন লাল গোলাপের গায়ে পোকার ওষুধ ছিটিয়ে দেবার জন্য পিচকারী হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, তখন নীরজাও ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে। মালীর কাছে দাঁড়িয়ে কাজ দেখে, যেন কাজে কোন ফাঁকি না থাকে, যেন কোন ভুল না হয়।

পাঁচ বছর আগে একদিন ওই লাল গোলাপ নেবার জন্য স্কুলের ছেলেরা এসেছিল। স্কুলের প্রাইজের অনুষ্ঠানে টেবিল সাজাতে হবে, তাই লাল গোলাপের দুটো তোড়া দরকার। ছেলেরা সে দরকারের কথা নরেশের কাছে বলেও ছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। নরেশ শুধু শান্তভাবে হেসে একটি কথা বলেছিল—আমি তো কিছু বলতে পারছি না, তোমরা ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ।

হ্যাঁ, ছেলেরা শেষে নীরজারই কাছে গিয়ে অনুরোধের কথাটা বলেছিল। আর, নীরজাও খুশী হয়ে মালীকে দিয়ে প্রায় এক ঝুড়ি লাল গোলাপ তুলিয়ে নিয়ে ছেলেদের দিয়েছিল।

কিন্তু আগের দিনের নরেশ ঠিক এরকমের একজন শুদ্ধ নরেশ ছিল না। আজ থেকে দশ বছর আগে এই বাড়িতে যে নরেশ তানপুরা হাতে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যখন-তখন গান গেয়েছে, সে নরেশ আর গান গায় না। সেজন্য অবিশ্যি এই সংসারের গানের প্রাণের কোন ক্ষতি হয়নি, হবেও না। কারণ, নরেশের গলায় সেই গানে শোনবার মতো অথবা শুনে খুশী হবার মতো কোন ব্যাপারই ছিল না। অনেকেই জানেন, বিশেষ করে সামনের বাড়ির অবিনাশবাবু জানেন যে, নরেশের গানের বাতিক একদিন নীরজারই ইচ্ছার একটি স্পষ্ট কথার কাছে বিনত হয়ে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়েই গিয়েছে।

শুধু গান গেয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, সে গান পৃথিবীর কোন দরকারে লাগুক বা না লাগুক, এরকম একটা নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিল বলেই বোধহয় নরেশ আর আইনের পরীক্ষাটা দেয়নি। উকীল না হলেও চলবে। নরেশের বাবা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য এই শহরের মধ্যেই ছোট-বড় যে দশটি বাড়ি রেখে গিয়েছেন, তার ভাড়াই যথেষ্ট। নীরজার বাবাও বোধ হয় নরেশের শুধু এই সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভেবেছিলেন, তাই নরেশের মতো ছেলের কাছে তাঁর একমাত্র মেয়ে নীরজাকে সঁপে দিয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন।

এই দশ বছর ধরে নীরজাও যেন প্রতি মুহূর্তের চিন্তা আর আগ্রহ দিয়ে এই বাড়িকে নিজেরই মনের মতো একটি খুশির স্বর্গ করে গড়ে নিয়েছে। নরেশের কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেনি নীরজা। আইন পাস করতেই হবে, নীরজার ইচ্ছার সেই নির্দেশ যেন একটা দুরন্ত আকাশবাণী। অবাধ্য হতে পারেনি নরেশ। পাটনাতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, আইন পাসও করেছে। তারপর নীরজা যা চেয়েছে, তাও হয়েছে। মুন্সেফ আদালতে রোজই একবার ঘুরে আসে নরেশ। ঠিক সকাল দশটার সময় বের হতে হয়। নীরজা বলেছে, কেস থাক বা না থাক, রোজ একবার আদালতে যেতেই হবে।

এই শহরের এই পাড়ার প্রায় সকলেই জানে, আজকের এই নরেশ আর সে নরেশ নয়। বদলে গিয়েছে নরেশ। যে নরেশ ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকতেই পারতো না, বেলবাগানের কাছে ওই এবড়ো-খেবড়ো মাঠেরই এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে, বাচ্চা ছেলেগুলোর সঙ্গে ডাণ্ডা-গুলি খেলতে গিয়ে সারা বিকালটাই পার করে দিত, সেই নরেশ আজকাল যেন শান্ত এক তপস্বীর মতো ওই বাড়ির বাইরের ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নীরজা বলেছে, ওরকম ছেলেমানুষী ছটফটানি তোমাকে একটুও মানায় না। একটুও ভাল দেখায় না। কাজ যখন থাকবে না, তখন চুপ করে ঘরের ভেতরে বসে থাকবে।

অবিনাশবাবুর আজও মনে পড়ে এই নরেশ, যার মাথাতে আজ খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের একটা স্তবক শক্ত হয়ে বসে রয়েছে, তার মাথায় ঢেউ-খেলানো চুলের ঝালর প্রায় কান পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তো আর দুলতো। ফুটবল বেশ ভালই খেলতো নরেশ। পাড়ার অনেকে আজও স্মরণ করতে পারে, খেলার মাঠে যখন ছুটে ছুটে বল ধরতো নরেশ, তখন নরেশের মাথার ঢেউ-খেলানো চুল যেন পাগল সন্ন্যাসীর জটার মতো এলোমেলো হয়ে উড়তো। সেই নরেশকে আজ দেখলে মনে হবে, এই মানুষ জীবনে কোনদিন কোন ফুটবলের

চেহারাও বোধহয় দেখেনি।

নীরজার দুই চোখের ওই দ্যুতির সঙ্গে যেন একটা তৃপ্তিও আলো হয়ে হেসে ওঠে। সত্যিই যা চেয়েছিল নীরজা, তাই হয়েছে। অবিনাশবাবুর মেয়ে চিত্রালীর কাছে বলতে গিয়ে নীরজার চোখের ওই আলো সত্যিই ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে—আমি যদি যেতে বলি, তবেই উনি যাবেন। নইলে যাবেন না, যেতে পারবেনই না, অসম্ভব।

অর্থাৎ শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আজ সন্ধ্যাবেলা নরেশদা যাবেন কিনা—চিত্রালী শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল, কারণ শিশিরবাবু বার বার চিত্রালীর বাবা অবিনাশবাবুকে অনুরোধ করেছেন, যেমন করে পারেন নরেশকে নিয়ে আসবেন।

ওই শিশিরবাবুর সঙ্গে নরেশের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। তা ছাড়া নরেশের বাবা ছিলেন শিশিরবাবুর অন্তরঙ্গ উপকারী বন্ধু। শিশিরবাবুও জানেন, বিয়ের পর কত বদলে গিয়েছে নরেশ। এই নরেশ যে নিজেই যখন-তখন শিশিরবাবুর বাড়িতে এসে চেঁচিয়ে ডাক দিত, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিন কাকিমা। সে-নরেশ এই দশ বছরের মধ্যে মাত্র একদিন শিশিরবাবুর বাড়িতে এসেছিল, যেদিন ওই কাকিমাই এক গেলাস জল খেতে গিয়ে হেঁচকি তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তারপর মরেই গেলেন। তিন বছর ধরে ভয়ানক রকমের একটা বুক-ব্যথার রোগে ভুগছিলেন শিশিরবাবুর স্ত্রী, নরেশের আত্মীয়া কাকিমা।

নীরজার প্রাণটা যেন একজন শিল্পী, আর নরেশ যেন একটা শিল্প। নীরজা যেমন করে গড়েছে, তেমন ভাবেই গড়ে উঠেছে নরেশ। কোনদিনও আপত্তি করেনি। কোন প্রশ্নও করেনি। নীরজার ইচ্ছার কথাগুলিকে যেন শোনামাত্র মাথা পেতে মান্য করে নিয়েছে নরেশ। নীরজা যদি মনে করে, এই বোশেখ মাসের গরমে খাঁটি দুধ নরেশের পক্ষে ভাল নয়, দই ভাল, তবে নরেশও মনে করে, দই ভাল, খাঁটি দুধ এই শরীরে আর এই গরমে কখনই সহ্য হবে না।

অবিনাশবাবুর স্ত্রী মনোরমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, ওই নীরজা এই বাড়িতে প্রথম যেদিন এল, সেদিন নীরজার কাছে কম করে বোধহয় দশটা হাসির গল্প বলেছিলেন মনোরমা। নীরজা কিন্তু একটুও হাসেনি। শুধু দুই কালো চোখের দুটো ঝিকঝিকে তারা থেকে অদ্ভুত রকমের একটা আলো, যেন একটা তীব্র দীপ্ত জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাকে ঠিকরে দিয়ে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই নীরজা আজকাল সব সময় সারা মুখ হাসিয়ে নিয়ে ওই

বাড়ির সব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ছুটোছুটি করে। যেন এক কৃতার্থা অগ্নিনীর মূর্তি। এই বাড়ির যত ঘরের দরজা ও জানালার পর্দাগুলি নীরজারই ইচ্ছার বাছাই-করা রং আর ডিজাইন নিয়ে দুলতে থাকে, যখন পাহাড়তলীর সবুজ শালবনের ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে শহরের পাড়ায় পাড়ায় যত গাছপালার মাথার পাতা দুলিয়ে দেয়।

নীরজা কোন দিনও এই বাড়ির বাইরে গিয়ে কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেনি। যদি কোন মহিলা হঠাৎ কোনদিন এবাড়িতে এসে পড়েন, তবে নীরজা অবশ্য একটা নিরীহ অস্তিত্বের মতো মুখ লুকিয়ে কিংবা নীরব হয়ে বসে থাকে না। না, নীরজার ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব কেউ কখনো দেখতে পায়নি। নীরজা যে কারও বাড়িতে যায় না, সেটাও বোধহয় একটা কঠিন অহমিকা নয়। খুব সম্ভব, একটা অভিরুচি। যেন নিজের ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাকবার আনন্দের কাছে আর-কোন আনন্দ ভালই লাগে না। চিত্রালী কতবার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছে, একবার আসুন না বউদি। ক্যারম খেলবেন, আসুন। কিন্তু শুধু হেসে সাড়া দিয়েছে নীরজা, না ভাই, এখন সম্ভব নয়।

—কেন? এখন তো বেলা তিনটে মাত্র। নরেশদা তো আদালত থেকে ফিরবেন সেই প্রায় পাঁচটায়।

নীরজা হাসে—না, ঠিক সাড়ে চারটেয়।

—কেন?

—আমার বলা আছে, বাড়ি আসতে যেন সাড়ে চারটার পর আর এক মিনিটও দেরি না হয়।

—যদি দেরি হয়?

নীরজা—হবেই না, অসম্ভব।

চিত্রালী জানে, ঠিকই বলেছেন নীরজা বউদি। নরেশদা যেন কাঁটায় কাঁটায় বাধ্য একটা যন্ত্রের মতো নীরজা বউদির কথা মান্য করে চলেন। ঝড়-বাদল থাকলেই বা কি? ঠিক সাড়ে চারটেয় বাড়ি ফিরে আসেন নরেশদা। নীরজা বউদি বলেন, না, আজ আর চা খেতে হবে না, আজ সরবত খাও। এক-একদিন সত্যিই অদ্ভুত রকমের এক-একটা কথা বলে ফেলেন নীরজা বউদি—আজ চা নয়, সরবতও নয়। আজ এখন শুধু কাশির ওষুধটা খেয়ে চুপ করে বসে থাক।

কতবার দেখতে পেয়েছে চিত্রালী, কাশির ওষুধ খেয়ে নিয়ে বাইরের ঘরের

চেয়ারে কত শান্ত হয়ে বসে আছেন নরেশদা।

চিত্রালীর মা মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য হয়ে একটা কথা বলেন—ভাগ্যি ভাল যে, ছেলেপুলে নেই।

চিত্রালীর মা মনোরমা বোধহয় মনে করেন, ছেলেপুলে নেই বলেই নীরজার স্বামিযত্নের চেষ্টা আর কাণ্ডটা এরকম চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তায় একটা বাতিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেপুলে আর হবে কবে? দশটা বছর তো পার হতেই চললো।

এরকম একটা রিক্ততার ভাব নীরজার জীবনে একটুও দুঃসহ বলে বোধ হয়েছে কিনা কে জানে! শশিবাবুর মা কিন্তু বেশ একটু রাগ করেই রগড় করেন।—এ-মেয়ের আর ছেলেপুলেতে দরকারই বা কি? স্বামীটাকেই তো একেবারে একটা শিশু করে ফেলেছে।

এক-এক সময় সত্যিই মনে হয়, নরেশ একটা ব্যক্তিই নয়, একটা শিশু। চকবাজারে গিয়ে আর দোকানে দোকানে ঘুরে যখন দরকারের জিনিস কেনা-কাটা করে নীরজা, তখন নরেশ ওই চকবাজারের রাস্তার একপাশে একটা রিক্সার উপরে চুপ করে বসে থাকে। কারণ নীরজা বলে গিয়েছে, আমি এখনই আসছি, তুমি ততক্ষণ এই রিক্সাতেই চুপ করে বসে থাক।

যাই হোক, পাড়ার মানুষ যতই আশ্চর্য হোক, আর, শশিবাবুর মা যতই নিন্দে করুক, পুরো দশটা বছর তো এই দু'জনের জীবনে একটা শান্তির একটানা প্রবাহের মতো পার হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা করলেও বাড়িয়ে বলেননি দার্শনিক অবিনাশবাবু; সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মতো, একজন শুধু চলেছেন, আর একজন শুধু চালিয়েছেন। মাস-পয়লার দিনে নীরজাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যাও, আজ বাড়ি-ভাড়া আদায় করে নিয়ে এস, আজ আর আদালতে যেতে হবে না। তখুনি ব্যস্ত হয়ে বের হয়ে যায় নরেশ। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। যদি কোনবার মাস-পয়লা পার হয়ে যায়, আর, বাড়িভাড়া আদায়ের কথা নরেশকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যায় নীরজা, তবে নরেশও ভুলে যায়। কোন দিন নিজের স্মৃতিশক্তির দোহাই দিয়ে একথা বলেনি নরেশ, মাস-পয়লা তো পার হয়ে গেল, এবার বাড়িভাড়া আদায়ের চেষ্টা করাই উচিত।

দশ বছরের মধ্যে মাত্র এই শেষ তিনটে মাস, নরেশের ওই বাড়ির বাইরের ঘরে মাঝে মাঝে এমন এক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে, যার পরিচয় এই পাড়ার কারও জানা নেই। অবিনাশবাবু শুধু অনুমান করেন, ভদ্রলোক খুব সম্ভব নরেশের স্ত্রী নীরজারই কোন আত্মীয়জন। হ্যাঁ, যে গাড়িতে চড়ে এই আত্মীয় ভদ্রলোক আসেন সেই গাড়িটা এই পাড়ার

অনেকেরই কাছে পরিচিত। ওটা হলো দয়াগঞ্জ ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিলাস দত্তের গাড়ি। হতে পারে, এই ভদ্রলোক হয়তো বিলাস দত্তেরও কোন আত্মীয়জন।

বেশ সুন্দর ঝকঝকে চেহারা, তেমনই সুন্দর সাজ-পোশাক ; ভদ্রলোক যেন চমৎকার এক অভিরুচির দীপ্ত ছবি। ভদ্রলোক যখন হেসে হেসে কথা বলেন, তখন মনে হয় নরেশের বাড়ির ওই বাইরের ঘরটা যেন চমকে চমকে অদ্ভুত একটা উৎসবের গান শুনছে। ভদ্রলোক নিজেই ব্যস্ত হয়ে অনুরোধ করেন, কই, এবার তাড়াতাড়ি এক কাপ চা দিয়ে ফেলুন, খেয়ে নিয়েই চলে যাই।

এবাড়ির এই দশ বছরের জীবনে কোন দিনও কারও অনুরোধের ভাষা শুনে কাজ করেনি নীরজা। কারও আদেশও শুনতে হয়নি। কিন্তু গত তিন মাসের মধ্যে অন্তত পনরটা দিন এই আত্মীয় ভদ্রলোকেরই একটা অনুরোধের কথা যেন উচ্চকিত একটা হর্ষের আদেশের মতো বেজে উঠেছে। শুনে খুশী হয়েছে নীরজা। খুব ব্যস্ত হয়ে, আর, একটুও সময় নষ্ট না করে চা তৈরী করেছে। সত্যিই, ভাবতে গিয়ে বেশ একটা আশ্চর্যও বোধ করে নীরজা। এই তো সেই শম্ভুবাবু, যার নামে কত গল্প শক্তিগড়ের বউদির মুখে নীরজা শুনেছিল। শম্ভুবাবু খুব ভাল ছবি আঁকেন ; বছরের ছ'টা মাস গোপালপুরে থাকেন, সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ান। কে জানতো যে, গল্পে শোনা সেই শম্ভুবাবুকে একদিন এখানেই এমন করে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে? দয়াগঞ্জের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বিলাস দত্তের মামাতো ভাই এই শম্ভুবাবুর চোখ গোপালপুরের সমুদ্র দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যায়নি। সে রকম কোন কারণ নয়, শম্ভুবাবু মাত্র তিন-চার মাসের জন্য ছোটপাহাড়, ঝরণা আর শালবনের সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য এসেছেন। ছবি আঁকার সব সরঞ্জামও সঙ্গে এনেছেন।

ওই, সপ্তাহের দুটি-তিনটি দিন কোন ছোট পাহাড়ের কাছে, কিংবা ঝরনার কাছে, অথবা কোন শালবনের কাছে গিয়ে বসে থাকেন শম্ভুবাবু ; তার পরেই এই শহরে নরেশের এই বাড়িতে এসে একটা-দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে যান। শিল্পী মানুষের চোখের হাসি দেখে মনে হয়, সেই চোখ বোধহয় নীরজাকেও একটা ঝরনা মনে করে আর খুশী হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু নরেশের বাড়ির বাইরের ঘরের এই হর্ষমুখর ব্যস্ততার নূতন পালা কি এই তিনটা মাস পার হয়েই ফুরিয়ে গেল? অবিনাশবাবু লক্ষ্য করেছেন, নরেশের বাড়ির বাইরের ঘর আবার তেমনই নীরব। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপরে নরেশের সেই চুপটি করে বসে থাকা অস্তিত্ব একাই পড়ে থাকে।

চিত্রালী এসে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন বউদি ?

নীরজা হাসে। সেই তৃপ্তির, সেই খুশি গর্বের হাসি।—ভাল আছি।

—নরেশদা কেমন আছেন ?

নীরজা—আমি যেমন রেখেছি, ঠিক তেমনই আছেন।

এইবার চিত্রালীও হেসে ফেলে—তা তো জানি। কিন্তু…।

নীরজা—না ভাই, কোন কিন্তুটিন্তু নেই। আজ এই দশ বছরের মধ্যে ভদ্রলোকের ওপর একটি মুহূর্তের জন্যেও রাগ করতে পারিনি। এ কী আমার কম সৌভাগ্যের কথা ?

চিত্রালী বলে—নরেশদা আপনাকে সত্যিই…।

নীরজা—কি ? বলেই ফেল না কেন ?

চিত্রালী—আপনাকে খুব বেশী ভালবাসেন।

নীরজা—অস্বীকার করতে পারি না। যদি তাই না হতো, তবে কি আমার ইচ্ছা আর আমার কথার কাছে ভদ্রলোক তাঁর জীবনটাকে এমন করে ছেড়ে দিতে পারতেন ?

কী আশ্চর্য, যেদিন চিত্রালীর কাছে নরেশের নামে এরকম একটা উদাত্ত প্রশস্তির কথা বলে দিয়ে আর একটুও লজ্জাকুণ্ঠিত না হয়ে হাসতে পেরেছিল নীরজা, ঠিক সেদিনই বিকালের রোদ যখন একটু লাল হয়ে এসেছে, তখন বাড়ির বাইরের বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে অবিনাশবাবুর বাড়ির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে নীরজা। দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে চিত্রালী। আশ্চর্য হন অবিনাশবাবু আর মনোরমা। এরকমভাবে পরের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে নীরজা, এটা যে চোখে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস হতো না। কী হলো, কিসের জন্যে, কোন্ দরকারে, অবিনাশবাবুর বাড়ির দিকে এরকম একটা অসহায়তার করুণ ছবির মতো তাকিয়ে আছে নীরজা ?

নীরজা যেন সাজ আর প্রসাধনের সব চমক একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে নিজেকে সাজিয়েছে। সবুজ শাড়ি, সত্যিই যে বৃষ্টিতে ধোওয়া শালবনের সরস সবুজের মায়া আজ নীরজার সুঠাম শরীরটাকে ঘিরে ধরেছে। আর একটু রাত হলে, আর, আগের কাল হলে মনে হতো, ওই সাজ একেবারে খাঁটি অভিসারিকার সাজ। তাই, ভাবতে অদ্ভুত লাগবেই তো; সে নারী আজ এত সাজে কেন ? নীরজা কি সত্যিই কোথাও যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে ?

বাইরের ঘরে তেমনি একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে আছে নরেশ।

নীরজার দিকে তাকিয়েও আছে নরেশ, কিন্তু নরেশের চোখে কোন বিস্ময় নেই, চমক নেই, শিহর নেই, চঞ্চলতাও নেই। কোন প্রশ্নও নেই নিশ্চয়। নইলে এত শান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারবে কেন নরেশের ওই দুই চোখ ?

কিন্তু নীরজার এই সুন্দর করে সাজা চেহারাটা যেন ভীরু বহুরূপীর মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। কালো চোখ দুটো হঠাৎ একেবারে সাদা আর লাল ঠোঁট একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চমকে উঠলেন অবিনাশবাবু, চমকে উঠলেন মনোরমা। নীরজা যেন একটা উতলা আতঙ্কের মতো ছুটে এসে অবিনাশবাবুর বাড়ির ফটকের দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে নীরজা—কাকাবাবু।

দার্শনিক অবিনাশবাবুর বুকের ভিতরটাই যেন চমকে ওঠে। আর কেঁদে ফেলে। নীরজার মতো মেয়ে যে প্রতিবেশী বৃদ্ধকে কাকাবাবু বলে ডাকতে পারে, একথা আগে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। এই ডাক যেন নীরজার বুকের ভিতরে ফুঁপিয়ে ওঠা একটা ভয়ের ডাক। কিন্তু কিসের ভয় ?

অবিনাশবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে ছটফট করে—কোন ভয় নেই। আমরা আছি কোন চিন্তা নেই। কী হয়েছে বল ?

নীরজা—আমি আর কত সহ্য করবো বলুন ? এরকম একজন একরোখা অবাধ্য মানুষ, আমার সামান্য একটা অনুরোধের কথাকেও যে মানুষ একটুও গ্রাহ্য করে না, তার সঙ্গে আমি কি করে ঘর করি, বলুন।

মনোরমা চেঁচিয়ে ওঠেন—কে ? কে ? কার কথা বলছো ? নরেশ ?

নীরজা—তা ছাড়া আর কার কথা বলছি, কাকিমা ? আমি কোনদিনও স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি কাকিমা, ভদ্রলোক এরকম একটা পাথরের মতো বধির হয়ে বসে থাকবেন, আমার কোন কথা শুনতেই পাবেন না।

মনোরমা—কথা শুনতে পাবে না, এর মানে কি ?

নীরজা—যেন আমাকে চোখেও দেখতে পাচ্ছেন না, এমন করে তাকিয়ে আছেন।

মনোরমা—এর মানেই বা কি ?

নীরজা—এর মানে আমাকে তুচ্ছ করা। আমার জীবনের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর সাধ-অসাধকে একটুও গ্রাহ্য না করা। আমি যা চাই, ঠিক তার উল্টোটি হয়ে আর চুপ করে বসে থাকা।

মনোরমা—তুমি এখন বোধহয় কোথায়ও বেড়াতে যাবার জন্য···।

—ছি ছি, কখ্খনো না, অসম্ভব, কোথাও বেড়াতে যেতে চাই না। দূর

সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র তার একটা মুখের কথা শুনেই আমি বেড়াতে বের হয়ে যাব কেন ?

মনোরমা—এই যে কিছুদিন আগে নতুন ভদ্রলোক, যিনি তোমাদের···।

নীরজা—হ্যাঁ, তিনি, তিনি বলেছিলেন, একবার দয়াগঞ্জে গিয়ে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

মনোরমা—নরেশ কী বলে ?

—সে যদি একটা কথাও বলতো, কাকিমা—একবার রাগ করেও একটা আপত্তি করতো, তবে আমাকে এত ভয় পেতে হতো না। কিন্তু সে যে অদ্ভুত অবাধ্য একরোখা মানুষ, একটা কথাও বলে না।

কেঁদে ফেলে নীরজা : কালো চোখের দুই তারার সেই ঝিকঝিকে আলো যেন ভয় পেয়ে চলে গিয়েছে।

মনোরমা বলেন—বলবে বলবে, নিশ্চয় বলবে। চল আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। দেখি নরেশ কেমন করে তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারে।

নিকষিত হেম

বাবা মা আর বউদির সঙ্গে রাজগীরে বেড়াতে গিয়েছিল প্রমিতা। রাজগীরে গিয়ে একদিন থাকা, তারপর আবার গয়ার বাড়িতে ফিরে আসা। এই তো সামান্য একটা ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটা প্রমিতার মনটাকে যে ভাবনায় ভরে দিয়েছে, তার ভার সামান্য নয়। প্রমিতার প্রাণটা যেন দুটো দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে।

সাদা শাড়ির আঁচলের উপর হঠাৎ একটু আবীরের গুঁড়ো ছিটকে এসে লাগলে যেমন দাগ হয়, একটা দাগ যেন সেই রকমের একটা রঙীন চিহ্ন। তুচ্ছ করে আর আঁচল-ঝাড়া দিয়ে সে চিহ্ন ঝরিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না।

আর-একটা দাগ যেন নিতান্ত কর্কশ আর গা-জ্বালানো একটা আঁচড়ের চিহ্ন। একটা অভদ্র মতলবের লোভ সত্যিই প্রমিতার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। গায়ে যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে ; ছটফট করে সরে গিয়েছিল প্রমিতা। সে-কথা মনে পড়লে এখনও গা সিরসির করে।

দুই পরিবারে দেখা হয়েছিল বক্তিয়ারপুরে। প্রমিতা, প্রমিতার বাবা

খগেনবাবু, মা তরুলতা আর বউদি মাধুরী ; এই দলটি চলে গেল রাজগীরে। আর, একটি পরিবার রাজগীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে পাটনা চলে গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এক প্রৌঢ় মহিলা, প্রমিতারই বয়সের এক তরুণী ; সেই সঙ্গে একটি যুবক, দেখতে খুবই সুন্দর।

প্ল্যাটফর্মের উপর কাছাকাছি দুটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দুই পরিবার। তরুলতা ফিস ফিস করে পুত্রবধূ মাধুরীর কানের কাছে কথা বলেন—বুঝতে পারছি, ওঁরা দুজন হলেন মেয়েটির বাবা আর মা। কিন্তু ছেলেটি কে, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাধুরী বলেন—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি।

তরুলতা—কী ?

মাধুরী—কেউ নয়।

তরুলতা—তার মানে ?

মাধুরী হাসে—তার মানে, এখনও কেউ নয়। কিন্তু শিগগিরই ওঁদের জামাই হবেন বোধহয় !

তরুলতা—কেমন করে বুঝলে ?

মাধুরী—মেয়েটির কথাবার্তার রকম-সকম আর কাণ্ড দেখেই বুঝতে পারছি।

যুবক ভদ্রলোকের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজে-বাজে কত কথাই না অনর্গল বকে যাচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা দেখতে একটুও ভাল নয়। কিন্তু সাজের চেহারা দেখলে বোঝা যায়, সুন্দর দেখাবার জন্য কী চেষ্টাই না করেছে। গায়ের রঙটা বেশ কালো, কিন্তু সাদা মালাবার সিল্কের শাড়িটাকে এমনই কায়দা করে গায়ে জড়িয়েছে যে, ওই কালো চেহারাতেও যেন সাদা জ্যোৎস্নার আভা চিক মিক করে হাসছে। ছোট ছোট চোখ, কিন্তু কাজলের বড়-বড় টানা দিয়ে চোখের চাহনিটাকে কত বড় করে তুলেছে ! খোঁপাতেও ফুল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—মৃণাল, চা খাবে নাকি ?

যুবক ভদ্রলোক বলে—না। উৎপলা বোধহয় খাবে।

মেয়েটি ভ্রূকুটি করে যুবক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলে—না, তুমি না খেলে আমিও খাব না।

প্রমিতার মা তরুলতা আবার পুত্রবধূ মাধুরীর কানের কাছে ফিস ফিস করেন।—কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেমন করে এই ছেলে ওই মেয়ের বর হবে। মেয়েটাকে যে ছেলেটার সঙ্গে একটুও মানাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমাদের পমির

সঙ্গেই এরকম ছেলেকে চমৎকার মানায়।

কথাটা শুনতে পেয়েছে প্রমিতা, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে চমকেও উঠেছে। কারণ, এতক্ষণ ধরে আনমনার মতো কি-যেন ভাবছিল প্রমিতা, আর উৎপলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মৃণালের মুখের দিকেও তাকিয়েছিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলছেন—তুমি আবার কবে ছুটি পাবে মৃণাল ?

মৃণাল বলে—যদি চীফ্-এঞ্জিনিআর এখন জার্মানী না যান তবে আমাকে এখন ধানবাদেই থাকতে হবে।

—তুমিই বোধহয় চীফ-এঞ্জিনিআরের জায়গায় অফিসিয়েট করবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উৎপলা আবার মৃণালের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা-গলায় কথা বলে—তুমিও আবার বিদেশে পাড়ি দেবে না তো ?

মৃণাল হাসে—না।

উৎপলা—কিন্তু আবার ছুটি পাবে কবে ? পাটনাতে আবার আসবে কবে ?

মৃণাল—ঠিক বলতে পারছি না। তবে গয়াতে একবার আসতে হবে। দেখি···।

উৎপলা—দেখি আবার কি ? গয়া থেকে একবার পাটনা ঘুরে যেতে কতক্ষণ লাগবে ?

উৎপলার মাথাটা যেন দুর্বার এক আবদারের ঝোঁকে মৃণালের কাঁধের উপর হেলে পড়তে চাইছে। কিন্তু সামলে নিয়েছে উৎপলা। মাথাটাকে কাত করে, আর, এক হাতে খোঁপায় ফুল চেপে রেখে, মৃণালের মুখের দিকে যেন একটা লোভী পিপাসার বেহায়া দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে উৎপলার চোখ দুটো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কাজলের টান দিয়ে বড় করে আঁকা দুটো ছোট-ছোট চোখ।

শুনতে পায় প্রমিতা, বেশ উৎফুল্ল স্বরে আর হেসে-হেসে উৎপলার সঙ্গে কথা বলছে মৃণাল—হ্যাঁ, চেষ্টা করলে কদিনের ছুটি নিয়ে একবার পাটনা ঘুরে যেতেও পারি, কিন্তু তুমি আবার রাজগীর-রাজগীর করবে না তো ?

উৎপলা—করলে ক্ষতি কি ? রাজগীরে আসতে তোমার কি ভাল লাগে না ?

মৃণাল—লাগে বইকি। কিন্তু প্রতি বছর একবার করে একই রাজগীরে বেড়াতে আসতে কেমন যেন লাগে, একটু একঘেয়ে লাগে। তোমাদের সঙ্গে রাজগীরে বেড়াতে আসা এবার নিয়ে মোট তিনবার হলো।

উৎপলা—তা তো হলোই, কিন্তু আমার একটুও একঘেয়ে মনে হয় না।

ভাল লাগলে আবার একঘেয়ে মনে হবে কেন ?

প্রমিতার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা অস্বস্তি ছটফট করে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে দূরের ঐ সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রমিতা। মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোকের জন্য বোধহয় একটা করুণার ভাব প্রমিতার মনের ভিতরে হঠাৎ আক্ষেপ করে উঠেছে। কী অদ্ভুত একটা বিপদেই না পড়েছেন ভদ্রলোক, একটা শাস্তিও বলা যায়।* একঘেয়ে লাগছে, তবু বলতে হচ্ছে, ভাল লাগছে। বুঝতেই তো পারা গেল, অন্তত তিন বছর ধরে মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোকটি উৎপলা নামে ওই শক্ত ফন্দীর মায়াজালে পড়ে বোকা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি মায়ার জাল ? একগাদা ফুল খোঁপায় গুঁজে আর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নাকে-মুখে কথা বলতে পারে—একটা বেহায়াপনার জাল !

সন্দেহ হয়, ভদ্রলোক নিজেই বোকা, তাই এত সহজে উৎপলার মতো মেয়ের মায়াজালে ধরা পড়েছেন। ভদ্রলোক একবার মুখ ফিরিয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাবার চেষ্টাও করতে পারছেন না, উৎপলা যেন অনবরত কথা বলে বলে ভদ্রলোকের চোখ দুটোকে শুধু ওর নিজেরই মুখের দিকে টেনে ধরে রেখেছে। যদি একবার এদিকে তাকাতে পারতেন ভদ্রলোক, তবে দেখেই চমকে উঠতেন যে, পৃথিবীতে এমন মুখও আছে, যার কাছে উৎপলার মুখটা একটা অন্ধকার মাত্র।

পাটনার ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মের গায়ে লেগেছে, ট্রেনের একটা কামরার দিকে ওরা চলে গেল। ইস, কী বিশ্রী রকমের নির্লজ্জ হয়ে মৃণালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে কামরার দিকে হেঁটে গেল উৎপলা। প্রমিতার চোখে যেন নতুন একটা সন্দেহ হেসে ফেলতে চাইছে। সত্যিই রুমাল তুলে একটা অস্বস্তির হাসিকে এইবার চাপা দিতে চেষ্টা করে প্রমিতা। মৃণালের সঙ্গে এই বেহায়া ধরনের গা-ঘেঁষা ভাবটা কি সত্যিই নিশ্চিন্ত মনের একটা খুশির উৎসাহ ? না, হারাই হারাই সদা ভয় হয় ; একটা উদ্বিগ্ন সতর্কতা ? হেসেই ফেলে প্রমিতা।

মাধুরী বউদি বলেন—তোমার আবার কি হলো ?

প্রমিতা—আমার আবার কি হবে ? কিছুই না।

সেই মুহূর্তে প্রমিতার মুখের এই হাসি হঠাৎ সাবধান হয়ে যায়। গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু লাল হয়ে গিয়েছে প্রমিতার সারা মুখটাই। চোখের দুটি কালো তারার দৃষ্টিও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছে।

ট্রেনের কামরার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে মৃণাল নামে সেই ভদ্রলোক সোজা প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মৃণালের পাশে বসে কত

কথাই মা বলছে উৎপলা। কিন্তু মৃণাল তবু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর উৎপলার দিকে তাকিয়ে কোন কথা শুনতে কিংবা বলতে পারছে না। ট্রেন ছাড়বার আগে মৃণাল যেন এই বক্তিয়ারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক মায়াময়ী ক্ষণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

ট্রেন ছেড়েছে। উৎপলা ব্যস্ত হয়ে বলছে—আমার ঘড়িতে দশটা তের হয়েছে। তোমার ঘড়িতে কি বলছে?

মৃণাল কিন্তু তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতে পারল না। প্রমিতারই মুখের দিকে তাকিয়ে মৃণালের চোখ দুটো যেন একটা মুগ্ধ বিস্ময়ে সুন্দর মুখটিকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছে।

জোরে স্পীড নিল ট্রেনটা। কী আশ্চর্য, মৃণাল নামে অচেনা-অজানা এই ভদ্রলোকও অভিবাদনের ভঙ্গীতে হঠাৎ হাত তুলছেন। হতে পারে, খগেনবাবু আর তরুলতাকে লক্ষ্য করে অভিবাদনের একটা সঙ্কেত জানালেন মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোক। কিন্তু প্রমিতার রুমাল-ধরা হাতটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। কী বিপদ, আর-একটু হলে প্রমিতার রুমাল-ধরা হাতটা বোধহয় পাল্টা সাড়া দিয়ে বিদায়-অভিবাদনের ছোট্ট একটি ভঙ্গী দুলিয়ে দিত।

রাজগীর যাবার ট্রেনটা ছাড়তেও আর বেশি দেরী করেনি। রাজগীরে পৌঁছতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। বিম্বিসারের ভাঙা-প্রাসাদের যত পুরনো পাথরের চারদিকে অনেক ঘুরে বেড়ানো হলো। রেষ্ট হাউসে চায়ের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারে প্রমিতা, না, মা আর বউদির কাছে চেআরে বসে চা খাওয়া সম্ভব নয়। সেই কথা, সেই পুরনো অভিযোগের কথাই শুরু করেছেন মা। আর, মাধু-বউদিও শতবার শোনা সেই কথাগুলিকেই চুপ করে শুনছেন।

তরুলতা বলেন—আমি তো কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, মাধু। আমরা চেষ্টা করে যে পাত্রের খোঁজ পাই, তাকে ওর পছন্দ হবে না, আবার নিজেও যে ইচ্ছে করে কাউকে···।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সরে যায় প্রমিতা।

একটা সমস্যারই কথা বলেছেন প্রমিতার মা তরুলতা। বয়স হয়েছে, এম-এ. পড়ছে কিন্তু কী অদ্ভুত রকমের ভীতু স্বভাবের মেয়ে প্রমিতা! বিয়ের সম্বন্ধ আসে, পাত্রের পরিচয়ও জানতে পারে প্রমিতা, কিন্তু প্রমিতার আপত্তির কারণ এই যে, ভয় করে।—না না বউদি, কখ্‌খনো না। একটা অচেনা-অজানা মানুষের সঙ্গে বিয়ে, আমার ভাবতেই ভয় করে।

বউদি কতবার বলেছেন—তবে চেনা-জানা করে নিয়েই বল।

—ছিঃ, ঘেন্না করে। ওসব হবে না।

বউদি—এদিকে হবে না, ওদিকেও হবে না, তাহলে কি করে হবে?

কোন ভদ্রলোকের ছেলে যদি ইচ্ছে করে প্রমিতার কাছে চেনাজানা হতে চেষ্টা করে, তাহলেও কিছু হবে না। বউদি জানেন, ভাগলপুরের সুহাস প্রমিতার সঙ্গে একটু গল্প করবার জন্য কতবার এসেছে আর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুহাসের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেনি প্রমিতা।

—না, আমার এসব এখন ভালই লাগে না বউদি।

বউদিও বিরক্ত হয়ে বলেছেন—তবে দেখ, কখন ভাল লাগে আর কাকে ভাল লাগে।

রাজগীরের মাঠের হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে রেষ্ট-হাউসের প্রমিতার শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দেয়। আঁচলটা যেন এক বিজয়িনীর পতাকা হয়ে উড়ছে। প্রমিতার চোখ দুটোও হাসছে। মৃণাল নামে সেই ভদ্রলোক এখন যদি হঠাৎ এখানে এসে পড়েন, আর উৎপলা যদি সঙ্গে না থাকে, তবে কী বলতেন ভদ্রলোক? এই তো, কী আশ্চর্য, ভাবতেই পারিনি যে আপনার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে।

রাতের ট্রেন আবার বক্তিয়ারপুর হয়ে পাটনা ফিরে যাচ্ছে। বক্তিয়ারপুরের প্ল্যাটফর্মে এত লোকের ভিড়, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা শূন্যতা আছে মনে হয়। সে ভদ্রলোক এরই মধ্যে এখানে আবার ফিরে আসবেন কেমন করে? অসম্ভব।

কিন্তু ইনি আবার কে? ছোট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে এই কামরাতেই ঢোকবার জন্যে এদিকে এগিয়ে আসছেন। ওদিকের কত কামরা খালি পড়ে আছে, তবু এই কামরার দিকে কেন?

কামরার ভিতরে ঢুকে প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবছেন ভদ্রলোক। তাকাবার কী ভঙ্গী! যেন একটা হাবা ছেলের চোখ জাদুঘরের একটা আশ্চর্যের জিনিসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

কামরার এদিকেওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আনমনার মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক। টিকেট চেকার কামরাতে উঠে ভদ্রলোকের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন—জেরা আগে বাঢ়িয়ে সাহেব! তবু ভদ্রলোকের হুঁস নেই?

এ কী? খুব হুঁস আছে দেখছি। খুব বুদ্ধিও রাখে মনে হচ্ছে। প্রমিতারই

পাশে সীটের উপর হাতের ব্যাগটাকে ঝুপ করে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোকও ঝুপ করে বসে পড়লেন। ব্যাগটাও যে একটা অভদ্র ভার হয়ে প্রমিতার শাড়ির আঁচলটাকে চেপে রেখেছে, এটুকুও ভদ্রলোকের চোখে পড়ছে না। ভদ্রলোকের ব্যাগটা আর শরীরটা, দুটোই যেন দুর্ভার ক্লান্তি হয়ে প্রমিতার গা ঘেঁষে সীটের উপর এলিয়ে পড়েছে।

এক হাত দিয়ে আস্তে টেনে শাড়ির আঁচলটাকে সেই অভদ্র ভারের চাপ থেকে ছাড়িয়ে নেয় প্রমিতা। ব্যাগটার ছোঁয়া থেকে অনেকখানি তফাৎ রেখে সরে বসে। এভাবে তফাৎ হয়ে বসে থাকতেও অস্বস্তি হয়; ভয় হয়, যে-কোন মুহূর্তে আর যে-কোন ছুতো করে লোকটার এই এলিয়ে-পড়া চেহারাটা প্রমিতার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়বে।

ট্রেন ছাড়লো, কামরাটা দুলে উঠলো। ঠিক তখনই উঠে দাঁড়ালেন অদ্ভুত মতলবের এই ভদ্রলোক। কী উপদ্রব! লোকটা অন্ধ না হয়েও অন্ধের মতো এ কী কাণ্ড করছে! প্রমিতার ঘাড়ের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে জানলার বাইরে ঝুঁকি দিলেন ভদ্রলোক। প্রমিতা ভ্রুকুটি করে নিজেরই মাথাটাকে কাত করে একপাশে সরিয়ে রাখে।

ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—জল, এই জল! এই পানি!

আহা! কী চতুর বোকামি। ট্রেন ছাড়লো, ঠিক সেই সময়ে বাইরের পানিপাঁড়ের কাছে জল চাওয়া। পানিপাঁড়েটা যদি এখন ছুটেও আসে, তবু চলন্ত ট্রেনের এই কামরার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

ভদ্রলোকের কামিজের বুক-পকেটে বোধহয় কোন ভারী জিনিস আছে, বোধহয় রুমালে বাঁধা টাকা আধুলি সিকি আর পয়সা। বুক-পকেটটা ঝুলে পড়ে প্রমিতার কাত মাথার খোঁপাটাকে ছুঁয়ে রয়েছে। প্রমিতা মাথা নাড়লেও বুক-পকেট সরে যায় না। নাঃ, উঠে গিয়ে আরও দূরে গিয়ে সরে না বসলে এই উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কিন্তু আর কত দূরেই বা সরা যায়? এ পাশে বউদি, ওপাশে কোন জায়গাই নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, আবার নিজেরই জায়গায় বসলেন ভদ্রলোক। কিন্তু কে জানে কেন, হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন। চট্ করে পা সরিয়ে নেয় প্রমিতা। লোকটা প্রমিতার পায়ে পা ঠেকিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

এইবার খগেনবাবু বলেন—ও মশাই, আপনি এরকম করছেন কেন? একটু স্থির হয়ে বসুন।

খগেনবাবুর কথায় ফল হলো। ভদ্রলোক নিজেরই জায়গায় চুপ করে বসে

রইলেন। চশমাটা মোছবার জন্যে বুক-পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা টাকা, সিকি আর আধুলি পকেট থেকে এদিকে-সেদিকে গড়িয়ে গেল।

চশমাটা তিন মিনিট ধরে মুছলেন। তারপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে আর আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে টাকা সিকি আর আধুলিগুলোকে তুললেন। একটা টাকা প্রমিতার পায়ের জুতোর গা ঘেঁষে পড়ে আছে। সে টাকাটাকে তুলে নেবার জন্য কোন চাড় দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারা যায়, ইচ্ছে করেই এই টাকাটাকে দেখতে ভুলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। তার মানে, এই আশা করছেন যে, প্রমিতা নিজেই টাকাটাকে হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের হাতের কাছে এগিয়ে দেবে—এই যে, আপনার টাকা।

প্রমিতা খগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ইসারা করে আর পায়ের কাছের টাকাটাকে দেখিয়ে দেয়।

খগেনবাবু ডাকেন—ও মশাই, ওই যে ওখানে, আপনার একটা টাকা।

ভুল, খুব ভুল করেছে প্রমিতা। এমন উপদ্রব সহ্য করতে হবে কল্পনা করতে পারলে, নিজেরই হাতে টাকাটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিত। তা-ও ভাল ছিল। কিন্তু, এ যে অসহ্য।

টাকাটাকে তোলবার জন্যে ভদ্রলোক হাত বাড়াতে গিয়ে এমন ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়লেন যে, চশমাটা চোখ থেকে ঝুপ করে প্রমিতার কোলের উপর পড়ে গেল। প্রমিতার হাঁটুতেও মাথাটাকে একবার ঠুকে নিলেন ভদ্রলোক তারপর নিজেই হাত বাড়িয়ে প্রমিতার কোলের উপর থেকে চশমাটাকে তুলে নিলেন।

মাধু-বউদি এইবার আস্তে আস্তে ফিসফিস করেন—ভদ্রলোক কেমন যেন, চালচলনের কোন ইয়ে নেই।

খগেনবাবুর কানের কাছে তরুলতাও খুব আস্তে আস্তে চাপা-স্বরে কথা বলেন—ছেলেটি তো দেখতে ভালই, বয়সও বেশ অল্প বলেই মনে হচ্ছে। কে জানে, এখনও হয়তো বিয়ে হয়নি।

খগেনবাবু হাসেন—থাম থাম, সব সময় এক কথা নিয়ে এত চিন্তে করতে নেই।

তরুলতা—বেশ তো, মেয়েকে তবে আইন-টাইন পড়িয়ে একটা উকীল করে দাও—আমারও চিন্তের লেঠা চুকে যাক।

অনেকক্ষণ পরে, ভদ্রলোকের চালচলনের আরও একটা কাণ্ড দেখে একটু

নিশ্চিন্ত হয় প্রমিতা। যাক্, ওভাবে লোকটা দুচোখ বন্ধ করে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেই বাঁচা যায়।

ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক। কিন্তু কোন রোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় চোখের রোগ। হঠাৎ যখন এক-একবার চোখ মেলে কামরার আলোটার দিকে তাকাচ্ছেন, তখন বেশ স্পষ্টই দেখা যায়, চোখ দুটো লালচে হয়ে ছলছল করছে।

রোগী মনে হলেও ভদ্রলোককে এখন বেশ ভালমানুষটির মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু···।

প্রমিতার মনের এই কিন্তুময় সন্দেহটাই সত্য হলো। ট্রেন থেকে নামবার সময় দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিল প্রমিতা। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে সেই ভদ্রলোক যেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। প্রমিতার কাঁধটাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে আর পাশ কাটিয়ে নেমে পড়লেন। তার পরেই স্টেশনের লোকের ভীড়ের আর সোর-গোলের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক তো নয়, একটা যাচ্ছেতাই অভদ্রলোক। প্রমিতা লোকটাকে একটা ধিকার দেবারও সুযোগ পেল না, এমনই হন্তদন্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পলাতক হয়ে গেল লোকটা।

[দুই]

গয়ার বাড়িতে একটানা সাতটা-আটটা মাস থাকলেই যেন হাঁপ ধরে যায়। তাই, শুধু প্রমিতা নয়, খগেনবাবুও মনে করেন, একবার বাইরে বেড়িয়ে আসা ভাল। গত বছরে সারনাথে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল, এবছর রাজগীর। মাঝে মাঝে গিরিডির বাড়িতেও একটা-দুটো মাস কাটিয়ে দিতে ভাল লাগে। তারপর আবার গয়া।

সেই পুরনো গয়া। প্রমিতার অভিযোগ সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই কোর্ট কামাই করে এইবার বাড়ির সবাইকে রাজগীর ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন খগেনবাবু। ছেলে অসিত আর্মিতে আছে, অসিত মাধুরীকে চিঠি দিয়ে ঠাট্টাও করেছে, এখন আরও কিছুদিন ইচ্ছেমত রাজগীর করে নাও; আর বেশি সুযোগ পাবে না, আমি হয়তো এই বছরেই কোয়ার্টার পেয়ে যাব।

মাধু বউদিও ঠাট্টা করেন—তার আগে তোমার একটা কোয়ার্টার হয়েছে দেখতে পেলেই ভাল হতো।

প্রমিতা—আর হয়েছে কোআর্টার। এই গয়াতেই গয়াপ্রাপ্তি হবে।

মাধু-বউদি—এত হতাশ হয়ে পড়লে কেন? কোন কারণ তো নেই?

প্রমিতা—না, গয়া আর ভাল লাগে না বউদি। দেখবার কি আছে এখানে? শুকনো ফল্গুর বালি আর কতগুলো মন্দির, এই তো! আর কত দেখবো? একশোবার দেখা হয়ে গিয়েছে।

গয়া যার কাছে একটা একঘেয়ে জীবনের পুরনো ভার বলে মনে হয়েছিল, সেই প্রমিতার মনে যেন গয়ার জন্য একটা নতুন মায়া দেখা দিয়েছে। বাড়ির বাইরে বেড়াতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল যে মেয়ে, সে মেয়েকেই এখন দেখা যায়, কখনও চকে, কখনও স্টেশনে, আর কখনও বা ফল্গুর ধারে ধারে অনেক দূরে বেড়িয়ে আসে। ড্রাইভার নালিশ করে—দিদিমণি পেট্রলের খরচ ডবল করে দিয়েছেন।

ছোটকাকা বলেন—কি হলো তোর, প্রমিতা? গয়াতে আবার এত দেখবার কি পেলি?

ছোটকাকার কথার জবাব না দিলেও নিজের মনের কাছে জবাবটাকে লুকোতে পারে না প্রমিতা। জবাবটা যে প্রমিতার মনের একটা আশার কথা। সে আশা সত্যিই লাল আবীরের গুঁড়োর ছোট্ট একটি দাগের মতো হাসছে। সেই ভদ্রলোক, যার নাম মৃণাল, উৎপলাকে যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই খারাপ লেগেছিল প্রমিতার, সে ভদ্রলোকের একবার গয়াতে আসবার কথা আছে।

কে জানে এসেছেন কি না? সত্যিই এসেছেন আর এরই মধ্যে চলে যাননি তো? এলেও সত্যিই কি হঠাৎ একবার দেখা হয়ে যেতে পাবে না? পৃথিবীতে কত কিছুই তো হঠাৎ হয়ে যায়! মৃণালের সঙ্গে একদিন গয়ার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াই বা অসম্ভব হবে কেন?

দেখতে সত্যিই বেশ ভয় করেছিল প্রমিতার, মৃণালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর হাত নেড়ে কী বিশ্রীভাবে কথা বলছিল উৎপলা! যেন মাকড়সার মতো জাল বুনে বুনে বেচারা মৃণালকে বাঁধতে চাইছে ছোট-ছোট চোখের বেহায়া খুশি। কিন্তু মৃণাল বাঁধা পড়েছে মনে হয় না। তা না হলে ট্রেন ছাড়বার সময় প্রমিতার দিকে হাত তুলে ওরকম সুন্দর একটা বিদায়ভঙ্গী জানাতে পারতো না।

মাধু-বউদি একদিন প্রমিতার কাছে এসে চমকে চমকে হাসতে থাকেন।—কী আশ্চর্য, প্রমিতা, সত্যিই আশ্চর্য।

—কী হলো?

—সেরেস্তা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার ভেতরে উঁকি দিয়ে চলে এস।

—কেন?

—সেই ভদ্রলোক। সেই, কী যেন নামটা, মৃণালবাবু।

প্রমিতার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।—তুমি একটা মিথ্যে সন্দেহ করে আমাকে একটা বাজে ঠাট্টা করছো বউদি, কোন মানে হয় না।

বউদি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন—কিসের সন্দেহ? ঠাট্টাই বা করবো কেন? কি বলছো তুমি?

—মৃণালবাবু এখানে আসবেন কেন?

—নিশ্চই আদালতে কোন কাজ আছে, তাই বাবার কাছে এসেছেন।

—কিন্তু…।

—বল, চুপ করে রইলে কেন?

—আমি কিছুই বলতে পারবো না।

—তুমি একবার দেখা করবে?

—ছিঃ!

—তবে?

—ছোটকাকাকে একবার বল, বউদি।

মাধু-বউদি হাঁপ ছেড়ে হাসেন—তাই বল। এরকম স্পষ্ট করে বললেই তো বুঝতে পারি।

মৃণালকে বৈঠকখানার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন ছোটকাকা। মাধু-বউদি মৃণালের জন্য চা পাঠিয়ে দিলেন।

মৃণালের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন ছোটকাকা। ছোটকাকার হাসির সঙ্গে মৃণালের গলার হাসির শব্দটাও কত স্বচ্ছন্দে বাজছে, এই ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পাচ্ছেন মাধু-বউদি, ও ঘরের ভিতরে বসে প্রমিতা।

প্রমিতার মা তরুলতাও ব্যস্ত হয়েছেন; সেরেস্তা থেকে খগেনবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে এসে বললেন—ঠাকুরপোকে একবার ভিতরে ডেকে নিয়ে এসে বলে দাও…।

—কি বলবো?

—ছেলেটির রাশি আর গণ যেন জেনে নেয়।

—ছেলেটির রাশি গণ জানবার সময় যখন হবে, তখন জানাই যাবে।

মৃণাল চলে যাবার পর ছোটকাকা যখন বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এলেন,

তখন সবার আগে মাধু-বউদি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো ছোট-কাকা?

—অনেক কথা হলো। চমৎকার ছেলে।

—আবার আসতে বলেছেন তো?

—বলেছি বইকি।

—কি বললেন মৃণালবাবু?

—সে তো বেশ খুশি হয়েই বললো, নিশ্চয় আসবে।

—কিন্তু পাটনাতেও তো যাবেন?—মাধু-বউদি কেমন যেন অপ্রস্তুতভাবে কথাটা বলে ফেললেন।

ছোটকাকা বললেন—না, এখন পাটনা যাবার কোন কথা নেই।

—কেমন করে বুঝলেন?

—নিজেই বললে, আদালতের কাজ শেষ হলে সোজা ধানবাদে ফিরে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করি নি, নিজেই হঠাৎ বললে, পাটনাতে কোনদিন যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ। পাটনাকে একটুও ভাল লাগে না। পাটনাতে গেলে মিছিমিছি নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়। পাটনাতে যেতে ভয় করে।

মাধু-বউদির চোখ বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে আরও বড় হয়ে যায়।—এত কথা নিজেই বলেছেন ভদ্রলোক?

—হ্যাঁ, আমি কিন্তু এসব কথার বিশেষ কোন মানে বুঝতে পারিনি।

—আপনি না বুঝুন, প্রমিতা বুঝতে পারবে।

—সে কি। যাক, ভালই তো, এতদিনে প্রমিতার কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে তাহলে?

—মনে হচ্ছে।

—তাহলে একটা কাজ করতে হয়। মৃণাল এলে প্রমিতা নিজেই যেন চা নিয়ে যায়।

গন্নার বাড়ির আশাটাকে আর খুব বেশিদিন উদ্বিগ্ন করে রাখেনি মৃণাল। আদালতের কাজ শেষ হয়েছে, এইবার ধানবাদে ফিরে যেতে হবে। এক সন্ধ্যায় মৃণাল এসে এই বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়ালো।

বৈঠকখানার ভেতরে বসে ছোটকাকার সঙ্গে গল্প করে মৃণাল। এইবার এবাড়ির দিক থেকে শুধু একটি অভ্যর্থনা এগিয়ে গিয়ে মৃণালকে চা দিয়ে আসবে। মৃণাল যদি প্রমিতার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রমিতা। মাধু-বউদি বলে দিয়েছেন—বোবার মত শুধু

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। অন্তত দু'একটা কথা বলবে।

সবই ভেবে রাখা আর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। নিজেরই হাতে চা তৈরি করলো প্রমিতা। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ যেন চমকে ওঠে প্রমিতা—পারবো না বউদি।

—কি পারবে না?

—আমি ওঘরে চা নিয়ে যেতে পারবো না।

—কেন?

—কেমন ভয়-ভয় করছে।

—তোমার মাথা আর মুণ্ডু!

—না বউদি, আজ থাক; না হয় অন্য কোনদিন হবে, আজ পারবো না।

কি আর করা যাবে! অগত্যা, চাকর রামধারীকেই আদেশ করেন মাধু-বউদি—ওঘরে চা পৌঁছে দিয়ে এস রামধারী।

[তিন]

মৃণাল যেদিন ধানবাদ চলে গেল, সেদিন ছোটকাকা স্টেশনে গিয়ে মৃণালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মৃণাল বলেছে, আমি ঠিক তিন মাস পরে আবার গয়াতে আসবো।

—অফিসের কাজে?

—না, ছুটি নিয়েই আসবো। একমাসের ছুটি না পাই, অন্তত পনেরো দিনের পাওয়া যাবে।

—শুনে খুবই খুশি হলাম।

শুনে আশ্বস্ত হয়েছে গয়ার বাড়ি। আবার আসবে মৃণাল। এবার অফিসের কোন কাজের জন্যে নয়; একমাস কিংবা পনেরো দিনের ছুটিকে আনন্দে হাসিয়ে রাখবার জন্য এই গয়াতেই আসবে। বুঝতে আর অসুবিধে কোথায়, মৃণালের আশা যে এই গয়ারই কাছ থেকে একটি পরম উপহার চাইছে।

কিন্তু প্রমিতা যদি আবার এরকম মাথামুণ্ডুহীন লজ্জার জন্য অভদ্র হয়ে যায়, মৃণালের কাছে গিয়ে একটা কথা বলতেও না চায়, তবে কি হবে?

তরুলতা রাগ করে বলেছেন—তাহলে আইন পড়বেন মেয়ে। আর কি করবেন?

মাধুরী হাসে—এত রাগ করবেন না। প্রমিতা বলেছে, এবার আর কোন গোলমাল হবে না।

তরুলতা—দেখ তাহলে? আমি অবিশ্যি এ মেয়ের মতিগতিকে একটুও বিশ্বাস করি না?

কিন্তু বিশ্বাস না করবারই বা কি কারণ থাকতে পারে? মাধুবউদি প্রমিতার একটা আপত্তির কথা শুনেই বুঝতে পারলেন যে প্রমিতাকে অবিশ্বাস করবার কোন মানে হয় না!

খগেনবাবু বলেছেন—চল, অন্তত দশটা দিন গিরিডির বাড়িতে কাটিয়ে আসি।

বাড়ির সবাই রাজি হয়েছে। রাজি হতে চায় না শুধু প্রমিতা। মাধু-বউদিকে বেশ স্পষ্ট করে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে প্রমিতা—এ সময়ে হঠাৎ আবার গিরিডি কেন?

মাধু-বউদি হাসেন—কোন ভয় নেই। যথাসময়ে ফিরে আসা যাবে।

সত্যি, গিরিডি যাবার দিনে খুবই গম্ভীর হয়ে যায় প্রমিতা। বউদির কাছ থেকে এত স্পষ্ট আশ্বাসের কথা শুনতে পেয়েও যেন একটা সন্দেহ প্রমিতাকে নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছে না। যথাসময়ে গয়াতে ফিরে আসতে পারা যাবে তো!

গয়া ছেড়ে গিরিডি যাবার দিনেও কিন্তু প্রমিতা তার মনের এই সন্দেহটাকে ঠিক চিনতে পারেনি। কিন্তু গিরিডিতে এসেই একদিন একটি শান্ত আনমনা ভাবনার মধ্যে সন্দেহটাকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে প্রমিতা। ছিঃ, এ কি হলো?

বক্তিয়ারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একটি ছবি হঠাৎ চোখের উপর ভেসে উঠেছে। উৎপলার ছোট-ছোট দুটো চোখে বড় করে কাজল বোলানো; কিন্তু সেজন্যে বেচারাকে ঠাট্টা করবে কেন পৃথিবীর চোখ? কি দোষ করেছে উৎপলা? যাকে ভাল লেগেছে, তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তারই মুখের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। বেচারা যে প্রাণ দিয়ে আর আত্মা দিয়ে ওর জীবনের পছন্দের মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইছে।

কে জানে এখন কি করছে পাটনার উৎপলা? কে জানে কতবার স্টেশনে এসেছে আর ট্রেনের কামরার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে চোখ, হেলে পড়েছে মাথাটা, ঝরে পড়ে গিয়েছে খোঁপার ফুল। মৃণাল যে আর কোন ছুটিতেই পাটনা যাবে না সেটা কি এখনও বুঝতে পারেনি উৎপলা?

বুঝতে পারলেই বা কি করবে উৎপলা? হয়তো একদিন বক্তিয়ারপুরে এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই তো সেই প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ওর খুশি ভাগ্যটাকে ভয়ানক এক অভিশাপ ছুঁয়ে দিয়েছিল।

মন্দ হয় না, যদি গয়া ফিরতে ছুটো মাস দেরি হয়ে যায়, আর মৃণালও গয়াতে এসে দেখতে পায় যে, খগেনবাবুর মেয়ে সেখানে নেই। আরও ভাল হয়, যদি পাটনার উৎপলা হঠাৎ সব জানতে পেরে সোজা গয়াতে চলে আসে। তাহলে গয়ার রাস্তায় উৎপলা আর মৃণালের হঠাৎ মুখোমুখি দেখা একদিন হয়েই যাবে। তারপর ওদের ভাগ্য জানে, কি হবে আর কি না হবে ?

নিজেরও ভাগ্যটার রকম দেখে বেশ আশ্চর্য হতে হয়। সবই যেন অকারণে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। শেষে একটা চাকরি-টাকরিই হয়তো ভাগ্যের সব ঝঞ্ঝাটের মীমাংসা করে দেবে। তাই ভাল, আর প্রণটাকে বেহায়া করে নিয়ে, একটা চায়ের পেয়ালা হয়ে কারও কাছে এগিয়ে যাবার দরকার নেই।

গিরিডির দিনগুলি মন্দ কাটে না। সারা দিন বাড়িতেই বসে থাকা, আর বিকেল হলে একটু বেড়িয়ে আসা। শুধু সড়ক ধরে সামান্য কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে উশ্রী নদীর কিনারাতে একটা কালো পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকা। বিকেলের রঙীন রোদ পাখায় মেখে বকের দল উড়ে যাচ্ছে ; চুপ করে কিছুক্ষণ দেখা।

এখন মনের সন্দেহটাও যেন সব জোর হারিয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। কি আর করা যাবে ? মৃণাল যদি পাটনাকে কোনমতেই আপন করে নিতে রাজি না হয়, আর গয়ার উকীল খগেনবাবুর বাড়িতেই বার বার এসে এক পেয়ালা চায়ের অভ্যর্থনা আশা করে, তবে তাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। আর খুঁতখুঁত করবার কোন মানে হয় না।

চমকে ওঠে প্রমিতা, কার পায়ের শব্দ যেন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে একেবারে প্রমিতার পাথরের পিছনে একটা ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে, ভয়ানক একটা অসম্ভবই সম্ভব হয়ে প্রমিতার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। ঘেন্নায় গা সিরসির করে প্রমিতার, রাগে চোখ জ্বলে ওঠে। আর নিজের ভাগ্যটাকেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে, বেশ হয়েছে, গয়া ছেড়ে চলে আসবার ভুলের এই রকমই শাস্তি হওয়া উচিত ! উশ্রী নদীর কিনারায় এমন নিরিবিলিতে, এই কালো পাথরটার উপরে কিছুক্ষণ বসে থাকবার শান্তিও আর ভাগ্যে সইল না।

সেই ভদ্রলোক, সেই বিশ্রী মতলবের লোকটা, বক্তিয়ারপুর থেকে গয়ায় ফেরবার পথে ট্রেনের কামরাতে যে লোকটা প্রমিতার শাড়ির আঁচল চেপে দিয়ে, গা ছুঁয়ে দিয়ে, পা মাড়াবার চেষ্টা করে আর কাঁধে ঠেলা দিয়ে, একটা নীচ লোভের খুশি হাসিল করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। চরম অভদ্রতায় সেই

ভদ্রলোকের ছায়া এখানেও প্রমিতার এই নিরিবিলি শান্তির উপরে আঁচড় দাগতে চলে এসেছে। শুনলে মাধু-বউদি যে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এমন অঘটনও সম্ভব হয়?

প্রমিতার ঘৃণা আর রাগের চোখ দুটো শুধু চকিতে একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী অদ্ভুত রকমের দুটো চোখ নিয়ে প্রতিমাকে দেখছেন ভদ্রলোক। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। যেন প্রমিতার চেহারাটাকে গিলে খাবার একটা লোভ অচঞ্চল হয়ে চক্‌চক্‌ করছে।

তাড়াতাড়ি চলে যায় প্রমিতা। ভদ্রলোক শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ওই ভয়ানক ছায়ার ভয়ে ওদিকে বেড়াতে যাবার আর উশ্রীর কিনারাতে ওই পাথরের উপরে বসবার আশা ছেড়েই দিতে হলো। বাড়ির সামনেই সড়কের উপর পায়চারী করে বিকেলবেলার বেড়াবার সাধ মিটিয়ে নেয় প্রমিতা। কিন্তু ভেবে একটু আশ্চর্য না হয়েও পারে না, সে ভদ্রলোক যে সত্যিই এই সড়কে কোনদিন দেখা দিল না। সেই নির্লজ্জ মতলব তো অনায়াসে এই রাস্তাতেও এসে প্রমিতার বেড়ানো বন্ধ করে দিতে পারে। মনে হয় লোকটা এখন গিরিডিতে নেই।

কিন্তু আর সাহসও হয় না, উশ্রীর কিনারার নিরিবিলিতে কালো পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকতে হলে আর একা-একা না যাওয়াই ভাল।

মাধু-বউদি বলেন—তোমাকে আর ওখানে একা-একা যেতে হবে না। আজ আমরাই যাব। আমাদের সঙ্গে চল। দেখে আসি, সত্যিই এই লোকটা সেই লোকটা কিনা।

ঠিকই, বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন খগেনবাবু, তরুলতা আর মাধু-বউদি, সেই ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে পাথরটার উপর বসে আছেন। খগেনবাবু বলেন—তাই তো, কি আশ্চর্য, সেই ছেলেটিই যে বসে রয়েছে।

মাধু-বউদি বলেন—একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, কেন এখানে এসে বসে রয়েছে।

—ওহে ইয়ংম্যান, শুনছো?

খগেনবাবুর গম্ভীর গলার ডাক শুনে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান আর নমস্কার করেন।

খগেনবাবু—আমাদের চিনতে পেরেছো নিশ্চয়?

—আজ্ঞে না?

—সত্যি কথা বলছো ?

—মিথ্যে কথা বলবো কেন ?

—বক্তিয়ারপুর থেকে গয়া যেতে ট্রেনের কামরাতে আমাদের একদিন দেখতে পাওনি ?

—একদিন ওই ট্রেনে যেতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আপনাদের কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—তাহলে তো বলতে হয়, তোমার বিস্মৃতির রোগ আছে।

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন—আজ্ঞে না।

—তুমি সেদিন খুবই অশোভন রকমের কাণ্ড করেছিলে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে আর চুপ করে কি-যেন ভাবলেন। তারপরেই খুব শান্ত স্বরে আস্তে-আস্তে কথা বলেন—হতে পারে।

খগেনবাবু বেশ ক্ষুব্ধভাবে বলেন —কেন হতে পারে ? কারণটা কি ?

—একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সেদিন খুবই··· ।

—তার মানে ?

—টেলিগ্রাম পেলাম, স্ত্রী হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

শুধু খগেনবাবু নয়, তরুলতা আর মাধু-বউদি, আর ওপাশে প্রমিতাও বোধহয় চমকে ওঠে।

খগেনবাবু—তোমার স্ত্রী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল তোমাদের ?

—এই তো কয়েক মাস হলো। বিয়ের ছ'মাস পরেই শান্তি মরে গেল।

তরুলতা—শান্তি মানে ?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর নাম শান্তি। সে এই গিরিডিরই মেয়ে।

তরুলতা—কি হয়েছিল শান্তির ?

—বলতে গেলে কিছুই হয় নি। সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল। তাই এরাও আমাকে কোন খবর জানায় নি। আমি তখন নালন্দাতে। সকালবেলা কাগজ কলম নিয়ে শান্তিকেই চিঠি লিখছি ; হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, শান্তি নেই।

খগেনবাবু—নালন্দা থেকে সোজা গিরিডিতেই এসেছিলে নিশ্চয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেও কিন্তু শান্তিকে দেখতে পাইনি। পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। এসে দেখি ওরা চিতে ধুয়ে-টুয়ে সব শূন্য করে রেখে দিয়েছে।

খগেনবাবু—থাক, আর বেশি বলো না, শুনতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

তরুলতা—তোমাদের বাড়ি এখানেই ?

—আজ্ঞে না। কলকাতায়। আমি কলেজে ইতিহাস পড়াই।

খগেনবাবু—তোমার নাম ?

—মণীশ রায়।

খগেনবাবু—এবার বুড়ো মানুষের একটা অনুরোধের কথা শোন মণীশ।

—বলুন।

—চেষ্টা করে মনটাকে শান্ত কর। কি আর করবে বল ? দুঃখ ভুলে যেতে পারলেই ভাল।

মণীশের মুখের করুণ হাসিটাও যেন প্রসন্ন হয়ে উঠতে চেষ্টা করে—কথাটা ঠিকই বলেছেন। কাল সন্ধ্যাতেই কলকাতা রওনা হব। কাজেই আজ শেষবারের মতো এখানে…।

চমকে ওঠে প্রমিতার চোখের তারা। মাধু-বউদিও যেন চোখ দু'টি বড় করে বুঝতে চেষ্টা করছেন, কি বলতে চাইছে মণীশ।

মণীশ বলে—শান্তির একটা অভ্যেস ছিল ; প্রায়ই এখানে এসে এই পাথরের উপর বসে বিকেলের উশ্রীর শোভা দেখতো। আমিও এখানে এসেই বসতাম। কিন্তু, আজ দেখুন, সেই উশ্রী আছে, আমিও আছি—শুধু শান্তি নেই।

তরুলতার চোখ ছলছল করে—আচ্ছা এবার আমরা চলি।

খগেনবাবু—আচ্ছা তুমি বসো মনীশ। আমরা চলি। কিছু মনে করোনা, মিছামিছি তোমাকে একটু বিরক্ত করে গেলাম।

মাধু-বউদি হঠাৎ উদ্বিগ্নভাবে প্রমিতার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করেন—এ কি ? কি হলো ? তুমি এরকম করছো কেন প্রমিতা ?

রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রমিতা। এখন যে চলে যেতে হবে, চলে যাবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রমিতা যেন কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পারছে না। বোধহয় সব হিসেব ভুল হয়ে গিয়েছে, কিংবা হিসেবের সব ভুল ধরা পড়ে গিয়েছে।

—কথা বল, প্রমিতা ? মাধু-বউদি আবার ফিসফিস করেন।

কি বলবে আর কেমন করে বলবে প্রমিতা ? গিরিডির মেয়ে শান্তি এসে যেখানে বসে থাকতো, সেখানে ভুল করে গয়ার মেয়ে এসে বসে পড়েছিল, দেখতে পেয়ে কে-জানে কী ভেবেছিলেন ভদ্রলোক।

প্রমিতা বলে—ভদ্রলোক কি এখনও এখানে একা-একা বসে থাকবেন ?

মাধু-বউদি—হ্যাঁ।

প্রমিতা—এটা ভাল দেখায় না বউদি।

মাধু-বউদি আশ্চর্য হয়ে প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় প্রমিতা? মণীশ নামে এই ভদ্রলোককে একটা শূন্যতার মায়ার কাছে একা রেখে চলে গেলে কি অভদ্রতা হবে?

মাধু-বউদি বলেন—যা বলবার স্পষ্ট করে বলেই ফেল, প্রমিতা।

প্রমিতা—ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে চল না কেন?

মাধু-বউদি—কেন? কোথায় যাবেন ভদ্রলোক?

প্রমিতা—আমাদের বাড়িতে, চা খাবেন।

চমকে ওঠেন মাধু-বউদি—তারপর কি হবে? নিজেই চা নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে?

—পারবো।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয় পারবো। এবার দেখে নিও, কোন ভুল হবে না।

না য়ি কা মু গ্ধা

দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে কুন্তলা, মানুষ এভাবে একটা অসম্ভবের আশায় এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে! ভদ্রলোকের নাম-ধাম গোত্রের কোন পরিচয় জানে না কুন্তলা। ভদ্রলোকও কুন্তলার নাম-ধাম-গোত্রের কী পরিচয়—আর কতটুকু পরিচয় জানতে পেরেছে কে জানে? মনে হয় কিছুই জানতে পারেনি। জানবে কেমন করে? ভদ্রলোক শুধু জানে যে, এই অফিসে কাজ করে কুন্তলা। কুন্তলা নামটাকেও জানে বলে মনে হয় না। জানলে এতদিনে কি কুন্তলার নামে আর এই অফিসের ঠিকানাতে একটা চিঠি লিখে ফেলতেন না এই ভদ্রলোক?

মান-সম্ভ্রমের কোন বোধ, কিম্বা কোন লজ্জার বোধ এই ভদ্রলোকের আছে কিনা সন্দেহ। পাঁচটা বাজতেই অফিসের যখন ছুটি হয়, তখন অফিসের বাইরে এসেই দেখতে পায় কুন্তলা, বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন এই ভদ্রলোক। সাজে-পোষাকে বেশ পরিপাটি যত্ন আছে, দেখতেও বেশ ভাল। বয়সই বা কত হবে? ত্রিশের বেশী হতেই পারে না। কে জানে কোথায় কী কাজ করেন ভদ্রলোক। ঝড় বৃষ্টি আর কড়া রোদ, শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষার সব দিনেই দেখা যায়; ভদ্রলোক একেবারে নিয়মিত ও অমোঘ একটি আবির্ভাবের মতো কুন্তলার এই অফিসের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

এই অফিসের কোন লোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ-পরিচয় কিংবা সামান্য চেনা-শোনাও যে নেই, সেটাও বেশ বুঝতে পারা যায়। ছুটির পর অফিসের এত লোক বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকিয়ে গল্প করে নিচ্ছে, হাসাহাসি করছে, খেলার কথা আর সিনেমা-ছবির কথা আলোচনা করছে, কিন্তু কই? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তো কাউকে কথা বলতে দেখা যায় না। অফিসের লোকেরা মনে করে, এই ভদ্রলোক নিজের কোন কাজের জন্য এসেছেন আর দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা কারও অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু কোন্ কাজের জন্য কিংবা কার অপেক্ষায়, সেটা জানবার জন্যে কারও মনে কোন ইচ্ছা বা চেষ্টার সাড়া নেই। কুন্তলাকেও তাই একটু আশ্চর্য হতে হয়েছে আর সন্দেহও করতে হয়েছে, তবে কি কুন্তলাকে দেখবার জন্যেই ভদ্রলোক রোজ পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে এখানে আসেন আর দাঁড়িয়ে থাকেন?

পুরো একটা বছর হলো, ভদ্রলোক রোজ আসছেন। রোজ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর কোথায় কোন্ দিকে আর কখন যে চলে যান, তাও জানে না কুন্তলা। কারণ, অফিস থেকে বের হয়ে এই ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে সেই যে মুখ ঘুরিয়ে নেয় কুন্তলা, তারপর আর কোন মুহূর্তেও ভদ্রলোকের দিকে তাকায় না। গেট পার হয়ে ফুটপাথের উপরে এসে প্রায় পাঁচ দশ মিনিট কুন্তলাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিন্তু ভুলেও মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকায় না কুন্তলা। জানতেও পারে না কুন্তলা, ভদ্রলোক এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি নেই।

ভদ্রলোক কি সত্যিই বিশ্বাস করেছেন যে, কুন্তলা একদিন হঠাৎ কথা বলে ফেলবে? ভদ্রলোকের চোখের চাহনিতে যেন একটা আশার ব্যাকুলতা লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু কী ভয়ানক একটা ভুল স্বপ্ন মনে পুষে রেখেছেন ভদ্রলোক। কুন্তলার মতো মেয়ে যে কোনদিনও নিজেকে এত ছোট আর এত নীচু করে ফেলতে পারে না, সে-খবর জানেন না ভদ্রলোক। একজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে-পড়ে কথা বলা কুন্তলার মতো মেয়ের জীবনের কোন গরজ হতে পারে না। কুন্তলার মতো শিক্ষিতা আর সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে যেচে কথা বলবার জন্য কারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সে-খবরও জানেন না এই ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখের চাহনীতে একটু সাবধানতা আর একটু বুদ্ধি থাকলে ভদ্রলোক বুঝতে পারতেন। রোজই তো ওখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে পান ভদ্রলোক, এই পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে পর-পর তিনটে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে চলে যায় এক-একটি তরুণ অনুরোধ

—চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই ভদ্রলোক জানেন না, ওরা কারা এত আগ্রহ করে কুন্তলার একটু সান্নিধ্য কামনা করে এরকম অনুরোধের কথা বলছে। ওরা শিক্ষিত, ওরা যথেষ্ট বিত্তবান আর বড় রোজগারের মানুষ। ওরা এক-একটা সুন্দর শখের আর স্টাইলের মানুষ। কুন্তলা যদি নিজে একটু আগ্রহ করে ওদের কারও একজনের গাড়িতে উঠে পড়ে, তবে একদিন তারই জীবনের চিরকালের সঙ্গিনী হয়ে যাবে কুন্তলা, এই সত্যে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু না, কুন্তলার জীবনে এই অহংকারটুকু আছে ; একটা ঝকঝকে গাড়ির অনুরোধের ভাষা শুনে একেবারে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে, এমন মনের মেয়ে নয় কুন্তলা।

তাই ভাবতে গিয়ে মনে-মনে এক-একবার হাসিও পায় কুন্তলার, এই ভদ্রলোকের আশার সাহস তো খুবই অদ্ভুত। শুধু চুপ করে একটা আপেক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই স্বপ্ন সফল হবে, এইরকম একটা বিশ্বাস ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট করে রেখে দিয়েছে! তা না হলে কি একটা মানুষ এভাবে পুরো এক বছর ধরে শুধু কুন্তলাকে একবার দেখবার জন্ম রোজ এসে এই অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন?

এভাবে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকলেও ভদ্রলোকের কোন লাভ হবে না। কারণ ভদ্রলোক জানতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে কুন্তলার মন এই অচেনা আবির্ভাবের উপর কত বিরক্ত ও তিক্ত হয়ে উঠেছে। এটা যে কুন্তলার জীবনের উপর একটা উপদ্রব! অফিস থেকে বের হবার আগেই কুন্তলার মন অস্বস্তিতে ভরে যায়। বের হয়েই তো দেখতে হবে, সেই ভদ্রলোক অদ্ভুত একটা পিপাসা দুই চোখে ভরে নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। কুন্তলা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একেবারে একটা মুগ্ধতার মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কুন্তলার সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন ভদ্রলোক। সে-সময় ভদ্রলোকের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাগোনাও বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়। এক-একবার চোখে পড়েছে কুন্তলার, ভদ্রলোকের হাতের জলন্ত সিগারেট শুধু পুড়ছে, সিগারেট মুখে দিতে ভুলে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রথম-প্রথম ভয় হতো ; ট্রামে উঠেই একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিত কুন্তলা, ভদ্রলোকও পিছু-পিছু এসে ট্রামে উঠে পড়েননি তো? ট্রাম থেকে নেমেও সাবধানে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখতো কুন্তলা, ভদ্রলোকও ট্রাম থেকে নেমে পড়েননি তো? সন্দেহ হয়েছিল, এমন বেহায়া মানুষ কুন্তলার

বাড়ির সন্ধান নিতেও চেষ্টা করবে।

ভুল সন্দেহ। মিথ্যে ভয়। এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের সব মতলব আর ইচ্ছা যেন নিদারুণ এক অলস তপস্যার মধ্যে অনড় হয়ে পড়ে আছে। শুধু কুন্তলাকে চোখে দেখবার চেষ্টা ছাড়া আর কোন চেষ্টাই নেই।

আরও আশ্চর্য, এই এক বছরে কলকাতা সহরের কত জায়গাতেই তো যেতে হলো কুন্তলার, কতবার ট্রামে বাসে ঘুরতে হলো; কত দোকানে ঘুরে জিনিস কিনতে হলো, কিন্তু কোনদিনও তো কোথাও এই ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। কুন্তলা যদি ভদ্রলোকের কাছে এমনই একটি আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে কুন্তলাকে পৃথিবীর অন্য কোন জায়গাতে একবার দেখবার জন্ম কোন সখে ভদ্রলোকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠেনি কেন? কুন্তলার জীবনটা তো শুধু এই অফিসের ছ'টি ঘণ্টার জীবন নয়। কুন্তলাকে তো ছবির এগজিবিশনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে আর সিনেমা ভবনের লাউঞ্জেও দেখা যায়। ভদ্রলোক যদি কুন্তলার জীবনের পরিচয় আরও ভাল করে পেতে চাইতেন, তবে কুন্তলার ছায়া অনুসরণ করে কুন্তলার নাম-ধাম-গোত্রের পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তা হলে, আর চেষ্টা করলেই দেখতে পেতেন ভদ্রলোক, কুন্তলার এই সুন্দর চেহারা কী অদ্ভুত সুন্দর সাজে সেজে মার্কেটের ষ্টলের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে চলে যায়।

কুন্তলার অস্বস্তিটা যেন মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে উঠেছে, এই ভদ্রলোককে আর কোথাও কোনদিনেও দেখতে পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকের উপরে মনের এই এক বছরের যত সন্দেহ বিরক্তি আর বিদ্রূপ, সবই যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়ে ছটফট করে। লোকটাকে ঘেন্না করবার মতো এত কারণ থাকতেও ঘেন্না করতে পারা যাচ্ছে না।

কিন্তু ইচ্ছে করে ঠিকই, মনের অস্বস্তিটা যেন একটা জ্বালা হয়ে ওঠে। ভদ্রলোককে একটা কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, এভাবে একটা মেয়ের চোখের কাছে রোজই উপদ্রবের মতো দেখা দিতে আপনার কি একটুও লজ্জা বোধ হয় না?

সেদিন খুব ঝড় আর বৃষ্টি চলছিল। তাই অফিসের ছুটির পরেও বাইরের বারান্দায় এসে কুন্তলাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অচেনা ভদ্রলোকের চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা। মনে হয়েছিল, আজ নিশ্চয়ই ভুল করে কথা বলে ফেলবেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত জবাবও শুনিয়ে দেবে কুন্তলা। তার মানে একটিও কথা না বলে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে

দেওয়া হবে যে, কুন্তলার কাছে উনি নিতান্ত একটি তুচ্ছ অস্তিত্ব।

না; এমন তুচ্ছতা দেখাবার সুযোগও পায় নি কুন্তলা। কারণ এই অদ্ভুত ভদ্রলোক কুন্তলাকে চোখের এত কাছে আধটি ঘণ্টা ধরে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও একটি কথা বললেন না।

বৃষ্টি থামবার পর, ট্রামে ওঠবার পর, ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফিরে এসে চা খাওয়ার পরও ঘরের ভিতরে চুপ করে পুরো একটি ঘণ্টা বসে থাকবার পর, কুন্তলার মনের ভিতরে যেন একটা অদ্ভুত অভিমানের বেদনা জ্বলতে থাকে। সেই অভিমানের সঙ্গে যেন একটা অপমানের ছায়াও মিশে আছে। লোকটা যেন আজ নিজেই মস্ত বড় একটা সুবিধা পেয়ে গিয়ে কুন্তলাকে তুচ্ছ করে সুখী হয়ে গেল।

কিন্তু পরের দিনও তো আবার ঠিক সেই পাঁচটার সময় অফিসের বারান্দায় একটা দুরন্ত পিপাসিত অপেক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। কুন্তলাকে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোকের চোখ দুটো তো আবার সেই রকমই নিবিড় হয়ে ওঠে।

প্রণব সরকার গেটের সামনেই রাস্তার উপর গাড়ি থামিয়ে জোরে হর্ণ বাজাচ্ছে। ইচ্ছা করে কুন্তলার, এখনই হেসে-হেসে সাড়া দিয়ে ছুটে গিয়ে প্রণব সরকারের গাড়ির ভিতরে উঠে পড়তে। তারপর দেখা যাবে, এই ভদ্রলোকের চোখ দুটো বোকা হয়ে, জব্দ হয়ে আর করুণ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিনা।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, এই সামান্য একটা অচেনা আজানা লোকের চোখের আশাকে জব্দ করতে গিয়ে কুন্তলা একটা জঘন্য কাণ্ড করে ফেলতে পারে না।

কিন্তু আর চুপ করে থাকবারও যে শক্তি নেই কুন্তলার। এই ভদ্রলোকের চোখের ওই ভয়ানক শান্ত লোভের দৃষ্টি আর সহ্য হয় না। ভদ্রলোককে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে ফেললেই তো হয়—আপনি রোজ এখানে আসেন কেন? কোন্ সাহসে? অপমানিত হবার কোন ভয় নেই বুঝি?

এমন প্রশ্ন করবার ইচ্ছাটা যে একটা যুক্তিহীন অভদ্রতার ইচ্ছা, তাও বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল কুন্তলা। তা না হলে সেদিন হঠাৎ চোখ-মুখ একেবারে কঠোর করে নিয়ে আর রুক্ষস্বরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে ফেলতে পারতো না কুন্তলা—আপনি রোজই এখানে কিসের জন্য আসেন? এই অফিসে আপনার কী কাজ আছে?

ভদ্রলোক হাসতে চেষ্টা করেন—কোন কাজের জন্যে আসি না।

—অদ্ভুত কথা। কাজ নেই, তবু এক বছর ধরে রোজই আসেন। লজ্জার কথা।

—লজ্জার কথা কেন হবে? আপনিই বা একথা বলছেন কেন?

—আমি কেন বলছি, সেটা আপনি জানেন!

—আমি তো আপনাকে চিনিও না।

—আমিও তো আপনাকে চিনি না।

—তাইতো বলছি, আপনি হঠাৎ আমাকে এরকম একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করে বসলেন কেন?

কুন্তলার গলার স্বর আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে।—আপনি রোজই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, এটা খুব কাজের কাজ, না?

—না।

—আপনার উদ্দেশ্য কি?

—আপনি পুলিশের মতো মেজাজ নিয়ে কথা বলছেন কেন? ভদ্রলোকের গলার স্বরও ভয়ানক তীব্র হয়ে কুন্তলাকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

অফিসের ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর লাঠি ঠুকে ঠুকে বের হয়ে এলেন অফিসের সিনিয়র ক্লার্ক, বুড়ো অনাদিবাবু। চোখে ভাল দেখতে পান না। তাই পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে অনাদিবাবুর চোখ দুটো টান হয়ে সামনের মানুষগুলিকে দেখবার চেষ্টা করে। মৃদুস্বরে একটা কথাও বলেন অনাদিবাবু—মনোজ এসেছ নাকি!

—এই যে, আমি এসেছি কাকা। এগিয়ে গিয়ে অনাদিবাবুর হাত ধরেন ভদ্রলোক।

চমকে ওঠে কুন্তলা। ভদ্রলোকের মুখের দিকে, তার মানে মনোজের মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

যেন কুন্তলার জীবনের একবছরের একটা আদুরে স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই মনোজ তাহলে কুন্তলার জীবনের কোন উপদ্রব নয়। বুড়ো কেরানী অনাদিবাবু হলেন এই মনোজের কাকা। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে, চোখে ভাল দেখতে পান না কাকা তাই ভাইপো রোজই এখানে এসে কাকাকে বাড়ি নিয়ে যায়। এই তো ব্যাপার।

কিন্তু কী ভয়ানক ছলনার ব্যাপার! এই ছলনা এক বছর ধরে কুন্তলার প্রাণটাকে অস্বস্তির কাঁটায় বিঁধে বিঁধে কষ্ট দিয়েছে। আর এখন কত খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত মনে, যেন একটা জয়ের গর্ব নিয়ে কাকার হাত ধরে চলে যাবার জন্য

তৈরী হয়েছে।

চোখ ভিজে গিয়েছে কুন্তলার। অনাদিবাবুর কাছে এগিয়ে যায় কুন্তলা—আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

অনাদিবাবু চোখ টান করে তাকান—ও হ্যাঁ, তুমি তো আমাদের কুন্তলা। তাই না ?

কুন্তলা হাসে—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছেন ; কিন্তু আপনি কি এখন বাড়ি যাচ্ছেন ?

অনাদিবাবু—হ্যাঁ, আজকাল তো একা-একা বাড়ি যেতে পারি না। একজন কেউ সাহায্য না করলে··· ।

কুন্তলা—আপনি আমাকে বললেই তো পারতেন। আমি ছুটির পর আপনাকে বাড়ি পেঁৗছে দিতে একটু সাহায্য নিশ্চয় করতে পারতাম।

অনাদি—তা দরকার হলেই বলবো।

কুন্তলা হাসে—আজই বলুন না।

অনাদিবাবু—আজ তো মনোজ আছে।

কুন্তলা—আজ ওঁকে চলে যেতে বলে দিন। আমিই আপনাকে বাড়ি পৌছে দেব।

অনাদিবাবু আশ্চর্য হয়ে তাকান—তুমি পৌছে দেবে ? তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে ?

কুন্তলা—হ্যাঁ।

অনাদিবাবু—মনোজ, তুমি তবে আগেই চলে যাও।

মনোজও আশ্চর্য হয়ে কুন্তলার দিকে তাকায়। কুন্তলা বেশ একটু ভ্রুকুটি করে, আর যেন চাপা অভিমানের স্বরে কথা বলে।—যান না, আমিও তো একটু পরে কাকাকে সঙ্গে নিয়ে আসছি।

—:০:—